বেলা-অবেলা

বাংলাদেশ ১৯৭২-১৯৭৫

মহিউদ্দিন আহমদ

বাহাত্তরে একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে উঠে দাঁড়াল বাংলাদেশ। সরকারের হাল ধরল আওয়ামী লীগ। এর মধ্যে দেশে অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে। জনজীবনের স্বাভাবিক ছন্দ গেছে হারিয়ে।
মানুষের আকাঙ্ক্ষা হয়েছে আকাশছোঁয়া। রাজনীতি বদলে যাচ্ছে, সমাজে চাহিদারও পরিবর্তন হচ্ছে।
দেশ এগোচ্ছে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে গোপন রাজনীতির সশস্ত্র ধারা।
তিন বছর যেতে না যেতেই হোঁচট খেল সংবিধান। দেশে জারি হলো জরুরি আইন, একদলীয় সরকারব্যবস্থা।
পঁচাত্তরের আগস্টে ঘটল রক্তাক্ত পালাবদল। হত্যা, অভ্যুত্থান আর পাল্টা অভ্যুত্থানে টালমাটাল হলো দেশ।
অস্থির সেই সময়ের ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ বইয়ে।

বাহাত্তরে শুরু হলো বাংলাদেশের নবযাত্রা।
সবার প্রাপ্য মেটানোর ক্ষমতা দারিদ্র্য-পীড়িত এই দেশটির ছিল না।
ক্ষমতার রাজনীতির লাগামহীন প্রতিযোগিতায় নির্বাসিত হলো গণতন্ত্র।
দেশ ধেয়ে গেল অনিশ্চয়তার দিকে।
পঁচাত্তরে ঘটল রক্তাক্ত পালাবদল। এ বইয়ে স্পর্শকাতর
সেই সময়ের একটি ছবি এঁকেছেন মহিউদ্দিন আহমদ।

Bela Obela
Bangladesh 1972-1975

A Baatighar publication

UB 9 789848 034682

মহিউদ্দিন আহমদ

জন্ম ঢাকায়। পড়াশোনা গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে।
১৯৭০ সালের ডাকসু নির্বাচনে মুহসীন হল ছাত্র সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিএলএফের সদস্য হিসেবে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।
সাংবাদিকতা করেছেন কিছুদিন।
একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। নাগরিক আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে পৃথিবীর নানা প্রান্তে গেছেন।
দক্ষিণ কোরিয়ার সুংকোংহে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মাস্টার্স ইন এনজিও স্টাডিজ' কোর্সের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও অধ্যাপক।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে তাঁর কয়েকটি বই পাঠকপ্রিয় হয়েছে।
বাতিঘর প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য বই :
ইতিহাসের যাত্রী, *রাজনীতির অমীমাংসিত গদ্য*, *বোমা বন্দুকের চোরাবাজার*, *Dream Merchant : Story of Brac*, *৩২ নম্বর পাশের বাড়ি*।

আলোকচিত্র : খালেদ সরকার

বেলা-অবেলা

বেলা-অবেলা

বাংলাদেশ ১৯৭২-১৯৭৫

মহিউদ্দিন আহমদ

বেলা-অবেলা : বাংলাদেশ ১৯৭২-১৯৭৫
মহিউদ্দিন আহমদ

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২৬, ফেব্রুয়ারি ২০২০
প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪২৬, ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রকাশক : বাতিঘর
রুমী মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

বিক্রয়কেন্দ্র
বাতিঘর ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামোটর
বাতিঘর চট্টগ্রাম : প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড
বাতিঘর সিলেট : গোল্ডেন সিটি কমপ্লেক্স, ৬৮২ পূর্ব জিন্দাবাজার

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : বাতিঘর প্রকাশনা বিভাগ

মূল্য : ৭০০ টাকা

Bela Obela : Bangladesh 1972-1975
by Mohiuddin Ahmad

Published by Baatighar
Rumi Market, 68-69 Pyari Das Road, Banglabazar, Dhaka, Bangladesh
Email : baatighar.pub@gmail.com Web : www.baatighar.com

৳ 700.00

ISBN : 978-984-8034-68-2

কর্মী-সম্পাদক মতিউর রহমান

ভূমিকা

কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের মনে খেদ ছিল। তিনি বলেছিলেন,

> 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়...। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?
>
> তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইঁহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?
>
> আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যত দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক: ক্ষুদ্র-কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।'

বিদেশিরা যখন আমাদের নিয়ে লেখেন, তাতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ থাকে। ইংরেজ ইতিহাসবিদ লেখেন, ১৮৫৭ সালে ভারতে 'সিপাহি বিদ্রোহ' হয়েছিল। ইউরোপীয় হয়েও দার্শনিক কার্ল মার্ক্স আমাদের শেখালেন, এটা ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। একজন পাকিস্তানি ইতিহাসবিদ লেখেন যে, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার 'পতন' হয়েছিল। আমরা বলি ঢাকা 'মুক্ত' হয়েছিল।

যখন নিজেদের কথা নিজেরা লিখতে বসি, তখন আমরাও কিছু সমস্যা তৈরি করি। নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে অনেক সময় ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ঢুকিয়ে দিই। এখানে লেখকের সামাজিক শ্রেণি অবস্থান ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব থাকে। এমনকি যারা অ্যাকাডেমিক গবেষণা করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা একটা ধারণা বা প্রস্তাবনা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এসব গবেষণায় পুরো ক্যানভাসটি ধরা পড়ে না। তারপরও বলা চলে, এসব গবেষণা হতে পারে সময়ের মূল্যবান দলিল, যা পরবর্তী প্রজন্মের ইতিহাসচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে থেকে যায়।

সমকালীন ইতিহাসচর্চার অনেক ঝক্কি। আমি কী মনে করি, আমার অনুমান বা ধারণা কী, এ নিয়ে ইতিহাস হয় না। ইতিহাসচর্চার মূল কথা হলো সত্য

উদ্‌ঘাটন। আমরা অনেকেই সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পাই। সময়ের চরিত্রগুলো যদি স্মৃতিতে জীবন্ত থাকে কিংবা বাস্তবে চোখের সামনে হাঁটাচলা করে, তাদের নিয়ে লেখা বিব্রতকর কিংবা বিপদজনক হতে পারে। কেননা অতীতের সত্য প্রকাশ পেলে কারও কারও বর্তমানটা ঝুঁকিতে পড়ে যায়। সেজন্য নিকট-অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করার কারণে নানান সমস্যা তৈরি হতে পারে।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নানা ঘটনার জন্ম হচ্ছে। সবটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। যারা রাজনীতিতে এখনো সক্রিয় কিংবা আগে সক্রিয় ছিলেন এবং এখন নিষ্ক্রিয়, তাঁরা অনেকেই ইতিহাসের সাক্ষী শুধু নন, তাঁরাও ইতিহাসের চরিত্র এবং অনেক ক্ষেত্রেই নির্মাতা। ইতিহাসের টালমাটাল সময়টাতে তাঁরা অনেকেই নিহত হয়েছেন কিংবা মারা গেছেন। ফলে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্যই চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে। যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের অনেকেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। সবাই সবটা বলেন না। কেউ যদি কিছু বলেন, তিনি অনেক সময় নিজের ভূমিকা অতিরঞ্জন করেন, অন্যকে খাটো করে দেখান। সব তথ্য সব সময় যাচাই করা সম্ভব হয় না। ইতিহাসচর্চার এই চ্যালেঞ্জগুলো রয়েই গেছে।

দেখতে দেখতে বাংলাদেশ কয়েক দশক পার করে ফেলেছে। তবে স্বাধীনতার পরের প্রথম কয়েক বছর ছিল ঘটনাবহুল, অস্থিরতায় টালমাটাল। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশ চালিয়েছে আওয়ামী লীগ এবং হাল ধরেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই পর্বটি বাংলাদেশের জন্য খুবই তাৎপর্যের। এর পর দেশের চালচিত্র বদলে গেছে, তাই একাত্তর-পরবর্তী এই পর্বের একটি নৈর্ব্যক্তিক সুরতহাল করার ইচ্ছে ছিল অনেক দিনের।

এই বইয়ে ১৯৭২-১৯৭৫ পর্বের বাংলাদেশকে তুলে ধরা হয়েছে কয়েকটি অধ্যায়ে। এই সময়টির বহুমাত্রিকতা একটি মাত্র বইয়ের মধ্যে পরিবেশন করা রীতিমতো অসম্ভব। তারপরও একটা চেষ্টা করেছি ঘটনাক্রম যতটুকু সম্ভব বর্ণনা করার। হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা বিষয় বাদ পড়ে গেছে। তবে ওই সময়টাকে ফিরে দেখার একটা তাগিদ আছে, প্রয়োজন আছে জন-আলোচনায় নিকট অতীতকে নিয়ে আসার। আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্মোপলব্ধির জন্য এটা দরকার। পঁচাত্তরের মধ্য আগস্টের পর বিপর্যস্ত আওয়ামী লীগের একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আবার ফিরে আসাটাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্য আগস্ট-পরবর্তী এই সময়টি খুব সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

১৯৭১ সালের পর আওয়ামী লীগ নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে। এতদিন দলটি ছিল রাজপথে, মিছিলে-স্লোগানে, যুদ্ধে। যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের হাল ধরেছিল আওয়ামী লীগ। এর মধ্যে দেশে অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে।

জনজীবনের স্বাভাবিক ছন্দটা হারিয়ে গেছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা হয়েছে আকাশছোঁয়া। একটা উপনিবেশ-উত্তর সমাজে আওয়ামী লীগের মতো মধ্যবিত্তের একটি মধ্যপন্থী দল দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেয়েছে, আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দলের বিবর্তন ঘটেছে, সমাজে চাহিদারও পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ ছিল রাজনীতির মূলধারা। পরে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্ম হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতার লড়াইয়ে তাকে অন্যের সঙ্গে নামতে হয়েছে প্রতিযোগিতায়। এসব কথা একটু গুছিয়ে বলার চেষ্টা করেছি।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের নবযাত্রা শুরু। দেশটা এগোচ্ছে অনেক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে রাজনীতিতেও। একটি মাত্র গ্রন্থে তার সবটা ছেঁকে তোলা যাবে না। অনেকেই এই দলটি এবং ওই সময়টি নিয়ে লিখেছেন, ভবিষ্যতেও লিখবেন। এই কাজে আমি শামিল হয়েছি মাত্র।

বাংলাদেশের বিগত বছরগুলোর ইতিহাস হলো নানান উত্থান-পতন, সাফল্য আর ব্যর্থতার যুগলবন্দি। দৃশ্যমান রাজনীতির আড়ালে যাঁরা কলকাঠি নাড়েন, তাঁদের আসল চেহারা মঞ্চের উজ্জ্বল আলোয় সব সময় ধরা পড়ে না। নেপথ্যের চেহারাটা কদাচিৎ গণমাধ্যমে উঠে আসে। অথচ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয় পর্দার আড়ালে। এর অনেকটাই থেকে যায় অজানা। ইতিহাসচর্চার জন্য এই অজানা দৃশ্যগুলো সামনে তুলে আনা জরুরি।

ইতিহাস লেখার কাজটি সময়সাপেক্ষ. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই লিখতে হয়। তথ্য সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। যাঁরা বলছেন বা লিখছেন, তাঁদের কথা ও লেখা থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। ফলে যত দিন যায়, ইতিহাস হয়ে ওঠে ততই তথ্যসমৃদ্ধ। এখানে আমি যা লেখার চেষ্টা করেছি, দশ বছর আগে হয়তো এত কিছু লিখতে পারতাম না। আবার দশ বছর পর হয়তো নতুন নতুন তথ্য পেয়ে আরও ভালোভাবে লিখতে পারব। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া

কাজটি করতে গিয়ে অনেক লিখিত সূত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু সবকিছু তো লেখা হয়নি। সেজন্য প্রাসঙ্গিক অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। কেউ কেউ কথা বলতে রাজি হননি। তাদের হয়তো পিছুটান আছে। হয়তো তাঁরা মনে করেন সব কথা লেখার এটা উপযুক্ত সময় না, হয়তো অনেকে বিব্রত হবেন। আশা করি, যখন তাঁদের সময় হবে তাঁরা লিখবেন। আবার কেউ কেউ মন খুলে কথা বলেছেন। তাঁরা এমনও বলেছেন যে, কেউ তো আসে না, জানতে চায় না। কথা বলতে গিয়ে কিছুটা অস্বস্তি এবং ভীতিও লক্ষ করেছি। রাজনীতির ময়দানে সবাই তো সন্ত নন। তাঁদের কারও কারও জীবনে একটা উজ্জ্বল অধ্যায় যেমন আছে, তেমনই আছে একটা অন্ধকার দিক। কেউ চান না অন্যরা তা জেনে যাক।

এই সব অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমাকে এগোতে হয়েছে। আমি যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাঁদের তালিকা বইয়ের শেষে দেওয়া আছে।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় দুটো বিষয় ভাবনায় রাখতে হয়েছে। এক, তাঁরা কতটুকু প্রাসঙ্গিক এবং, দুই—তাঁদের দেওয়া তথ্য কতটুকু নির্ভরযোগ্য। আমার জন্য এ কাজটা ছিল কঠিন। তবে কয়েক বছর ধরে ইতিহাসচর্চার এই প্রক্রিয়ায় থেকে অনেক জেনেছি, বুঝেছি, চিনেছি। এক সময় রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম। এজন্য রাজনীতির ভাষা কিছুটা হলেও বুঝি এবং রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট লোকদের বডি-ল্যাঙ্গুয়েজও কিছু কিছু পড়তে পারি। আবার কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও ছাত্রদের গবেষণা তত্ত্বাবধান এবং বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করার সুবাদে গবেষণা পদ্ধতির টেকনিক্যাল বিষয়গুলো সম্বন্ধেও কিছু জানার সুযোগ ও অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি কোনো প্রশ্নমালা নিয়ে তাঁদের সামনে হাজির হইনি। আমরা আলাপ করেছি। প্রয়োজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন। ফলে কিছু না কিছু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। স্পষ্টতার জন্য আবারও যোগাযোগ করেছি। আলাপ করতে করতেই বোঝা যায়, কোনটা কেচ্ছা, কোনটা সত্য, কোনটা সমালোচনা, কোনটা গিবত

পাঠকের সমস্যাও কম নয়। এক ধরনের তথ্য-উপাত্তে যে পাঠকমন তৈরি হয়, সেখানে হুট করে নতুন কোনো তথ্য কিংবা বিশ্লেষণ ঢুকে পড়লে তা পাঠকের মানসিক ছাঁচের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। পূর্ব-ধারণার ভিত্তিতে যে পক্ষপাত বা বিদ্বেষ গড়ে ওঠে, তাকে সরিয়ে দিয়ে নতুন করে ভাবতে পারার ইচ্ছা বা সাহস আমাদের অনেকেরই নেই। বস্তুনিষ্ঠতা শুধু লেখকের জন্য নয়, পাঠকের জন্যও একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ হলো বিশ্বাসকে অতিক্রম করে যুক্তিকে গ্রহণ করার।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য কেউ কেউ নাকচ করে দেন। তাঁদের যুক্তি হলো, কে ঘরের মধ্যে কী বলল, কোনো সাক্ষী-সাবুদ নেই, সেটাকেই কি সত্য হিসেবে মেনে নিতে হবে? সমস্যা হলো, কিছু কিছু তথ্য তো সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিতেই হবে। আর কোনো সূত্র নেই। সবটা তো সবাই লিখে রেখে যাননি। আর লিখে গেলেও কি তার সবটা বিশ্বাসযোগ্য? লিখিত ভাষ্য আর কথ্য ভাষ্যের মধ্যে আমি কোনো বিরোধ দেখি না। দুটোর মধ্যেই নির্ভেজাল তথ্য থাকতে পারে, আবার কল্পকথাও থাকতে পারে। যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, তাঁর ইচ্ছা ও সততার ওপর নির্ভর করে, তিনি কতটুকু নেবেন, কতটুকু ফেলে দেবেন। যিনি বলছেন এবং যাঁর সম্পর্কে বলছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিক গঠন, অতীত কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করেই তাঁদের দেওয়া তথ্যগুলো বস্তুনিষ্ঠতার চালুনি দিয়ে ছেঁকে তুলতে হয়। তারপরও ভুল করার বা বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। আমি

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সৎ ও নির্মোহ থাকতে। বাকি বিচার পাঠকের হাতে।

লিখতে গিয়ে অনেকের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছি। সুমন মাহমুদ, হাবিব বাবুল, আহমদ তাবশির চৌধুরী, জাফর আহমদ রাশেদ ও মোহাম্মদ ইনজামুল হক নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এ বইয়ে ব্যবহৃত ছবিগুলো সমসাময়িক পত্রিকা, ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও ইন্টারনেট থেকে নেওয়া।

লেখায় কিছু তথ্যগত অসঙ্গতি বা ভুল থাকতে পারে। আশা করি সহৃদয় পাঠক ভুল ধরিয়ে দিয়ে বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করবেন।

মহিউদ্দিন আহমদ
mohi2005@gmail.com

যাত্রা শুরু

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ ভোরে লন্ডনে উপস্থিত হন। তাঁর মুক্তির খবর শুনে বাংলাদেশে খুশির বন্যা বয়ে যায়। পুরো জাতি তখনো তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর লন্ডনে তাদের হাইকমিশনারকে বার্তা পাঠিয়ে জানায় যে, শেখ মুজিবকে লন্ডন থেকে দিল্লি ও পরে ঢাকায় নিয়ে আসতে ভারত সরকার এয়ার ইন্ডিয়া অথবা ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটা বিমান পাঠাতে চায়। শেখ মুজিব এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেননি। তিনি একটি ব্রিটিশ বিমানে আসবেন বলে জানান। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল যৌক্তিক। তিনি ভারতের ওপর নির্ভরশীল—জনমনে এমন একটি ধারণা হোক তা তিনি চাননি।[১]

ভারতীয় কূটনীতিক শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জী বিষয়টা দেখেছেন খুব কাছে থেকে। তিনি ষাটের দশকে ঢাকায় ভারতের উপহাইকমিশনে পলিটিক্যাল অফিসারের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় শেখ মুজিবের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬২ সালে তাঁর মাধ্যমেই শেখ মুজিব বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য সাহায্য চেয়ে ভারতের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের লন্ডনে যাত্রাবিরতির সময় তাঁদের দুজনের আবার দেখা হয়। ব্যানার্জীর ভাষ্য অনুযায়ী, শেখ মুজিব ভোর ছয়টায় লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছালে বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ অ্যালকক অ্যান্ড ব্রাউন স্যুট-এ তাঁকে স্বাগত জানান যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান আয়ান সাদারল্যান্ড এবং লন্ডনে ভারতের হাইকমিশনার আপা বি পন্থ। সাদারল্যান্ড দ্রুতই যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে তাঁর সরকারি বাসায় শেখ মুজিবের বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। আপা পন্থ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে শেখ মুজিবকে ফোনের রিসিভারটি দেন। আধা ঘণ্টা ধরে তাঁরা দুজন কথা বলেন। ইন্দিরা শেখ মুজিবের

মুক্তিতে অভিনন্দন ও স্বস্তি জানিয়ে তাঁকে ঢাকা ফেরার পথে দিল্লি সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং বলেন যে, তিনি মুজিবের জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার একটা বিশেষ বিমান পাঠাবেন। শেখ মুজিব আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ পর ইন্দিরা আবার ফোন করে শেখ মুজিবকে বলেন যে, তিনি তাঁর মত বদলেছেন; এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে কথা বলে তিনি যুক্তরাজ্যের রাজকীয় বিমান বাহিনীর একটা জেট বিমানের ব্যবস্থা করেছেন। ইন্দিরা এই পরিবর্তনের কারণটিও ব্যাখ্যা করেন।[২]

ওই সময় লন্ডনে বাংলাদেশ মিশনের দ্বিতীয় সচিব ছিলেন মহিউদ্দিন আহমদ (পরে পররাষ্ট্রসচিব)। লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, শশাঙ্ক ব্যানার্জী ও আপা পন্থ শেখ মুজিবকে স্বাগত জানাতে হিথ্রো বিমানবন্দরে যাননি। তাঁরা পরে মুজিবের সঙ্গে দেখা করেছেন। বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন লন্ডন মিশনের কাউন্সেলর (পরে ভারপ্রাপ্ত মিশনপ্রধান) এম এম রেজাউল করিম, নাইজিরিয়ার পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগকারী তৃতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ জায়গীরদার এবং তিনি নিজে।[৩]

ইন্দিরার ভয় ছিল, ভারতীয় বিমানটি যাত্রাপথে শত্রুর হামলার শিকার হতে পারে। এজন্য তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বিকল্প ব্যবস্থা করেন। যুক্তরাজ্য তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। শেখ মুজিবকে ঢাকা পাঠানোর জন্য বিমান দিতে এডওয়ার্থ হিথকে রাজি করানো ছিল ইন্দিরার একটা কূটনৈতিক কৌশল। হিথ বুঝতে পেরেছিলেন, ইন্দিরা আসলে কী চান। বাংলাদেশকে যুক্তরাজ্যের কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়াটা তখন সময়ের ব্যাপার। ইন্দিরা এবং হিথ দুজনই ছিলেন খোশমেজাজে, শেখ মুজিবকে সমর্থন দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন।[৪]

তখন প্রশ্ন উঠল, লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে ঢাকার পথে শেখ মুজিবের সফরসঙ্গী হবেন কে। দৃশ্যপটে তখন হাজির হলেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণ বিষয়ের উপদেষ্টা দুর্গা প্রসাদ ধর. পররাষ্ট্র সচিব ত্রিলোকী নাথ কাউল, গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং 'র'-এর প্রধান রামেশ্বর নাথ কাও এবং 'র'-এর দ্বিতীয় প্রধান কে শঙ্কর নায়ারের সঙ্গে আলোচনা করে ডি পি ধর ইন্দিরার কাছে প্রস্তাব করেন যে, শশাঙ্ক ব্যানার্জী শেখ মুজিবের সঙ্গে থাকবেন। কারণ হিসেবে বলা হলো, ব্যানার্জী আগে থেকেই মুজিবকে জানেন। ইন্দিরা এই প্রস্তাবে রাজি হন। মুজিবের সঙ্গে কী কথাবার্তা বলতে হবে সে সম্পর্কে ইন্দিরার কাছ থেকে ব্যানার্জীকে নির্দেশনা পাঠানো হয়।[৫]

বিমানে শেখ মুজিবের সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ড. কামাল হোসেন ও তাঁর স্ত্রী এবং লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তা শশাঙ্ক

ব্যানার্জী ও ফার্স্ট সেক্রেটারি ভেদ মারওয়া (পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মহাপরিচালক ও পর্যায়ক্রমে কয়েকটি রাজ্যের গভর্নর)। পথে শেখ মুজিবের সঙ্গে ভেদ মারওয়ার কিছু কথাবার্তা হয়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পরিচয় কী হবে এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'দেখো, আমরা প্রথমে বাঙালি। আমাদের আছে বহুস্তরবিশিষ্ট পরিচয়। এসব স্তরের মধ্যে শীর্ষে হলো বাঙালি পরিচয়। আমরা এ পরিচয় নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। এ পরিচয়কে ভিত্তি করেই স্বাধীনতার সব সংগ্রাম হয়েছে। দ্বিতীয়ত আমাদের মুসলিম পরিচয়। তৃতীয়ত আঞ্চলিক পরিচয়।' শেখ মুজিব আরও বলেছিলেন, এ অঞ্চলের সমস্যাগুলো অভিন্ন। পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এসব সমস্যা সমাধানের অন্য কোনো উপায় নেই। ভেদ মারওয়ার উপলব্ধি হলো, 'একজন মানুষ কতটা আত্মবিশ্বাসী হলে দায়িত্বভার গ্রহণের আগেই এমন সব কথা বলতে পারেন! তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব আমার মনে দাগ কেটেছিল।'[৮]

লন্ডন থেকে ঢাকা ফেরার পথে বিমানে পাশাপাশি বসে আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতীয় কূটনীতিক শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জী

সাদারল্যান্ড শশাঙ্ক ব্যানার্জীকে বিমানে শেখ মুজিবের পাশের আসনে বসতে বলেন। বিমানটি ছাড়ার পর পাইলট তাঁদের দুজনের ছবি তোলেন। ১৩ ঘণ্টার যাত্রায় বিমানটি জ্বালানি নেওয়ার জন্য সাইপ্রাস এবং ওমানে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল। বিমানে বসে শেখ মুজিব ব্যানার্জীকে কিছু কথা বলেছিলেন, যার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ব্যানার্জীর বিবরণ থেকে জানা যায় :

কিছুক্ষণ খোশগল্প করার পর মুজিব বললেন, দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলার আগে তিনি তাঁর কাছে একটা বার্তা পাঠাতে চান। তিনি এই আগাম কাজটুকু করার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, ইন্দিরা প্রকাশ্যে বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য ৩০ জুনের (১৯৭২) মধ্যে ফিরে যাবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ জানতে চেয়েছেন, ভারত যদি তিন মাস আগেই, অর্থাৎ ৩১ মার্চের মধ্যে সৈন্য সরিয়ে নেয় তাহলে ব্রিটেনের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া সহজ হবে। মুজিব চান ইন্দিরার সঙ্গে আলোচনার পর যে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হবে, তাতে যেন এই বিষয়টির উল্লেখ থাকে।

দিল্লি বিমানবন্দরে সস্ত্রীক রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডি পি ধর বাংলাদেশের নেতাকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। ধর আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে জানতে চান, মুজিবের সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে। আমি সরাসরি এডওয়ার্থ হিথের প্রসঙ্গ টেনে বললাম যে, ভারতীয় সৈন্য ৩১ মার্চের মধ্যে সরিয়ে নিতে হবে। ইন্দিরার সঙ্গে আলোচনার সময় মুজিব এই প্রশ্ন তুলবেন। এ ব্যাপারে ভারত আন্তরিকতা দেখালে জনগণের মধ্যে মুজিবের অবস্থান আরও মজবুত হবে।

বিমানবন্দর থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে যাওয়ার পর ডি পি ধর ইন্দিরাকে বিষয়টি অবহিত করেন। শেখ মুজিবকে কলকাতা থেকে আনানো গুড়ের সন্দেশ, সিঙ্গাড়া ও দার্জিলিংয়ের চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো। গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর প্রধান আর এন কাও, পররাষ্ট্র সচিব টি এন কাউল, মুখ্যসচিব পরমেশ্বর নাথ হাকসার, ডি পি ধর এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল স্যাম মানেকশকে ইন্দিরা বললেন, ৩১ মার্চের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে আনতে হবে। ভারতের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এত সহজভাবে এর আগে কখনো সমাধান করা হয়নি।

ইন্দিরার সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকে মুজিব ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি তুললেন। যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শ অনুযায়ী ভারত তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের তারিখ ৩০ জুন থেকে এগিয়ে এনে ৩১ মার্চ নির্ধারণ করেছে। এটা বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আন্তরিকতার একটি দৃষ্টান্ত।

ইন্দিরার সঙ্গে বৈঠকের ফলাফলে মুজিব ছিলেন খুবই সন্তুষ্ট। তাঁর মনে আর সন্দেহ রইল না যে যুক্তরাজ্যের কূটনৈতিক স্বীকৃতি এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যের স্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলতর হলো।

সৈন্য প্রত্যাহার নিয়ে মুজিবের দুশ্চিন্তা ছিল। তিনি বিষয়টি ঝুলিয়ে

রাখতে চাননি। লক্ষ্য হাসিলের জন্য তিনি ছিলেন দৃঢ়। ভারতীয় সৈন্য আগেভাগেই ফিরিয়ে নেওয়াটা দুদেশের জন্যই শুভ হয়েছিল।

মুজিব বলেছিলেন, এটা অকল্পনীয় যে নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে বাংলাদেশের জন্য ভারত নিজেকে যুদ্ধে জড়িয়েছে এজন্য বাংলাদেশ ভারতের কাছে সব সময় কৃতজ্ঞ থাকবে। আমি (শশাঙ্ক) তাঁকে বললাম, তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ যদি সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই না করত, ভারত কিছুই করতে পারত না। ভারতের সমর্থন ছিল প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে।

বিমানে আসার সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মুজিবকে কলকাতায় যাত্রাবিরতির অনুরোধ করে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। মুজিবের অনুরোধে আমি তাঁর জবাবের একটা খসড়া লিখে দিই। সেখানে বলা হয়, কলকাতা যাওয়ার আগে তিনি তাঁর জনগণের কাছে ফিরে যেতে চান। তিনি প্রথম সুযোগেই কলকাতা সফরের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।[৭]

শেখ মুজিবকে বহনকারী বিমানটি দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বিমানে ওঠেন এবং ভেতরে কয়েক মিনিট অবস্থান করেন বিমানবন্দরে অনেক মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রায় ২০টি দেশের কূটনীতিক এসেছিলেন। তাঁরা বেশিরভাগই ছিলেন রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের সোভিয়েত ব্লকের কূটনীতিকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এছাড়া যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি, পশ্চিম জার্মানি, নরওয়ে ও ডেনমার্কের দূতাবাসের প্রতিনিধিরা হাজির হয়েছিলেন। ভারত ও ভুটান ছাড়া অন্য কোনো দেশ তখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়নি। বাংলাদেশের ব্যাপারে ব্যক্তিগত সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ বার্নার্ড কিটিং আসেননি। অনুমান করা যায়, ওয়াশিংটন থেকে তাঁকে আসতে নিষেধ করা হয়েছিল[৮]

এরপর দিল্লির প্যারেড গ্রাউন্ডে শেখ মুজিবকে স্বাগত জানিয়ে বক্তৃতা দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বলেন, তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, মানবমুক্তি ও বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাস করেন। তিনি 'জয় হিন্দ' বলে তাঁর ভাষণ শেষ করেন এবং পরে ইন্দিরা ও তিনি একযোগে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন।[৯]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে পা রাখলেন বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি বিকেলে। সবার আগে শেখ মুজিবকে স্বাগত জানাতে বিমানে ওঠেন মুজিববাহিনীর গেরিলা যোদ্ধা কামরুল আলম খান খসরু[১০] বিমানবন্দরে শেখ মুজিবকে গার্ড অব অনার দেয় বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর একটি দল। ঢাকায় অবস্থানরত কয়েকটি দেশের কূটনীতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। এমনকি

মার্কিন কনসাল জেনারেল হার্বার্ট ডি স্পিভাকও এসেছিলেন। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে করমর্দন করে বলেন, 'ঢাকায় আপনাকে স্বাগতম।' মুজিব হেসে জবাব দেন, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ'। স্পিভাক বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন এবং তার উপস্থিতির কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই। স্পিভাকের হঠাৎ হাজির হওয়া জানান দিচ্ছিল যে, যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সঙ্গে তৈরি হওয়া তিক্ততা যুক্তরাষ্ট্র কাটিয়ে উঠতে চায়।[১১] ওই রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাতে লেখা একটা কাগজে সই করে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন।

বঙ্গবন্ধু-জামাতা এম এ ওয়াজেদ মিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী, বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সভা শেষ করে, শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর মাজার জিয়ারত করেন এবং শহীদ মিনারে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের বাড়িটিতে আসেন। সেখানে তাঁর পরিবারের সদস্যরা অস্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। সন্ধ্যার পর দোতলার একটি ঘরে তিনি শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ—মুজিববাহিনীর এই চার নেতার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ওয়াজেদ মিয়াও এই আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। চার যুবনেতা যুদ্ধকালীন সময়ের পরিস্থিতি ও মুজিবনগর সরকারের সদস্যদের কাজকর্ম সম্পর্কে শেখ মুজিবকে অবহিত করেন। তাঁরা এ সময় মুক্তিবাহিনী ও সেক্টর কমান্ডারদের ভূমিকা নিয়েও কথা বলেন এবং এ মুহূর্তে কী করণীয় সে সম্পর্কে মতামত দেন।[১২]

যুদ্ধের নয় মাস এদেশে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও চার যুবনেতার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ওই সময়ের একটা মূল্যায়ন করে থাকতে পারেন। এ বিষয়ে সিরাজুল আলম খানের ভাষ্য হলো, শেখ মুজিবের সঙ্গে তাদের কোনো আলোচনাই হয়নি। আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি তাঁর করণীয় ঠিক করে ফেলেছিলেন।[১১]

১১ জানুয়ারি সকালেই দৃশ্যপট পাল্টে যায়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা হলে শেখ মুজিব তাঁকে কোনোরকম শুভেচ্ছা জানাননি, নীরবে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন। নীরবতা ভেঙে তাজউদ্দীন বলেছিলেন, 'আমি আশা করেছিলাম কী পরিস্থিতিতে আমি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছি, আপনি তা জানতে চাইবেন। কিন্তু দেখছি যে, আপনার তাতে আগ্রহ নেই। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে মনে করি, একটা বিষয় আপনাকে বলা দরকার। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে এখন অনেক অস্ত্র। অস্ত্র জমা দেওয়ার ব্যাপারে আমার অনুরোধ তারা উপেক্ষা করেছে।... আপনি আহ্বান জানালে তারা অস্ত্র জমা দেবে। না হলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা কঠিন হবে।' এখানে উল্লেখ্য যে, তাজউদ্দীন ইতিপূর্বে অস্ত্র

জমা দেওয়ার আহ্বান জানালেও মুজিববাহিনী শেখ মুজিব না ফেরা পর্যন্ত অস্ত্র জমা দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছিল এজন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করা যায়নি বলে তাজউদ্দীন ইঙ্গিত করেছিলেন। শেখ মুজিবের মন্তব্য ছিল, 'আমার ছেলেদের হাতে অস্ত্র আছে এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। আমি যখনই বলব, তখনই তারা অস্ত্র জমা দেবে'। এই আলোচনার পর বিদায় নেওয়ার পর তাজউদ্দীনের উপলব্ধি হয়েছিল যে, তিনি তাঁর নেতার সুনজর হারিয়েছেন।[১৪]

বলা চলে, বাংলাদেশের নবযাত্রার প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে তাজউদ্দীনের দূরত্ব তৈরি হলো। সিরাজুল আলম খানের ভাষ্য অনুযায়ী, 'মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল শেখ মুজিবের নামে। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ের নেতা ছিলেন তাজউদ্দীন। অথচ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ক্যাজুয়ালটি হলেন তিনিই।'[১৫] এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মুহম্মদুল্লাহর (সাবেক স্পিকার ও রাষ্ট্রপতি) মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক :

> ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কিছুদিনের পরের ঘটনা। মুজিবনগর সম্পর্কিত ৭-৮ জন নেতা পুরাতন গণভবনে বেতের চেয়ারে গোল হয়ে বসে মুজিবনগরের সরকার ও ভেতরের টানাপোড়েন এবং কী প্রতিকূলতার মাঝখানে দেশ স্বাধীন হলো তা বলা শুরু করেছিল। আশা ছিল বঙ্গবন্ধু শুনবেন এবং আমরা তাঁকে মেহেরপুর (মুজিবনগর) ও ৮নং থিয়েটার রোডে (কলকাতায় প্রবাসী সরকারের কার্যালয়) নিয়ে যাব। সব গুড়ে বালি। তিনি 'সব জানি' ও 'সব ঠিক করে গিয়েছিলাম' বলে থামিয়ে দেন। তাজউদ্দীন তাকালেন আমার দিকে। কী মারাত্মক কানভারী করা হয়েছিল।[১৬]

১১ জানুয়ারি (১৯৭২) 'বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করা হলো। এই আদেশে বলা হলো, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলোতে বিজয়ী এবং আইনের দ্বারা অযোগ্য বিবেচিত নন—এমন সব নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নিয়ে 'গণপরিষদ' গঠিত হবে।[১৭]

আগের প্রাদেশিক হাইকোর্ট বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি অস্থায়ী হাইকোর্ট গঠনের প্রয়োজন হলো। ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ তাজউদ্দীন আহমদ সাবেক রাষ্ট্রদূত ও লেখক এবং তাঁর শ্রদ্ধাভাজন কামরুদ্দিন আহ্‌মদকে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করার প্রস্তাব দেন। কামরুদ্দিন আহ্‌মদের সংসার তখন এলোমেলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া তাঁর সন্তান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি জানিয়ে দেন, এই দায়িত্ব নেওয়ার মতো শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তাঁর নেই। ১১ জানুয়ারি হাইকোর্টের বিচারপতি আবুসাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে প্রধান

বিচারপতি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।[১৮]

১২ জানুয়ারি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। বঙ্গবন্ধু একই দিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন এবং ১১ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং প্রধান সেনাপতি মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীসহ ওই মন্ত্রিসভার সব সদস্যই নতুন মন্ত্রিপরিষদে বহাল থাকেন। বঙ্গবন্ধুর তখন আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। তিনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন।

১৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব হলো হৃদয়ের। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে কোনো বিশেষ চুক্তি হতে যাচ্ছে কি না, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক খুবই বিশেষ ধরনের। এই সম্পর্ক সর্বোচ্চ বন্ধুত্বের। আমাদের মৈত্রী চুক্তি আমাদের হৃদয়ে' -এই কথা বলে তিনি বুকে হাত দিয়ে দেখান। ভারতের সেনাবাহিনী কবে ফিরে যাবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'ভারতীয় সৈন্য এখানে মিত্রবাহিনী হিসেবে আছে এবং আমি যখনই চাইব, তারা তখনই চলে যাবে। মিসেস গান্ধীও আমাকে এমনটি বলেছেন।' বৃহত্তর বাংলা গঠনের কোনো সম্ভাবনা আছে কি না, একজন বিদেশি সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, 'আমার বাংলাদেশের স্বপ্ন অর্জিত হয়েছে। আমি আর এক ইঞ্চি জমিও চাই না। আপনি আমাদের পতাকায় বাংলাদেশের মানচিত্র দেখেছেন। আমি ওই জমিটুকু নিয়েই খুশি। পশ্চিমবঙ্গ ভারতেই থাকবে এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতের জনগণ হবে আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু।'[১৯]

দেশে তখনো শৃঙ্খলা পুরোপুরি ফিরে আসেনি। যুদ্ধের সময় এদেশের মানুষের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল। অগুনতি মানুষ হতাহত হয়েছিলেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তার সহযোগীরা স্মরণকালের নৃশংসতম গণহত্যা চালিয়েছিল। মানুষ স্বভাবতই ছিল ক্ষুব্ধ। এর কোপটা গিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী রাজাকার ও অবাঙালিদের ওপর। তাদের অনেকেই জনতার হাতে নিহত বা লাঞ্ছিত হয়।

৩১ মার্চ দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে বসবাসকারী 'বিহারি মুসলমানদের' বিষয়ে কথা বলেন। 'বিহারি মুসলমানদের কী হবে, তাদের কি উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসার সম্ভাবনা আছে'—এমন প্রশ্নের জবাবে ইন্দিরা বলেন :

> এর কোনো সুযোগ নেই। প্রথমদিকে প্রতিশোধমূলক কিছু ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই, এই প্রশ্নের পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। এক শ্রেণির পশ্চিমা গণমাধ্যমে কিছু লোককে খুন করার

ছবি ছাপিয়ে একটা ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। আমি যেকোনো হত্যাকাণ্ড এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার বিরোধী। কিন্তু সবাইকে এর প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে। যখন দশ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, এমনকি আত্মসমর্পণের আগেও ২১৮ জন বুদ্ধিজীবীকে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছিল, তাঁদের স্ত্রী, সন্তান, পরিবারের সামনে নির্যাতন করা হয়েছিল, তখন এসবের ছবি কেউ ছাপেনি। বিশ জন লোক পরে নিহত হয়েছে। স্বীকার করি তাদের নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে। কিন্তু দশ লাখ মানুষ হত্যার সঙ্গে এই বিশ জনের খুন হওয়াকে মিলিয়ে দেখতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ এ ব্যাপারে যে সংযমের পরিচয় দিয়েছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে।[২০]

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ পল্টন ময়দানে বন্দি বিহারিদের
প্রকাশ্যে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারছেন আবদুল কাদের সিদ্দিকী

বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত সংবাদে বলা হয় ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব দিল্লিতে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে দশ লাখ লোককে (এক মিলিয়ন) হত্যা করেছে।[২১] পরে ঢাকায় ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ইয়াহিয়ার সৈন্যরা ৩০ লাখ লোককে (তিন মিলিয়ন) হত্যা করেছে। তাঁদের কথোপকথন ছিল এ রকম :

ফ্রস্ট : ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাকে আপনি কী বলবেন?

মুজিব : সে অপরাধী। আমি তার ছবিও দেখতে চাই না। সে বাংলাদেশে

তার সৈন্যদের দিয়ে আমার ত্রিশ লাখ লোককে মেরেছে।

ফ্রস্ট : মি. ভুট্টো তাকে গৃহবন্দি করেছে। ভুট্টো কী করবে বলে আপনি মনে করেন?

মুজিব : আপনি জানেন বাংলাদেশে কী ঘটেছে? আমি বলছি, ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে—নারী, শিশু, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র। ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ ঘরবাড়ি লুট করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শস্যগুদাম সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

ফ্রস্ট : আপনি কীভাবে জানলেন যে সংখ্যাটি এত বেশি—ত্রিশ লাখ?

মুজিব : আমি ফেরার আগেই লোকেরা তথ্য জোগাড় করতে শুরু করেছিল। সব এলাকায় আমার লোক আছে এবং সব জায়গা থেকে আমি খবর পাচ্ছি। চূড়ান্ত হিসাব এখনও করিনি। সংখ্যাটি আরও বেশি হতে পারে, তবে নিশ্চিতভাবেই এটা ত্রিশ লাখের কম না।[২১]

দেশ এখন স্বাধীন। কিন্তু শুরুটা ভালো হলো না। আরম্ভ হলো বিরোধ আর তিক্ততা। মওলানা ভাসানী ভারত থেকে ফিরে এলেন জানুয়ারির ২২ তারিখ। তিনি থেকে গেলেন লোকচক্ষুর আড়ালে। তাঁর এক সময়ের শিষ্য শেখ মুজিব এখন 'জাতির পিতা'। কিন্তু দুজনের মধ্যে শীতল সম্পর্ক। এ প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন সাংবাদিক কামাল লোহানী :

> তখন আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পরিচালক, ঢাকায়। একদিন, সম্ভবত কাদের সিদ্দিকীর অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান শেষে, সড়কপথে ঢাকা এসে ঢাকা স্টেশনের ডিউটি রুমে বসে খবর নিচ্ছি সবকিছুর। এমন সময় ফোন এলো গণভবন থেকে। ছুটে গেলাম ধরতে। মি. রোজারিও, যত দূর মনে পড়ে, শেখ মুজিবুর রহমানের পিএস ছিলেন, তিনি বললেন, 'বঙ্গবন্ধু কথা বলতে চান।' টেলিফোন দিলেন। তারপর বর্ষণ শুরু হলো আমার ওপর। আজ রেডিওতে মওলানা ভাসানীর নিউজ কমেন্ট্রি গেছে, শুনেছিস? আমি বললাম, 'ওটা তো আমার বিষয় নয়, সাইফুল বারীর।' তিনি থামেননি। মওলানা ভাসানী দেশে মাত্র ফিরলেন। এখনই তিনি স্বাধীনতার ঘোষক হয়ে গেলেন? মুক্তিযুদ্ধে কী তাঁর ভূমিকা ছিল, খোঁজখবর নিয়ে তাঁর অবস্থান ঠিক করতে হবে, তা না তোরা রেডিওতে 'তিনিই দেশ স্বাধীন করেছেন' বলে দিলি?
>
> আমি তো বিস্ময়ে হতবাক। যে মওলানা মুক্তিযুদ্ধে নির্দ্বিধায় শেখ মুজিবের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে নয়টি মাস দুঃখ, কষ্ট এবং বন্দিত্বের মধ্যে থেকেও লড়াই করে গেলেন, তাঁর সম্পর্কে তাঁরই শিষ্য মুজিবুর এই কথা উচ্চারণ করলেন? এতটুকু দ্বিধা করলেন না?
>
> আসলে সাপ্তাহিক হলিডের সম্পাদক এম আসলাম তখন বেতারে

ইংরেজি নিউজ কমেন্ট্রি লিখতেন। তিনি সেদিন মওলানা সাহেবের সেই ঐতিহাসিক 'আসসালামু-আলাইকুম' ধ্বনি উচ্চারণের প্রসঙ্গ তুলে ধরে লিখেছিলেন, তাই শেখ মুজিবের ক্ষোভের কারণ।'[২৩]

৩১ জানুয়ারি ঢাকা স্টেডিয়ামে মুজিববাহিনীর সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের কাছে অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। মাঠের মধ্যেই একটা মঞ্চ বানানো হয়েছিল। শেখ মুজিব মঞ্চে ওঠার পর সিরাজুল আলম খান প্রথমে স্লোগান দেন, 'বঙ্গবন্ধু-বঙ্গবন্ধু'। চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি শোনা গেল, 'জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ'। এরপর সিরাজুল আলম খান কণ্ঠ সপ্তমে চড়িয়ে আওয়াজ তুললেন, 'মুজিববাদ-মুজিববাদ'। আবারও শোনা গেল 'জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ'। মঞ্চে অন্যান্যের মধ্যে দাঁড়ানো ছিলেন যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নান। তাঁদের কেউ স্লোগান দেননি।[২৪]

৩১ জানুয়ারি ঢাকা স্টেডিয়ামে মুজিব বাহিনীর অস্ত্র জমা দেওয়ার অনুষ্ঠানে মুজিববাদের পক্ষে স্লোগান দিচ্ছেন সিরাজুল আলম খান। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক ও আবদুল মান্নান

এরপর একে একে মুজিববাহিনীর এই পাঁচ শীর্ষ নেতা (মান্নানসহ) প্রতীকী অস্ত্র জমা দেন। প্রথমেই শেখ মণি। তিনি উবু হয়ে একটি স্টেনগান শেখ মুজিবের পায়ের কাছে রেখে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্য চারজনও একই ভঙ্গিমায় সালাম করে শেখ মুজিবের পায়ের কাছে অস্ত্র রাখলেন।[২৫]

২

একাত্তরের যুদ্ধে বাংলাদেশ একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ভারপ্রাপ্ত মিশনপ্রধান ছিলেন জ্যোতিন্দ্র নাথ দীক্ষিত। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে তিনটি অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শেখ মুজিব চেয়েছিলেন, তিন থেকে ছয় মাসের জন্য ভারতের অসামরিক কর্মকর্তারা বাংলাদেশের প্রশাসনকে সহযোগিতা করুক। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল অন্তত এক বছর বাংলাদেশে থাকুক, যাতে বাংলাদেশবিরোধী 'পকেটগুলো' নিষ্ক্রিয় করা যায়। শেখ মুজিব চেয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকুক, যাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ওখানে নিজেদের সংহত করতে না পারে। তৃতীয়ত, ভারত যেন অর্থনৈতিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং বাংলাদেশে বিমান ও নৌ সংস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ভারত এই অনুরোধে সাড়া দেয়। ভারতের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় যাতে বাংলাদেশে জেলা প্রশাসনের দেখভাল এবং খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা ঠিকঠাক মতো চলে। ভারত বাংলাদেশকে দুটো জাহাজ এবং দুটো ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমান উপহার হিসেবে দেয়। কিন্তু শেখ মুজিবের আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রখর। তিনি এটা দান হিসেবে নিতে অস্বীকার করেন এবং দীর্ঘমেয়াদি সুদমুক্ত ঋণের আওতায় এই সাহায্য নেওয়ার প্রস্তাব দেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও রেলওয়ে প্রকৌশলীরা বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন অপসারণের দায়িত্ব নেয় ভারতের নৌবাহিনী। কিন্তু মাইন অপসারণের কঠিন কাজটা করেছে সোভিয়েত রাশিয়ার নৌবাহিনী। ইন্দিরা গান্ধী কক্সবাজারে এক ব্রিগেড সৈন্য পাঠাতে রাজি হন। ঢাকার নিয়ন্ত্রণে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার পান্ডে। তিনি তাঁর ব্রিগেড নিয়ে কক্সবাজার রওনা হন।[১৬]

ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখ শেখ মুজিব পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের কৃতজ্ঞতা জানাতে কলকাতা যান। ওই দিন বিকেলে তিনি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। ইন্দিরা ওই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিব ইন্দিরা গান্ধীকে মার্চে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে তিনি সানন্দে রাজি হন। শেখ মুজিব এটাও বলেন যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধপ্রসূত বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে ইন্দিরার সঙ্গে আলাপ করতে চান। ভারতীয় সৈন্য আরও ছয় মাস থেকে এক বছর যেন বাংলাদেশে থাকে–শেখ মুজিব এই অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করেন।

ইন্দিরা এই অনুরোধে আপত্তি জানান। তিনি বলেন, ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার পরই তিনি ঢাকা আসতে চান। কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু ভারতীয় সৈন্য থাকতে পারে। ইন্দিরা কাউকে এমন ধারণা দিতে চাননি যে তিনি একটি 'অধিকৃত দেশ' সফরে আসছেন।[২৭]

বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতির বিষয়টি ছিল বেশ স্পর্শকাতর। এমন প্রচারও ছিল যে, ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ দখল করেছে। শেখ মুজিব চেয়েছিলেন, ভারতীয় বাহিনী যেন তাড়াতাড়ি ফিরে যায়। শশাঙ্ক ব্যানার্জীর বিবরণেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যদিও ভারতীয় কূটনীতিক জে এন দীক্ষিত এ ব্যাপারে অন্যরকম তথ্য দিয়েছেন।

৮ ফেব্রুয়ারি সকালে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার আলোচনার সারসংক্ষেপ নিয়ে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের সশস্ত্রবাহিনীকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। যেহেতু দায়িত্ব শেষ হয়েছে, তাই ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ফিরে যাওয়া উচিত বলে দুই প্রধানমন্ত্রী মনে করেন। ২৫ মার্চ ১৯৭২-এর মধ্যে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী সম্পূর্ণভাবে ফিরে যাবে।'[২৮] বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই অঞ্চলের মানুষের কল্যাণে উন্নয়ন ও সম্পদের ব্যবহার নিয়ে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হয়েছে। 'তাঁরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ফারাক্কা বাঁধ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীদ্বয় চান, দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নেওয়ার জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া শুরু করা দরকার।'[২৯]

বাংলাদেশে ভারতের স্বল্পকালীন সামরিক উপস্থিতি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। ভারতের সৈন্যরা একটা দখলদার বাহিনীর মতো আচরণ করছে এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল অনেকের মধ্যে। অপপ্রচারও ছিল। বিষয়টি খুব কাছে থেকে দেখেছেন ভারতীয় কূটনীতিক জে এন দীক্ষিত। ওই সময় উঁচু পর্যায়ের বেশ কয়েকজন ভারতীয় কর্মকর্তা ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব কে বি লাল এবং সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা। মার্চের মাঝামাঝি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঢাকা সফরের আগেই কয়েকটি জরুরি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ছিল তাঁদের আগাম সফরের উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যে সুবিমল দত্ত ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনারের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি ১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ভারতের পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন। তাঁর আদি নিবাস চট্টগ্রাম। এই বাঙালি কূটনীতিককে অবসর থেকে ডেকে এনেছিলেন স্বয়ং

ইন্দিরা। ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসকে তখন খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছিল। সুবিমল দত্ত তাঁর সহকারী দীক্ষিতের কাছে জেনারেল অরোরার আসন্ন সফরের খুঁটিনাটি জানতে চাইলেন। দীক্ষিতের বিবরণে জানা যায়, অরোরা এর আগেও দুবার ঢাকা এসেছিলেন। তিনি তাঁর গাড়িতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের পতাকা ওড়াতেন। তাঁর গাড়ির নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য তাঁর নিজস্ব সেনাদল রাস্তার লোকদের সরিয়ে দিত। ঢাকায় তিনি সেনানিবাসের ভেতরে কমান্ড হাউজে থাকতেন। সেটি ছিল ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডারের বাসভবন। দীক্ষিতের কাছে অরোরার এসব বৃত্তান্ত শুনে সুবিমল দত্ত পুরো ব্যবস্থাটি পরিবর্তন করতে বললেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, এমন কোনো আচরণ করা যাবে না, যাতে করে এদেশের মানুষের মনে ভারত সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। জল ইতিমধ্যে অনেক ঘোলা হয়ে গেছে। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, অরোরা গাড়িতে তাঁর তিন-তারকাখচিত কমান্ডারের চিহ্ন রাখতে পারবেন, কিন্তু ইস্টার্ন কমান্ডের পতাকা ব্যবহার করতে পারবেন না; রাস্তায় চলাচলের সময় প্রয়োজনে মানুষ এবং যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে স্থানীয় পুলিশ বা সৈন্যদের দিয়ে; ঢাকা সেনানিবাসে থাকার সময় তিনি কমান্ড হাউজে থাকতে পারবেন না; তাঁকে থাকতে হবে সেনানিবাসের ভিআইপি গেস্ট হাউজে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি সরাসরি দেখা করবেন না, এর আগে তাঁকে ভারতীয় হাইকমিশন থেকে ব্রিফিং নিতে হবে; এবং তিনি যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন, তখন হাইকমিশনের সামরিক উপদেষ্টা এবং পলিটিক্যাল অফিসার তাঁর সঙ্গে থাকবেন। জেনারেল অরোরাকে যখন এসব জানানো হলো, তিনি তা সহজভাবেই নিলেন।[৩০]

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর তাদের সব অস্ত্রশস্ত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর জিম্মায় ছিল। তারা এগুলো ভারতে নিয়ে যায়। এ নিয়ে বাংলাদেশের সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। দখলে আসা অস্ত্রের কিছু অংশ পরে বাংলাদেশকে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। অবশ্য জয়দেবপুরের অস্ত্র কারখানাটি সচল করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য দিতে ভারত রাজি হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রশিক্ষণ সুবিধা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ভারতের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সামরিক সম্পর্কের ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না।[৩১]

প্রায় ৯৩ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে ছিল। শেখ মুজিব তাদের বেশিরভাগকেই ভারতের যুদ্ধবন্দি

শিবিরগুলোতে পাঠাতে চেয়েছিলেন। প্রথম দিকে তিনি চেয়েছিলেন যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারের জন্য ৪০০ পাকিস্তানি সৈন্যকে রেখে দিতে। এই তালিকায় লে. জেনারেল নিয়াজি এবং মে. জেনারেল রাও ফরমান আলীর মতো জ্যেষ্ঠ কমান্ডাররাও ছিলেন। ভারত সরকার চেয়েছিল সব বন্দিকেই ভারতে নিয়ে যেতে এবং যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু হলে অভিযুক্তদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে। ভারত মনে করেছিল, বাংলাদেশ যুদ্ধবন্দিদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে পারবে না।[৩২]

বাহাত্তরের মার্চে ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সই হয়। এই চুক্তির নেপথ্যের ইতিহাস উঠে এসেছে জে এন দীক্ষিতের বর্ণনায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৭ মার্চ ১৯৭২ বিকেলে ঢাকায় আসেন। তাঁর সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব পি এন হাকসার, পররাষ্ট্র সচিব টি এন কাউল, উপদেষ্টা ডি পি ধর এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার কয়েকজন সদস্য। ওই দিনই শেখ মুজিবের সঙ্গে ইন্দিরার তিন দফা বৈঠক হয়। পরদিন ছিল ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ নদীপথে নৌবিহার। নৌবিহার চলাকালে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিতটা তৈরি হয়ে যায়। দীক্ষিতের ভাষ্য অনুযায়ী :

> একটু আগেভাগেই মধ্যাহ্নভোজ হলো। মিসেস গান্ধী এবং শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের উপদেষ্টাদের নিয়ে জাহাজের উপরতলায় গেলেন। মুজিবুর রহমান মিসেস গান্ধীর কাছে জানতে চাইলেন, তাঁর সফর শেষে কী ধরনের ঘোষণা আসবে? মিসেস গান্ধী টি এন কাউলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রকম ঘোষণা হবে? কাউল বললেন, দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার কথাবার্তার সারসংক্ষেপ নিয়ে একটা যৌথ ইশতেহার (জয়েন্ট কম্যুনিকে) প্রকাশ করাটাই রীতি। মুজিব বললেন, দিদি, একটা ইশতেহারের চেয়ে আরও ভালো কী হতে পারে? কাউল বললেন, একটা যৌথ ঘোষণা (জয়েন্ট ডিক্লারেশন)। মুজিব আবারও বললেন, যৌথ ঘোষণার চেয়ে আরও ভালো কী? জবাবে ডি পি ধর বললেন, শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি (ট্রিটি)। মুজিবুর রহমান তখন বললেন, তিনি যৌথ ঘোষণা এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তি—দুটোই চান। মিসেস গান্ধী সায় দিয়ে বললেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে চান তিনি তাই করবেন।
>
> টি এন কাউল এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব এনায়েত করিমকে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির খসড়া তৈরি করতে বলা হলো। জয়েন্ট ডিক্লারেশনের খসড়া তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হলো আমাকে আর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মহাপরিচালক এস এ এম এস কিবরিয়াকে। কিবরিয়া এবং আমি নিচতলায় গিয়ে একটা যৌথ ঘোষণা তৈরির জন্য পুরো বিকেলটা

খাটলাম। কাউল ও করিম দ্বিপাক্ষিক চুক্তির খসড়া তৈরি করলেন। ১৮ মার্চ অনেক রাতে দুই প্রধানমন্ত্রী যৌথ ঘোষণা ও চুক্তি অনুমোদন করলেন এবং ১৯ মার্চ সকালে বঙ্গভবনের মূল অভ্যর্থনা কক্ষে তাতে সই দিলেন।

এভাবেই স্বাক্ষরিত হলো ২৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ-ভারত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি। ১৯৭১ সালের আগস্টে স্বাক্ষরিত ২০ বছর মেয়াদী ভারত-সোভিয়েত চুক্তির আদলে এটা করা হয়েছিল, যেখানে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বিষয়ে কয়েকটি ধারা ছিল।[৩৩]

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ইন্দিরা মঞ্চে ভাষণ দেওয়ার আগে
অপেক্ষমাণ শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধী

ভারত-বাংলাদেশ চুক্তির সমালোচনা করে কয়েকটি রাজনৈতিক দল এই 'চাপিয়ে দেওয়া গোপন চুক্তির' প্রবল বিরোধিতা করে বলেছিল, বাংলাদেশ ভারতের করদ রাজ্য হয়ে গেছে। একটি মন্তব্যে বলা হয়, শেখ মুজিব নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করবেন এটা জানতে পেরে ভারত বাংলাদেশের ওপর এই চুক্তি চাপিয়ে দেয়।[৩৪] দীক্ষিতের বর্ণনায় জানা যায়, এই চুক্তি হয়েছিল শেখ মুজিবের আগ্রহে এবং এটা কোনো গোপন বিষয় ছিল না। এ ধরনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির উদাহরণ পৃথিবীতে অনেক আছে। এই অপপ্রচারের মাধ্যমে উগ্র

ভারতবিরোধী মনোভাব উসকে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট দিল্লিতে স্বাক্ষরিত ভারত-সোভিয়েত চুক্তির আদলেই বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির ভাষ্য ঠিক করা হয়। দুটো চুক্তিতেই ১২টি ধারা এবং সবগুলোর ভাষা প্রায় একই রকম দুটো চুক্তির মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, ভারত-সোভিয়েত চুক্তিটি ছিল ২০ বছর মেয়াদী এবং বাংলাদেশ-ভারত চুক্তিটি ২৫ বছরের জন্য। দুটো চুক্তিরই ৮, ৯ ও ১০ নম্বর ধারায় একই কথা বলা হয়েছে, যেখানে সামরিক চুক্তির গন্ধ পাওয়া যায়। ধারাগুলো হলো :

ধারা ৮ : উভয় পক্ষ ঘোষণা করছে যে, তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে অন্য কারো সঙ্গে কোনো সামরিক চুক্তি করবে না বা চুক্তিতে অংশ নেবে না।

ধারা ৯ : কোনো এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় কোনো পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হলে চুক্তিকারী পক্ষ তৃতীয় পক্ষকে কোনো সাহায্য দেবে না।

ধারা ১০ : এই চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে কোনো পক্ষ প্রকাশ্যে বা গোপনে অন্য কোনো দেশের সঙ্গে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতিতে যাবে না।[৩৫]

বাংলাদেশ-ভারত চুক্তিকে 'দাসত্বে'র চুক্তি বলে অনেকেই সমালোচনা ও গালাগাল করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশ তার সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়েছে। ১৯৭১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের ২০ বছরের চুক্তি সই হওয়ার পর ভারতের বিরোধী রাজনীতিবিদদের মুখে এ ধরনের কথা শোনা যায়নি কিন্তু বাংলাদেশে একটি মহল সবসময়ই ভারতের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল এবং তারা ভারতের সঙ্গে যেকোনো চুক্তিতেই সর্বনাশের গন্ধ পেত। এ ধরনের সমালোচনা ডান-বাম সব মহল থেকেই হয়েছিল। অনেক সময় চুক্তির নাম উল্লেখ না করে অনেক রাজনৈতিক দল 'ভারতের সঙ্গে সকল প্রকার প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি' বাতিলের দাবি জানাতো। দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জাসদ, ন্যাপ (ভাসানী) ও বাংলা জাতীয় লীগ (অলি আহাদ)। জাসদের দাবি ছিল, 'বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হুমকিস্বরূপ এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদাহানিকর সকল প্রকার প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি বাতিল করতে হবে।'[৩৬]

অলি আহাদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় লীগের অভিযোগ ছিল, ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তিটি আসলে একটি 'সামরিক চুক্তি' এবং এটি অবিলম্বে বাতিল করা উচিত। 'দিল্লির দাসত্ব' মোচনের দাবিতে অলি আহাদ 'আজাদ বাংলা' আন্দোলনের ডাক দেন।[৩৭]

ন্যাপের (ভাসানী) সাধারণ সম্পাদক কাজী জাফর আহমদ 'ভারতীয় গোলামির জিঞ্জির ছিন্ন করিয়া বাংলাদেশকে প্রকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম হিসাবে'

গড়ে তোলার জন্য 'ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত সকল গোপন চুক্তি অথবা প্রকাশ্য চুক্তি, সামরিক চুক্তি' বাতিল করার দাবি জানান।[৩৮]

১৯ মার্চ ১৯৭২ স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ ঘোষণায় উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল :

ক) দুই দেশের নদীগুলোর পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে স্থায়ীভাবে একটি যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হবে।

খ) বাঙলাদেশের জরুরি অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও পুনর্বাসন কর্মসূচির জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহ পর্যালোচনা করা হবে।

গ) দুই প্রধানমন্ত্রী নীতিগতভাবে একমত হয়েছেন যে ট্রানজিট ও সীমান্ত বাণিজ্য আবার শুরু হওয়া দরকার। এ সংক্রান্ত চুক্তি ১৯৭২ সালের মার্চের মধ্যে সই করা হবে।[৩৯]

ইন্দিরা গান্ধী যখন ঢাকায় তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল। শহীদ বুদ্ধিজীবী কল্যাণ পরিষদের একটি মিছিল নিয়ে শহীদ পরিবারের সদস্যরা ১৮ মার্চ শহীদ মিনার থেকে দুপুরবেলা বঙ্গভবনে যান। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের প্রিয়জন হারানোর কথা বলবেন এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে তাদের কিছু দাবি জানাবেন। বঙ্গভবনের গেটে তাঁদের বাধা দেওয়া হলো। কিন্তু তাঁরা জিদ ধরলেন, ভেতরে যাবেনই। শেষে শেখ মুজিব নিজেই গেটে চলে আসেন। তিনি বললেন, 'আপনারা কী বলতে এসেছেন? বিদেশি মেহমান, তাঁর কাছে এভাবে মিছিল করে যাওয়াটা কি আমাদের জন্য সম্মানজনক হবে? আপনাদের যা বলার আমাকেই বলুন।' মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন নফিসা কবির। তিনি পরিষদের দাবিদাওয়াগুলো বলতেই বঙ্গবন্ধু বলে উঠলেন— 'অনেকে তো দালালি করে মরেছে।' নফিসা কবির একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'বঙ্গবন্ধু, আপনি তো এদেশের কিংবদন্তি নেতা। ডাক দিয়েছিলেন স্বাধীনতার। স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। আপনি আটক ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। বুদ্ধিজীবীরা কেউ দালালি করে মরেনি। দালালি যারা করেছে, তারা এখনও বেঁচে আছে। সে দালালদের বিচারের দাবি জানাতে এসেছি।' শেখ মুজিব বললেন, 'দালালদের বিচার করব সে-কথা আমি বহুবার বলেছি। এভাবে মিছিল করে আসার কী অর্থ আছে। বিদেশি মেহমানদের কাছে তাতে সম্মান কি বাড়বে?' বঙ্গবন্ধু বিদেশি মেহমান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন; স্বভাবতই উনি একটু উত্তেজিতও ছিলেন সে মুহূর্তে।[৪০]

দিল্লি ফিরে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ২০ মার্চ ভারতের পার্লামেন্টে

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ ঘোষণা এবং শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তির ভাষ্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, দুই দেশের সরকার পারস্পরিক স্বার্থ বিবেচনা করে চুক্তিটি সই করেছে। পার্লামেন্ট সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ইন্দিরা বলেন, 'ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও গঙ্গার পানি দুই দেশের মানুষের কল্যাণে ব্যবহারের একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে।'[৪১]

১৮ মার্চ বঙ্গভবনের গেটের বাইরে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলছেন একাত্তরের শহীদদের স্বজনরা

২৮ মার্চ বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সই করেন বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী এবং ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী ললিত নারায়ণ মিশ্র। ১১টি ধারা সংবলিত এই চুক্তির পঞ্চম ধারায় বলা হয়, দুই দেশ তাদের পারস্পরিক সুবিধার জন্য এক দেশের ভেতর দিয়ে অন্য দেশ তার এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পণ্য পরিবহনের জন্য নদীপথ, রেলপথ ও সড়কপথ ব্যবহার করার ব্যবস্থা নেবে।[৪২]

৩

জন্ম মুহূর্তেই বাংলাদেশ বৈশ্বিক কমিউনিস্ট শিবিরের বিভক্তি ও ষাটের দশকের সোভিয়েত-মার্কিন ঠান্ডা লড়াইয়ের শিকার হয়েছিল। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন দুভাগ হয়ে যায় ষাটের দশকে, সোভিয়েত ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফলে। ১৯৫৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে দলের সাধারণ সম্পাদক নিকিতা ক্রুশ্চেভ দলের সাবেক নেতা জোসেফ স্ট্যালিনের কড়া সমালোচনা করলে এই দ্বন্দ্বের শুরু। সোভিয়েত পার্টির এক চিঠির জবাবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এক চিঠিতে জানায়, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো 'সংশোধনবাদ'। এরপর থেকেই চীনা পার্টি সোভিয়েত পার্টিকে 'সংশোধনবাদী' এবং কয়েক বছরের মাথায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' বলা শুরু করে। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীন গোপনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তুলছিল। এতকাল 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ'কে চীন মানবতার প্রধান শত্রু হিসেবে তুলে ধরলেও সত্তর দশকের গোড়া থেকে চীনের চোখে 'সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে দাঁড়ায়। 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ' চলে যায় কিছুটা আড়ালে।

চীন-সোভিয়েত তাত্ত্বিক লড়াইয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টি মস্কো ও পিকিং—এই দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায় এবং নিজ নিজ 'অভিভাবক' পার্টির তত্ত্বকে গ্রহণ করে। চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৬৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টি এবং ১৯৬৮ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ভাগ হয়। ১৯৬৯ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্ক্সবাদী) একটি অংশের নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানকে সমর্থন করা বা না করা অথবা এর ব্যাখ্যা নিয়ে এদেশে পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি আরও খণ্ড-বিখণ্ড হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন-সোভিয়েত ঠান্ডা লড়াই এবং ভারত-পাকিস্তান প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পিকিংপন্থী দলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ে। তারা কেউ কেউ চীনা পার্টির অন্ধ অনুকরণ করে, কেউ আবার একটু দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করে। ওই সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে চীনা পার্টির মূল্যায়ন ছিল—চীনকে দুর্বল করার জন্য সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের সহযোগিতায় পাকিস্তানকে ভেঙে বাংলাদেশ রাষ্ট্র তৈরি করতে সাহায্য করেছে। ১৯৭৩ সালের ২৪-২৮ আগস্টে অনুষ্ঠিত চীনা পার্টির ১০ম কংগ্রেসে এই মূল্যায়নটি আনুষ্ঠানিকভাবে

উল্লেখ করা হয়। চীনা পার্টির এই মূল্যায়ন হুবহু অনুকরণ করতে গিয়ে বাংলাদেশে চীনপন্থী পার্টিগুলো বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং পরবর্তীকালের পাকিস্তানি রাজনৈতিক উন্মাদনার অনুরূপ, যদিও তাদের কথাবার্তা ছিল বামপন্থার আবরণে।

বাংলাদেশের পিকিংপন্থী দলগুলোর পুস্তিকা-প্রচারপত্র-পোস্টারের ভাষা শুরু থেকেই ছিল আক্রমণাত্মক। জনসম্পৃক্ত রাজনীতি না করার কারণে এবং এক পর্যায়ে গণসংগঠন করাকে 'সংশোধনবাদী' কাজ হিসেবে বিবেচনা করার ফলে সাধারণ জনগণের বোধগম্য ভাষায় তাঁরা অনেক সময় কথা বলতে বা বক্তব্য প্রচার করতে পারেননি। জনমনে একটা সাধারণ ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, যাঁরা সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট, তাঁরা হবেন উন্নত সংস্কৃতি ও চরিত্রের অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রচারপত্রগুলো ছিল বাগাড়ম্বরে ঠাসা এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও গালিগালাজে ভরা তাঁরা চীনা পার্টির দলিল এবং অনেক ক্ষেত্রে 'নকশালবাড়ি' আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদারের অনুসারীদের প্রচারপত্র থেকে শব্দচয়ন করে নিজেদের বক্তব্য উগরে দিতেন। তাঁরা অনেকেই ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের ওজনদার শব্দগুলো নিয়ে 'তাত্ত্বিক লড়াই' করতেন এবং এসব শব্দের ব্যাখ্যায় পান থেকে চুন খসলেই দল ভাগ করে ফেলতেন।

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) বাহাত্তরের শুরুতেই ভাঙনের মুখে পড়ে। সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে একটি উপদল এবং আবদুল হকের নেতৃত্বে আরেকটি উপদল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। তোয়াহার নামে তাঁদের উপদলের একটি বিবৃতি সাপ্তাহিক *হলিডে* পত্রিকায় ছাপা হলে, হকের অনুসারীরা তা পছন্দ করেননি। হকের উপদল ১৯৭২ সালের ১ এপ্রিল আলাদা সভা করে 'জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে আসুন' শিরোনামে একটি দলিল গ্রহণ করে এই দলিলে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়, 'ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গীনের ডগায় চড়ে এসে তথাকথিত স্বাধীন বাংলার মুজিব সরকার গদীতে বসেছে।... পূর্ব বাংলা আজ সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে, আর ভারতীয় জনতার জানি দুশমন ইন্দিরা সরকারের সৈন্যবাহিনী এই উপনিবেশের তদারকিতে নিযুক্ত হয়েছে'।[৪৩] মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদারের অনুসারীদের নিয়ে ১৯৭২ সালেই তৈরি হয় পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল (মা-লে)। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত

দ্বিতীয় কংগ্রেসে দলের নাম বদলে রাখা হয় বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে) আওয়ামী লীগ সরকারকে তারা মনে করত 'জাতীয় দুশমন', 'রুশ-ভারত শাসকচক্রের' দালাল ও 'জাতীয় বিশ্বাসঘাতক'।[৪৪]

১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (মা-লে) একটি খণ্ডিত অংশ পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি নামে সক্রিয় ছিল। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে দলটি আবদুল মতিন ও আলাউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হয়। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির এক রিপোর্টে বলা হয়, 'পূর্ব বাংলায় এখন একটি নতুন তাঁবেদার রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে। এই রাষ্ট্র স্বাধীনও নয়, এই রাষ্ট্র জনগণেরও নয়। সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদ পূর্ব বাংলাকে দখল করে নয়া উপনিবেশে পরিণত করেছে। পূর্ব বাংলা তাই নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ আজ পূর্ব বাংলার জনগণের সামনে চলে এসেছে এবং এক বিপজ্জনক শত্রুতে পরিণত হয়েছে'।[৪৫] রিপোর্টে ভারতীয় বাহিনীকে দখলদার বাহিনী হিসেবে উল্লেখ করে মুজিব সরকারকে 'পুতুল সরকার' বলা হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বলা হয়, 'দেশি ও বিদেশি সমস্ত শোষণের হাত থেকে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করতে হবে। শ্রেণি সংগ্রাম অর্থাৎ খতম অভিযান চালিয়ে সকল সমস্যার সমাধান করার কাজ অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে।... শ্রেণি শত্রুর হাত থেকে গ্রামগুলো মুক্ত করুন।' বাহাত্তরের মে মাসেই রাজশাহীর আত্রাইয়ে (বর্তমান নওগাঁ জেলায়) দলটির সদস্যদের সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ হয় এবং ওহিদুর রহমান ও আবদুল মতিন আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। দলের মুখপত্র *পূর্ব বাংলার* ১৫ জুন ১৯৭২ সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়, 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)-এর নেতৃত্বে রাজশাহী জেলার আত্রাই, রানীনগর ও বাগমারা থানায় সশস্ত্র কৃষক লড়াই আজ সারা দেশের লোককে চমকে দিয়েছে।... হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য রাজশাহী জেলার হাজার হাজার কৃষকের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, অসংখ্য মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছে, বহু কৃষককে হত্যা করেছে।'[৪৬]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ওই সময় ওই অঞ্চলে ভারতের কোনো সৈন্য ছিল না। ভারতীয় সেনাবাহিনী মার্চ মাসেই দেশে ফিরে গিয়েছিল। আত্রাই ও আশেপাশের এলাকায় সেনা কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রংপুরের ব্রিগেট কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলের তত্ত্বাবধানে। মতিন-আলাউদ্দীনরা তখন ভারতবিরোধী প্রচারণাটি ভালোভাবেই উসকে দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির সমালোচনা করে সম্ভবত সবচেয়ে কড়া বক্তব্যটি

দিয়েছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা। সমালোচনার ভাষা যে কত আক্রমণাত্মক হতে পারে তার নমুনা পাওয়া যায় 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ও রক্ষা চুক্তি নামধারী দাসত্বমূলক চুক্তিটির কবর রচনা করুন' শিরোনামে তোয়াহার এই বিবৃতিতে :

> আমাদের জীবনের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ স্বাধীনতা থেকে আজ আমরা বঞ্চিত। দুইশত বছর আগে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর-জগৎ শেঠরা গদীতে বসার লোভে আমাদের দেশকে ইংরেজ দস্যুদের হাতে তুলে দিয়েছিল। দুই শত বৎসর পর সেই মীরজাফরদের বংশধর শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন, মণি সিং, মোজাফফররা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে রাশিয়া ও ভারতের বেনিয়াদের নিকট বেচে দিয়েছে। এই নতুন মীরজাফরেরা ৭টি গোপন চুক্তি এবং একটি প্রকাশ্য চুক্তির মাধ্যমে যেরূপ হীন দাসত্বের সনদে স্বাক্ষর দান করেছে, তারা আমাদের প্রতি ও দেশের প্রতি যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অতীতে মীরজাফররাও এতখানি করেনি।
>
> ভারতে থাকাকালে দেশদ্রোহী তাজউদ্দীন-নজরুল সাহেবরা ইন্দিরার সঙ্গে যে সাতটি গোলামীর চুক্তি করেন তা দেশবাসীর নিকট তখনও গোপন রাখা হয় এবং এখনও গোপন রাখা হয়েছে কিন্তু দেশদ্রোহীদের মধ্যেই গুতাগুতির ফলে তার কিছু কিছু শর্ত প্রকাশ্যে এনে দেশদ্রোহীদের সর্দার শেখ মুজিব ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে অষ্টম চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছেন আর এই হীন দাসত্বমূলক চুক্তিটির নাম দেওয়া হয়েছে "ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী, শান্তি ও রক্ষা চুক্তি।"[৪৭]

পিকিংপন্থী বর্গের আরেকটি দল হলো পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি। ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) সাবেক সহসভাপতি সিরাজুল হক সিকদারের নেতৃত্বে এই দলটি শুরু থেকেই সরকারের বিরোধিতা করে আসছিল। এরা অন্য সব বাম দলেরও বিরোধিতা করত এবং নিজেদের একমাত্র খাঁটি কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে দাবি করত। তারা পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের উপনিবেশ মনে করত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের আহ্বানও জানিয়েছিল। বাংলাদেশ ভারতের একটি উপনিবেশে পরিণত হয়েছে বলে তারা প্রচার শুরু করে। ১৯৭২ সালের মার্চে 'পূর্ব বাংলার বীর জনগণ, আমাদের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি, পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান সংগ্রাম চালিয়ে যান' শিরোনামে প্রচারিত এক বিবৃতিতে দলটি বলে :

> পাকিস্তানের সামরিক ফ্যাসিস্টরা পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয় বিকাশ অবাধে চলতে দেওয়ার পরিবর্তে পূর্ব বাংলাকে শোষণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করে, একে তার উপনিবেশে পরিণত করে।
>
> পূর্ব বাংলার জনগণ এ উপনিবেশিক শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে জাতীয়

মুক্তির জন্য মহান সংগ্রাম পরিচালনা করে, লক্ষ লক্ষ জনগণ এ সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

পূর্ব বাংলার জনগণের এ মহান সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণি... বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়।... ফলে পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া সামন্তবাদী ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তারা এ সংগ্রামকে বিপথে পরিচালনা করে।... নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে পূর্ব বাংলা মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতার লোভে সাড়ে সাত কোটি জনগণের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে; বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের নিকট বিক্রি করে দেয়, পাক সামরিক ফ্যাসিস্টদের উৎখাতের জন্য তাদেরকে ডেকে আনে।

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তা ও সমর্থনে এ সুযোগ গ্রহণ করে।... তারা পূর্ব বাংলা দখল করার জন্য বাংলাদেশে পুতুল সরকার গঠন করে একে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করায়, কামানের খোরাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য তার সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে তাঁবেদার মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলে, তাদেরকে পূর্ব বাংলার নাশকতামূলক তৎপরতা চালাবার জন্য প্রেরণ করে। শেষ পর্যন্ত তারা পাকিস্তান আক্রমণ করে এবং সশস্ত্র আগ্রাসী বাহিনীর দ্বারা পূর্ব বাংলা দখল করে নেয়

এভাবে পূর্ব বাংলা ভারতের উপনিবেশে পরিণত হয় এবং পূর্ব বাংলার জনগণ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক জনগণের রক্তপাত বৃথা যায়।...

এ দ্বন্দ্ব সমাধানের উপায় হচ্ছে সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লব পরিচালনার মাধ্যমে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও তার পদলেহী কুকুর ছয় পাহাড়ের দালাল জাতীয় শত্রুদের খতম ও উৎখাত করা, বাংলাদেশের পুতুল সরকারকে উৎখাত করা, পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করা।[৬৮]

৪

ঢাকায় যখন মুজিব-ইন্দিরা বৈঠক চলছে, মস্কোয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি নিকোলাই কোসিগিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো। তাঁদের আলোচনায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বারবার। ভুট্টোর সফরসঙ্গী পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব সুলতান মোহাম্মদ

খানের বয়ানে ভুট্টো-কোসিগিন সংলাপ সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হলো।

ভুট্টো : আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে তাসখন্দ চুক্তি মেনে চলা হয়নি। তাহলে সাম্প্রতিক ভুলগুলো এড়ানো যেত। বাস্তবতা মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। তবে আন্তর্জাতিক আইনের সীমার মধ্যে থেকেই বাস্তবতা মানতে হবে।

শুধু যুদ্ধের জঞ্জাল সাফ করা নয়, উপমহাদেশের সমস্যা সমাধানের জন্য মিসেস গান্ধী ও মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে আমি প্রস্তুত। ভারতে আটক যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে আমরা চিন্তিত। ঢাকার নিরাপত্তা, বিহারি ও পাকিস্তানের সমর্থক বাঙালিদের হত্যার বিষয়টিও উদ্বেগের কারণ অন্যান্য বিষয় নিয়েও আমরা আলাপ করতে চাই। আমরা খোলা মন নিয়ে কথা বলছি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।

কোসিগিন : আমরা আপনার অবস্থা জেনেছি। উপমহাদেশের জটিল পরিস্থিতির চটজলদি কোনো সমাধান নেই। আপনি কীভাবে সমাধান করবেন তা শুনতে চাই আবেগ শুধু পাকিস্তানেই নেই, তা বাংলাদেশ এবং ভারতেও আছে। তিন দেশেরই আলাদা মতামত আছে।

বাংলাদেশকে নিয়ে আপনি কী ভাবছেন তা নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। ইতিমধ্যে পঞ্চাশটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আপনি এটা কীভাবে দেখছেন? স্বীকার করছি আপনার জন্য এটা সহজ ব্যাপার না। তবুও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে আপনার মত জানতে চাই।

সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য শুনেছি। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব। সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য নিবেদিত সব শক্তিকে আমরা সমর্থন দেব। যদি চান, তাহলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে আমরা অনানুষ্ঠানিক ও বন্ধুসুলভ আলোচনার উদ্যোগ নিতে পারি। যদি অগ্রহণযোগ্য কোনো প্রস্তাব আসে, তবুও কিছু মনে করবেন না। আমরা অনানুষ্ঠানিক, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করতে পারি।

ভুট্টো : ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা না চাইলেও যদি কোনো বিরোধ দেখা দেয়, তা হবে ভারতের সঙ্গে। সুতরাং দিল্লি এবং ইসলামাবাদের মধ্যকার সম্পর্কের ওপর সমাধান নির্ভর করছে। বাংলাদেশের ওপর ভারতের যথেষ্ট প্রভাব আছে। আমরা যদি ভারতের সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে ঢাকার সঙ্গে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সম্পর্কের ওপর ভালো প্রভাব পড়বে।

আপনি চাইলে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়েও কথা হতে পারে—এমনকি আমি এটাকে বাংলাদেশও বলতে পারি। মুজিব শর্ত দিয়েছেন স্বীকৃতি দিতে হবে। ৭ জানুয়ারি (১৯৭২) রাওয়ালপিন্ডিতে যখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তিনি দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন তিনি শেখ আবদুল্লাহ বা বখশি গোলাম মুহাম্মদ (কাশ্মিরের ভারতপন্থী নেতা) নন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে তিনি গিলে খেতে দেবেন না। ঢাকায় ফিরে তিনি অনেক আপত্তিকর কথা বলেছেন। কিন্তু আমি তাঁর সমালোচনা করিনি। আমি পরিস্থিতি বেহাল করতে চাই না। আমি আপসের মনোভাব দেখিয়েছি। কিন্তু সাড়া না দিয়ে তিনি কেবল স্বীকৃতির কথাই বারবার বলে যাচ্ছেন।

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে (বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ায় পাকিস্তান এই দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল)। আমি সাবধানে এগোচ্ছি। হঠাৎ স্বীকৃতি দিলে তা পাকিস্তানে গোলযোগ ও উত্তেজনার কারণ হবে।

শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিতে গিয়ে আমি রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েছি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পরামর্শ আমাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে আমি বাস্তববাদী। অন্যরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে। আমার জন্য এটা কঠিন, কেননা আমার দেশের একটা অংশ ভেঙে আলাদা হয়েছে। আপনার দেশের একটা অংশ ভেঙে গেলে অন্যরা তাকে যদি স্বীকৃতি দেয়, তাহলে আপনার ক্ষেত্রে বিষয়টা হবে অন্যরকম। একটা অবস্থান থেকে আরেকটা অবস্থানে আমি অত তাড়াতাড়ি যেতে পারি না। যদি ভারত ও মুজিবের কাছ থেকে সাড়া পাই, তবে সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদস্য হতে ব্যক্তিগতভাবে আমি বাংলাদেশের দায়িত্ব নেব। যদি আমি তাড়াহুড়ো করি, পাকিস্তানের মানুষ ভাববে আমি বুঝি দরকষাকষির কোনো জায়গা রাখিনি। আপনাকে আমার অবস্থা বুঝতে হবে। আমাকে কিছু সময় দিন, অনির্দিষ্টকাল না, ধরুন তিন মাস। কারণ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হবে আমার জন্য বেদনাদায়ক।

কোসিগিন : আপনার কথা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশেও প্রচণ্ড জনমত আছে। তবে বাংলাদেশ পরিস্থিতির জন্য আপনি দায়ী না। এ দায় সেনাবাহিনীর। তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেনি, নিজের লোককে শাস্তি দিয়েছে। সব প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে এটা ছিল একটা

অপরাধ, যা আপনাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিতে পারত। আমরা ইয়াহিয়াকে সতর্ক করেছিলাম যে কী ভয়াবহ দুর্যোগ প্যাকিস্তানের ওপর নেমে আসছে। কিন্তু সামরিক একনায়কত্ব বজায় রাখার জন্য তিনি বলপ্রয়োগ করেছেন। জেনারেল টিক্কা খানকে ঢাকায় পেলে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে। মুজিব বলেছেন ১০ লাখ লোক মারা গেছে। সংখ্যাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রগতিশীল মানুষদের খুন করা হয়েছে, এটাই সেনাবাহিনীর অপরাধ। যুদ্ধটা বাইরে থেকে কেউ চাপিয়ে দেয়নি। এটা ছিল আপনাদের ভেতরের লড়াই।

আমরা আপনার অবস্থা বুঝি। আমাদের পরামর্শ শুনে মুজিবকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু মুজিবের অসুবিধাগুলোও আপনাকে বুঝতে হবে। সেগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি কয়েকটি বিষয়ে নিশ্চয়তা এবং স্বীকৃতি চান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর মনে কোনো বিদ্বেষ নেই। যারা প্রগতিশীল মানুষদের হত্যা করেছে, তিনি তাদের ঘেন্না করেন।

আপনি টিক্কা খানকে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ করায় মুজিবের মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়েছে তার মানে সব সম্পর্ক চুকে গেছে। ভারতের প্রতিক্রিয়া একই রকম আমরা মুজিবকে বলেছি, এর পেছনে হয়তো বিশেষ কারণ আছে এবং ঝোঁকের মাথায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো ঠিক হবে না। তিনি বলেছেন, তাতে পরিস্থিতি তো বদলাচ্ছে না।

আপনি যে পদক্ষেপগুলোর কথা ভাবছেন এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদের পক্ষে সমর্থন দেওয়ার যে কথা বলেছেন, তা প্রশংসনীয়। এই কথাটা একটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে থাকতে পারে অথবা ব্যক্তিগতভাবে এটা মুজিবকে বলতে পারি। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে মুজিব আপনাকে যা-ই বলে থাকুন না কেন, শুনতে ভালো লাগলেও এটা একটা অলীক স্বপ্ন। যা ঘটে গেছে, তা অপরিবর্তনীয়। তৃতীয় কোনো শক্তি (যুক্তরাষ্ট্র বা চীন) যদি নাক গলায়, তা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য দুর্ভোগের কারণ হবে। আপনাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য আমাদের সাধ্যমতো যেকোনো পদক্ষেপ নিতে তৈরি থাকব। (তাকে লেখা ইন্দিরা গান্ধীর একটা চিঠির অংশবিশেষ কোসিগিন পাঠ করে শোনান)। 'অনুগ্রহ করে মি. ভুট্টোকে বলুন, আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। আমরা কোনো শর্ত ছাড়া সরাসরি আলাপ করতে চাই। মি. ভুট্টোর অসুবিধাগুলো আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। সমস্যা বাড়ুক আমি

তা চাই না। তবে চার ডিভিশন যুদ্ধবন্দিকে শান্তি প্রক্রিয়া থেকে আলাদা করে দেখা যাবে না। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে আরও চার ডিভিশন সৈন্য যুক্ত হবে এটা আমার জনগণকে বোঝাতে পারব না। যুদ্ধবন্দিরা পাকিস্তানে ফিরে যাবে এটা বলার মতো পরিবেশ আমাকে পেতে হবে। আমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সম্পর্ক চাই। আমাদের মধ্যে একটা শীর্ষ বৈঠক আয়োজনের জন্য একজন বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ দিতে চাই। অনুগ্রহ করে মি. ভুট্টোকে বলুন, পাকিস্তানের ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পথে সব সন্দেহ দূর করতে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।'

ভুট্টো : মিসেস গান্ধীর সঙ্গে আমি সরাসরি বৈঠকে আগ্রহী। দুদেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈঠকসংক্রান্ত নানান আনুষ্ঠানিকতার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই . তাতে শুধু সময় নষ্ট হবে।[৪১]

মার্কিন প্রশাসন মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও ঢাকায় তাদের কনস্যুলেট অফিসটি চালু ছিল কনসাল জেনারেল হার্বার্ট ডি স্পিভাক ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে ওয়াশিংটনে স্টেট ডিপার্টমেন্টে চিঠি দেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার তখন চীনে। ২৪ ফেব্রুয়ারি তিনি ওয়াশিংটনে বার্তা পাঠিয়ে স্পিভাককে চুপচাপ থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেন, ভারতীয় সৈন্যরা ফিরে গেলে, চীনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ স্পিভাককে মন্ত্রণালয়ে ডেকে এনে জানতে চান, ঢাকার কনস্যুলেট কি বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে, না কি ইসলামাবাদের দূতাবাসের অংশ হয়ে পাকিস্তানের স্বার্থ দেখবে। সামাদ আজাদ যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক স্বীকৃতির চেয়েও বেশি ভাবছিলেন বাংলাদেশ নিয়ে তাদের মনোভাব কী তা জানতে। ওই সময় কনস্যুলেটে মার্কিন পতাকা তোলা হতো এবং কনসাল জেনারেল তাঁর গাড়িতে পতাকা ব্যবহার করতেন। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশি কূটনীতিকরা, যারা আগেই পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেছিলেন, কোনো কূটনৈতিক মর্যাদা পেতেন না এবং তাঁদের আয়কর দিতে হতো। স্পিভাক ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।[৩৩]

৩ মার্চ নিক্সন এবং কিসিঞ্জার দক্ষিণ এশিয়ায় উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসেন যে,

নিক্সনের আসন্ন চীন সফরের পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাঁদের কথোপকথন ছিল এ রকম :

কিসিঞ্জার : জো সিসকো (পররাষ্ট্র দপ্তরের অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি) গতকাল আমার কাছে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছে।

নিক্সন : তাকে কিছু বলবে না।

কিসিঞ্জার : আমি ভয়ানক একটা ভুল করে ফেলেছি। আমি বলেছি যে, আগামী চার থেকে ছ'সপ্তাহ এ ব্যাপারে কিছু করবেন না। খোদা না করুক, এটা না আবার আজকের কাগজে ছাপা হয়ে যায়। আমার বোঝা উচিত ছিল...

নিক্সন : আমি বাংলাদেশের ব্যাপারে হয়তো কিছু করব না। হেনরি, তুমি নিশ্চয়ই আমার মনোভাব জান। আমি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করব। চীনাদের জন্য আরও দু সপ্তাহ অপেক্ষা করাই ঠিক হবে। তোমার কী মনে হয়?

কিসিঞ্জার : এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা দরকার।

নিক্সন : ঠিক বলেছ আমিও তা-ই ভাবছি। এ নিয়ে তাড়াহুড়োর দরকার নেই।

কিসিঞ্জার : চীনে এ নিয়ে আমরা অনেক কিছু বলেছি। এ নিয়ে তাড়াহুড়ো করব না।

নিক্সন : স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলতে পারে যে, তুমি যে প্রেক্ষাপট দিয়েছ তার বাইরে তারা যাবে না।

কিসিঞ্জার : আমি তো এ বিষয়ে কিছু বলিনি।

নিক্সন: কথা হলো এটা নিয়েই তাদের কথা চলবে।

কিসিঞ্জার : নেপথ্যে কিছু বলা আর কাগজে-কলমে বলার মধ্যে ফারাক আছে। আর আমি তো তা বলিনি।

নিক্সন : ঠিক ঠিক।[৫১]

৬ মার্চ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে প্রস্তাব রাখেন যে, ২৫ মার্চের কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। তিনি বলেন, 'মুজিব যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নমনীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি তাঁকে সোভিয়েত ও ভারতের ওপর অতি নির্ভরতা কাটানোর বিকল্প চিন্তা করার সুযোগ করে দেবে। এ জন্য তিনি এই পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানাবেন। আমাদের বিশ্বাস, এটাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঠিক সময় এবং দেরি হলে ঢাকায় মার্কিন স্বার্থ রক্ষার অনুকূল পরিবেশটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে আমাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।... এমনকি ভুট্টোও মনে করে যে, আশু

মার্কিন স্বীকৃতি উভয়ের স্বার্থের জন্যই ভালো। তবে ভারতীয় সৈন্যের বাংলাদেশ থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার'।[৫২]

২৮ মার্চ কিসিঞ্জার রজার্সকে জানান, স্টেট ডিপার্টমেন্ট ৩ এপ্রিলের পরে ঘোষণা দিতে পারে যে, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি এই তথ্যটি ভুট্টো এবং চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে জানাতে বলেন। তিনি আরও বলেন, ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত যেন এটা গোপন রাখা হয়।[৫৩]

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ৩ এপ্রিল ঢাকা কনস্যুলেটকে স্বীকৃতির ব্যাপারে মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্ত জানায়। কনসাল জেনারেল স্পিভাক ওই সময় ওয়াশিংটনে ছিলেন। তাঁকে ৭ এপ্রিল ঢাকা যেতে এবং ৮ এপ্রিল বা যত শিগগির সম্ভব প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে এটা জানাতে বলা হয়।[৫৪]

রজার্স ৪ এপ্রিল ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেন। ওই দিন নিক্সন শেখ মুজিবকে দেওয়ার জন্য একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি বলেন, 'প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে জানাতে চাই যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আমরা আপনার সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাই।'[৫৫]

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ভারত সরকারের প্রতিনিধি ডি পি ধর ও পি এন হাকসার পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারির শেষে এবং মার্চে মারী এবং ইসলামাবাদে বৈঠক করেন। বৈঠকে যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে কথা হয়। ফেব্রুয়ারি ও জুনের মধ্যে দুই দেশের প্রতিনিধিরা চারবার বৈঠক করেন। এপ্রিলের মধ্যে শেখ মুজিব ৪০০ জন সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধীর তালিকা ছোট করে ১৯৫ জনে এবং পরে ১২৮ জনে নামিয়ে আনেন। শেখ মুজিব জুন মাসে (১৯৭২) হাকসারকে বলেছিলেন, সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় করা খুবই কঠিন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য তিনি শক্তি ও সময়ের অপচয় করতে চান না। এই বিচার পাকিস্তান ও অন্যান্য ইসলামি দেশের স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে, এটা ভেবেই শেখ মুজিব হয়তো এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উপমহাদেশে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত ছিল যৌক্তিক। এর ফলে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ভারতের সিমলায় ইন্দিরা-ভুট্টো শীর্ষ বৈঠকের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা সহজ হয়েছিল। সিমলা চুক্তিতে বাংলাদেশ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো ছিল :

— সব যুদ্ধবন্দিকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হবে।

– বাংলাদেশের হয়ে ভারত পাকিস্তানকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, যুদ্ধাপরাধের কোনো বিচার হবে না।
– বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে ভারত জুলফিকার আলী ভুট্টোকে পরামর্শ দিয়েছে।[৫৬]

৫

বঙ্গবন্ধু ঘর গোছানোর দিকে মনোযোগ দেন। বাহাত্তরের ৭-৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সরকারে থেকে দলীয় পদ ধরে রাখার উপায় ছিল না। কাউন্সিলে শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচন করে তাঁকে কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কাউন্সিলে পাওয়া ক্ষমতাবলে শেখ মুজিব ১৬ এপ্রিল ৪৫ সদস্যের সাংগঠনিক কমিটি ঘোষণা করেন। কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন মো. কোরবান আলী, জহিরুল কাইয়ুম ও মো. আবদুর রহিম (সহসভাপতি), জিল্লুর রহমান (সাধারণ সম্পাদক), মো. আবদুর রাজ্জাক (সাংগঠনিক সম্পাদক), সরদার আমজাদ হোসেন (প্রচার সম্পাদক), মুস্তাফা সারোয়ার (সমাজকল্যাণ সম্পাদক), আনোয়ার চৌধুরী (দপ্তর সম্পাদক), আবদুর রউফ (কৃষি সম্পাদক), রুহুল আমিন ভুঁইয়া (শ্রম সম্পাদক), সাজেদা চৌধুরী (মহিলা সম্পাদিকা) এবং আবদুল মোমিন (কোষাধ্যক্ষ)। কার্যনির্বাহী সদস্য হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ফনীভূষণ মজুমদার, জহুর আহমদ চৌধুরী, দেওয়ান ফরিদ গাজী, রফিক উদ্দিন ভুঁইয়া, শামসুদ্দিন আহমদ মোল্লা, রওশন আলী, গাজী গোলাম মোস্তফা, ময়েজউদ্দীন আহমদ, নূরুল হক, এ কে মুজিবর রহমান, নূরুল ইসলাম মঞ্জু, সালাহউদ্দিন ইউসুফ, আবদুল মোমিন তালুকদার, আবুল কাসেম, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে এম ওবায়দুর রহমান, আজিজুর রহমান আক্কাস, আবদুল হান্নান, শেখ ফজলুল হক মণি, লুৎফর রহমান, আবদুল মান্নান (শ্রমিক লীগ), তোফায়েল আহমেদ, শামসুর রহমান খান, ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল ও রাফিয়া আখতার ডলি।[৫৭]

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভার দ্বিতীয় দিনে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটেছিল। মার্কিন কূটনীতিক হার্বার্ট স্পিভাক ৮ এপ্রিল গণভবনে এসে শেখ

মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। গণভবন চত্বরেই চলছিল কাউন্সিল সভা। শেখ মুজিব সভা ছেড়ে স্পিভাকের সঙ্গে দেখা করেন। স্পিভাকের বর্ণনা অনুযায়ী 'এই সাক্ষাৎপর্বটি ছিল অনানুষ্ঠানিক, উষ্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ।' নিক্সনের পাঠানো চিঠি পেয়ে মুজিব ধন্যবাদ জানান এবং খাম খুলে চিঠিটি পড়েন। মুজিব বলেন, তিনি শিগগিরই ওয়াশিংটনে দূতাবাস খোলার ব্যবস্থা করবেন। স্পিভাককে আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি বলেন, 'আপনি যখন খুশি আমার কাছে চলে আসবেন।'[৩৮]

৯ এপ্রিল শেখ মুজিব নিক্সনকে তাঁর চিঠির জবাব দেন। এর দুমাস পর, ১৬ মে এনায়েত করিম বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত হিসেবে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে দেখা করে শেখ মুজিবের একটি চিঠি দেন। নিক্সন বলেন, 'ঝগড়াবিবাদ এখন অতীতের বিষয়। আমরা একসঙ্গে সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলব।' তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, মুজিবের সঙ্গে একদিন নিশ্চয়ই দেখা হবে।[৩৯] দুজনের কখনোই দেখা হয়নি।

১০ এপ্রিল (১৯৭২) বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। গণপরিষদের ৪০৩ জন সদস্যের মধ্যে ৪০১ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের, একজন ন্যাপের (মোজাফফর) এবং একজন স্বতন্ত্র (পার্বত্য চট্টগ্রামের)। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ৩৩ সদস্যের সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির কাজ হলো বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধানের খসড়া তৈরি করা। আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন কমিটির সভাপতি। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, আবদুর রহিম, আবদুর রউফ, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, আবদুল মোমিন তালুকদার, আবু সাইয়িদ, মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ, আমীর-উল-ইসলাম, বাদল রশীদ, খোন্দকার আবদুল হাফিজ, নূরুল ইসলাম মঞ্জু, শওকত আলী খান, হুমায়ূন খালিদ, আসাদুজ্জামান খান, এ কে মোশাররফ হোসেন আকন্দ, আবদুল মোমিন, শামসুদ্দিন মোল্লা, আবদুর রহমান, ফকির শাহাবুদ্দীন আহমদ, আবদুল মুন্তাকীম চৌধুরী, খোরশেদ আলম, সিরাজুল হক, দেওয়ান আবুল আব্বাস, হাফেজ হাবীবুর রহমান, আবদুর রশীদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ খালেদ, রাজিয়া বানু ও ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র মন্ডল। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছিলেন একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য (ন্যাপ-মোজাফফর)। কমিটির সব সভায় সব সদস্য হাজির থাকতেন না। কামাল হোসেন ইংরেজিতে খসড়া তৈরি করতেন। বাংলায় এটা অনুবাদ করতেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। তাঁর সহযোগী ছিলেন

নেয়ামাল বসির ও এ কে এম শামসুদ্দিন। আনিসুজ্জামান কমিটির সদস্য না হয়েও কমিটির সভায় অংশ নিতেন।[৬০]

সংবিধান বিষয়ে কথা বলার জন্য শেখ মুজিব দুবার কামাল হোসেনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে আনিসুজ্জামানও ছিলেন। শেখ মুজিব দুটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রথমটি হলো, রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংযোগ ছিন্ন করার বিধান থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, দলীয় শৃঙ্খলা ভেঙে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট দেওয়া বন্ধ করতে হবে।[৬১]

বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের একটি দৃশ্য, ১০ এপ্রিল ১৯৭২

১৪ এপ্রিল টাঙ্গাইলের সন্তোষে অনুষ্ঠিত ন্যাপ (ভাসানী)-এর সংগঠকদের এক সভায় সব পেশা ও সংগঠনের মতামত নিয়ে সংবিধান তৈরির আহ্বান জানানো হয়।[৬২] ১৮ জুন টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী ময়দানে এক জনসভায় মওলানা ভাসানী বলেন, 'দিল্লির শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে প্রণীত কোনো শাসনতন্ত্রই বাংলার বীর জনতা মানবে না'।[৬৩] ৮ অক্টোবর ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় মওলানা ভাসানী সবার মতামত নিয়ে সংবিধান তৈরির দাবি আবারও উল্লেখ করে বলেন, 'কোরআন, সুন্নাহ, ওয়াজেব, শরিয়ত ও হাদিসের খেলাপ করিয়া কোনো শাসনতন্ত্র মুসলমানদের ওপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইলে মুসলমানগণ এক বিন্দু রক্ত থাকিতে তাহা মানিবে না'।[৬৪]

একেই বলে উল্টোযাত্রা! ১৪ এপ্রিল (১৯৭২) ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

টাঙ্গাইলের সন্তোষে দলের সংগঠকদের সভার প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, 'সংবিধান হবে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক।'[৬৫] ছয় মাস না পেরোতেই ভাসানী ইসলামি সংবিধান দাবি করে বসলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুটো সমান্তরাল ধারা আবার চালু হলো, মুক্তিযুদ্ধের সময় যা আড়ালে চলে গিয়েছিল।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা পঙ্গু রাখতে

রুশ-ভারতীয় চক্রান্ত

লাল বাহিনী দিয়ে কৃষক সমিতি দমন করলে মুজিবের দশা চিয়াং কাইশেকের মত হবে

মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক *হক কথা*র ২ জুন ১৯৭২ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা

আওয়ামী লীগের মধ্যেও চলছিল টানাপোড়েন। ছাত্রলীগের মধ্যে দুটো উপদল ছিল। একটির নেতৃত্ব দিতেন শেখ ফজলুল হক মণি, অন্যটির সিরাজুল আলম খান। ছাত্রলীগের মধ্যে এই বিভক্তি জোরালো হয়ে উঠেছিল ১৯৬৯ সালেই। এর একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল নভেম্বরে (১৯৬৯) ঢাকার জিন্নাহ কলেজের (পরে নাম বদলে হয় তিতুমীর কলেজ) ছাত্রসংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। নির্বাচনে ছাত্রলীগের দুটো প্যানেল হয়। সিরাজপন্থীদের সমর্থিত কুতুবউদ্দিন চৌধুরী ও আনিসুজ্জামান খোকনের প্যানেল অপর গ্রুপের আলী হোসেন ও মনজুর কাদেরের নেতৃত্বাধীন প্যানেলকে হারিয়ে দেয়।[৬৬] উপদলীয় কোন্দলের ওপর আদর্শের একটা চাদর জড়ানো হয়েছিল। মণি গ্রুপ চাইত 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'; সিরাজ গ্রুপের স্লোগান ছিল 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ'।

১৯৭১ সালের শেষদিকে শেখ মুজিবের 'আদর্শ'কে 'মুজিববাদ' নাম দিয়েছিলেন সিরাজুল আলম খান।[৬৭] এরপরই ছাত্রলীগে নতুন একটা স্লোগান চালু হলো বিশ্বে এল নতুন বাদ/ মুজিববাদ মুজিববাদ। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সিরাজুল আলমের অনুসারীরা এই স্লোগানটি দেওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁরা নতুন স্লোগান চালু করেন—সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে বিপ্লব আর সমাজতন্ত্র তখন খুবই জনপ্রিয় শব্দ। আর এই শব্দগুলোই সিরাজপন্থীদের অনানুষ্ঠানিক 'লোগো' হয়ে গেল।

বাহাত্তরের শুরু থেকেই এই কোন্দল নতুন মাত্রা পায়। মণি গ্রুপ চায় 'বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'; সিরাজ গ্রুপের স্লোগান হয় 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সামাজিক বিপ্লব।' ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শেখ মুজিব একটি নীতিনির্ধারণী ভাষণ দিয়েছিলেন ওই ভাষণে তিনি 'পরিত্যক্ত' সব কল-কারখানা জাতীয়করণের ঘোষণা দেন. তিনি তাঁর বক্তৃতায় 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছিলেন।[৬৮] যখন ভাষণটির খসড়া তৈরি হচ্ছিল, শেখ মুজিব ওই সময় সিরাজুল আলম খানকে খসড়াটি একটু দেখে নিতে বলেছিলেন।[৬৯] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রেহমান সোবহান লেখককে বলেন:

> আমি বঙ্গবন্ধুর ভাষণের খসড়া তৈরি করছিলাম খসড়ায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির উল্লেখ ছিল হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলো কাপালিক (সিরাজুল আলম খান, তাঁকে এ নামেই অনেকে ডাকতেন) সে আমার কাছ থেকে কলমটা নিয়ে কাগজে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটার আগে খসখস করে লিখে দিল 'বৈজ্ঞানিক'।[৭০]

এরপর থেকেই সিরাজপন্থীরা সব বক্তৃতা-বিবৃতিতে একটা বাক্য জুড়ে দিত—আমরা লড়ছি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য।

সিরাজুল আলম খান এবং আবদুর রাজ্জাকের মধ্যে সখ্য ছিল। তাঁরা আদর্শগতভাবে ছিলেন একই মতের। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য সিরাজুল আলম খান যে 'নিউক্লিয়াস' গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমদ। বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারি-মার্চেই এই নিউক্লিয়াস কার্যত ভেঙে যায় এবং আবদুর রাজ্জাক শেখ মুজিবকে ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেন। বাহাত্তরের শুরুতেই ছাত্রলীগের বিভক্তির প্রক্রিয়াটি শুরু হওয়ার সময় আবদুর রাজ্জাকের মধ্যে এই পরিবর্তনটি লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ছাত্রলীগের ওই সময়ের সহসভাপতি সৈয়দ রেজাউর রহমান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন :

> বত্রিশ নম্বর এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে একটা ব্রিফিং ছিল। ওখান থেকে ডিকটেকশন এলে ছাত্রলীগ পরিচালিত হবে কি না। ওইটার বিপক্ষে অবস্থান ছিল আমাদের। ছাত্রলীগ লেজুড় কি না, আওয়ামী লীগের লেজুড় কি না, শেখ মুজিবের ডিকটেশনে চলবে কি না—এসব প্রশ্ন উঠেছিল। তখন আমরা সিরাজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নিলাম। সিরাজ ভাই 'এজেন্ট'—এ রকম বক্তব্য ছিল আমাদের মধ্যে। আমি সরাসরি বলি নাই। এক সময় সিরাজ ভাইয়ের টাচে ছিলাম তো? পরে ডিটাচড হইছি। তবে এটা ঠিক, সিরাজ ভাই কিন্তু ছাত্রলীগের একটা ভালো অংশকে নিতে পেরেছিল। কর্মী হিসেবে এরা কর্মঠ ছিল, অগ্রণী ছিল। এদেরকে সিরাজ ভাই যেভাবেই হোক প্রভাবিত করতে সক্ষম হইছে।[৭১]

শেখ মণি ও সিরাজুল আলম খানকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের মধ্যে যে মেরুকরণ হচ্ছিল, তার প্রকাশ ঘটে ১৯৭২ সালের ৬ মে বটতলায় অনুষ্ঠিত আসন্ন ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত একটি পরিচিতি সভায়। ওই নির্বাচনে ছাত্রলীগের বিভক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ছাত্রলীগ দুটো আলাদা প্যানেল নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাদের মধ্যকার বিভক্তির সুযোগে ছাত্র ইউনিয়ন ডাকসু নির্বাচনে একটি ছাড়া সবগুলো পদে জয় পায়। রোকেয়া হলের প্রতিনিধি হিসেবে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' গ্রুপের একমাত্র মমতাজ বেগম ডাকসুর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ এরপর নিজেদের মধ্যে বহিষ্কার-পাল্টা বহিষ্কারের খেলায় মেতে ওঠে এবং দুই গ্রুপই ২১-২৩ জুলাই সম্মেলন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করে। 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র গ্রুপ' সম্মেলন ডাকে পল্টন ময়দানে এবং 'মুজিববাদী গ্রুপ' সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্মেলনের আয়োজন করে।

পল্টনে সমবেত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সকাল পর্যন্ত আশা করছিলেন, শেখ

মুজিব তাদের সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে আসবেন, অথবা তিনি নিরপেক্ষ থেকে পল্টন কিংবা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান কোথাও যাবেন না। এই গ্রুপের শীর্ষ পর্যায় থেকে সবাইকে এ রকম ধারণা দেওয়া হয়েছিল। আগেই ঠিক করা ছিল পল্টনের সম্মেলন উদ্বোধন করবেন একাত্তরের শহীদ ছাত্রলীগ নেতা স্বপন কুমার চৌধুরীর বাবা। তাঁকে আনার চেষ্টা হয়েছিল। তিনি আসেননি। স্বপনের বড় ভাই অধ্যাপক রূপেন চৌধুরী এসেছিলেন। তবে তিনি পল্টনে না এসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশে যোগ দেন।[৭২]

পল্টনের সমাবেশে শেখ মুজিব তো এলেনই না, তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ওইটিকে তাঁর দলের মূলধারা হিসেবে বেছে নেন। এ সংবাদটি মুহূর্তের মধ্যে পল্টনে সমবেত ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাঁরা অনেকে অবাক হন, অনেকেই ক্ষুব্ধ হন এবং হতাশায় ভেঙে পড়েন। সবার মনেই প্রশ্ন, এমনটি তো হওয়ার কথা ছিল না। 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' গ্রুপের জ্যেষ্ঠ নেতা আ স ম আবদুর রব এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

> ২০ জুলাই সন্ধ্যার পর আমি গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি আমাকে জানান, তিনি কোনো সম্মেলনেই যাবেন না। সেই মোতাবেক আমি *গণকণ্ঠে* একটা সংবাদ ছাপাতে বলি। রাত দশটার দিকে *গণকণ্ঠে* টেলিপ্রিন্টারে সংবাদ এল, বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাবেন। আমি গণভবনে ফোন করলাম। ফোন ধরলেন বঙ্গবন্ধুর সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরী। বললেন, 'কী যে হয়ে গেল? শেখ মণির প্রেসারে এটা হয়েছে।'[৭৩]

ওই সময় ছাত্রলীগের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' গ্রুপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন শরীফ নুরুল আম্বিয়া এবং অন্যতম সহসভাপতি ছিলেন মনিরুল ইসলাম। তাঁকে দলের মধ্যে মার্শাল নামে ডাকা হতো। মনিরুল ইসলামকে সিরাজুল আলম খানের খুব কাছের লোক মনে করা হতো। তাঁদের দুজনই লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, তাঁরা জানতেন, শেখ মুজিব ওইদিন তাঁর বাড়িতেই থাকবেন, কোনো গ্রুপের সম্মেলনেই যাবেন না।[৭৪]

ছাত্রলীগের ঘর যখন ভাঙছে, তখন শেখ মুজিব কোন দিকে যাবেন, এ নিয়ে কিছুদিন আগে থেকেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' গ্রুপের সদস্যরা কল্পনাও করতে পারেননি যে, তিনি ইতিমধ্যে তাদের ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিষয়টি এই গ্রুপের শীর্ষ নেতা সিরাজুল আলম খানের কি অজানা ছিল? না কি তিনি তাঁর নেতা শেখ মুজিবের মন পড়তেই পারেননি? লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকার সিরাজুল আলম খান বলেছেন :

আগের রাতে একটা-দেড়টা পর্যন্ত আমি মুজিব ভাইয়ের বাসায় ছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তিনি কোথাও যাবেন না। এক পর্যায়ে বললেন, 'সিরাজ, আমি তো কমিউনিস্ট হতে পারব না?' তারপর আমি চলে আসি। শুনেছিলাম, মণি এসেছিল রাত দুটোর দিকে. সে মুজিব ভাইকে সরাসরি বলেছিল, 'আপনি যদি সিরাজের সঙ্গে যান, রাজনীতির উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তা ঠিক আছে। যদি আমাকে সমর্থন দেন, তাহলে রাজনীতির উত্তরাধিকার তো আছেই, রক্তের উত্তরাধিকারও থাকছে এখন আপনি ঠিক করেন, আপনি কোনদিকে যাবেন।[৭৫]

পল্টনের সম্মেলনের দাওয়াতপত্র নিয়ে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক রেজাউল হক মুশতাক গিয়েছিলেন শেখ মুজিবের কাছে। এটা সম্মেলনের তিন-চারদিন আগের কথা। মুশতাক লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

সিরাজ ভাই (সিরাজুল আলম খান) বললেন, মুজিব ভাইকে দাওয়াত দিয়ে আসো। দাওয়াতপত্র নিয়ে আমি পার্লামেন্ট ভবনে (এখন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) গেলাম। ওখানে প্রধানমন্ত্রীর একটা অফিস ছিল বঙ্গবন্ধু খামের ভেতর থেকে কার্ডটা খুলে পড়লেন আমি চলে আসার সময় উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুইও আমাকে ছেড়ে চলে যাবি?' একটু চুপ করে থাকলেন তারপর বললেন, 'তোরাও শেষ হবি, আমাকেও শেষ করবি।'

ফিরে এসে সিরাজ ভাইকে রিপোর্ট করলাম আমরা তো বোকা! ওই কথায়ই তো বোঝা যায় যে, তিনি আমাদের সঙ্গে আর নেই অথচ সবাইকে ধারণা দেওয়া হয়েছিল, তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বা আমাদের ছেড়ে যাবেন না।[৭৬]

২১ জুলাই সকালে পল্টনের প্যান্ডেলে ছাত্রলীগ কর্মীদের ভিড় ছিল দেখার মতো। সাধারণ কর্মীরা অনেকেই আশা করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু এই সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। অথচ শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সম্মেলনে যোগ দিয়ে তাঁর অবস্থানটি স্পষ্ট করবেন। এ সম্পর্কে ছাত্রলীগ নেতা শেখ শহীদুল ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি ওই সময়ের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যমে বাহাত্তরের রাজনৈতিক বিভক্তির একটা ছবি পাওয়া যায় :

শহীদ : মূল গোলমালটা তো বাধালো মণি ভাই (শেখ ফজলুল হক মণি) মণি ভাই ছিলেন হাইলি অ্যাসপারেন্ট উনি চাচ্ছিলেন, আফটার বঙ্গবন্ধু, উনি সাকসিড করবেন। উনি এজন্য তাজউদ্দীনকেও টলারেট করতেন না এই গোলমালটা বাঁধানোর মূল কারণ উনি সিরাজ ভাই যে দাবিদাওয়ার

কথা বলেন, ওইভাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কোনোদিন দাবিদাওয়া আকারে কিছু বলেন নাই। উনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনার সময় সিরাজ ভাই যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেটা ৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু করলেন—'বাকশাল'। এই কথাটা সিরাজ ভাই বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন যে, রেভ্যুল্যুশন হলে পুরোনো কিছু রাখা হয় না। আপনি এই আইনকানুনের মধ্যে যাইয়েন না। আপনি দেশের নাম বদলায়া ফেলেন। এটাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ না বলে সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অব বাংলাদেশ—সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলেন এবং ওয়ান পার্টি সিস্টেমে চইলা যান। এবং স্বাধীনতাবিরোধী যেগুলো আছে, এগুলো রাখা যাবে না। হাফ সমাজতন্ত্র, হাফ ব্যক্তিপুঁজির বিকাশ—এগুলো চলবে না।

মণি ভাই এইটা ডিজএগ্রি করলেন। মণি ভাই বললেন যে, এই মুহূর্তে করা যাবে না। এটা করার দরকারও নাই। আমরা কমিটেড টু পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আপাতত চলুক।

মণি ভাইয়ের কথা পার্শিয়ালি ট্রু। আমাদের ক্যাডার তো সমাজতান্ত্রিক না। এরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসেছে। এরা প্রিপেয়ার্ডও না। সিরাজ ভাইকে এক্সাক্টলি এই কথাটাই বললেন মণি ভাই। 'সিরাজ, তোমার ওই কয়েকজন লোক নিয়া তো সমাজতন্ত্র কায়েম করা যাবে না। তোমার সেই প্রিপারেশন কই?' সিরাজ ভাই বললেন, 'কর্মক্ষেত্রে গেলে প্রস্তুতি হয়ে যাবে তাদের।'

—বাহাত্তর সালে ছাত্রলীগের বিভক্তি নিয়ে আপনার অবজারভেশনটা বলুন। বঙ্গবন্ধু যে ডিসাইড করলেন, উনি এইদিকে থাকবেন না, ওই দিকে থাকবেন, এইটা তো খুব ক্রিটিক্যাল ডিসিশন ছিল। আমরা জানতাম, আপনি, রাজ্জাক ভাই, সবাই হলেন সিরাজ ভাইয়ের লোক। হঠাৎ ওই দিকে শিফট হয়ে গেলেন কেন?

শহীদ : আমি, রাজ্জাক ভাই, ইভেন তোফায়েল ভাইও। সিরাজ ভাই যে এইভাবে মুভ কইরা ছাত্রলীগকে এই পর্যায়ে নিয়া যাবে, এইটা কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল না। আমাদের ধারণা ছিল, ছাত্রলীগের ঐক্যটা রাখবে। আমাদের এই গ্রুপ থেকে অথবা যারা ওই দিকে শিফট করলাম, দেখলাম, সিরাজ ভাই ওয়ান্টস টু গো অ্যাহেড উইথ দিস কাউন্সিল, পল্টন কাউন্সিল। বঙ্গবন্ধু সিরাজ ভাইকে কী বলছেন আমি জানি না। যা বলছেন, সিরাজ ভাই মান্য করতে পারে নাই। বঙ্গবন্ধু তখন রাজ্জাক ভাই, তোফায়েল ভাই—এদেরকে ডেকে বললেন, নূরে আলম সিদ্দিকী ছিল, মাখন ছিল। তখন আমি কিন্তু সরকারি চাকরি করি। আমি বঙ্গবন্ধুর তথ্য অফিসার হই স্বাধীনতার পরপর। বাদশা ভাই (আমিনুল হক বাদশা) ছিলেন প্রেস

সেক্রেটারি। তখন তারা বলল যে, শেখ শহীদকে আমাদের সাথে দিয়া দেন। ছাত্রলীগে যদি রিপ্লেস করতে হয়, হি ইজ দ্য পার্সন, যে পরবর্তীকালে চালাতে পারবে। বঙ্গবন্ধুর কথায় আমি চাকরি ছেড়ে চলে এলাম। ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট হলাম।

মণি ভাইয়ের সঙ্গে সিরাজ ভাইয়ের এই বিষয়টা নিয়া দুই-তিনবার আলোচনা হইছে। বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্তটায় ইনফ্লুয়েন্স করতে সবচেয়ে বেশি কাজ করছে মণি ভাইয়ের কথা। আমরা চাচ্ছিলাম ওই মুহূর্তে ডিভিশন না হোক। আমি রাজ্জাক ভাইকে বললাম, এক রাখা যায় কি না। এক রাখার জন্য আমরা কোনো সাইডে যাইনি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলাম। যেকোনো কারণেই হোক ঐক্যটা রাখা গেল না।

মূল ডিফারেন্সটা কিন্তু ওইটা থেকে আসছে। সমাজতান্ত্রিক...। ওইটার সঙ্গে এইটা লিংকড। যখন এইটা রাখতে পারে নাই, তখন থেকেই মনে হয় সিরাজ ভাই থট যে, তার লাইনটা পারস্যু করতে হবে। ভেতরে কী ঘটছে, অতটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

—পল্টনে যখন ওই গ্রুপের সম্মেলন হচ্ছে, রাজ্জাক ভাই আর আপনি, আপনারা মিছিল-টিছিল নিয়া গেলেন, ধাক্কাধাক্কি হলো।

শহীদ: নাহ্, গোলমাল হয়নি কোনো। দুইটা সম্মেলনই পিসফুল হইছে।

—একটা মিছিল তো গিয়েছিল।

শহীদ : কোথায়?

—সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে গুলিস্তানের দিকে।

শহীদ : ছাত্রলীগের সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের পর চিরকালই একটা মিছিল বের হয়। এটাই ট্র্যাডিশন ছিল।

—এই যে দুই জায়গায় দুইটা সম্মেলন হলো, বঙ্গবন্ধু কি আপসেট হন নাই একটুও?

শহীদ : সত্যি কথা বলতে কি, আমি কোনো আপসেট দেখি নাই উনাকে। উনার একটা ধারণা ছিল যে, উনি যেখানে থাকবেন, সেটাই মূল ছাত্রলীগ।

—এই ডিসিশনটা উনি কতদিন আগে নিয়েছেন?

শহীদ : আমাদেরকে যেটা বললেন, আমি যেদিন আইসা নতুন কইরা জয়েন করলাম...

—আপনাকে চাকরি ছাড়তে বলেছেন কতদিন আগে?

শহীদ : কনফারেন্সের ডেট হওয়ার পরপরই। নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, মণি ভাই তখন তোফায়েল ভাই আর রাজ্জাক ভাইকে ডাইকা বলল, দে ওয়ান্ট টু মিট বঙ্গবন্ধু তখন রাজ্জাক ভাই বলল যে, যদি

আলাদাই হয়ে যাইতে হয়, তাহলে শেখ শহীদ ইজ দ্য পার্সন।

—তাহলে এই কথা হয়েছে অ্যাট লিস্ট দুই-তিন সপ্তাহ আগে?

শহীদ : না না, তারও আগে। কারণ আমরা কনফারেন্সের জন্য পোস্টার দিছি, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জায়গা নিছি। হাজি চান মিয়াকে যখন কনট্যাক্ট করতে গেছি, হাজি চান মিয়া কয় যে, আমার তো এত বড় প্যান্ডেল বানানোর সরঞ্জাম নাই। আমি তো পল্টনের কাজ নিয়া নিছি। তখন তাকে বলা হইল যে, বঙ্গবন্ধু আসবেন, এটা করাই লাগবে। তখন সে এখানে করল।

—হাজি চান মিয়া দুজায়গাতেই প্যান্ডেল বানালো? তার মানে এটা অনেক আগেই ডিসাইডেড। আমাদের কাছে গোপন ছিল।

শহীদ : দুজনই এই ডিসিশনের জন্য দায়ী। একজন শেখ ফজলুল হক মণি, আরেকজন সিরাজুল আলম খান। তোফায়েল ভাই, রাজ্জাক ভাই, সিরাজ ভাই—আমরা তো এক গ্রুপের। সত্তর সালে ছাত্রলীগের সম্মেলনে আমাদের গ্রুপের প্যানেলে তো আমি আর শাজাহান সিরাজই প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি ক্যান্ডিডেট ছিলাম। পরে মোয়াজ্জেম ভাই (শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন) আর অন্য সব রাইটিস্ট এলিমেন্টসরা গিয়ে ধরল, ওরে (নূরে আলম সিদ্দিকী) একটা চান্স দেন। তখন আমাকে ডাইকা বঙ্গবন্ধু বললেন, 'নূরে আলমরে রিকমেন্ড করতেছে। তুই থাক।' তখন আমাকে বলা হলো যে, ডাকসুর ভিপি করা হবে আমাকে। তখন আবার রব (আ স ম আবদুর রব) আইসা গেল।

—আপনাকে রব ভাইয়ের নির্বাচন পরিচালনা পরিষদের আহ্বায়ক করা হলো। আপনি রাগ করে দুদিন ক্যাম্পাসে এলেন না। তারপর অবশ্য আপনি হলে হলে গেছেন। শহীদ ভাই, আপনার অনেক স্যাক্রিফাইস আছে। পরে আপনি ভাঙ্গা ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট হলেন।

শহীদ : মণি ভাইয়ের সঙ্গে পরে তাজউদ্দীনের দ্বন্দ্ব হইছে। রাজ্জাক ভাই, তোফায়েল ভাইয়ের দ্বন্দ্ব হইছে। দ্বন্দ্ব হয় নাই কার সঙ্গে? বিকজ, মণি ভাই যারেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত, আফটার বঙ্গবন্ধু, তারেই...। সত্য লিখতে গেলে ইউ হ্যাভ টু এন্টার ইনটু কনট্রোভার্সি।

—আমার দুশ্চিন্তা অন্য জায়গায়। আপনি কনট্রোভার্সি এড়াইতে চান?

শহীদ : আমি চাই। আমি তো পলিটিকস করি। আপনি তো পলিটিকস করেন না।

—আপনি যদি কনট্রোভার্সি এড়াইতে চান, যদি মনে করেন যে এখনো এগুলি লেখার সময় হয় নাই, সময় যখন হবে তখন তো আপনি থাকবেন না।

শহীদ : মণি ভাই তাজউদ্দীনকে আউট করল কেন? হি কলাবরেটেড উইথ খন্দকার মোশতাক টু আউস্ট তাজউদ্দীন। মণি ভাই তার লক্ষ্য অ্যাচিভ করার জন্য ডাইনে-বাঁয়ে যেকোনো দিকে যাইত। এয়ারপোর্টে স্লোগান হয় নাই? শেখ মুজিব না শেখ মণি? যুবলীগকে দিয়ে, বার্লিন থেকে ফিরে আসার পর ঢাকা এয়ারপোর্টে? উনি হাইলি অ্যামবিশাস ছিলেন। উনি মনে করতেন যে, হি ইজ অ্যান ইনটেলেকচুয়াল জায়েন্ট, অ্যান্ড হি ইজ অ্যান অর্গানাইজার টু। উনি নিজেকে লেনিনের মতো মনে করতেন

—ছাত্রলীগ ভাঙার পর রিঅর্গানইজ করলেন কীভাবে?

শহীদ : যখন ডিভিশন হইল, আমি তো অথৈ সমুদ্রে পড়লাম। আরে, আমি যাদের সঙ্গে কাজ করেছি, আমি আর তাদের সঙ্গে নাই। আমাকে কাজ করতে হচ্ছে যত সব ফতেউল্লা-টতেউল্লার সঙ্গে। আমি তো এদের সঙ্গে কখনো কাজ করি নাই।

তারপর আমি অর্গানাইজ কইরা ছুটাইয়া আনা শুরু করলাম। ওবায়দুল কাদেরকে আনলাম। ওবায়দুল কাদের তো তোমাদের ক্যান্ডিডেট ছিল মুহসীন হলে। আমি আর মাহমুদুর রহমান বেলায়েত কথা বললাম; যাই, ওরে নিয়া আসি। রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে মাহফুজ আসল না; ডা. করিমও আসল না। জেলা ছাত্রলীগে আমি ঠাণ্ডু, পটল আর বাইশ আইঙ্গুইলা মিজান— ব্রাহ্মণবাড়িয়ার, ওদেরকে নিয়া ছাত্রলীগ করলাম। পরে ওইখানে ইলেকশনে জিতলাম।

রাজ্জাক, নজিবুর, রহমতউল্লাহ—এদেরকে দিয়া এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে অর্গানাইজ করলাম।

আরে, আশরাফ তো যায় যায়, এই অবস্থা তারপর বকুলরে আনলাম, শাহ জাফররে আনলাম। শাহ জাফর তো রওনা দিয়া দিছিল ওই দিকে। ওরে ঘুরাইয়া নিয়া আসলাম। বললাম, তুই আমার সাথের লোক, ওখানে কেন যাবি? এ রকম কইরা অর্গানাইজ করলাম।

এই গোলমালটা, এটাকে পাওয়ার স্ট্রাগল বলবেন, না আইডোলজিক্যাল স্ট্রাগল বলবেন? দুইজন লোক রেসপনসিবল। শেখ মণি আর সিরাজুল আলম খান।

—বঙ্গবন্ধু চেষ্টা করলে একটা প্যাচ-আপ করতে পারতেন না?

শহীদ : উনি চেষ্টা করছেন। মণি ভাই অ্যারোগেন্ট টাইপের লোক ছিলেন। যা-ই বলেন, উইথ অল হিজ অর্গানাইজিং ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড আদার থিংগস। সিরাজ ভাই ছিলেন, অ্যারোগেন্ট বলব না, হার্ডলাইনার। তার মূল পয়েন্ট থেকে কখনো সরতে চায় না

—মণি ভাইকে আমার বেশি রিজনেবল মনে হতো কথাবার্তায়।

শহীদ : মণি ভাই হলো অ্যামবিশাস। যুদ্ধের পর ঢাকায় আইসাই একটা অ্যাবানডন্ড বাড়ি দখল করছে ধানমন্ডিতে। তারপর একটা অ্যাবানডন্ড বিল্ডিং দখল করছে মতিঝিলে। পাসবান প্রেসটারে তুলে নিয়ে আসল। আইনা *বাংলার বাণী*তে বসাইল। *বাংলার বাণী* বাইর করল। *টাইমস* বাইর করল। *সিনেমা* বাইর করল। একটা মিডিয়া এম্পায়ার গড়ে তোলার চেষ্টা করল। বদনাম হইয়া গেছিল এতগুলো পেপার সে কেমনে বাইর করে? অর্থ সম্পদের প্রতিও তার লোভ ছিল। এইগুলি থিকা সিরাজ ভাই আবার মুক্ত।[৭৭]

শেখ মুজিবের উপস্থিতি সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সম্মেলনে লোক সমাগম ছিল কম। তুলনামূলকভাবে পল্টনের সমাবেশ ছিল অনেক বড়। ছাত্রলীগের সহসভাপতি (১৯৭০-৭২) সৈয়দ রেজাউর রহমানের মতে, 'সিরাজুল আলম খান ছাত্রলীগের একটা ভালো অংশকে যেভাবেই হোক প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।' তাঁর ভাষ্য হলো :

বললে অত্যুক্তি হবে না, এরা সিরাজ ভাইয়ের ব্রিফিংয়ের দ্বারা বিপথগামী হইছে। এই বিপথগামিতা ছাত্রলীগের বিভক্তির একটা কারণ. মুক্তিযুদ্ধের পর ছাত্রলীগ যদি বিভক্তিতে না যেত, রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা হয়তো এভাবে ক্ষুণ্ণ হতো না আমি দেখেছি কাছে থেকে, ছাত্রলীগের ওপর বঙ্গবন্ধুর নির্ভরশীলতা। ছাত্রলীগের বিভক্তি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা প্রভাব ফেলেছে। অন্যরা যথাযথভাবে এর সুযোগ নিয়েছে।[৭৮]

একটা প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যাচ্ছে। শেখ মুজিব যদি মণি গ্রুপকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন, তাহলে সেটা সাধারণ ছাত্রলীগ কর্মীদের কাছে গোপন করা হয়েছিল কেন? তিনি যে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাবেন, এটা কি সাধারণ কর্মীদের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবেই গোপন রাখা হয়েছিল?

আগেই ঠিক করা হয়েছিল যে, একাত্তরের শহীদ সাবেক ছাত্রলীগ নেতা স্বপন কুমার চৌধুরীর বাবাকে দিয়ে পল্টনের সম্মেলন উদ্বোধন করা হবে। বঙ্গবন্ধু পল্টনে আসবেন না, এই তথ্য গোপন করার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে, কর্মীরা এটা জানলে হতাশায় ভেঙে পড়বে এবং এদের অনেকেই হয়তো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সম্মেলনে যোগ দিতে চলে যাবে। এটা হলে তো শেখ মুজিবের লাভ ছাড়া ক্ষতি হতো না। তিনি নিজে কেন তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে আগেই জানান দিলেন না? তিনি কি ভিন্নমতাবলম্বীদের দল থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন? তিনি কি ভেবেছিলেন, এতে করে তাঁর নিজস্ব বলয় আরও সংহত হবে? অথবা তিনি কি চেয়েছিলেন যে, তাঁর অনুগত মুক্তিযোদ্ধারা নতুন একটা প্লাটফরম গড়ে তুলুক, যাতে করে চরম ডানপন্থী ইসলামী দলগুলো বা উগ্র বাম

দলগুলো প্রধান বিরোধী দল হয়ে উঠতে না পারে? এটা কি একটা পাতানো খেলা ছিল? বাহাত্তরের বিভাজনের কারণে রাজনীতিতে পরে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তার একটা বিশ্লেষণের জন্য এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া দরকার।

ছাত্রলীগের আনুষ্ঠানিক বিভক্তির পর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রপন্থী গ্রুপটি সব বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'জাতির পিতা' বলা বন্ধ করে দেয়। তরুণদের একটি বড় অংশ এই গ্রুপের সঙ্গে চলে যায়। এই গ্রুপের মুখপত্র ছিল দৈনিক *গণকণ্ঠ*। পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক আফতাবউদ্দিন আহমাদের সই করা কিছু নির্দেশ একটি বিজ্ঞপ্তি আকারে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নির্দেশগুলোর মধ্যে ছিল :

১. শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' লেখা যাইবে না;
২. মতিয়া চৌধুরীর নামের আগে 'অগ্নিকন্যা' লেখা যাইবে না;
৩. মণি সিংহ... প্রমুখের নামের আগে 'কমরেড' লেখা যাইবে না।[৭৯]

এটা বোঝা যাচ্ছিল যে, ছাত্রলীগের 'বিদ্রোহীরা' সংঘটিত হয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেবে। প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ নিয়ে কৌতূহল যেমন ছিল, সন্দেহও ছিল। কেউ কেউ এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধও পেয়েছেন রাজনীতিবিদ ও গবেষক বদরুদ্দীন উমর পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে, রাজনীতির মাঠে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভব হতে যাচ্ছে। ১ অক্টোবর ১৯৭২ সাপ্তাহিক *স্বাধিকার*-এ তিনি লেখেন :

> ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের সামরিক আক্রমণের পর থেকে অসংখ্য গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মী শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের আওতায় এসে পড়ে। আওয়ামী লীগের এই অংশ আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চলে গেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া আরও দ্রুতগতিতে চলে আওয়ামী লীগকে পুরোপুরিভাবে জনগণের শ্রেণীশত্রুদের একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত করবে। আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসা অংশটি হয়তো ইতিমধ্যেই নিজেদেরকে অপ্রকাশ্যে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে সংগঠিত করেছে। তা না করে থাকলেও ভবিষ্যতে তাদেরকে সেটা করতেই হবে। ছাত্রলীগের রব-সিরাজ গ্রুপের ভাঙন পরিণতিতে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলের জন্ম দান করতে বাধ্য এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পরিচালিত ন্যাপ নয়, এই নতুন পার্টিই হবে বাংলাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক সংগঠন।[৮০]

সিরাজুল আলম খান একটি নতুন রাজনৈতিক দল তৈরির চেষ্টা চালাতে থাকেন। ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি আ স ম আবদুর রব নতুন দলের সাধারণ

সম্পাদক হবেন, এটা মোটামুটি স্থির করাই ছিল। সিরাজুল আলম খান একজনকে খুঁজছিলেন, যিনি এই দলের সভাপতি হবেন। তিনি তাঁর একসময়ের রাজনৈতিক গুরু ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বলেছিলেন। শাহ্ মোয়াজ্জেম বলেছিলেন, 'তোমরা তো মার্ক্সবাদী। আমি একজন ডেমোক্র্যাট। আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।'[৮১] নতুন দল তৈরির ব্যাপারে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গেও যোগাযোগ এবং সলাপরামর্শ হয়েছিল।[৮২] পরে সেনাবাহিনী থেকে সদ্য অবসরে যাওয়া মেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিল ও আ স ম আব্দুর রবকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে দল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ৩১ অক্টোবর ১৯৭২ এই প্রক্রিয়া থেকে জন্ম নেয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামের নতুন একটি রাজনৈতিক দল। জন্মলগ্নেই জাসদ সরকার উৎখাতের ঘোষণা দেয়:

> ...বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে এবং বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক ও পুতুল সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে এবং আগামী দিনের সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা শ্রেণিহীন-শোষণহীন সমাজ ও কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েমের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে প্রবল জনমত সৃষ্টির নিমিত্ত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পতাকাতলে জমায়েত হওয়ার জন্য... উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।[৮৩]

ছাত্রলীগের যে অংশটি পরবর্তীতে জাসদ প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা রেখেছে, এক সময় শেখ মুজিবের প্রতি তাদের অতি ভক্তি ছিল লক্ষণীয়। বাহাত্তরের ২৫ মে এক বিবৃতিতে এই অংশটি শেখ মুজিবকে একচ্ছত্র নেতা ঘোষণা করে দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে প্রশাসন চালানোর আহ্বান জানিয়েছিল। তাদের এই অবস্থান ২০ জুলাই পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়েছিল আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ ও শরীফ নুরুল আম্বিয়ার নামে। বিবৃতিতে বলা হয়, দেশের পরিস্থিতি খুবই জটিল এবং 'কেবল বঙ্গবন্ধুই দেশকে নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।' তাঁদের দাবিগুলো ছিল :

১. জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে সকল ক্ষমতার উৎস বলে ঘোষণা করতে হবে।
২. বর্তমান মন্ত্রিসভা ও গণপরিষদ বাতিল করে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বোত্তম সদস্যদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করতে হবে।
৩. বিপ্লবী সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট করে অন্তর্বর্তীকালীন একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করতে হবে।

৪. গণ-আদালতে দুর্নীতিপরায়ণ গণপরিষদ সদস্যদের প্রকাশ্য বিচার করতে হবে।
৫. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দালাল, রাজাকার, আলবদর, চোরাচালানি, কালোবাজারি ও সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীদের প্রকাশ্যে গুলি করে মারতে হবে।
৬. অসৎ ব্যবসায়ী এবং নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, লালবাহিনী ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে দিতে হবে।
৭. সব রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চপদস্থ আমলাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে হবে।[৮৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের সাবেক সহসভাপতি আ স ম আবদুর রব ও ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বাধীন এই গ্রুপটির রাজনীতি ২১ জুলাই ১৯৭২ থেকে একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে যায়। তিন মাসের মাথায় শেখ মুজিবকে তাঁরা 'সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক ও পুতুল' আখ্যা দিয়ে একটি অতিনাটকীয় আবহ তৈরি করেন।

৬

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি মাইলফলক তৈরি হলো। গণপরিষদে গৃহীত হলো সংবিধান। প্রস্তাবনায় 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা'র আদর্শ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হলো। বলা হলো, রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার' নিশ্চিত হবে।[৮৫] আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরির যে লড়াই আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালের জন্মমুহূর্তে শুরু করেছিল, তা অবশেষে একটি নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছাল ২৩ বছর পর।

সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল। ৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হলো, 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।'[৮৬]

সংবিধানের এই অংশটি অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ৭০-খ অনুচ্ছেদে বলা হলো, কেউ যদি সংসদে নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেন, তাহলে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে।[৮৭] ১৯৫৬-৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদে যখন-তখন দলবদলের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এই অনুচ্ছেদটি সংযোজিত হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা এবং ভিন্নমতের স্বাধীন প্রকাশ প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়।

সংবিধানে প্রস্তাবিত ৭০ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে গণপরিষদ সদস্য আসাদুজ্জামান খান আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'এতে দলের সদস্যদেরকে দলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বশংবদ করে তুলতে পারে ... এই অনুচ্ছেদটি যদি সংবিধানে রাখতে হয়, তাহলে দল থেকে স্বেচ্ছাচারিতামূলক বহিষ্কারের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে।'[৮৮]

১১ সেপ্টেম্বর গণপরিষদে বক্তব্য দিতে গিয়ে হাফেজ হাবীবুর রহমান আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নিম্নপরিষদ দ্বারা নির্বাচিত ৬০ জন সদস্যের একটি উচ্চপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন প্রস্তাবিত ৬৫ নং অনুচ্ছেদের সংশোধনী হিসেবে তিনি দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাব দেন।[৮৯] একই দিন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ৭২ অনুচ্ছেদের তৃতীয় ধারায় সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছরের বদলে চার বছর রাখার দাবি জানান। তিনি ১১৮ ও ১১৯ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে ন্যূনতম শর্তের বিষয়টি যোগ করতে বলেন এই অনুচ্ছেদের ২নং ধারার শেষে এই পদে 'ন্যূনপক্ষে হাইকোর্টের (বা সুপ্রিম কোর্টের) বিচারপতি' হতে হবে বলে যোগ করার প্রস্তাব দেন।[৯০]

খসড়া সংবিধানের ওপর আলোচনা প্রসঙ্গে গণপরিষদ সদস্য আবদুর রাজ্জাক ভুঁইয়া সংবিধান বিলের ৬ অনুচ্ছেদ পরিমার্জনের প্রস্তাব দেন. গণপরিষদে এ প্রসঙ্গে যে বিতর্ক হয়েছিল, এখানে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

> জনাব আ. রাজ্জাক ভূঁইয়া : মাননীয় স্পিকার সাহেব, আমি প্রস্তাব করছি যে 'সংবিধান বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক :
>
> '৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।'
>
> স্পিকার : পরিষদের সম্মুখে জনাব আবদুর রাজ্জাক ভুঁইয়া প্রস্তাব এনেছেন যে...।
>
> ড. কামাল হোসেন : মাননীয় স্পিকার সাহেব, এই সংশোধনী

গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি এবং এটা গ্রহণ করা যেতে পারে।

স্পিকার : শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : ...বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবদিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলেন নাই, আমি বাঙালি ...

স্পিকার : আপনি কি বাঙালি হতে চান না?

শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : ...যদি... এই সংশোধনী পাস হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশি মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি বলে নয়।

স্পিকার : আপনি বসুন। প্লিজ রিজিওম ইয়োর সিট

শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : মাননীয় স্পিকার সাহেব, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, জনাব আবদুর রাজ্জাক ভূঁইয়া সাহেব যে সংশোধনী এনেছেন, তাতে মনে এ প্রশ্ন জাগে যে বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়া ভারতের কেউ বাস করছে। আমি শুধু বলতে চাই যে বাঙালি বলতে এইটুকু বোঝায় যে যারা বাংলা ভাষা বলে তাদেরকে আমরা বাঙালি বলি।

স্পিকার : প্লিজ রিজিওম ইয়োর সিট। আপনি বসুন, আপনি বসুন এখন পরিষদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে : ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে... যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন, তাঁরা বলুন 'হ্যাঁ'। যাঁরা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে, তাঁরা বলুন 'না'।

'হ্যাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে, 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে, 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত হয়েছে।

অতএব, সংশোধিত আকারে ৬ নম্বর অনুচ্ছেদটি সংবিধান বিলের অংশে পরিণত হলো।

শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : মাননীয় স্পিকার, আমাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে এই ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধিত আকারে গৃহীত হলো আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদস্বরূপ আমি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিষদের বৈঠক বর্জন করছি।

(অতঃপর মাননীয় সদস্য পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান।)[৩১]

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা খসড়া সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের পর একটি নতুন অনুচ্ছেদ যোগ করার জন্য সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন। প্রস্তাবে বলা হয়, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত

অঞ্চল হইবে।' প্রস্তাবটি ২ নভেম্বর সদস্যদের ভোটে বাতিল হয়ে যায়।[১২] পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি সেদিন কেউ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেননি। পরে এ সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মন্তব্য করেছিলেন :

> পাহাড়িদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য যে সেদিন আমরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হইনি, এ ছিল নিজেদের বড়ো রকম এক ব্যর্থতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রেরণা পেয়েও যে পাহাড়ি জাতীয়তাবোধের বা চাকমা জাতীয়তাবোধের সূচনা হতে পারে, এ-কথা একবারও আমাদের মনে হয়নি। নিজেদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যে আমরা তখন বেশিদূর দেখতে পারছি না, মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরে অন্য কোনো জাতীয়তাবোধ স্বীকার করতে পারছি না, বরঞ্চ তাকে সন্দেহের চোখে দেখছি। ৬ অনুচ্ছেদের ওই ছোট্ট সংশোধনীকে উপলক্ষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতিত্বের সঙ্গে পাহাড়িদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার যে-বিবোধ সেদিন সূচিত হলো, তার ফল কত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, তা এখন আমরা জানি।[১৩]

৪ নভেম্বর সংবিধান বিল গৃহীত হওয়ার পর গণপরিষদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ বক্তব্য দেন। বক্তব্যের কিছু অংশ নিচে তুলে ধরা হলো :

> জনাব স্পিকার সাহেব, আজই প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে।...
>
> স্বাধীনতাসংগ্রাম কেবল নয় মাসই হয় নাই, স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে। তারপর ধাপে ধাপে সে সংগ্রাম এগিয়ে গেছে।...
>
> বাংলার মানুষ আমরা বুঝতে পারি না, হুজুগে মেতে পরের ছেলেকে বড় করে দেখি—এই ছিল আমাদের দুর্ভাগ্য। দুনিয়ার কোনো দেশে 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোনো অর্থ পাই না বাংলাদেশ ছাড়া। বাঙালি জাতি আমরা পরশ্রীকাতর এত বেশি। ইংরেজি ভাষায়, রুশ ভাষায়, ফরাসি ভাষায়, চীনা ভাষায় 'পরশ্রীকাতরতা' বলে কোনো শব্দ নাই—একমাত্র বাংলা ভাষা ছাড়া।
>
> এই কারণে বাঙালিদের যেমন ত্যাগ, সাধনা করার শক্তি ছিল, বাঙালিদের মধ্যে তেমনি পরশ্রীকাতরতার মনোভাব দেখা দেয়। যেসব বাংলাদেশের নেতা সংগ্রাম করেছেন, আমরা তাঁদের বুঝতে পরি নাই। আমরা বুঝেছি, আমাদের নেতা বুঝি চলে এসেছেন সেই বোম্বে থেকে মিস্টার জিন্নাহ।...
>
> এই যে চারটা স্তম্ভের ওপর শাসনতন্ত্র রচনা করা হলো, এর মধ্যে জনগণের মৌলিক অধিকার হচ্ছে একটা মূল বিধি। মূল চারটা স্তম্ভ—জনগণ

ভোটের মাধ্যমে নয়, ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়ে, রক্তের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিয়েছে।...

ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়।... আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না।... আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না. ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যভিচার—এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।

সরকারি কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে তাঁরা শাসক নন, তাঁরা সেবক।...

বিরোধী দলের নাম শুনতে পাই।... ভোট পেয়ে পরিষদে এসে বলুক, আমরা বিরোধী দল। যারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট পায়নি, তারা বলে, আমরা বিরোধী দল ভবিষ্যতে ভোট নিয়ে এসে তারপর বলুক আমরা বিরোধী দল। তা না হলে বলুক, এই আমাদের দাবি।...

সাধারণভাবে যারা দোষী, যারা কলাবরেশন করেছে, যারা আমাদের হাজার হাজার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিলিটারির কাছে দিয়ে গুলি করে হত্যা করিয়েছে, তাদের আমরা ভাত খাওয়াচ্ছি, অনেককে ডিভিশন পর্যন্ত দিয়েছি।...

নিরপরাধ যারা থাকবেন তাদের খালাস দেওয়া হবে কিন্তু যারা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে গণপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের—যাঁরা দেশের জন্য যুদ্ধ করছিলেন, তাঁদের সিট খালি করিয়ে, আচকান গায়ে দিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, ইয়াহিয়া খানকে সাহায্য করেছেন, তাদের বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার দেওয়াতেও জনগণ আপত্তি করেছিল। জনগণ বাইরে পেলে তাদের কেটে ফেলত। তাদের আমরা জেলের মধ্যে রেখে ভাত খাইয়ে রক্ষা করেছি।...

নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট করা হোক ঐতিহাসিক ৭ মার্চে। কারণ, সেই দিন, ৭ মার্চে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করেছিলাম, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেই দিন ৭ মার্চ তারিখে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[১৪]

বাংলাদেশের সংবিধানকে যতদূর সম্ভব 'গণতান্ত্রিক' করার একটা চেষ্টা ছিল। এজন্য মূল সংবিধানে 'জরুরি অবস্থা' জারি করার কোনো বিধান রাখা হয়নি। ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন তৈরির মাধ্যমে

জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান সংসদে পাস হয়।

সংবিধানের মূল কপিটি হাতে লেখা হয়েছিল। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে হাশেম খান, জুনাবুল ইসলাম, সমরজিৎ রায় চৌধুরী ও আবুল বারক আলভী বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোকাচারের রঙ-রেখা ব্যবহার করে সংবিধানের প্রতিটি পাতার জন্য নকশা তৈরি করেন। ক্যালিগ্রাফি করেন আবদুর রউফ। কাজটি শেষ করতে চার মাস লেগেছিল।[৬৫] সংবিধানের মূল কপিতে গণপরিষদের দুজন সদস্য ছাড়া সবাই সই দিয়েছিলেন। অজ্ঞাত কারণে ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং স্বতন্ত্র সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্বাক্ষর দেননি।[৬৬]

প্রস্তাবনা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

বাংলাদেশের সংবিধানের নকশাখচিত প্রথম পৃষ্ঠা

১৬ ডিসেম্বর (১৯৭২) সংবিধান বলবৎ করা হয়। ১৭ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গোটা মন্ত্রিসভা নতুন সংবিধানের অধীনে শপথ নেয়। শুরু হয় সাংবিধানিক গণতন্ত্রের যাত্রা। ন্যূনতম সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ একটা সংবিধান তৈরি করা ছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন গণপরিষদের একটি বিশাল অর্জন।

পাকিস্তানের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ নিজেকে সাংবিধানিকভাবে একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করল। রাষ্ট্রীয় চারটি মূলনীতির অন্যতম হলো 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। মুক্তিযুদ্ধের আগে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন প্রচারণা ও বক্তব্যে ধর্মের নামে শোষণ-বঞ্চনার উল্লেখ থাকলেও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি সরাসরি উচ্চারণ করা হতো না। মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালি মুসলমানের মনোজগতে এ ব্যাপারে খুব একটা পরিবর্তন এসেছে –তা বলা যাবে না। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ভিত্তি ছিল ঠুনকো। এ প্রসঙ্গে লেখক-গবেষক গোলাম মুরশিদের সোজাসাপটা মন্তব্য হলো :

> ১৯৭২-এ পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিব ধর্ম ও ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে যে সংকেত দেখান, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে কোনো দিন ধর্মনিরপেক্ষ হবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা যে বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মৌলনীতির অন্যতম বলে স্বীকৃতি লাভ করে, সেটাই বিস্ময়ের কারণ। বস্তুত এটা ছিল দেশের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি এবং অমুসলমানদের প্রতি একটা বড় রকমের ছাড় দেওয়ার ঘটনা।...[৮৭]

মাত্র সিকি শতাব্দী আগে যে বাঙালি মুসলমান ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে অত কম সময়ের মধ্যে সেই মনোভাব অথবা নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়কে পুরোপুরি বিসর্জন দেওয়া সম্ভব ছিল না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এম এন রায়ের মতে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না, এটি একটি সাংস্কৃতিক আবহ যা কোনো ব্যক্তি ঘোষণা দিয়ে তৈরি করতে পারে না, তা যতই আন্তরিকতা ও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হোক না কেন'[৮৮] রাজনীতি আর ধর্মের মধ্যকার দেয়ালটি অত্যন্ত নড়বড়ে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি জন্মের পর থেকে অসাম্প্রদায়িক হওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মানুষ তার অবচেতনে সুপ্ত সাম্প্রদায়িক অনুভূতি একাত্তর-পরবর্তী সময়ে আবার উগরে দিয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অঙ্গীকার নতুন করে জেগে ওঠা ধর্মীয় পরিচিতির কাছে হোঁচট খেয়েছে। আওয়ামী লীগ ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিরোধিতা করেছে, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু 'কোরান ও

স্বার্থবিরোধী' আইন তৈরি না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাজনীতি আর রাষ্ট্র থেকে ধর্ম বিচ্ছিন্ন হয়নি। রাষ্ট্র সকল ধর্মকে সমান চোখে দেখার কথা বলেছে। কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষপাত রয়ে গেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষে। বলা চলে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে পদে পদে আপস করতে হয়েছে। সংবিধানে বর্ণিত এই মৌলনীতিটি টেকসই হয়নি। চার বছরের মাথায় তা আমূল পাল্টে গিয়েছিল। তবে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল আগেই।

'জাতীয়তাবাদ' যেকোনো জাতিরাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শেখ মুজিব বক্তৃতা-বিবৃতিতে প্রায়ই বলতেন : 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা তোমার আমার ঠিকানা।' তবে এর একটি সহজিয়া ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন ৪ নভেম্বর (১৯৭২), যেদিন গণপরিষদে 'সংবিধান বিল' পাস হয়েছিল। ওই দিন সকাল ১০-৪০ মিনিটে এক আবেগপূর্ণ ভাষণে তিনি বলেন :

> আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। জাতীয়তাবাদের অনেক সংজ্ঞা আছে।... সুতরাং, এ সম্বন্ধে আমি আর নতুন সংজ্ঞা না-ই দিলাম। আমি শুধু বলতে পারি আমি বাংলাদেশের মানুষ, আমি একটা জাতি
>
> এই যে জাতীয়তাবাদ, সে সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন—সকল কিছুর সঙ্গে একটা জিনিস রয়েছে সেটা হলো অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে তাহলে কোনো জাতি বড় হতে পারে না। এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, যারা বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক জাতি হয়েছে। অনেক দেশে আছে, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সবকিছু নিয়ে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে তারা এক জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে অনুভূতির ওপর.
>
> সে জন্য আজ বাঙালি জাতি যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন নিয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে আমরা স্বাধীনতা নিয়েছি, যার উপর ভিত্তি করে আমরা সংগ্রাম করেছি, সেই অনুভূতি আছে বলেই আজকে আমি বাঙালি, আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদ. এর মধ্যে যদি কেউ আজকে দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন তুলতে চান, তাহলে তাঁকে আমি অনুরোধ করব, মেহেরবানি করে আগুন নিয়ে খেলবেন না।[১১]

জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবোধ বা জাতিসত্তার মর্মবাণী বোঝানোর জন্য যে 'অনুভূতির' কথা শেখ মুজিব বলেছেন, মুজিবের জন্মের আগে একই কথা বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের মতে, ইংরেজি 'নেশন' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ নেই। বাংলা ১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসে 'নেশন কী' প্রবন্ধে তিনি বলেন, ভাষায় জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথা ঠিক না। আবার নেশন

ধর্মমতের ঐক্যও মানে না। 'সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে। জাতি ভাষা বৈষয়িক স্বার্থ ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান নেশন-নামের মানস পদার্থ সৃজনের মূল উপাদান নহে। তবে তাহার মূল উপাদান কী?' এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :

> নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিতমত নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীত কালের প্রয়াস, ত্যাগ স্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য, মহত্ত্ব, কীর্তি, ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূলপত্তন। অতীতকালে সর্বসাধারণের এক গৌরব এবং বর্তমান কালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা, পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প ইহাই জনসম্প্রদায়-গঠনের ঐকান্তিক মূল।...
>
> অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ। একত্রে দুঃখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা -এইগুলিই আসল জিনিস, জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এগুলির মাহাত্ম্য বোঝা যায়; একত্রে মাসুলখানা স্থাপন বা সীমান্তনির্ণয়ের অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক বেশি। একত্রে দুঃখ পাওয়ার কথা এই জন্য বলা হইয়াছে যে, আনন্দের চেয়ে দুঃখের বন্ধন দৃঢ়তর।[১০০]

দেশে আগুন নিয়ে খেলার লোকের অভাব ছিল না। জাতীয়তাবাদের নামগান জারি থাকলেও তার ব্যাখ্যা পাল্টে যেতে খুব বেশি সময় লাগেনি। শেখ মুজিবের ঘোষিত 'অনুভূতি' অবিভাজ্য ছিল না। চার বছরের মাথায় সেটা প্রমাণিত হয়েছিল।

পিচ্ছিল পথ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) নেতা হামিদুল হক চৌধুরীর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার তাঁর মালিকানাধীন *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে অধিগ্রহণ করে এবং *বাংলাদেশ অবজারভার* নামে এর প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। আগে থেকেই এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবদুস সালাম। তিনি একজন সাহসী সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশ সরকার শুরু থেকেই ভিন্নমতের ব্যাপারে অসহিষ্ণু ছিল। এর প্রথম কোপটা পড়ে আবদুস সালামের ওপর বাহাত্তরের ১৫ মার্চ *বাংলাদেশ অবজারভারে* 'দ্য সুপ্রিম টেস্ট' নামে একটি সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছিল। আর এটাই তাঁর কাল হলো। তিনি বরখাস্ত হলেন।

এই সম্পাদকীয়তে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, দেশে এখনো কোনো সংবিধান নেই এবং এই সরকারের কোনো গণতান্ত্রিক আইনি অধিকার নেই। একটা সফল বিপ্লবী যুদ্ধের উত্তরাধিকার নিয়ে এই সরকার এসেছে এবং এটি একটি অন্তর্বর্তী সরকার মাত্র। ন্যাপের একটি অংশের প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সব দলের সমন্বয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছেন। সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়, রাষ্ট্রের ভেতরে আরেকটি রাষ্ট্র থাকতে পারে না এবং সত্যিকার ক্ষমতা সংবিধান এবং আইনি শৃঙ্খলার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া দরকার। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় :

> ক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগের এমন কিছু করা ঠিক হবে না, যা সে আগের সরকারগুলোর সময় নিন্দা জানিয়েছিল। স্থায়ী সরকারি চাকরিগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। মোনায়েম খান (পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর) গ্রামের দারোগাদেরও সরাসরি নির্দেশনা দিতেন। আমরা যদি এক মোনায়েম খানের জায়গায় হাজারটা বসাই, তাতে কোনো উন্নতি হবে না।[১]

মুক্তিযুদ্ধের ফলে দেশে একটা বড় রকমের ওলটপালট ঘটে গিয়েছিল। সমাজে এবং মানুষে-মানুষে আন্তঃসম্পর্কে ঘটেছিল বিরাট পরিবর্তন। একটা যুদ্ধ দেশে শুধু আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন আনেনি, বিরাট রকমের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনও ঘটিয়েছিল।

রাজনীতিতে পেশিশক্তির ভূমিকা আগেও ছিল। ১৯৬৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত আওয়ামী লীগের সংশোধিত গঠনতন্ত্রে 'আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়েছিল।[২] কে, কবে, কোথায়, কী প্রক্রিয়ায় এই সংগঠনটির জন্ম দিয়েছিল, তা জানা যায় না। হঠাৎ দেখা গেল একদল মানুষ এক ধরনের 'আওয়ামী টুপি' পরে, লাঠিসোঁটা হাতে মিছিল-মিটিং করে বেড়াচ্ছে এর প্রধান ছিলেন আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা আবদুর রাজ্জাক বাহাত্তর সালে এই বাহিনী আরও দৃশ্যমান হলো।

মুক্তিযুদ্ধের পরপরই দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলো জাতীয় শ্রমিক লীগের সদস্যদের নিয়ে গড়া 'লাল বাহিনী'। এই বাহিনী তৈরি হলো শ্রমিক লীগের প্রধান সংগঠক সিরাজুল আলম খানের নির্দেশে। চীনের 'রেড আর্মির' নামে নাম হলেও লাল বাহিনীতে শৃঙ্খলা ও আদর্শ বলতে কিছু ছিল না তারা সমস্বরে দেশে 'মুজিববাদ' কায়েম করতে উঠে পড়ে লাগল। জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান শিল্পাঞ্চলগুলোতে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। লাল বাহিনী হলো তাঁর প্রধান বাহন। এরা সবাই ছিলেন সরকার অধিকৃত কলকারখানার বেতনভুক শ্রমিক। লাল বাহিনীর ব্যানার নিয়ে এরা মাথায় লালপট্টি বা টুপি পরে এবং লাল জামা গায়ে দিয়ে সারা দিন প্যারেড করে বেড়াতেন।

১৯৭২ সালের ২৫ মে ছাত্রলীগের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' গ্রুপের নেতা আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ ও শরীফ নূরুল আম্বিয়া একটি বিবৃতি দিয়ে গণপরিষদ বাতিল, জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার গঠনের আহ্বান জানান। বিবৃতিতে তাঁরা ১৭টি দাবি উত্থাপন করেন। ৬ নম্বর দাবিতে বলা হলো, 'সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, লাল বাহিনী ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে দিতে হবে।'[৩]

শেখ মুজিব এই ফাঁদে পা দেননি। ২৯ মে (১৯৭২) বিবৃতি দিয়ে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান আবদুর রাজ্জাক স্বয়ং রব-সিরাজ-আম্বিয়ার বিবৃতির কঠোর নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'যারা দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে নস্যাৎ করে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা কখনো গণতন্ত্রকে সম্মান করতে

পারে না।... কিছুসংখ্যক লোক দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অনাস্থা সৃষ্টি করতে চায়।'[৪]

লাল বাহিনীর প্রধান আবদুল মান্নানও রব-সিরাজ-আম্বিয়ার বিবৃতির বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন। মান্নান প্রায়ই হুংকার দিয়ে বলতেন, তাঁর ৮০ হাজার সদস্যের লাল বাহিনী 'মুনাফাখোর, মজুতদার ও চোরাকারবারিদের' নির্মূল করবে। জুন মাসে এক জনসভায় শেখ মুজিব লাল বাহিনীকে ইঙ্গিত করে বলেন, তাদের উচিত হবে নিজ নিজ কারখানায় গিয়ে দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। তাঁর এই আহ্বানে তেমন কাজ হয়নি।[৫]

লালবাহিনীর গার্ড অব অনার নিচ্ছেন শেখ মুজিব। পাশে শ্রমমন্ত্রী জহুর আহমদ চৌধুরী এবং শ্রমিকনেতা আবদুল মান্নান

এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' নামে একটি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন। এই বাহিনী তৈরির একটি পূর্ব-ইতিহাস আছে। আওয়ামী লীগের ছয়দফার ৬-নম্বর দফায় এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ৩ (চ) উপদফায় মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের প্রস্তাব ছিল। ১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার প্রথম সভায়

মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ২৩ ডিসেম্বর ঢাকায় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ১১ সদস্যের 'জাতীয় মিলিশিয়া বোর্ড' গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে মিলিশিয়া বোর্ডের সভাপতি হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। বোর্ডের অন্য সদস্যরা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (সভাপতি, ন্যাপ-ভাসানী), এ এইচ এম কামারুজ্জামান (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী), মনোরঞ্জন ধর (জাতীয় পরিষদ সদস্য), মণি সিংহ (সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (সভাপতি, ন্যাপ-মোজাজফর) গাজী গোলাম মোস্তফা (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য), রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য), তোফায়েল আহমেদ (জাতীয় পরিষদ সদস্য), আবদুর রাজ্জাক (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) ও ক্যাপ্টেন সুজাত আলী (জাতীয় পরিষদ সদস্য)। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি এক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'অনতিবিলম্বে একটি জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হইবে এবং তালিকাভুক্ত হউক বা না হউক, সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে তাহার আওতায় আনা হইবে।' মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর এ এন এম নূরুজ্জামানকে (পরে ব্রিগেডিয়ার) এই বাহিনীর পরিচালক এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় কাদেরিয়া বাহিনীর উপ-প্রধান আনোয়ার উল আলম ও মুজিববাহিনীর মাদারিপুর মহকুমার প্রধান সরোয়ার হোসেন মোল্লাকে নূরুজ্জামানের সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৬]

সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল, অবলুপ্ত ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এর সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী তৈরি করা হবে। ইপিআর-এর বেশিরভাগ সদস্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও তাদের অনেক জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার (জেসিও) ও ননকমিশন্ড অফিসার (এনসিও) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গেই ছিল। তাদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মনে প্রশ্ন ছিল। এ ব্যাপারে যাচাই-বাছাই করার জন্য ১৬ ফেব্রুয়ারি আনোয়ার উল আলমকে সভাপতি করে একটি স্ক্রিনিং বোর্ড গঠন করা হয়। একটা গুজব রটে যায় যে, ইপিআর-এর অমুক্তিযোদ্ধা সদস্যরা মিলিশিয়া বাহিনী থেকে বাদ পড়বেন। ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুক মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় ইপিআর-এর সদর দপ্তর পিলখানায় সমবেত হয়েছিলেন। সেখানেই তাঁরা থাকতেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ করেই সেখানে একটা গোলমাল শুরু হয়ে যায় এবং ইপিআর-এর কয়েকজন জেসিও-এনসিও মেজর নূরুজ্জামানকে মারধর করেন। আনোয়ার উল আলমও আক্রান্ত হন মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধারা

পরস্পরের বিরুদ্ধে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। খবর পেয়ে সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল মো. আতাউল গণি ওসমানী এবং ঢাকাস্থ ৪৬ ব্রিগেডের অধিনায়ক লে. কর্নেল কাজী মোহাম্মদ সফিউল্লাহ (পরে মেজর জেনারেল) কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে নিয়ে পিলখানার গেটে উপস্থিত হন। কিন্তু অবিরাম গোলাগুলির কারণে তাঁরা ভেতরে ঢুকতে পারেননি। শেষমেষ খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই পিলখানায় চলে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনার পর অবলুপ্ত ইপিআর আর মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের চিন্তা বাদ দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন ইপিআর-এর সদস্যদের নিয়ে শুধু সীমান্ত পাহারা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে আলাদা একটি বাহিনী তৈরি করবেন। নতুন এই বাহিনীর নাম ঠিক করা হয় 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী'।[৭]

৮ মার্চ ১৯৭২ 'রক্ষী বাহিনী অধ্যাদেশ, ১৯৭২' নামে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই বাহিনী গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।[৮] বাহিনীটিকে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। যদিও বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, চোরাচালান দমন এবং পুলিশ বাহিনীকে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সাহায্য করার লক্ষ্যে এই বাহিনী গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন এবং গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। আইন করে এই বাহিনীকে ইমিউনিটি (সুরক্ষা) দেওয়া হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পরপর সমাজের প্রায় সব অংশে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল। সেনাবাহিনীও এ থেকে মুক্ত ছিল না। এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল দিনাজপুরে, বাহাত্তরের পয়লা এপ্রিল, শুক্রবারে। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) স্থানীয় সংবাদদাতার পাঠানো একটি রিপোর্টে জানা যায়, সেনাবাহিনীর স্থানীয় একটি ইউনিটের কয়েকজন সদস্য শহরের একটি সিনেমা হলে সন্ধ্যায় ছবি দেখতে গিয়ে স্থানীয় মহিলাদের প্রতি ইঙ্গিত করে মন্তব্য করেছিলেন। এই খবর পেয়ে শহরের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সিনেমা হলে যান এবং সেনাসদস্যদের সঙ্গে তাঁদের কথা কাটাকাটি হয়। সিনেমা চলাকালেই সেনাসদস্যরা সিনেমা হল থেকে চলে যান। রাতে সিনেমা শেষ হওয়ার পর দর্শকরা যখন হল থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন সেনাসদস্যরা হলের গেটে হঠাৎ গুলি ছুড়তে শুরু করে। এতে কতজন হতাহত হয়েছিলেন, তা জানা যায়নি। পরদিন স্থানীয় স্টেশন ক্লাবের পাশ থেকে আটটি লাশ উদ্ধার করা হয়। ঢাকায় বিকেলে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুলিবর্ষণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রিসভার বৈঠক যখন প্রায় শেষ, তখন বাসসের প্রধান ফয়েজ আহমদ চিফ রিপোর্টার জোয়াদুল করীমকে

সঙ্গে নিয়ে গণভবনে হাজির হন। ফয়েজ আহমদের বিবরণ অনুযায়ী :

আমাকে দেখেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন : আমি জানি, কেন এসেছ। খবরটা যাবে না। তখনও তাঁর দু'পাশে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ড. কামাল হোসেন ও আরও কয়েকজন মন্ত্রী উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো এ ব্যাপারটি কিছুক্ষণ পূর্বেই মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর উপরই দায়িত্ব পড়েছে নির্ধারণের, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে কি হবে না।...

আমি শান্তভাবে বললাম : যাই ঘটুক না কেন, খবরটা পত্রিকায় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা থাকা উচিত নয়।

'না যাবে না—কি যুক্তিতে যাবে। দুদিন আগে যারা দেশ মুক্ত করেছে, তারাই সাধারণ মানুষের উপর গুলি করল।' তাঁর বক্তব্যে অন্য সুর মিশ্রিত ছিল। তিনি যেন এক অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে ভাসমান।

এই সুযোগে পুনরায় বললাম : এমন একটা রূঢ় সত্যকে গোপন করলে দৈত্যের রূপ নিয়ে কাহিনীটা প্রতিটি ঘরে পৌঁছাবে এবং এতে যে আস্থার অভাব ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই জানেন যে, সত্যের এমন একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে যে লৌহপ্রাকার ভেদ করেও সে আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং জনগণ অন্যায়ের প্রতিকারকে স্বাগত জানায়।

সোফায় উপবিষ্ট প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছিলাম। তিনি আকস্মিকভাবে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে বললেন, জানি, জানি। কিন্তু কীভাবে প্রতিকার করব? একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, তিনি অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

নিস্তব্ধ কক্ষে তিনি পুনরায় নাটকীয়ভাবে বললেন, নাহ্, যাবে না এ দুঃসংবাদ।

আমি নিজের অজান্তেই যেন খুবই নরম কণ্ঠে বললাম : তবুও মনে হয় খবরটা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। তাতে সুফলই অধিক পাওয়া যাবে।

কোনো উত্তর এল না। এবার যুক্তি দিয়ে বললাম : দেশ স্বাধীন হবার পর যাদের রিক্রুট করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ সামরিক শৃঙ্খলার মধ্যে এখনো আসেনি; তাছাড়া রাজনৈতিক 'মোটিভেশন' হয়তো এখনো তাদের নিয়ন্ত্রিত করে না। আপনি তো জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সাধারণ অর্থে মুক্তিযোদ্ধা, যারা অগ্রিম ট্রেনিং না নিয়েই শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন—তাদের অধিকাংশই আসেন সাধারণ মানুষ শ্রমিক-কৃষকের ঘর

থেকে। তাদের মধ্যে কি কুখ্যাত 'ষোড়শ বাহিনী' ছিল না? তিন মাস সময়ের মধ্যে আপনি কি নবনিযুক্ত সাধারণ সেনাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় মোটিভেটেড করতে এবং শারীরিক দিক থেকে উপযুক্ত করে তুলতে পারেন? নিয়মিত সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা এত অল্প সময়ের মধ্যে আশা করেন কীভাবে? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের ব্যবস্থা করতে দোষ কি? তাতে জনসাধারণ শান্ত হতে বাধ্য। গুলিবর্ষণের খবরের সাথেই এই বিচারের কথা ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয়।...

'খবরটা যেতে পারে, তবে জেনারেল সায়েব ড্রাফট করে দেবেন। তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে?' শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব সম্মতি জানালেন।

কজন ছুটে গেল পার্শ্বকক্ষে টেলিফোনে জেনারেল এম এ জি ওসমানীকে খোঁজার জন্য। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নিজেই ইংরেজিতে ড্রাফট নির্দেশ করতে শুরু করলেন। ড. কামাল সহযোগিতা করলেন চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করতে। রাত প্রায় দশটার দিকে খোঁজ পাওয়া গেল জেনারেল ওসমানীর—তিনি তখন ইন্টারকন হোটেলের 'মেলোনী'তে রাশিয়ান নৌবাহিনীর জনৈক এডমিরালকে নৈশ পানাহারে আপ্যায়িত করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ফোনে নিজেই তাঁকে সংবাদটি প্রকাশের সিদ্ধান্তের কথা বলে জানালেন যে, খসড়াটি তাঁকেই অনুমোদন করতে হবে। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ড. কামাল ও আমি।

আমি আর চিফ রিপোর্টার করীম হোটেল ইন্টারকনে জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ছুটে গেলাম। সে সময় ভোজসভা শেষ হয়ে এসেছে। জেনারেল ওসমানী চাইলেন তার বেইলী রোডস্থ বাসায় খসড়াটা দেখতে। তখন সেন্যাবাহিনীর সিজিএস অস্থায়ী কর্নেল খালেদ মোশাররফ (পরবর্তীকালে ব্রিগেডিয়ার) আমাদের সঙ্গে ওসমানী সায়েবের বাসায় আসেন। কফির আদেশ দিয়ে জেনারেল ওসমানী খসড়াটা পড়েই উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন : ড্রাফটটা হয়নি –নো ইংলিশ! তারপর কাগজটা হাতে করেই বলে চললেন : লিখে নিন।

তিনি ড্রাফট হাতে নিয়ে সংবাদটি কীভাবে কার ভিত্তিতে লেখা হবে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের চিফ রিপোর্টারকে বলে যেতে লাগলেন।

পরদিন সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় বিএসএস কর্তৃক সরবরাহকৃত এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে বলা হলো : বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দিনাজপুরে একটি সিনেমা হলে গুলিবর্ষণ করেছে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানী ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত ও গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে একজন সিনিয়র অফিসারকে প্রেরণ করেছেন। গুলিবর্ষণের জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কোর্ট মার্শালে বিচার করা হবে। ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হবার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী

দিনাজপুর যাচ্ছেন।

আমরা প্রধানমন্ত্রীর মূল খসড়া অবলম্বন করেই গুলিবর্ষণের সংবাদ তৈরি করেছিলাম। কারণ, জেনারেল ওসমানী নৈশভোজের পর বাসায় ফিরে নতুন করে খবরটা নির্দেশ করার সময় সেই মূল খসড়াটিই প্রকৃতপক্ষে পড়ে দিয়েছিলেন।[৯]

২

বাহাত্তর সালে ছাত্রলীগের মধ্যে যে মেরুকরণ ঘটেছিল, তার ফলে একটি অংশ জাসদের সহযাত্রী হয়। তারা নিজেদের 'বিপ্লবী' মনে করত। অন্য অংশটি শেখ ফজলুল হক মণিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। আওয়ামী লীগের ভেতরে শেখ মণি নিজের প্রভাববলয় তৈরির চেষ্টা করছিলেন। রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য তাঁর নিজস্ব একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার ছিল। ১১ নভেম্বর (১৯৭২) তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সম্মেলন উদ্বোধন করেন। শেখ মণি ছাত্রলীগের সদ্য-বিদায়ী সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীকে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক বানান। শেখ মণির উদ্দেশ্য ছিল, যুবলীগের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে চাপে রেখে নীতিনির্ধারণে যত দূর সম্ভব অংশ নেওয়া এবং জাসদের অগ্রযাত্রা যেকোনো উপায়ে ঠেকিয়ে রাখা।

আওয়ামী লীগের 'লড়াকু' অংশটি স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাসদ তৈরি করেছিল। এ প্রসঙ্গে লেখক আহমদ ছফার সরল মন্তব্য হলো, যে জাতীয়তাবাদী কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করছিল, তার পাটাতনটি বিস্তৃত না হওয়ায়, জাতীয়তার আদর্শের বোধ-উপলব্ধি তীক্ষ্ণ না হওয়ায়, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি না থাকায়, উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠার বদলে লুটপাটের রাজনীতিকে উৎসাহিত করার কারণে এবং জাতীয় প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশীদার হতে না পারায় একটি অংশ আবেগে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে।[১০]

যে সময় জাসদ তৈরি হয়, একই সময় রাজনীতির মাঠে শেখ ফজলুল হক মণির দ্রুত উত্থান ঘটতে থাকে। সিরাজুল আলম খান এবং শেখ মণি দুজনই চেয়েছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকতে। এ প্রসঙ্গে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও গণপরিষদ সদস্য ডা. আবু হেনার মন্তব্য ছিল :

> যারা বিএলএফ (বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স, পরে যার নাম হয়েছিল মুজিববাহিনী) বানাইছে, তারাই আবার পরে জাসদ করাইয়া দিছে। খেপে যাইয়া সিরাজুল আলম খান জাসদ করছে। সে নিছে প্রতিশোধ।[১১]

জাসদ তৈরি হওয়ার ফলে মূল সংগঠন আওয়ামী লীগে ভাঙন না ধরলেও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনে এর প্রভাব পড়েছিল। ১৯৬৯ সালের ১১ অক্টোবর জাতীয় শ্রমিক লীগ তৈরি হয়েছিল। এই সংগঠনে সিরাজুল আলম খানের অনেক প্রভাব ছিল। জাসদ তৈরি হওয়ার পর শ্রমিক লীগেও চিড় ধরে। প্রধান তিনজন শ্রমিকনেতার মধ্যে মোহাম্মদ শাহজাহান ও রুহুল আমিন ভূঁইয়া জাসদের প্রতি সমর্থন দেন। অন্য দিকে আবদুল মান্নান থেকে যান আওয়ামী লীগের সঙ্গে। ডিসেম্বরে (১৯৭২) জাতীয় শ্রমিক লীগ ভেঙে দুভাগ হয়।

পিকিংপন্থী হিসেবে পরিচিত কমিউনিস্টরা আওয়ামী লীগ সরকারকে গোড়া থেকেই অগণতান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী ও ব্যর্থ বলে প্রচার চালাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে জাসদের অভ্যুদয়। জন্মলগ্ন থেকেই জাসদ মস্কোপন্থী এবং পিকিংপন্থী দুই শিবির থেকেই সমদূরত্ব বজায় রাখার কৌশল নেয়। তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত নমনীয় ভাষায় গালি দিত। জাসদ সচেতনভাবেই 'সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেনি। এর বদলে তারা বলত 'সোভিয়েত সংশোধনবাদ।' দলের মধ্যে মার্ক্সীয় বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা ছিল অগোছালো এবং কথিত সংশোধনবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা জাসদ কখনো দেয়নি। পিকিংপন্থী দলগুলো উঠতে-বসতে 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ' উল্লেখ করলেও জাসদ বলত 'ভারতীয় আধিপত্যবাদ'। জাসদ নিজেকে একটি বামপন্থী দল হিসেবে দাবি করার কারণে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে মার্ক্সবাদের উল্লেখ করত। তবে কখনোই 'লেনিনবাদ' শব্দটিকে কোনো প্রচারপত্র বা পুস্তিকায় প্রশ্রয় দেয়নি।

দলের নামের সঙ্গে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শব্দ জুড়ে দিয়ে এদেশে চারু মজুমদারের অনুসারীরা যে রাজনৈতিক ধারার সূচনা করেছিলেন ১৯৬৯ সালে, জাসদ সবসময়ই ওই ধারার বিরোধিতা করেছে, কিংবা এড়িয়ে গেছে। অন্যান্য কমিউনিস্ট দলগুলো জাসদকে কখনোই একটি বাম দলের মর্যাদা দেয়নি। মস্কোপন্থী সিপিবির চোখে জাসদ ছিল 'বিভ্রান্ত' ও 'হঠকারি'। পিকিংপন্থী দলগুলো জাসদের মধ্যে চক্রান্তের ছায়া দেখত এবং বলত, জাসদ হলো 'ভারতের সেকেন্ড ডিফেন্স লাইন'। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ এবং তার মিত্র সিপিবি ও ন্যাপ (মোজাফফর) হলো ভারতের স্বার্থরক্ষাকারী প্রাথমিক রক্ষাব্যূহ। তারা ব্যর্থ হলে ওই জায়গাটি নেবে জাসদ জাসদকে 'ভারতের দালাল' বলে যারা

প্রচার করত, তাদের অন্যতম ছিল আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে)। এই দলের অঙ্গসংগঠন ইয়ুথ ফ্রন্ট ফর ন্যাশনাল লিবারেশনের একটি প্রচারপত্রে জাসদকে নির্মমভাবে আক্রমণ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২৮ জুন প্রকাশিত এই প্রচারপত্রে বলা হয় :

> উগ্র জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ পূজারী হয়েও কেন তারা মার্ক্সবাদের কথা বলছে? শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলছে? এর উত্তরও সবার জানা আছে। যখন তারা দেখল যে উগ্র জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে জনগণকে তারা আর ধরে রাখতে পারছে না, তথাকথিত স্বাধীনতার স্বরূপ জনগণের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তখন তারা তাড়াতাড়ি ভোল পাল্টে ফেলে এবং মার্ক্সবাদ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও শ্রেণি সংগ্রামের ধ্বজা তুলে ধরে। এর প্রয়োজনে তারা তাদের মূল সংগঠন আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে আসে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বানচাল করার জন্য এবং জনগণের স্তরে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যই তারা এটা করছে [১১]

এটা ঠিক যে, জাসদ প্রথাগত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে অতীতে সব সময় 'ভুল রাজনীতি' করার অভিযোগে সমালোচনা করেছে। ১৯৭২ সালের ২১ জুলাই ছাত্রলীগের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' গ্রুপের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে উপস্থাপিত সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে এই দলগুলোর সমালোচনা করে বলা হয়েছিল—'রেড ফ্ল্যাগ টু অপোজ রেড ফ্ল্যাগ।' অভিযোগের তীর পরে বুমেরাং হয়ে জাসদের দিকেই ফিরে আসে।

জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খানকে এক সময় শেখ মুজিবের 'প্রতিজে' বা আস্থাভাজন শিষ্য মনে করা হতো তাঁর গোঁড়া অনুসারীরা মনে করতেন, তিনি শেখ মুজিবের আস্থা এবং রাজনৈতিক উত্তরাধিকার দুটোই বহন করছেন। তাঁকে ঘিরে এক ধরনের 'কাল্ট ওয়ারশিপ' চলেছিল এবং তাঁকে বাংলার ক্যাস্ট্রো বলে প্রচার করা হতো।

বাহাত্তর সালের মাঝামাঝি এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হলো যে, সিরাজুল আলম খান তাঁর গুরু শেখ মুজিবের সঙ্গে থাকতে পারলেন না। তিনি প্রকারান্তরে শেখ মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করলেন। তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব ও বিভাজন নিয়ে নানান আন্দাজ-অনুমান চালু আছে। শেখ মুজিব দেখলেন, এই ঝামেলা আর বয়ে বেড়ানোর দরকার নেই। তাঁর মনোভাব ছিল অনেকটা এ রকম—সিরাজ, তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও, দেখব কতদূর যেতে পার তুমি। শেখ মুজিবের শাসনামলে সিরাজুল আলমের অনেক কর্মী-অনুসারী, এমনকি জাসদের অনেক নেতাও নির্যাতিত হয়েছেন, জেলে গেছেন, নিহত হয়েছেন। কিন্তু

সিরাজুল আলমের একটা কেশও কেউ স্পর্শ করেনি। এ ব্যাপারে শেখ মুজিবের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। শেখ মুজিব এমনও বলেছেন, 'আমার সিরাজের গায়ে যদি কেউ হাত দেয়, আমি তাকে আস্ত রাখব না।'[১৩]

বছর না পেরোতেই সরকারের পদত্যাগের দাবিতে একটি রাজনৈতিক জোট তৈরি হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের ২৯ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে একটি 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। পরিষদের ১৫ দফা দাবির মধ্যে ছিল সরকারের পদত্যাগ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি এবং সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠন কমিটির শরিক রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও গণসংগঠনগুলোর মধ্যে ছিল ন্যাপ (ভাসানী), বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সোশালিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল, বাংলা জাতীয় লীগ, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, ফরোয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক, বাংলা ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ কৃষক সমিতি, বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলা মজদুর ফেডারেশন, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক পরিষদ, সমাজবাদী ছাত্র জোট, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, নিখিল বাংলা জোয়ান কর্মী শিবির, নিখিল বঙ্গ ইমাম ও মুসল্লী কমিটি, পাকিস্তানে আটক বাঙালি উদ্ধার সমিতি, ক্রান্তি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, উন্মেষ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ, সৃজনী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী এবং গণশিল্পীগোষ্ঠী।[১৪]

তেহাত্তর সালটি শুরু হয়েছিল একটি দুঃখজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে। ঢাকার তোপখানা রোডে ছাত্র ইউনিয়ন ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী একটি কর্মসূচি পালন করার সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের (ইউএসআইএস) সামনে পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র মতিউল ইসলাম এবং ঢাকা কলেজের ছাত্র মির্জা কাদিরুল ইসলাম নামে দুজন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী নিহত হন। গুলিতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। ছাত্র ইউনিয়ন এবং ডাকসু বাংলাদেশে সব মার্কিন প্রচার ও তথ্যকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণার দাবি জানায় এবং দায়ী মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে বলে। ছাত্র ইউনিয়নের মিছিল থেকে স্লোগান দেওয়া হয়, 'নিক্সন-মুজিব ভাই ভাই—এক রশিতে ফাঁসি চাই', 'খুনিশাহি-মুজিবশাহি ধ্বংস হোক', 'বাংলার মীরজাফর শেখ মুজিব', ইত্যাদি।[১৫]

পরে জানা যায়, পয়লা জানুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণের পেছনে ছাত্র ইউনিয়নের উসকানি ছিল। মিছিল থেকে ককটেল ছোড়া হতে পারে এই আশঙ্কায় পুলিশ মারমুখী হয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের নেতৃত্বে দলের উর্ধ্বতন নেতাদের জ্ঞাতসারেই ইউএসআইএস ভবনসংলগ্ন ন্যাপ অফিসের ছাদে বসে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা বোমা তৈরি করেছিল।

ইউএসআইএস ভবন আক্রমণের লক্ষ্যেই ছিল এই আয়োজন। পরে এটা জানতে পেরে সিপিবি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং সেলিমের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।[১৬]

নববর্ষের বলি

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে ছাত্রদের তাজা রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত

শহীদ মতিউল-কাদেরের রক্ত বৃথা যাবে না

ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভস্মীভূত
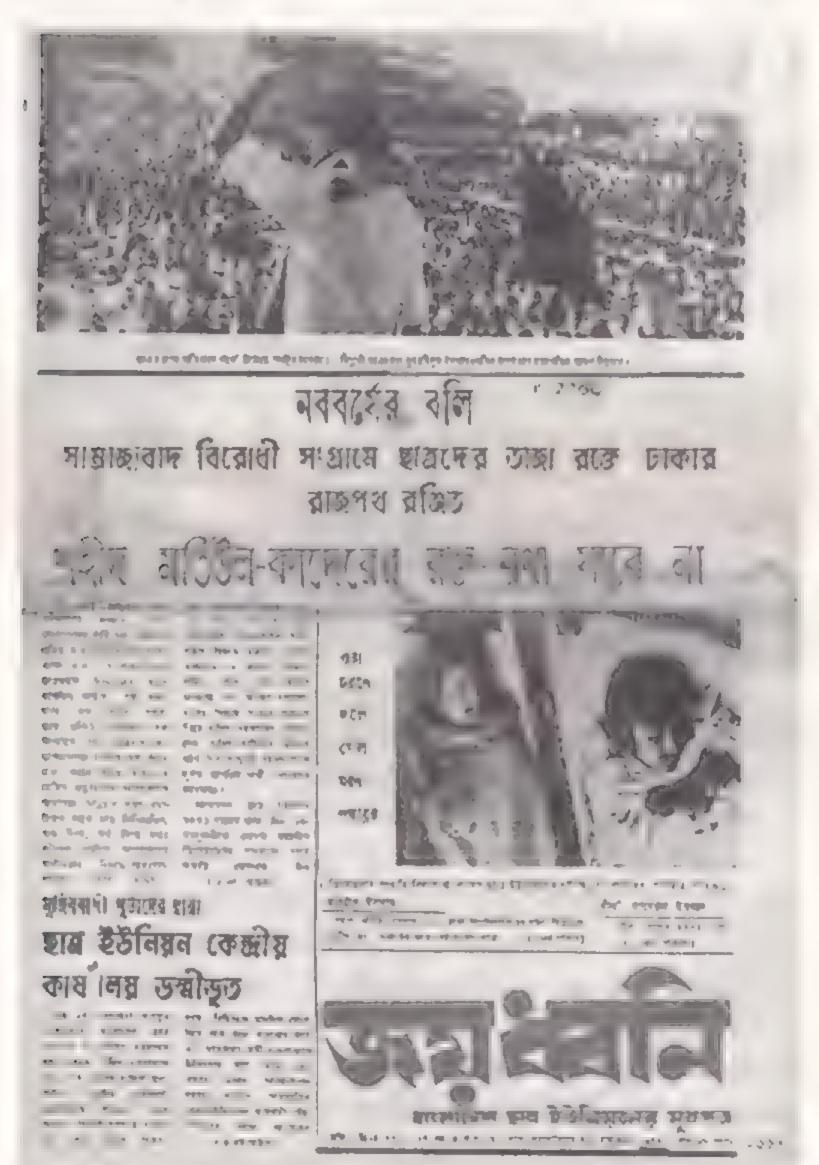
জয়ধ্বনি

১ জানুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদের সংবাদ ছাপা হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র *জয়ধ্বনিতে*

২ জানুয়ারি ১৯৭৩ পল্টনে এক জমায়েতে ডাকসুর সহসভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব জামান ১৯৭২ সালের ৬ মে শেখ মুজিবকে দেওয়া ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ বাতিলের ঘোষণা দেন। সেলিম তাঁর বক্তৃতায় শেখ মুজিবকে একহাত নেন। তিনি বলেন :

> এই সমাবেশের সামনে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি যে, বিগত ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা যে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিলাম, ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আজ সেই 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রত্যাহার করে নিলাম। আমরা দেশের আপামর জনসাধারণ, সংবাদপত্র, রেডিও টেলিভিশনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, আজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে তার বঙ্গবন্ধু বিশেষণ ব্যবহার করবেন না একদিন ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা শেখ মুজিবকে জাতির পিতা আখ্যা দিয়েছিলাম। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে আবার ছাত্রের রক্তে তার হাত কলঙ্কিত করায় আমরা ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি, আজ থেকে কেউ আর জাতির পিতা বলবেন না। শেখ মুজিবুর রহমানকে একদিন ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল আজকের এই সমাবেশ থেকে ডাকসুর পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি, আজ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়া হলো।[১৭]

সেলিম তাঁর ভাষণে সত্য কথা বলেননি। 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ডাকসুর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি এটা ছাত্রলীগের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ২৩ ফেব্রুয়ারির (১৯৬৯) সভায় ঘোষণা করা হয়েছিল। তখনও ছাত্র ইউনিয়ন এর প্রতিবাদ করেছিল। বঙ্গবন্ধুকে সর্বপ্রথম 'জাতির পিতা' সম্বোধন করা হয় ছাত্রলীগের জনসভায়, ৩ মার্চ ১৯৭১।[১৮]

৩ জানুয়ারি হরতাল পালিত হলো। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উল্টোদিকে গোলচত্বরে নিহতদের স্মরণে স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়। শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদসভা ডাকেন বেগম সুফিয়া কামাল, জসীমউদ্‌দীন, রণেশ দাশগুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, কামরুল হাসান, স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, সরদার ফজলুল করিম, সন্‌জীদা খাতুন, জাহেদুর রহিম, সৈয়দ হাসান ইমাম, কায়সুল হক, আলী আকসাদ, বজলুর রহমান, সাইফুদ্দৌলা, ইকরাম আহমদ, আরিফুল হক। এঁদের আহ্বানে সভা ও মিছিল হয়।[১৯]

ছাত্র উত্তেজনা থেমে যাওয়ার আগেই সরকারি দল পাল্টা আক্রমণ চালায়। ৪ জানুয়ারি সকালে সরকার-সমর্থক ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় একটি লাশ নিয়ে মিছিল করে ও স্লোগান দেয়, 'মিরজাহানের রক্ত বৃথা যেতে দেব না'।

তারা দেখাতে চেয়েছিল যে, প্রতিপক্ষের আক্রমণে তাদের কর্মী মিরজাহান নিহত হয়েছে। লাশটি ছিল কেরানীগঞ্জে ডাকাতি করতে গিয়ে নিহত হওয়া জনৈক ব্যক্তির।[২০]

৪ জানুয়ারি আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ব্যানার নিয়ে একদল লোক তোপখানা রোডে ন্যাপের অফিসে হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুরানা পল্টনে ছাত্র ইউনিয়নের অফিসও আক্রান্ত হয়। পাল্টা আক্রমণে দিশেহারা হয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপ তাদের আন্দোলনে ইতি টানে। ১ জানুয়ারি পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনার সংবাদ ফলাও করে বিকেলে একটা বিশেষ সংখ্যা ছেপেছিল সরকারি পত্রিকা *দৈনিক বাংলা*। পত্রিকাটির ওপর খড়্গ নেমে আসে। ৬ জানুয়ারি সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান এবং নির্বাহী সম্পাদক তোয়াব খানকে *দৈনিক বাংলা* থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।[২১]

৩

সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এ কিউ এম বজলুল করিমকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়। তাঁর একজন প্রাক্তন ছাত্র এবং প্রভাবশালী উদীয়মান আওয়ামী লীগ নেতার সুপারিশে তাঁকে এই পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল বলে জনশ্রুতি ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারি চাকরিতে সুযোগ দেওয়ার যুক্তি দেখিয়ে শুধু মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে সিভিল সার্ভিসের ৩৫০টি পদে নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। মৌখিক পরীক্ষাতেও প্রতিযোগিতার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব রুহুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে একটা কমিটি তৈরি করা হয়। ওই কমিটিতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কোনো সদস্যকে রাখা হয়নি। যাদের নিয়োগ দেওয়া হবে, তাদের তালিকা আগেই তৈরি করা ছিল। কমিটির কাজ ছিল ওই তালিকাকে বৈধতা দেওয়া। তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের মুক্তিযোদ্ধা দাবির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। নিয়োগপ্রাপ্তরা রাজনীতিবিদদের ঘনিষ্ঠজন, আত্মীয় কিংবা কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না বলে অভিযোগ ছিল। পুরো বিষয়টি রাজনৈতিক সুবিধা দেওয়ার জন্যই সাজানো হয়েছিল। এই মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নিয়োজিত ১৯৭৩ ব্যাচের বিসিএস (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) কর্মকর্তারা খুব একটা সম্মানের সঙ্গে চাকরি করতে পারেননি। অনেকেই অকারণে অবজ্ঞা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। তাঁদের

মধ্যে অবশ্য কিছু মেধাবী কর্মকর্তা ছিলেন, যাঁরা নিয়মিত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে এ ধরনের চাকরি পাওয়ার উপযুক্ত ছিলেন।[২২]

শেখ মুজিব মনে করতেন, দল দাঁড় করাতে হলে দলের লোকদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হয়। সিরাজুল আলম খানের ভাষ্যমতে, শেখ মুজিব তাঁকে বলেছিলেন যে, 'আমার লোকেরা ভুখা।'[২৩] যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এই পৃষ্ঠপোষকতার বণ্টন হয়েছিল নানাভাবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা জাতীয়করণের পর ওইসব প্রতিষ্ঠানে দলের লোকদের প্রশাসক হিসেবে বসিয়ে দেওয়া হয়। দেশে ভোগ্যপণ্যের ঘাটতি ছিল। দেশে উৎপাদিত ও বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্য বাজারজাত করার জন্য অনেক ডিলার নিয়োগ করা হয়। পেশাদার ব্যবসায়ীদের বদলে দলের লোকদের ডিলারশিপ দেওয়া হয়। অনেক ডিলার তাদের লাইসেন্স বেশি দামে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেন। এছাড়া অবাঙালিদের 'পরিত্যক্ত' ৬০ হাজার বাড়ি আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দখলে চলে যায়। তাদের অনেকে ভারতের সঙ্গে চোরাচালানে জড়িয়ে পড়ে। ফলে একটা নব্য ধনিক শ্রেণি তৈরি হয়। তারা দেশে বাস করে কিন্তু বিনিয়োগ করে না। দল চলে তাদের কথায়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) নির্বাচনী ইশতেহারে (১৯৭৩) বলা হয়েছিল, পাকিস্তানের ধনী ২২ পরিবারের জায়গায় বাংলাদেশে দুই হাজার পরিবার জন্ম নিয়েছে, যারা বাংলাদেশকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে অক্ষম।[২৪]

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতারা প্রায় সব সময় অগণতান্ত্রিক ও অসহিষ্ণু আচরণের অভিযোগ করতেন। আওয়ামী লীগ যখন বাংলাদেশের হাল ধরল, তাদের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ তুললেন বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের অনেক সদস্য। আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি বড় রকমের হোঁচট খায় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে।

১৯৭৩ সালের ১১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, ড. কামাল হোসেন, আবদুস সাত্তার, কোরবান আলী ও শেখ ফজলুল হক মণিকে নিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। শেখ মণি কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন।[২৫] ইশতেহারে বলা হয়, 'আওয়ামী লীগ ১৯৭৩ সালের নির্বাচনকে মুজিববাদের ওপর একটি গণভোট বলে চিহ্নিত করেছে এবং যে চারটি মৌল স্তম্ভের ওপর আমাদের জাতীয় কাঠামো নির্মিত তার স্বপক্ষে ম্যান্ডেট দানের জন্য বাংলার মজলুম জনতার নিকট আবেদন জানাচ্ছে।'[২৬]

ইশতেহারটি শেষ হয়েছিল 'জিন্দাবাদ' দিয়ে।

উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে 'জয়বাংলা' স্লোগানটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পরিণত হলেও 'জিন্দাবাদ' নির্বাসনে যায়নি। 'জয়' আর 'জিন্দাবাদ'-এর মধ্যে কোনো বিরোধও নেই। 'জিন্দাবাদ'-এর মধ্যে তখনও কেউ পাকিস্তানবাদের ছায়া দেখেননি। পরে অবশ্য আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখানোর জন্য 'জয়' ছেড়ে 'জিন্দাবাদ'কেই আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং এটাকে মুসলমানের স্লোগান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। আওয়ামী লীগও 'জিন্দাবাদ' বলা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ঝগড়া ছিল অর্থহীন। ১৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৩) সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান স্বাক্ষরিত ইশতেহারের শেষে নিম্নবর্ণিত স্লোগানগুলো ছিল :

জয় বাংলা, জয় মুজিববাদ।
বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতার ঐক্য—জিন্দাবাদ।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ—জিন্দাবাদ।[২৭]

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহার, ১৯৭৩

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ আবদুল আজিজের ভাষ্যে জানা যায়, ১৯৭১ সালে প্রাক্তন মন্ত্রী কফিলউদ্দিন চৌধুরী বৃদ্ধ বয়সে পুত্র বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে নিয়ে কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আওয়ামী লীগের দুর্দিনে ছয়দফা আন্দোলন থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম ও তাজউদ্দীন আহমদের পরিবারকে তিনি নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দিতেন। অসুস্থ অবস্থায় কফিলউদ্দিন চৌধুরীকে শেখ আবদুল আজিজ দেখতে গেলে তিনি আজিজের হাত ধরে বলেন, 'আজিজ, তুমি শেখ মুজিবকে বলে আমার পুত্র ডাক্তার বি চৌধুরী এমআরসিপিকে (খোকা) মুন্সিগঞ্জ থেকে আওয়ামী লীগ দল থেকে জাতীয় পরিষদের নমিনেশন দিতে বলো।' কফিলউদ্দিন চৌধুরীর ইচ্ছাপূরণ হয়নি। ওই আসনে মনোনয়ন পেয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা কোরবান আলী।[২৮]

নির্বাচনের আগেই নির্বাচনপ্রক্রিয়াটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ভোলার একটি আসনে জাসদের মনোনয়ন পেয়েছিলেন ডা. আজহারউদ্দিন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় তাঁকে অপহরণ করা হয় এবং ওই আসনে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।[২৯] শেখ মুজিব চারটি আসনে প্রার্থী হন এবং দুটি আসনেই তিনি 'একমাত্র বৈধ প্রার্থী' হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

শেখ মুজিব ছাড়াও আওয়ামী লীগের আরও নয়জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলের কর্মীরা অন্য কাউকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেননি। জীবনের হুমকি, ভীতি প্রদর্শন কিংবা অপহরণসহ নানাবিধ উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিবৃত্ত রাখা হয়। 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত' এই নয়জন হলেন সোহরাব হোসেন, তোফায়েল আহমেদ, মোতাহার উদ্দিন, কে এম ওবায়দুর রহমান, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া, মনোরঞ্জন ধর, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও জিল্লুর রহমান। 'এদের কারও কারও এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়'।[৩০]

আওয়ামী লীগ ছিল দেশের সবচেয়ে সংগঠিত দল। নির্বাচনে এই দলটির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। তথাপি অন্যান্য দলের প্রার্থীরা যাতে নির্বাচিত হতে না পারেন, সে জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়। নির্বাচনের তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিতদের একজন ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ। এখানে তাঁর অভিজ্ঞতা উদ্ধৃত করা হলো :

৭ মার্চের নির্বাচনের দিনের ঘটনা ছিল লজ্জাজনক ও হাস্যকর। বিকেল

পাঁচটা থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষে নির্বাচনের ফলাফল আসছিল। উপস্থিত শত শত কর্মকর্তা ও সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাত নয়টার দিকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে এঁরা জিতে গেছেন, যেমন ন্যাপ থেকে আলীম আল রাজী, আবদুর রহমান, মসিয়ুর রহমান (জেলে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন), রাশেদ খান মেনন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত; জাসদের শাজাহান সিরাজ, এম এ জলিল ও আবদুস সাত্তার। এ ছাড়া ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং মুশতাক আহমদ চৌধুরী এবং জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান বিপুল ভোটে এগিয়ে ছিলেন। এমনকি টেলিভিশনে তাঁদের কয়েকজনকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছিল। রাত ১০টার দিকে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা বন্ধ রাখার নির্দেশ আসে।[৩১]

ভোটকেন্দ্রে হাজির হয়েও অনেকে ভোট দিতে পারেননি। এ রকম একটি অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক আনিসুজ্জামান। উপাচার্য ইন্নাস আলী, রেজিস্ট্রার মুহম্মদ খলিলুর রহমান এবং ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে তিনি ক্যাম্পাসের কাছে একটি ভোটকেন্দ্রে গিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনায় জানা যায় :

স্বাধীন দেশে এই প্রথম ভোট দিতে যাচ্ছি—মনের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে সে-উৎসাহ দপ করে নিভে গেল। জানলাম, আমাদের ভোট দেওয়া হয়ে গেছে।

আমাদের এলাকায় সরকারদলীয় প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন। নিজের ভোটটা আমি তাঁকেই দিতাম। তিনি এমনিতেই জিততেন। তবে উৎসাহী রাজনৈতিক কর্মীরা সে-আশার ওপর ভর করে নিশ্চেষ্ট থাকতে চায়নি

পরীক্ষা না দিয়ে পাশ করতে চাওয়া আর ভোট না দিতে দিয়ে নিজেদের প্রার্থীকে পাশ করাতে চাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য আমি দেখতে পাইনি। এবারের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ২৯৩টি। প্রায় দশটা আসনের ফলাফলের যথার্থতা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন ছিল।[৩২]

বাকেরগঞ্জ-৮ ও ৯ এই দুটি আসনে ন্যাপ (ভাসানী)-এর প্রার্থী ছিলেন রাশেদ খান মেনন। তিনি দুটি আসনেই ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ করেন। বাকেরগঞ্জ-৯ আসনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, 'তখনো আমি ৩ হাজার ৭০০ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে ছিলাম। হঠাৎ ভোটগণনা থামিয়ে দেওয়া হলো এবং কিছুক্ষণ পরেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হলো।'[৩৩]

ড. আলীম-আল-রাজী ন্যাপ (ভাসানী) থেকে টাঙ্গাইলের দুটি ও ঢাকার একটি আসনে প্রার্থী হয়েছিলেন। কোনো আসনেই তিনি জয়ী হননি. পরে এ

সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর দলীয় সতীর্থ রাশেদ খান মেনন বলেছিলেন :

> জনগণের ভোটে বিজয়ী হওয়ার পরও তাঁকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনো যখন আওয়ামী লীগ আমলের সেই নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন ড. আলীম-আল-রাজীর প্রতি মুজিব সরকারের ওই অন্যায় ব্যবহার সবার স্মরণে আসে। ক্ষমতাসীন থাকার সুযোগ গ্রহণ করে নির্বাচনী ফলাফল নিজেদের পক্ষে নেওয়ার আওয়ামী লীগের এই উলঙ্গ প্রচেষ্টাই সেদিন তাদের জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথকে প্রশস্ত করেছিল।[৩৪]

নির্বাচনের পরে ন্যাপের (মোজাফফর) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন :

> ...আমরা সুস্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে, কমপক্ষে ৭০টি নির্বাচনী আসনে যেখানে ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সুনিশ্চিত বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল, সেই সব আসনে শাসক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, অস্ত্রের ঝনঝনানি, ভয়-ভীতি, সন্ত্রাস প্রয়োগ, গুণ্ডাবাহিনী ব্যবহার, ভুয়া ভোট, পোলিং বুথ দখল, পোলিং এজেন্ট অপহরণ—প্রভৃতি চরম অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের মাধ্যমে উক্ত নির্বাচনী কেন্দ্রসমূহে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করিয়াছে এবং বিরোধী দলের প্রার্থীদিগকে জোরপূর্বক পরাজিত করিয়াছে।[৩৫]

জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের প্রার্থী বেশি সংখ্যায় জয়ী হবে, এমন ধারণা শেখ মুজিব কখনো করেননি। এক আলাপচারিতায় তিনি বলেছিলেন, 'বিরোধী দলের তারা যদি ভোট না পায়, আমি কি বাক্স ভেঙে তাদের পক্ষে ভোট দেব?'[৩৬] যদিও পরে তাঁর দলের বিরুদ্ধেই বাক্স ভাঙার অভিযোগ উঠেছিল। ওই সময় একটা কথা চাউর হয়েছিল যে, কুমিল্লার দাউদকান্দি আসনে জাসদের প্রার্থী আবদুর রশীদ ইঞ্জিনিয়ার আওয়ামী লীগের খন্দকার মোশতাক আহমদকে ভোটে হারিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু সরকার হস্তক্ষেপ করে মোশতাককে ওই আসনে জিতিয়ে দেয়।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলকে আওয়ামী লীগ মূল্যায়ন করেছে 'মুজিববাদের' প্রতি জনগণের আস্থা হিসেবে। আওয়ামী লীগের একটি রিপোর্টে বলা হয় :

> এ নির্বাচনে মোট ২৯৫টি আসনে আমাদের প্রার্থীরা জয়ী হয়। আদর্শভিত্তিক এ নির্বাচনে আমাদের একক জয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদী ও তথাকথিত উগ্র প্রগতিবাদীরা প্রত্যাখাত হয়ে যায় এবং তাদের মুরুব্বিদের হতবাক করে দিয়ে বাংলার মানুষ মুজিববাদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে।...[৩৭]

১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদে নির্বাচিত শতকরা ৭৩ ভাগ সদস্যের কমপক্ষে

স্নাতক ডিগ্রি ছিল। এদের মধ্যে শতকরা ২৮ জনের ছিল স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। উচ্চশিক্ষিত লোকের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও সদস্যরা খুব একটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেননি। সংবিধানের ৭০ ধারা ছিল এক্ষেত্রে প্রধান বাধা। শেখ মুজিব চেয়েছিলেন, জাতীয় সংসদে যা কিছু আলোচনা হোক তা সংসদীয় দলের সভায় অনুমোদিত হতে হবে। ফলে সংসদ হয়ে দাঁড়ালো একটা 'বোবার সমাবেশ'।[৩৮]

ব্যতিক্রম ছিল সংসদের বাজেট অধিবেশন। প্রথম জাতীয় সংসদে ৯৯৫ কোটি টাকার প্রথম বাজেটটি উত্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ।[৩৯] সংসদে আওয়ামী লীগের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকায় তাঁরাই আলোচনায় অংশ নেন বেশি। বাজেট নিয়ে সরকারি দলের সদস্যরা যেমন প্রশংসামূলক মন্তব্য করেছেন, সমালোচনাও কম করেননি।

তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন গোছালো স্বভাবের মানুষ। যেহেতু বাজেটটি তিনি দিয়েছেন, তিনি সবার কথা মন দিয়ে শুনতেন এবং নিজেই আলোচনার নোট রাখতেন। তাঁর লেখা নোট থেকে বাজেট নিয়ে সংসদে আলোচনার একটা ধারণা পাওয়া যায়। ১৯ জুন ১৯৭৩ বাজেট প্রসঙ্গে সরকারদলীয় সদস্য আবদুল কুদ্দুস মাখনের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করে তিনি লেখেন :

১. পূর্ণ অর্থনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেননি—সুতরাং আলোচনা সম্ভব নয়।
২. বাজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা—সরকারের কর্তৃত্বের অভাব।
৩. মোটা কাপড়ের কর মওকুফ অভিনন্দনযোগ্য—মোটা কাপড়ের বাক্সে যেন মিহি কাপড় না আসে।
৪. ঢেউটিনের ওপর কর অযৌক্তিক—সম্পূর্ণ মওকুফ করা দরকার।
৫. চাউলের ওপর থেকে কর(?) প্রত্যাহার করা হোক।
৬. ছাতার কাপড় ও শিকের কর প্রত্যাহার করা হোক।
৭. বাজেট পেশের সঙ্গে সঙ্গে অশুভ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে—অসাধু ব্যবসায়ী দমন করা আবশ্যক।[৪০]

আবদুল্লাহ সরকার 'স্বতন্ত্র' প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে তিনি জাসদে যোগ দেন। ২৮ জুন ১৯৭৩ বাজেট সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তাজউদ্দীনের লেখা নোটে এভাবে ওঠে এসেছে :

১. স্বাধীনতার জন্য বিভিন্নরূপ ত্যাগ-তিতীক্ষা—এই বিলে তার মর্যাদা নেই।
২. সংবিধান পরিপন্থী—সমাজতান্ত্রিক বিল তুলে ধরতে ব্যর্থ।
৩. বুর্জোয়া স্বার্থের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। সর্বহারার কথা স্মরণ রাখা হয়নি। এটাকে সমাজতান্ত্রিক বাজেট বলতে পারি না।
৪. যুব সম্প্রদায়কে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়নি। স্বেচ্ছাশ্রম ব্যবহারের ব্যবস্থা নেই। বাধা কোথায়?

৫. পল্টনের ভাষণ সমস্যার সমাধান আনবে না। শ্রমিক এবং যুব সম্প্রদায়কে কাজে লাগাতে ব্যর্থতা।
৬. জ্বালানির অর্ডার—প্রাইভেট কার, মোটর সাইকেল আমদানি বন্ধ করতে হবে? (প্রাইভেট কার বন্ধ আছে)
৭. সিগারেট বিলাসিতা?—নিম্নমানের রেখে উচ্চমানের সিগারেট ৫ বছরের জন্য বন্ধ করতে হবে।[৪১]

৪ জুলাই ১৯৭৩ শ্রীমতি কণিকা বিশ্বাসের আলোচনায় নারী উন্নয়নের প্রসঙ্গটি স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছিল। তাঁর বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ করে তাজউদ্দীন লেখেন :

১. সোনার বাংলা গড়ার জন্যে সোনার মানুষ চাই—তার অর্ধেক নারী। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের অর্ধেক নারী শিক্ষায় ব্যয় করতে হবে। একজন পুরুষ শিক্ষিত হলে একজনই তার ফল পান—একজন নারী শিক্ষিত হলে পরিবারের ছেলেমেয়েরা তার ফল পান।
২. নারী শিক্ষায় বৈষম্য—একটি মাত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ময়মনসিংহে। তিন বঙ্গে তিনটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।
৩. ঘরে ঘরে কুটির শিল্প গড়ে তোলার ডাক দিন।[৪২]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সংসদে বাজেট অধিবেশনের আলোচনা, তাজউদ্দীন আহমদের নোট

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে একতরফা জয় পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। সংবিধানে পশ্চিমা ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলা থাকলেও কার্যত তা রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার অনুরূপ হলো। মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠ সদস্যরা, বিশেষ করে তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং কামারুজ্জামান প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেওয়ার সামর্থ্য রাখলেও প্রধানমন্ত্রী চাইতেন যে, সবাই যেন বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁকে সমর্থন দেন। তিনি মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীদের ইচ্ছামতো দপ্তর বাটোয়ারা করে দেন। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি তিনি উদ্যোগ নিলেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে এবং এর পর পর মন্ত্রীরা দেশে গোপনে কী পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন, তার তদন্ত করবেন। এতে মনে হয় সহকর্মীদের কারও কারও ব্যাপারে তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ছিল। ভারতীয় কূটনীতিক জে এন দীক্ষিতের বর্ণনায় জানা যায়, তাজউদ্দীন এবং কামারুজ্জামান দীক্ষিতকে গোপনে এ কথাটি জানিয়ে বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত ছিল নির্মম পরিহাস এবং তাঁরা কখনো ভাবেননি তাঁদের এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। দীক্ষিতকে তাঁরা এ-ও বলেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া মন্ত্রিসভার কোনো সদস্য ব্যক্তিগত সফরেও ভারতে যেতে পারবেন না বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪৩]

শেখ মুজিব দুই দশক ধরে স্বাধীনতার জন্য জাতিকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, যদিও তাঁর নামেই তাঁর সহকর্মীরা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। এটা শেখ মুজিবের মনে ছাপ ফেলে থাকতে পারে যে, সঠিক সময়ে ঐতিহাসিক ভূমিকাটি তিনি পালন করতে পারেননি। মুজিবনগর সরকারের নেতাদের ব্যাপারে তাঁর মনে কিছুটা ক্ষোভ ছিল। পরে তাঁর সহকর্মীদের ব্যাপারে, বিশেষ করে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গে আচরণে এর প্রকাশ ঘটেছে।[৪৪]

৪

জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিন্নচিত্র দেখা যায়। এ দেশে তরুণেরা সব সময়ই সরকারবিরোধী ভূমিকা পালন করে এসেছে। একাত্তর-পরবর্তী সময়েও তার ব্যতিক্রম হলো না। ছাত্রলীগ দুভাগ হওয়ার পর জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের জোয়ার দেখা গেল সবখানে। ছাত্রলীগ ভাগ হওয়ার পর যে শূন্যতা তৈরি

হয়েছিল, তার সুযোগে বাহাত্তর সালে ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়। কিন্তু তেহাত্তর সালের শুরুর দিকে বাতাস ঘুরে যায়। শুরু হয় জাসদ-ছাত্রলীগের জয়জয়কার। ৩ সেপ্টেম্বর (১৯৭৩) ডাকসু নির্বাচনে সরকার-সমর্থিত ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ প্যানেলকে হারিয়ে জাসদ-ছাত্রলীগের জয় যখন প্রায় নিশ্চিত, তখন সরকারি ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নির্বাচন পণ্ড করে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ধরনের কাণ্ড আগে কখনো ঘটেনি। একটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সহযোগী ছাত্রসংগঠন ডাকসু নির্বাচনে সরকার-সমর্থক প্রার্থীদের হারিয়ে দেবে, এটা হজম করার মতো মানসিকতা সরকার-সমর্থকদের ছিল না। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর কাছে অভিযোগ করা হলেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। তিনি সরকার-সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[৪৫]

ডাকসু নির্বাচনের দিন সংবাদ সংগ্রহ করতে সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন চত্বরে গিয়েছিলেন *ভয়েস অব আমেরিকার* ওই সময়ের প্রতিনিধি আমানউল্লাহ। তিনি তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> দেখলাম একটা ব্যালট বাক্স মাথায় নিয়ে সাবু দৌড়াচ্ছে। ওকে আমি চিনতাম। ও একজন দর্জি, সাকুরার নিচতলায় একটা দোকান ছিল ওর। আমি ওকে দিয়ে একবার স্যুট বানিয়েছিলাম। আমি ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর বাসায় গেলাম। একসময় তাঁর ছাত্র ছিলাম। খবর পাঠালাম, 'ভোয়া' থেকে এসেছি, কথা বলতে চাই। দেখা হতেই তিনি আমাকে চিনলেন। ফরমাল সাক্ষাৎকার শেষ হলে বললাম, এতক্ষণ সাংবাদিক হিসেবে কথা বলেছি, এখন আপনার ছাত্র হিসেবে বলব। আমাদের কথাবার্তা ছিল এ রকম :
>
> আমান : আপনার ছাত্র ছিলাম ভেবে এখনো গর্ববোধ করি। কিন্তু আজ আপনার যে ভূমিকা দেখলাম, তা আপনার অতীতের ভূমিকার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।
>
> মোজাফফর : আমি কী করতে পারতাম?
>
> আমান : আপনার এখনই রিজাইন করা উচিত।
>
> মোজাফফর : বুঝবে না, বুঝবে না।
>
> আমি যা বোঝার বুঝে নিয়েছি। ভয় আর মোহ একসঙ্গে ভর করেছে। ভয়ে কোনো অ্যাকশন নিতে পারছেন না। আবার আশা আছে, শিগগিরই মন্ত্রী হবেন। হয়েছিলেনও।[৪৬]

ছাত্র ইউনিয়ন-ছাত্রলীগ যৌথ প্যানেলের জয়লাভের ব্যাপারে ওই দুই

সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা প্রায় নিশ্চিত ছিলেন। ভোট গণনা শুরু হওয়ার পর অবস্থা দেখে তাঁরা হতচকিত হয়ে যান। সে সময় দৈনিক *সংবাদ* পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ছিলেন মোরশেদ শফিউল হাসান। তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক ছিলেন। ওই দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন :

> আমি থাকতাম মুহসীন হলে। ওই দিন সকালে ও দুপুরে দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে আমি আরও কয়েকটি হলের ভোটগ্রহণ কার্যক্রম দেখতে যাই। বিকেলে আমার সঙ্গে যোগ দেন পত্রিকার সহ-সম্পাদক জি এম ইয়াকুব। এটা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। আমরা দুজন সলিমুল্লাহ হলে ঢুকতেই গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাই। হল প্রাঙ্গণের সবগুলো আলো হঠাৎ নিভে যায়। অস্ত্র হাতে দুজন তরুণ আমাদের দেখে ধমকের সুরে জানতে চাইল, আমরা কে। সাংবাদিক পরিচয় দিতে তারা আমাদের অবিলম্বে এলাকা ছেড়ে যেতে বলল। সেখান থেকে আমরা এরপর হেঁটে হেঁটেই জগন্নাথ হলে পৌঁছলাম। ততক্ষণে সেখানেও যা ঘটার ঘটে গেছে। প্রভোস্টের কক্ষে গিয়ে আমরা জানলাম, জাসদ-ছাত্রলীগের কর্মীরা অস্ত্রের মুখে ও বোমা ফাটিয়ে ওখান থেকেও ব্যালট বাক্স নিয়ে গেছে। ওখানে বসে থাকতেই আরও দু-একটি হলেরও ব্যালটবাক্স ছিনতাইয়ের কথা জানা গেল। অতঃপর সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা দুজন রিক্সা নিয়ে বংশালে *সংবাদ* অফিসে হাজির হলাম।
>
> অফিসে পৌঁছতেই পত্রিকার তৎকালীন স্টাফ রিপোর্টার বেবী মওদুদ, চিফ রিপোর্টার এম আর বাদল, সিটি এডিটর হাসান আলী ও উপস্থিত আরও কয়েকজন আমাদের কাছে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে আমরা যথারীতি জাসদ-ছাত্রলীগের কর্মীদের দ্বারা ব্যালটবাক্স হাইজ্যাকের কথা বলি। এ সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন বার্তা সম্পাদক সন্তোষ গুপ্ত। তিনি ভিড়ের মধ্য থেকে আমাকে বের করে একদিকে নিয়ে গিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি করে বলুন তো কারা কাজটা করেছে?' আমি জাসদ-ছাত্রলীগের কথা বলতে যেতেই তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'অসম্ভব, সরকারি দলের সমর্থন ছাড়া এ কাজ অন্য কেউ করতে পারে না।' তিনি কেন বা কী ভেবে কথাটা বলেছিলেন জানি না। যাই হোক, তিনি চলে যাওয়ার পর বেবী আপা ও বাদল ভাই আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'দাদা কী বললেন?' উনি যা বলেছেন তা জানাতে তাঁরা মন্তব্য করলেন, 'দাদা কী বলে না বলে ঠিক নাই!' যাই হোক, সেদিন আমাকে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে কোনো রিপোর্ট লিখতে হয়নি। এমনিতেও ঘটনার গুরুত্বে সংবাদটা লিড আইটেম হবে যেহেতু, আমার কাছ থেকে কিছু কিছু বিষয় জেনে নিয়ে রিপোর্টটা লিখেছিলেন পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার তোজাম্মল আলী। বলা বাহুল্য তাতে জাসদ ছাত্রলীগের দ্বারাই ব্যালটবাক্স ছিনতাইয়ের কথা লেখা

> হয়েছিল। সেদিন রাতে অফিস থেকে যাওয়ার সময় সন্তোষ দা বলে গেলেন আমি যেন রাতে আর হলে না ফিরি। শিফট-ইন-চার্জ নাজিমুদ্দীন মোস্তানকে তিনি বলে গেলেন সামনের হোটেল থেকে খাইয়ে নিয়ে যেন রাতে অফিসেই আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়।
>
> পরদিন বিকেলে 'জাসদ-ছাত্রলীগের ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ে'র প্রতিবাদে ছাত্র ইউনিয়ন-ছাত্রলীগের একটি যৌথ মিছিল কলাভবন থেকে বেরিয়ে বায়তুল মোকাররম অবধি যায়। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মাহবুব জামান, আবদুল কাইয়ুম মুকুল, মনিরুল হক চৌধুরী, শফিউল আলম প্রধান প্রমুখ দুই সংগঠনের নেতারা সে মিছিলের নেতৃত্ব দেন। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার হিসেবে আমি যথারীতি সেই মিছিল ও প্রতিবাদ সভার রিপোর্ট লিখি।[৪৭]

ডাকসু নির্বাচনে ব্যালট বাক্স লুটের ঘটনা এর আগে কখনো শোনা যায়নি। ঘটনাটি ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মো. আনিসুর রহমানকে। ৩ অক্টোবর ১৯৭৩ প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে লেখা কমিশন থেকে পদত্যাগপত্রে তিনি বলেছিলেন, 'ছাত্রদের নিয়ে কিছু কাজ করে আশা পাচ্ছিলাম, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে মর্মন্তুদ ঘটনাবলী ঘটেছে তাতে বিরাট ধাক্কা খেয়েছি।'[৪৮]

৫

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। একদিকে চলছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামোর পুনর্বাসন, অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল জিনিসপত্রের দাম। কম আয়ের লোকেরা সংসার সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশ হলেও জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল ৩ শতাংশ। জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যায় তিনগুণ।[৪৯] ১৯৬৩ সালের তুলনায় ১৯৭৩ সালে কৃষি শ্রমিকের প্রকৃত গড় মজুরি শতকরা ২৩ ভাগ কমে যায়। এই সময়ে শহরের অদক্ষ শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায় ৪৬ শতাংশ। সমাজের দরিদ্রতম অংশের দুর্ভোগের সীমা ছিল না।[৫০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মো. আনিসুর রহমানকে ১৯৭২ সালের শুরুতেই পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। কমিশনের কাজে তিনি 'তৃপ্তি' পাননি। আরও কিছু ব্যাপারে তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। এসব জানিয়ে ১৯৭৩ সালের ৩ অক্টোবর তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে

লিখিত পদত্যাগপত্র পাঠান। দেশে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও এক শ্রেণির লোকের বাড়াবাড়ি আচরণ তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল :

> স্বাধীনতার প্রত্যুষে জাতি সুবিচার ও ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে সমাজটিকে নতুন করে গড়ার জন্য যেকোনো রকম ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত ছিল, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধারা যে নিষ্ঠা নিয়ে যুদ্ধ করেছিল ঠিক সেই রকম নিষ্ঠা নিয়ে দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মনে হয়, যে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশ গঠনের চাইতে তাঁদের নিজেদের এবং পারিবারিক ধনদৌলত বাড়াবার কাজকেই অগ্রাধিকার দেন, যেন যুদ্ধে শুধু তাঁরাই কষ্ট করেছিলেন। লাইসেন্স ও রিলিফের টাকা নিয়ে পুরোদস্তুর র‍্যাকেটিয়ারিং শুরু হয়ে যায়।...
>
> একদিকে দেশের এলিটদের অত্যন্ত বিলাসী জীবন যাপন করতে দেওয়া হলো, আর অন্যদিকে সাধারণ জনগণ যাদের এ রকম সামাজিক শক্তি নেই তাদের বলা হলো আরও তিন বছর কষ্ট সহ্য করতে। মন্ত্রী ও আমলারা নির্লজ্জ আনন্দে প্রকাশ্যে চোখ ধাঁধানো ভোজ ও দামী গাড়ি দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন এবং তাঁদের পরিবারবর্গেরও অলঙ্কারাদি ও পোশাকের জৌলুসে নগরের রাস্তা সজ্জিত হতে থাকল।[৫১]

জন্ম হওয়ার পর জাসদ খোলামেলাভাবে সরকার উৎখাতের স্লোগান দিয়েছিল। বেপরোয়া উগ্র বক্তব্য দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এই দলটি জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। অন্যদিকে সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতা, অসহনশীল আচরণ, যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং লাগামহীন মুদ্রাস্ফীতির কারণে মানুষ ক্রমেই আওয়ামী লীগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকে। জাসদের দ্রুত বেড়ে ওঠার পেছনে এই কারণগুলোও কাজ করেছিল।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ বিজয় দিবস উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত আওয়ামী লীগের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বিরোধীদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, আমার নির্বাচন দেওয়ার উদ্দেশ্য আছে। এমনি এমনি নির্বাচন দেই নাই ৭ মার্চের পর আমি 'লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেবো।'[৫২] ওই সময় ঘোড়সওয়ারের ছবিসংবলিত জাসদের একটি পোস্টার নজর কেড়েছিল। পোস্টারটি ডিজাইন করেছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাজহারুল হক বাকীর মালিকানাধীন 'বিজ্ঞাপনী'র শিল্পী কামাল আহমেদ। পোস্টারে একটা ছুটন্ত ঘোড়ার ওপর বসে আছে একটা কঙ্কাল, তার গা থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, ছুটন্ত ঘোড়া হলো তার প্রতীক; কঙ্কালটি হলো অপশক্তি, যা দেশের কাঁধে ভর করেছে।[৫৩]

১৯৭৩ সালে প্রচারিত জাসদের একটি পোস্টার

বিদ্রোহী ছাত্রলীগ ও জাসদের কর্মীরা শাসক দল, পুলিশ ও রক্ষী বাহিনীর টার্গেটে পরিণত হয়। অন্যান্য দলের সদস্যরাও রেহাই পাননি। গুম এবং বিচারবহির্ভূত খুনখারাবি ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। বিভিন্ন গণমাধ্যমে, বিশেষ করে জাসদের মুখপত্র দৈনিক *গণকণ্ঠে* এ বিষয়ে প্রায় প্রতিদিন সংবাদ ছাপা হতো। এখানে *গণকণ্ঠ*-এ প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ উদ্ধৃত করা হলো। এসব উদ্ধৃতিতে ছাত্রলীগ বলতে জাসদ-সমর্থক ছাত্রলীগকে বোঝানো হয়েছে :

> ২৬ জুলাই ১৯৭২ : ২৩ জুলাই আওয়ামী গুণ্ডাবাহিনী ও সরকার-সমর্থক এনএসএফ মার্কা ছাত্রলীগের ফ্যাসিবাদী হামলায় আহত আবদুল মালেক গতকাল সকাল সাড়ে ছয়টায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।
>
> ৫ আগস্ট ১৯৭২ : ফ্যাসিবাদী গুণ্ডাদের আক্রমণে গত পরশু (বৃহস্পতিবার) কালিগঞ্জ ইউনিয়নের আবদুর রহিম (২৩) নামে একজন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হয়েছেন। সেদিন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কালিগঞ্জ ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে একদল সশস্ত্র মুজিববাদী নামধারী গুণ্ডা সভায় উপস্থিত ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর আক্রমণ করে। ফলে ১০ জন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হন।

আহত কর্মীদের ফেনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সন্ধ্যার সময় আবদুর রহিম হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৬ নভেম্বর ১৯৭২ : জাসদ নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে বলেন, যেসব বিপ্লবী পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাঁরা ফ্যাসিবাদের শিকার হচ্ছেন। দেশ স্বাধীন করার পর সুপরিকল্পিতভাবে তিন হাজারেরও বেশি প্রগতিশীল ছাত্র-শ্রমিক-রাজনৈতিক কর্মীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, তাঁরা নরসিংদীর শ্রমিক মুক্তিযোদ্ধা কাদের, সিরাজ, ঈশ্বরদীর কচি, কুষ্টিয়ার হাবিব, টাঙ্গাইলের জিন্নাহ ও নবাবগঞ্জের সিদ্দিকুর রহমানের নাম উল্লেখ করেন।

৬ জানুয়ারি ১৯৭৩ : রোববার রাত সাড়ে ১২টায় সরকারি শ্রমিক সংগঠনের কয়েক শতের একটি দল স্টেনগান, এসএলআর, এলএমজি ও অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাড়বকুণ্ড শিল্পাঞ্চলের আর আর টেক্সটাইল মিলে হামলা চালায়। আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত শ্রমিকেরা গুণ্ডাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করলেও বহুসংখ্যক শ্রমিককে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। পলায়নপর শ্রমিকদের অনেককে হাত পা বেঁধে কাঁচা ঘরের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। উক্ত মিলের সম্মুখস্থ মুদি দোকানদার মোহাম্মদ বশিরুল্লাহ হতভাগ্য শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলে তাঁকে হাত-পা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ : রক্ষীবাহিনী খুলনায় ফকিরহাট ও সদর থানায় দুটি গ্রামে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে।... রক্ষীবাহিনীর নির্মম প্রহারে আবদুল খালেক শেখ এবং আবদুল জব্বার শেখ নামের দুজন কৃষক মারা গেছেন বলে জানা গেছে।

১১ মার্চ ১৯৭৩ : শনিবার (১০ মার্চ-'৭৩) সকালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, মোজাফফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের স্থানীয় কয়েকজন নেতা ও কর্মী কোটালীপাড়া থেকে গোপালগঞ্জ যাচ্ছিলেন। তারা যখন টুকুরিয়া গ্রামে পৌঁছান তখন চারদিক থেকে বেশ বড় একটা দুর্বৃত্ত দল তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।... এই বর্বরোচিত আক্রমণে ঘটনাস্থলেই চারজন মারা গেছেন, পরে আরও একজন গুরুতর আঘাত নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা গেছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ফরিদপুর-২ থেকে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের ন্যাপ প্রার্থী শ্রী কমলেশ চন্দ্র বেদন্ত, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতা জনাব ওয়ালিউর রহমান লেবু, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা লুৎফর রহমান মানিক ও শ্যামল ব্যানার্জি। এ ছাড়া অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন।

১৫ মার্চ ১৯৭৩ : ঢাকা জেলার ধামরাইতে রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ জাতীয় লীগের বিশিষ্ট কর্মী আবদুল মান্নাফকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে

হত্যা করেছে বলে দলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

২৬ মে ১৯৭৩ : মুজিববাদী গুণ্ডারা গতকাল (২৪ মে) রাতে ঈশ্বরদী থানার শাহপুর গ্রামের বিশিষ্ট ছাত্রলীগের কর্মী রিয়াজউদ্দিনকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।... আজ সকালে তার লাশ পাওয়া গেছে

১৮ জুন ১৯৭৩ : রক্ষীবাহিনীর নির্মম শিকারে পরিণত হয়ে আজ (১৭ জুন) দুপুর ১২টার সময় স্থানীয় (বগুড়া) কারাগারে জাসদের অন্যতম কর্মী শ্রী মানিক দাসগুপ্ত মৃত্যুবরণ করেছেন। কারাগারে থাকাকালে তাঁর আহার্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং শেষ পর্যায়ে তাঁর আঙুলগুলো কেটে ফেলা হয়।... ইতোপূর্বে গত ৮ জুন বিকেল পাঁচটায় মুজিববাদী গুণ্ডারা প্রকাশ্য দিবালোকে বগুড়ার রাজপথে আতা এবং রঞ্জু নামে ছাত্রলীগের দুজন কর্মীকে গুলি করে হত্যা করে।

৮ অক্টোবর ১৯৭৩ : জাকসুর (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ) সাধারণ সম্পাদক বোরহানউদ্দিন রোকন পরিণত হয়েছেন গুপ্তহত্যার শিকারে।... গত শনিবার রাতে নারায়ণগঞ্জ জাসদ অফিস থেকে তাঁর বোনের বাসায় যাওয়ার পথে প্রকাশ্য রাস্তা থেকে মুজিববাদীরা বুকের ওপর বন্দুকের নল ঠেকিয়ে রোকনকে ছিনতাই করে।... গতকাল (৭ অক্টোবর) লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলের সামনে রোকনের লাশ পাওয়া গেছে।

২৪ অক্টোবর ১৯৭৩ : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পাবনা জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক জনাব আসফাকুর রহমান কালু, বিশিষ্ট জাসদ কর্মী ফারুক ও পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি জনাব মাসুদকে সম্প্রতি রক্ষী বাহিনী পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে ঢাকায় প্রাপ্ত এক খবরে জানা গেছে।

২৫ অক্টোবর ১৯৭৩ : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল রাজশাহী জেলা শাখার সহসভাপতি এবং বাগমারা থানা জাসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব মনিরুদ্দিন আহমদ ও তাঁর ছোট ভাইকে রক্ষীবাহিনী গত ২১ অক্টোবর রাতে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে।

১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩ : গত ১০ ডিসেম্বর তানোর থানায় মোহাম্মদপুর, চৌবাড়িয়া, পূর্বপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ১৩১ ব্যক্তিকে যৌথ বাহিনীর লোকজন ধরে নিয়ে যায় এবং পরে তাদের প্রত্যেককে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তিরা বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছিল।[৫৪]

১৯৭৩ সালের মার্চে 'বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) অধ্যাদেশ' জারি করা হয় এবং সেপ্টেম্বরে তা সংশোধন করা হয়। এই আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান এবং ৯ জন সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচন করার কথা বলা হয়। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের

কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। আওয়ামী লীগসহ বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল ঘোষণা দেয় যে, তারা সরাসরি প্রার্থী দেবে না বা কাউকে সমর্থন করবে না। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন যে, আওয়ামী লীগ সরাসরি কোনো প্রার্থী না দিলেও তিনি আশা করেন জনগণ যোগ্য লোককেই ভোট দেবে। একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে একজনকেই প্রার্থী করার এবং দলের মধ্যে একতা বজায় রাখার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। প্রকারান্তরে তিনি ঐকমত্যের ভিত্তিতে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের কথা বলেন।[৫৫]

১২ দিন ধরে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের সময় অনেক গোলযোগ হয়েছিল। সংঘর্ষে অনেকেই হতাহত হন। ৮০০টি ইউনিয়নের ভোটদান স্থগিত করা হয়। পরিস্থিতি বর্ণনা করে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান বলেন, '৩০০ ইউনিয়নে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠান করা দরকার। আমার এলাকা ধামরাই থানা সম্পর্কে বলতে আমারই লজ্জা হচ্ছে। এখানে ১৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ১১টিতেই মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেওয়া হয়নি। কিছু লোক বন্দুক আর স্টেনগান নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই ১১টি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান আর ভাইস চেয়ারম্যানরা সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে।' সহিংসতায় কয়েকজন পোলিং অফিসারও নিহত হন।[৫৬]

সংসদে বিরোধী দলের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। অন্যদিকে রয়েছে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের খাঁড়া। আওয়ামী লীগের সাংসদরা দলীয় নীতির বাইরে কথা বলতেন না। তারপরও সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলেছে অনেক সময় ধরে। চুয়াত্তর সালের বাজেট অধিবেশনে এক হাজার ৬৭০টি তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের মধ্যে ২০০টি উত্থাপন করেছিলেন বিরোধী দলের সদস্যরা। তার মানে, দুই শতাংশ বিরোধী সদস্য ১২ শতাংশ প্রশ্ন করেছিলেন। এ সময় সংসদে ২২৯টি জনগুরুত্ব সম্পর্কিত নোটিশ জমা পড়ে। এর মধ্যে ৫৮টি ছিল বিরোধীদের। মোট ৫১টি নোটিশ আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে ৯টি ছিল বিরোধী সদস্যদের।[৫৭]

তেহাত্তরের জাতীয় সংসদের মেয়াদে ১১০টি আইন পাস হলেও তার মধ্যে ৯১টি ছিল রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ। আইন প্রণয়ন নিয়ে সংসদে বেশি বিতর্ক বা আলোচনা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, 'প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন সংশোধনী বিল ১৯৭৪' নিয়ে মাত্র এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিট আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন সরকারি দলের মাত্র একজন এবং বিরোধীদের পক্ষ থেকে চারজন সাংসদ। 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ১৯৭৪' নিয়ে আড়াই ঘণ্টা

আলোচনা হয়। এতে অংশ নেন সরকারি দলের দুজন এবং বিরোধীদের চারজন সদস্য। 'বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪' নিয়ে চার ঘণ্টা আলোচনা হয়েছিল এবং মাত্র একজন সরকারদলীয় ও ছয়জন বিরোধী সদস্য আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। সবগুলো ক্ষেত্রে 'স্বতন্ত্র' সদস্যরা 'বিরোধী' পক্ষে ছিলেন এবং বিলগুলো কণ্ঠভোটে পাস হলে তাঁরা সবাই অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন।[৫৮]

৬

দেশ স্বাধীন হলে স্বস্তি আর সুখ নেমে আসবে, এমন সহজ-সরল চাওয়া ছিল সাধারণ মানুষের। দিন যায়, মাস যায়, ক্রমেই অস্থির হয়ে পড়ে সমাজ।

পথে-ঘাটে মানুষের লাশ পড়ে থাকে। কেউ গণপিটুনির শিকার, কেউ বা রাজনৈতিক সহিংসতার। এক দলের লোক মারে অন্য দলের লোককে। কখনো বা নিজ দলের ভিন্নমতের লোককে খতম করে দেয়। পুলিশ আর রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের লোকদের সংঘর্ষে উভয়পক্ষের মানুষের জান যায়। খবরের কাগজের পাতায় লাঞ্ছনা, ধর্ষণ আর খুনোখুনির সংবাদ ছাপা হয় প্রায়ই। আল মাহমুদ সময়টা কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায় : 'এ বোধের উৎস কই, কোনদিকে'?

> হঠাৎ গুলির শব্দ। চিৎকার, ধর ধর ধর
> কিন্তু আমি কাকে ধরবো? স্টেনগান কাঁধে নিয়ে হেঁটে যায়
> উনিশশো তেয়াত্তর সাল।
> বাগান মাড়িয়ে দিয়ে জীপ যায়,
> আবার গুলির শব্দ,
> মা...মা...মা জানালা বন্ধ করো
> টেলিফোন টেলিফোন...
> আবার গুলির শব্দ। বাঁচাও বাঁচাও...
> বানাও শালাকে ছিঁড়ে ফ্যালো—
> ...ট্যাট্...ট্যাট্..ট্যাট্।[৫৯]

এ সময় সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি বেশ তৎপর ছিল। এই দলটিও 'বিপ্লব' করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। 'আওয়ামী বিশ্বাসঘাতক ও তার প্রভু ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীদের উৎখাত করুন' স্লোগান দিয়ে তারা দেশের অনেক জায়গায় সশস্ত্র তৎপরতা চালাতে থাকে। পুলিশ ও

রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে তাদের অনেক জায়গায় সংঘর্ষ হয় এবং উভয় পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটতে থাকে।

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আত্মীয় ও পরিবার তোষণের অভিযোগ ছিল। তিনি নিজেও পরিবারের কিছু সদস্যকে নিয়ে বিপাকে ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর ছেলে শেখ কামাল এবং বোনের ছেলে শেখ ফজলুল হক মণির কিছু কিছু কাজের ফলে তাঁরা শুধু নিজেরাই সমালোচিত হননি, এর দায় নিতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে। শেখ কামাল অতি উৎসাহে কিছু কিছু কাজ করতেন, যা প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্ট বিব্রত করত। এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ বিজয় দিবসকে কেন্দ্র করে সর্বহারা পার্টি হরতাল ডেকেছিল। স্বভাবতই নিরাপত্তা বাহিনীগুলো এ উপলক্ষে সতর্ক হবে, যাতে জনজীবন ব্যাহত না হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীপুত্র শেখ কামাল ১৫ ডিসেম্বর রাতে দলবল নিয়ে 'সর্বহারা' ধরতে বের হন এই দলের একজন ছিলেন আবুল ফজল মোহাম্মদ আবদুল হান্নান। বার্তা সংস্থা 'এনা'কে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি ওই রাতের ঘটনা বর্ণনা করেন এভাবে :

> ...ঢাকা কলেজের বিপরীত ২৫ নং ছাত্রলীগের অফিস থেকে বেক্সিমকোর বড় ভ্যানে ১০ বন্ধু চেপে বসেন। এমন সময় টুকু (ইকবাল হাসান, পরবর্তী সময়ে বিএনপি সরকারের প্রতিমন্ত্রী) দেখতে পান যে নিকটেই আল-হেলাল হোটেলের সামনে লাল রঙের একটি টয়োটা গাড়ি, সে গাড়িটি তাঁদের লক্ষ্য করছে। এ অবস্থায় আমাদের বহনকারী ভ্যানটি ধীরে ধীরে ওই গাড়ির দিকে এগোতে থাকে। এ সময় টয়োটা সামনের দিকে চলতে থাকে... টয়োটা স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসের দিকে যাচ্ছিল। পরে জানা গেছে, টয়োটায় ছিলেন সার্জেন্ট শামীম কিবরিয়া তিনি ফাঁড়িতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয় এবং সবাইকে পজিশন নিতে নির্দেশ দেন ওয়াকিটকির মাধ্যমে।... টয়োটাকে অনুসরণ করে ভ্যানটিও ভেতরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে টয়োটার স্টার্ট বন্ধ করা হয় এবং মুহূর্তেই এলাকাটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক অবিরতভাবে গুলি চালায়। কয়েকটি গুলি শেখ কামালের বাঁ পাশের কলারে লাগে. চারটি গুলি কলার বোনের ভেতরে ঢোকে একজনের হাতের আঙুল উড়ে যায়। কারও পিঠে গুলি লাগে, আমি, রুহুল, খোকা ও টুকু গুলি থেকে বেঁচে যাই।
>
> ... মুসলিম লীগের নেতা আবদুল্লাহ আল মামুনের ছেলে টুকু বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণের সময় চিৎকার করে শেখ কামালকে বলেন যে 'এটা স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস'। সঙ্গে সঙ্গে শেখ কামাল আরও জোরে চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'আমি শেখ কামাল'। এ কথা শুনে সার্জেন্ট গুলি বন্ধ করান নির্দেশ

দিয়েই দৌড়ে ভ্যানের কাছে আসেন এবং ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করেন। এমনি অবস্থায় রেজাউল আহত ব্যক্তিদের জিপে তুলে নিয়ে যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেখ মুজিবের ছেলে গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর মুহূর্তে জানাজানি হওয়ার পর হাসপাতালে গভীর রাতেই সর্বাগ্রে ছুটে আসেন জেনারেল জিয়াউর রহমান (সে সময় সেনাবাহিনীর উপপ্রধান), তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক, তোফায়েল আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ এবং বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যসহ ঘনিষ্ঠ প্রায় সবাই।... জাসদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় যে শেখ কামাল দলবল নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।...[৬০]

সংবাদটি দৈনিক *গণকণ্ঠে* ছাপা হয় এভাবে :

গত শনিবার রাত সাড়ে এগারোটায় ঢাকার কমলাপুর স্পেশাল পুলিশের সাথে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রধানমন্ত্রীতনয় শেখ কামাল, তার ৫ জন সাঙ্গোপাঙ্গ ও একজন পুলিশ সার্জেন্ট গুলীবিদ্ধ হয়েছে। শেখ কামাল ও তার সঙ্গীদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নয়, দশ ও তেত্রিশ নম্বর কেবিনে ভর্তি করা হয়েছে আহত পুলিশ সার্জেন্ট শামীম কিবরিয়াকে ভর্তি করা হয় রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে।[৬১]

কামাল বাংলাদেশ ব্যাংকে ডাকাতি করতে গিয়ে গুলি খেয়েছেন, এমন একটা গুজব ছড়ানো হয়েছিল। অনেকেই এটা বিশ্বাস করেছিলেন। অভিযোগটি যে ভিত্তিহীন, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শেখ হাসিনা ১৯৯৩ সালের ১২ আগস্ট জাতীয় সংসদে বলেছিলেন :

...রাত্রি ১২টার সময় কোনোদিন কোনো ব্যাংকে ডাকাতি করা যায় কি না। তাও আবার স্টেট ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক কীভাবে তার ভোল্ট রক্ষা করে, তা যাদের সামান্য কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাঁরাও জানেন। আর একটা কথা মনে রাখা উচিত। একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছেলের টাকার জন্যে ব্যাংক ডাকাতির প্রয়োজন হয় না।[৬২]

রাজনৈতিক সহিংসতা দিন দিন বাড়ছিল। আঘাত আসছিল আওয়ামী লীগের ওপরও। এ রকম পরিস্থিতিতে ১৮-২০ জানুয়ারি ১৯৭৪ ঢাকায় আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে শেখ মুজিব 'ঘরের শত্রুদের' ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান এবং এদের 'কুমীর, সাপ আর মোনাফেক' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন :

এরা রাতের অন্ধকারে গুলি করে মারল বলে আমি বিপ্লবী। তুমি বিপ্লবী না

দাগি চোর? যেকোনো সময় যেকোনো লোককে গুলি করে মারা যায়। এটা কি বিপ্লব? তোমরা রাত্রে গুলি করে মারো, আমরা প্রস্তাব পাস করি। আর আমি যদি লোকদের বলে দেই যে, তোমরাও রাত্রে গুলি করে মারো, তখন কী হবে? এদের কোনো নীতি নাই, এদের কোনো আদর্শ নাই, এদের কিছুই নাই। এরা বড় বড় কথা বলে। আসলে চোর-ডাকাতের ন্যায় হাট-বাজারে ডাকাতি করে জিন্দাবাদ দিয়ে চলে যায়। সব ডাকাত, সব চোর। হাট-বাজার, চিনির দোকান, মুরগির দোকানে, সবজির দোকানে ডাকাতি করে বিপ্লব হয় না। ঐ রণদিভের থিওরি ইট মারো, সেপাই আস্তানায় ইট মারো, ওয়ালে একটা পাথর মারো। এতে বিপ্লব হয় না।

সেই জন্যই আমি বলতে চাই যে, তাকে বিপ্লব বলে না, তাকে বলে পারভার্শন—বিপ্লবের বিকৃতি।... রাতের অন্ধকারে গুলি করে মাইরা বলে, আমরা মাওবাদী। কিন্তু আমি জানি, তোমরা চোর আর গুন্ডা ছাড়া আর কিছু না।[৮৩]

এই কাউন্সিলে দলীয় গঠনতন্ত্রের বিধান মেনে শেখ মুজিব সভাপতির পদ ছেড়ে দেন। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন এ এইচ এম কামারুজ্জামান। তিনি মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেন। জিল্লুর রহমান সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বহাল থাকেন। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য পদে নির্বাচিতদের মধ্যে ছিলেন মহিউদ্দিন আহমেদ, ডা. আসহাবুল হক ও রফিক উদ্দীন ভূঁইয়া (সহসভাপতি), আবদুর রাজ্জাক (সাংগঠনিক সম্পাদক), সরদার আমজাদ হোসেন (প্রচার সম্পাদক), আনোয়ার চৌধুরী (দপ্তর সম্পাদক), কাজী মোজাম্মেল হক (শ্রম সম্পাদক), রহমত আলী (কৃষি সম্পাদক), মোস্তাফা সারোয়ার (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), সাজেদা চৌধুরী (মহিলা সম্পাদিকা) এবং হামিদুর রহমান (কোষাধ্যক্ষ)।[৮৪]

সভাপতি পদে পরিবর্তনে দলে ক্ষমতার ভারসাম্য হেরফের হয়নি। শেখ মুজিব সরকারপ্রধান থেকে যাওয়ায় দল সরকারের ওপর নির্ভরশীল থেকে গেল।

জাসদের সঙ্গে তাজউদ্দীনের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। তিনি জাসদের মধ্যে একটি বিকাশমান রাজনৈতিক শক্তির সম্ভাবনা দেখেছিলেন, কিন্তু জাসদের 'বাড়াবাড়ি' আচরণে তিনিও বিরক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৭৪ সালের ২০ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে তাজউদ্দীন নাম উল্লেখ না করে জাসদের সমালোচনা করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন :

বর্তমানে আমি যে জিনিসটা লক্ষ্য করেছি—খোলাখুলি বলছি, আমাকে একটু মাফ করবেন—চার বছর হয়ত পুলিশ টুলিশ দিয়ে আমরা ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করতে পারব। গত মার্চ মাসে ইলেকশন হয়েছে। বর্তমানে যাদেরকে

নিয়ে আমরা বিব্রত বোধ করছি, নাম বেশি বলতে চাই না। এক সময় ওরা আমাদের মধ্যেই ছিল। খুব বেশি দিনের কথা নয়, ওরা আমাদের চাইতে ভালো কথা বলত এবং তখন সাময়িকভাবে অনেকে মনে করত ওরাই বোধহয় আসল কথা বলছে।

ওরাও এক সময় বলেছিল যে, বঙ্গবন্ধুকে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া দরকার। এই মন্ত্রী-টন্ত্রীরা খুব বেশি সুবিধার নয়। তাদের আসল মতলব ছিল বঙ্গবন্ধুকে আস্তে আস্তে একা করে ফেলা, যেটা আমাদের শ্রদ্ধেয় সৈয়দ নজরুল সাহেব বললেন, একা করে একটু বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া—একা লোককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া খুব সহজ। তাদের মতলব কী ছিল? এ রকমই একটা কিছু ছিল বোধহয়।... তাকে একা করে সব ধাক্কা তখন বঙ্গবন্ধুর দিকে—তখন তো সৈয়দ সাহেবকেও মারা লাগে না, মোশতাক সাহেবকেও মারা লাগে না বঙ্গবন্ধুকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেই হয়। এই রকম একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল ...[৬৫]

৭

যত দিন যাচ্ছিল, রাজনীতি হয়ে উঠছিল সংঘাতময়। চুয়াত্তরের ১০ ফেব্রুয়ারি জাসদ ঘেরাও আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৭ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে জাসদ একটা জনসভা করে। জনসভা শেষে একটা জঙ্গি মিছিল মিন্টো রোডের দিকে যায় এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর বাসা ঘেরাও করে। সেখানে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী গুলি চালালে অনেকেই হতাহত হন। সরকারি প্রেসনোটে তিনজন নিহতের কথা বলা হলেও দৈনিক *ইত্তেফাকে* ছয়জন নিহত হওয়ার খবর ছাপা হয়।[৬৬] ঘটনাস্থলেই জাসদের কর্মীসহ ৫০ জন মিছিলকারী নিহত হয়েছিলেন বলে জাসদ দাবি করে।[৬৭] ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তরুণ ফটোগ্রাফার নাসির আলী মামুন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

আমি তখন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও ছবি তুলতাম। ১৭ মার্চের সভায় গিয়েছিলাম ছবি তোলার জন্য। সভা শেষে মিছিলের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির কাছে এলাম। ৪০০ থেকে ৫০০ পুলিশ মোতায়েন ছিল বাড়িতে।... এমন সময় চারদিক থেকে অসংখ্য রক্ষীবাহিনী এসে ঘিরে ফেলল মিছিলের লোকদের। প্রথমে তারা ফাঁকা আওয়াজ করল এবং সবাইকে চলে যেতে বলল। রক্ষীবাহিনী দেখে লোকজন পালাতে শুরু করল এ অবস্থায় নতুন

কোনো উসকানি ছাড়াই মারপিট ও গুলি শুরু করল।... চারদিকে মরণ চিৎকার। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা। নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চলল চোখের সামনে। জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে থাকলাম। শুয়ে শুয়ে দেখলাম দেয়াল টপকে পলায়মান অনেককে গুলি করছে, যেন পাখি শিকার।... গুলিতে আহত ও রক্তাক্ত লোকগুলোকে টেনেহিঁচড়ে কোথাও বা মারতে মারতে গাড়িতে তুলল তারা। পুলিশ অবশ্য আহত ব্যক্তিদের সাহায্য করেছে। আমার ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে লাথি মারতে মারতে ট্রাকে তুলল তারা...। আমি রক্ষীবাহিনীর গাড়িতে ওঠার সময় দেখলাম রব ও জলিলকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হচ্ছে ঘেরাও দিয়ে যাতে রক্ষীবাহিনী তাদের মারতে না পারে. পরে আমাদের নিয়ে গেল শাহবাগের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে আমাদের পাঠিয়ে দিল রমনা থানায়।

রাত দুটোর দিকে, আমি তখন হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ঘুমোতে চেষ্টা করছিলাম, হঠাৎ শুনলাম একজন ভদ্রলোক সেলের চোর-ছ্যাচড়াদের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করছেন। মাথা তুলে দেখি কবি আল মাহমুদ। আমাকে চিনতেন তিনি। তাঁকে রাতে ঘেরাও করে বাসা থেকে ধরে এনেছে তিনি তখন *গণকণ্ঠের* সম্পাদক। পরদিন আমাদের দুজনকে পুলিশ ভ্যানে পাঠিয়ে দিল সেন্ট্রাল জেলে। জাসদের অফিস অতিক্রম করার সময় দেখলাম আগুন জ্বলছে সেখানে। পরদিন শুনলাম শেখ কামাল ও পাহাড়ির নেতৃত্বে জাসদ অফিস পোড়ানো হয়েছে ... সেদিন আরও বহু সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার মার খেয়েছিলেন।[৬]

১৭ মার্চের ঘটনার একটি বিবরণ পাওয়া যায় বিডিআর-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানের লেখায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসার আশেপাশে পুলিশ, এক কোম্পানি রক্ষীবাহিনী ও এক কোম্পানি বিডিআর অপেক্ষমাণ ছিল এদের সম্মিলিত নেতৃত্বে ছিলেন ঢাকার ডিআইজি আবদুর রকিব খন্দকার। তিনি জাসদ নেতাদের বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে আর অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক হবে। ঠিক তখনই জিপে করে রক্ষীবাহিনীর এক 'তরুণ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন লিডার' এসে হাজির হলো এবং চিৎকার করে বলল, 'রক্ষীবাহিনী, তোমরা এখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? গুলি চালাও।' বলেই তিনি নিজেই মেশিনগান হাতে নিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি চালানো শুরু করলেন। গুলিতে বেশ কয়েকজন হতাহত হওয়ার পর জাসদ কর্মীরা রমনা মাঠের দেয়াল টপকে ওপাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল খন্দকার ছিলেন মাঝামাঝি। তিনি মাটিতে শুয়ে প্রাণ বাঁচালেন। ঘটনার পরপর মে. জে. খলিল পুলিশের আইজিপি নূরুল ইসলামের অফিসে যান। সেখানে রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান এবং ডিআইজি খন্দকার ও এসপি মাহবুবকেও ডেকে আনা হলো কথাবার্তায় খুনখারাবির দায়িত্ব

রক্ষীবাহিনীর ঘাড়েই পড়ল। পরদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিসে কনফারেন্স। তোফায়েল আহমেদসহ দু-একজন মন্ত্রী উপস্থিত। জাসদের এই বাড়াবাড়ির উত্তর কী দেওয়া যায়, তাই নিয়ে আলোচনা জেনারেল খলিলের বর্ণনা মতে :

> শুনেই এসেছি, ওইদিন দুপুরে আওয়ামী লীগের কর্মীরা বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে জাসদের অফিসটি তছনছ করে অগ্নিসংযোগ করবে। এ প্রসঙ্গে আলোচনার সময় ঢাকার ডিআইজি খন্দকার অনেকটা ভয়ে ভয়ে বললেন যে, পত্রিকার ফটোগ্রাফারদের সামনে এ রকম অগ্নিসংযোগ না করাই ভালো। এ কথায় অনেক তরুণ নেতা প্রতিবাদ করে উঠলেন। জাসদ যদি অবৈধভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি আক্রমণ করতে পারে, তবে সেখানে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রশ্ন ওঠে কেন? প্রয়োজন হলে তাদের অফিস জ্বালাতেই হবে; পত্রিকা যা-ই বলুক না কেন। খন্দকার চুপ করে গেলেন।[৬৯]

১৭ মার্চের ঘটনার আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন দৈনিক *বাংলার বাণীর* রিপোর্টার মতিউর রহমান চৌধুরী। ওই দিনের ঘটনার ওপর তিনি একটি প্রতিবেদনও লিখেছিলেন এবং এ জন্য তাঁকে চড়া দাম দিতে হয়েছিল। এখানে তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো :

> আমার সেদিন রিপোর্ট করার কথা ছিল না। সিনিয়র রিপোর্টার হামিদুর রহমানের অ্যাসাইনমেন্ট ছিল। মিন্টো রোডের কাছে আসার আগেই পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। হামিদুর রহমান আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আমি যেহেতু কৌতূহলবশত জনসভায় এবং মনসুর আলী সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলাম, সে কারণে সিটি এডিটর রকীব সিদ্দিকী আমাকে পুরো ঘটনা লিখতে বললেন। অফিসে যাওয়ার পর বার্তা সম্পাদক শহীদুল হক বললেন, যা ঘটেছে তা লিখতে হবে। রাত নয়টার দিকে মণি ভাই (*বাংলার বাণীর* সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণি) এসে বললেন, যা দেখেছিস তা লিখে দে সাহস পেলাম। রাত ১০টার দিকে রিপোর্ট জমা দিলাম রকীব সিদ্দিকীর কাছে। তিনি এডিট করে পাঠিয়ে দিলেন বার্তা সম্পাদকের কাছে। বার্তা সম্পাদক আমাকে বললেন, সব ঠিক আছে তো? বিলকুল ঠিক, আমি বললাম। রিপোর্ট ছাপা হয়ে গেল, সঙ্গে দুটি ছবি। পরদিন ব্যাপক প্রতিক্রিয়া রিপোর্ট নিয়ে। বঙ্গবন্ধু মণি ভাইকে ডেকে পাঠালেন গণভবনে। সকালে প্রেসক্লাবে নাশতা খেয়ে *বাংলার বাণী* অফিসে গেলাম। সিটি এডিটর আমাকে দেখে বললেন, তুমি ববি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করো। আনোয়ারুল ইসলাম ববি তখন ম্যানেজিং এডিটর রুমে ঢুকতেই বললেন, তোমার একটা চিঠি আছে। চিঠি নিয়ে নিউজ রুমে এসে খুললাম। দুই লাইনের একটি চিঠি। ইয়োর সার্ভিস ইজ নো লঙ্গার রিকয়ারড। সহকর্মীরা শুনে

হতবাক। এর মধ্যে ববি ভাই নিউজ রুমে এসে বললেন, শোনো মতি, তোমার রিপোর্ট পড়ে বঙ্গবন্ধু ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বলেছেন, এটা নাকি *বাংলার বাণী* নয়, *গণকণ্ঠ* হয়ে গেছে।

চাকরিচ্যুতির খবরটা রটে গেল সর্বত্র। প্রেসক্লাবে ঢুকতেই মূসা ভাই বললেন, কী ব্যাপার, তোর কী অপরাধ? চাকরি গেলে যাওয়ার কথা সিটি এডিটর বা বার্তা সম্পাদকের। রিপোর্টারের চাকরি যাবে কেন? তিনি পরামর্শ দিলেন নির্মল সেনের সঙ্গে কথা বলতে। নির্মলদা তখন বিএফইউজের প্রেসিডেন্ট। পেয়ে গেলাম প্রেসক্লাবেই। শুনে বললেন, কী করার আছে। বললাম, একটা বিবৃতি দেন অন্তত। একটু ভেবেচিন্তে বললেন, সম্ভব নয়। বয়স কম, ছাত্ররাজনীতি করি। রক্ত গরম। মুখের ওপর বললাম, কেন দেবেন না? বললেন, ইয়ংম্যান, সবই তো জানো। এই সময় কোনো বিবৃতি দেওয়া যাবে না। তাহলে নেতৃত্ব ধরে রাখছেন কেন? ঠিকই বলেছ। আমরা বড় অসহায়। কিছুই বলা যাচ্ছে না, লেখা যাচ্ছে না।[৭০]

১৭ মার্চ (১৯৭৪) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়ে জাসদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। এটা ছিল দলকে আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার একটি অংশ। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাই ছিলেন দলের মূল শক্তি। সিরাজুল আলম খান নেপথ্যে থেকে দলকে পরিচালনা করতেন। তিনি কোনো কমিটিতে না থাকলেও তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। এ ব্যাপারে তিনি নির্ভর করতেন তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী কাজী আরেফ আহমদের ওপর।

১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের সম্মেলনে তাঁরা রীতিমতো একটা ক্যু করে ফেললেন। ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় প্রায় সবাইকে কমিটির বাইরে রাখা হয় এবং আনকোরা ও অনভিজ্ঞ বেশ কয়েকজনকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়। ফলে ছাত্রলীগে একটি চক্রের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যাঁরা ধীরে ধীরে দলকে প্রকাশ্য সংসদীয় রাজনীতির ধারা থেকে সরিয়ে 'বিপ্লবী ধারার' গোপন রাজনীতির পথে নিয়ে যান। দলের নীতি ও কৌশলে এই পরিবর্তন আনার জন্য ১৭ মার্চের মতো একটা 'নাটক' সাজানোর দরকার ছিল।[৭১]

১৭ মার্চের পর বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সংগঠক জাসদের সংশ্রব ত্যাগ করেন অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। দলের মূল নেতা ছিলেন মেজর জলিল, আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, মোহাম্মদ শাহজাহান, মির্জা সুলতান রাজা, রুহুল আমীন ভুঁইয়া প্রমুখ। তাঁরা গ্রেপ্তার হয়ে গেলে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে কাজী আরেফ আহমদ, মনিরুল ইসলাম, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া প্রমুখ দলটিকে 'বিপ্লবী পার্টিতে' রূপান্তরের চেষ্টা চালান। যেহেতু এঁদের গণসম্পৃক্ত রাজনীতির কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, ফলে জাসদ ক্রমে জনবিচ্ছিন্ন

একটি জঙ্গি সংগঠনে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনের তাত্ত্বিক ভিত্তি দেওয়ার জন্য একটি প্রচারপত্রে লেখা হলো, 'গণ-আন্দোলনে ছেদ ঘটিয়ে বিপ্লবী আন্দোলন করতে হবে'। তৈরি হয় জাসদের সামরিক সংগঠন 'বিপ্লবী গণবাহিনী'। যুক্তি হিসেবে বলা হলো, 'মুজিবের নেতৃত্বাধীন শাসক-শোষকগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান শ্বেত-সন্ত্রাস—বিশেষত ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চের পর সর্বহারা শ্রেণির নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং ২৭ ও ২৮ জুনের (১৯৭৪) বৈঠকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিপ্লবী গণবাহিনী গঠন করা হয়।'[৭২] লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের হলেন এই বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার এবং হাসানুল হক ইনু হলেন তাঁর সহকারী।[৭৩] সেনাবাহিনী থেকে অবসর দিয়ে তাহেরকে শেখ মুজিব প্রথমে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থার সি-ট্রাক ইউনিটে এবং পরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার বিভাগে 'পরিচালক' পদে চাকরি দিয়েছিলেন। সরকারি চাকরিতে বহাল থেকেই তিনি সরকার উৎখাতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

১৭ মার্চ নিয়ে ওই সময় জাসদের মূল্যায়ন যা-ই হোক না কেন, পরে দলটি তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। ১৯৮০ সালের মার্চে জাসদের দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে উপস্থাপিত 'রাজনৈতিক রিপোর্টে' আত্মসমালোচনা ছিল :

> ১৭ মার্চ আন্দোলন সম্পর্কে সেদিন যে মূল্যায়নই আমরা করি না কেন, বস্তুত এটি আন্দোলন বিকাশে সহায়ক হয়নি বরং আমাদের জন্যে বয়ে এনেছে একটি শিক্ষা পরবর্তী ঘটনাবলী ও জনগণের প্রতিক্রিয়াই তার প্রমাণ। ১৭ মার্চের পূর্বে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে আমাদের কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল না। স্বভাবতই শত্রু-মিত্র নির্ধারণ ও আন্দোলনের রূপরেখা সম্পর্কে আমাদের বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা ছিল অনুপস্থিত। শ্রমিক ও পেশাভিত্তিক জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে না তুলে, সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে এবং গণতান্ত্রিক ধারাকে পরিহার করে সংগ্রামের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত সংগঠন ও আন্দোলনকে সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।[৭৪]

জাসদের সাতজন বিদ্রোহী নেতা, যাঁরা পরে বাসদ নামে অন্য একটি দল তৈরি করেছিলেন, ১৯৮০ সালের ১৮ এপ্রিল সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়* দেওয়া এক যৌথ সাক্ষাৎকারে ১৯৭৪ সালের নেতৃত্বকে হঠকারী বলে সমালোচনা করেছিলেন। আব্দুল্লাহ সরকার, একরামুল হক, খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া, আসাফদ্দৌলা, মমতাজ বেগম, হাবিবুল্লাহ চৌধুরী ও আ ফ ম মাহবুবুল হক ওই সাক্ষাৎকারে আত্মসমালোচনা করে বলেন, 'গণসংগ্রামের পথে না গিয়ে অপরিণত অবস্থায় রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হ'য়ে তাঁরা ভুল করেছিলেন।[৭৫]

জাসদের অন্যতম নেতা এম এ আউয়াল ১৯৭৩ সাল থেকেই কারাবন্দি ছিলেন। ১৯৭৬ সালের ২০ অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'চুয়াত্তরের ১৭ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করার ব্যাপারে জাসদের কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। এটা হয়েছিল একজন উসকানিদাতার নেতৃত্বাধীন কোটারীর জন্য।' এই উসকানিদাতা কে জানতে চাওয়া হলে তিনি সিরাজুল আলম খানের নাম উল্লেখ করে বলেন, জলিল ও রবের ধরা পড়ার মূলেও ছিলেন সিরাজুল আলম খান এবং তিনিই সংগঠনের 'অকালমৃত্যুর' জন্য দায়ী।[৭৬]

সিরাজুল আলম খানকে জার্মান কবি গ্যাটের বিখ্যাত কাব্য-নাটকের ফাউস্ট চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ফাউস্ট হচ্ছে সংশয়-সন্দেহে দোলায়মান একজন ব্যক্তি, যার মনে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব। ফাউস্ট প্রচলিত জার্মান লোকগাথার ফস্টাস চরিত্রের অনুরূপ। লোকজ গল্প অনুযায়ী, সংশয়বাদী ফস্টাসের সঙ্গে শয়তানের চুক্তি হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শয়তান তার হাতে জাগতিক সব কাজ করার অপার ক্ষমতা দেয়, বিনিময়ে তার শরীর থেকে ছিনিয়ে নেয় আত্মা।[৭৭] ফাউস্টের মুখ দিয়ে গ্যাটে শুনিয়েছেন :

> জানতে উৎসুক নই পরের সংবাদ
> পহেলা জাগাও তুমি ধ্বংসের গাজন
> পুরাতন এ পৃথিবী খণ্ড খণ্ড লন্ডভন্ড হোক
> যাক রসাতলে
> দ্রুত হস্তে টেনে দাও কৃষ্ণ যবনিকা...
> কাজ নেই ভাবনায়, যা হবার হবে।[৭৮]

৮

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৃহত্তর নাগরিক সমাজের চিন্তা-ভাবনার সরাসরি তেমন সংযোগ ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই ছিলেন রাজনীতিমনস্ক এবং তাঁরা কেউ কেউ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন দিতেন বা যোগাযোগ রক্ষা করতেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে নাগরিক সমাজের একটা সম্মিলন দেখা গেল এ সময়। ১৯৭৪ সালের ৩১ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে তৈরি করা হলো 'মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি'। ঢাকায় এ ধরনের নাগরিক সংগঠন এটাই প্রথম। সভায় কবি সিকানদার আবু জাফরকে সভাপতি, মওদুদ

আহমদকে সাধারণ সম্পাদক, এনায়েতউল্লাহ খানকে কোষাধ্যক্ষ ও সৈয়দ জাফরকে সহসম্পাদক করে ৩৩ সদস্যের কমিটি তৈরি হলো। এই কমিটির অধীনে কয়েকটি উপকমিটি করা হয়। এগুলোর সভাপতির দায়িত্ব নেন মির্জা গোলাম হাফিজ (আইন পর্যালোচনা উপকমিটি), আহমদ শরীফ (প্রকাশনা উপকমিটি), বিনোদ দাশগুপ্ত (তথ্য অনুসন্ধান উপকমিটি) এবং আবদুল হক (আইন সাহায্য উপকমিটি)। কমিটির লক্ষ্য হিসেবে বলা হয় 'যেসব দায়িত্বশীল নাগরিক আইনের শাসনে বিশ্বাসী, তাদের মতামত সংগঠিত করা দরকার এবং এই কাজের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও শান্তিকামী ব্যাপক জনগণকে মৌলিক অধিকার হরণের প্রকৃত ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করে জনমত সংগঠিত করা প্রয়োজন, যাতে শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত আইনের শাসনের নিশ্চয়তাকে নগ্নভাবে উপেক্ষা করে যে ব্যক্তি-নিপীড়নের কাজ চলছে তা প্রতিরোধ করা যায়।' সভায় রক্ষীবাহিনীর 'নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের' তীব্র নিন্দা জানিয়ে রক্ষীবাহিনী আইন বাতিল, *গণকণ্ঠ* সম্পাদক আল মাহমুদের মুক্তি এবং যেসব সাংবাদিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে, তাদের বিরুদ্ধে জারিকৃত পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।[৭৯]

আওয়ামী লীগও স্বস্তিতে ছিল না। জীবনে প্রথমবারের মতো ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে অনেকেই ভারসাম্য রাখতে পারছিলেন না। আবার ক্ষমতার বৃত্তে না পৌঁছাতে পেরে হতাশা এবং ক্ষোভও ছিল অনেকের মধ্যে। মনে হলো, দলের মধ্যেই একটা বিরোধী দল গজিয়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও এ ধরনের কোন্দল দেখা গিয়েছিল। অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া যেত।

সরকার-সমর্থক ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মনিরুল হক চৌধুরী ও শফিউল আলম প্রধান। তাঁরা হঠাৎ দলের মধ্যে 'শুদ্ধি অভিযান' শুরু করলেন। আওয়ামী লীগে শেখ ফজলুল হক মণি এবং আবদুর রাজ্জাকের মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না। ছাত্রলীগ-নেতৃত্ব রাজ্জাকের প্রতি অনুগত ছিল। বিষয়টি নানাভাবে ছাত্রলীগের মধ্যে মেরুকরণ তৈরি করে এর পরিণতি হয় ভয়াবহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের মধ্যকার উপদলীয় কোন্দলের জের ধরে ৩ এপ্রিল (১৯৭৪) রাতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। ১২ এপ্রিল দৈনিক *ইত্তেফাকে* ছাপা হওয়া ওই ঘটনার একটি বিবরণের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো :

> সেই ভয়াল রাতে ১০-১৫ জন সশস্ত্র ব্যক্তি (সূর্যসেন) হলে প্রবেশ করিয়াছে। ফাঁকা গুলি ছুড়িয়া সগর্বে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করিয়া তাহারা পাঁচতলায় উঠিয়া যায় এবং প্রথমে ৬৩৪ নাম্বার রুমের দরজায় করাঘাত করিয়া কোহিনুর কোহিনুর বলিয়া ডাক দেয়... কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর

কোহিনুর দরজা খুলিলে তাহারা ঘরের চারজনকেই 'হ্যান্ডস আপ' অবস্থায় রুমের বাহিরে লইয়া আসে। ওই সময়ে সশস্ত্র ব্যক্তিদের এক অংশ ৬৪৮ নম্বর কক্ষ হইতে তিনজনকে 'হ্যান্ডস আপ' অবস্থায় বাহির করে এবং সাতজনকে একত্রে স্কট করিয়া লইয়া যায়।... সাতটি হতভাগ্য তরুণকে যখন সূর্যসেন হল হইতে হাজী মুহসীন হলে নিয়ে যাওয়া হয় তখন রাত্রি দুইটা চার মিনিট। মুহসীন হলের টিভি রুমের সম্মুখস্থ করিডরটিকে বধ্যভূমি হিসেবে নির্বাচিত করিয়া সাতজনকে সেখানে দাঁড় করানো হয়।

রাত দুইটা এগারো মিনিটের সময় হতভাগ্য তরুণদের লক্ষ্য করিয়া ব্রাশফায়ার করা হয়। তাহাদের প্রাণহীন দেহ লুটাইয়া পড়ার পরও কয়েকবার ফাঁকা ব্রাশফায়ার করা হয়। অতঃপর ২-২৫ মিনিটে তাহারা ধীরে-সুস্থে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এই ঘটনায় যাঁরা নিহত হন, তাঁদের নাম : ১. নাজমুল হক ওরফে কোহিনুর, ২. মোহাম্মদ ইদরীস, ৩. রেজওয়ান রব, ৪. সৈয়দ মাসুদ মাহবুব, ৫. বশির উদ্দিন আহমদ, ৬. আবুল হোসেন, ৭. এবাদ খান।[৮০]

নিহতের সংখ্যা সাত না হয়ে দশও হতে পারত। ঘাতকেরা সূর্যসেন হলের ২১৫ নং কামরায় মোহাম্মদ আবদুর রবকে ধরতে গেলে রব ঘরের গ্রিলবিহীন জানালা দিয়ে লাফিয়ে নিচে নামেন এবং দ্রুত পালিয়ে যান। রব ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের এমএ শেষ পর্বের ছাত্র।[৮১]

ঘাতকেরা নয়জনকে ধরে এনেছিল। সূর্যসেন হল থেকে মুহসীন হলে আনার পথে হাসান নামের একজন পালিয়ে যায়। বাকি আটজনকে মুহসীন হলে নিয়ে আসার পর আরেকজন পালাতে সক্ষম হয়। তার নামও ছিল হাসান।[৮২]

খুনিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করে শফিউল আলম প্রধানের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সরকারি ছাত্রলীগ মিছিল করে। কয়েক দিন পর 'সাত খুনের' অভিযোগে শফিউল আলম প্রধানসহ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মামলা হয়। খুনিদের মধ্যে দু-একজন রাজসাক্ষীও হয়েছিলেন। শফিউল আলম প্রধান ছিলেন প্রধান আসামি। বিচারে তাঁর এবং আরও কয়েকজনের ১৪ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। বছর দুয়েক পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের নেতা আবদুর রাজ্জাক ওই হত্যাকাণ্ডে সাজা পাওয়া ব্যক্তিদের অন্যতম আব্বাসউদ্দিন আফসারিকে দেখতে পেয়ে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, 'হলের ভেতরে মারতে গেলি কেন? ওদের ডেমরা-টেমরা নিয়ে ফেলে দিয়ে আসলেই তো হতো'?[৮৩]

প্রধান এবং তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার হওয়ার পেছনের কাহিনিটি চমকপ্রদ। সরকার-সমর্থক ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা এ ধরনের একটি

হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত ছিলেন, এমন সম্ভাবনা কারও মনেই উঁকি দেওয়ার কথা নয়। রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনিগুলো পড়ে জানা যায়, আততায়ী ঘটনাস্থলেই কোনো না কোনো ক্লু রেখে যায়, যার সূত্র ধরে অপরাধীকে শনাক্ত করা সম্ভব। এক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছিল।

প্রধান ও তার সহযোগীরা সূর্যসেন হল থেকে যে আটজনকে ধরে এনেছিল, তাদের মধ্যে হাসান নামের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একজন তরুণ ছিল। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল না। সে এসেছিল বেড়াতে। হত্যাকারীরা যখন তাদের লাইন ধরে দাঁড় করায়, তখন তাদেরই একজন একপাশে দাঁড়ানো হাসানকে এক ঝাপটায় সরিয়ে দেয়। হাসান হকচকিত হয়ে দূরে সরে যায়। উত্তেজনার বশে এটা অন্যরা খেয়াল করেনি। তারপর বাকি সাতজনের ওপর স্টেনগানের ব্রাশফায়ার করা হয়। এক সাক্ষাৎকারে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ছাত্রলীগের সংগঠক এবং ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ওই সময় জাতীয় সংসদের সদস্য আবদুল কুদ্দুস মাখনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মাসুদ খান :

> মাখন ভাই আর আমি তখন ধানমন্ডির ৪ নম্বর সড়কের একটি বাসায় থাকি। ভোর বেলায় একটা ছেলে এসে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলতে লাগল, 'গুলি কইরা সবাইরে মাইরা লাইছে, হেরা সবাইরে মাইরা লাইব। আফনেরা কেউ বাঁচবেন না।' তারপর সে বর্ণনা দিল কীভাবে মুহসীন হলে ওই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। ওর নাম হাসান।
>
> আমরা হাসানকে নিয়ে ভোরেই শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের বাসায় গেলাম। তাঁকে বললাম। তারপর বেইলী রোডে ঢাকার এসপি মাহবুবের বাসায় গেলাম। হাসান মাহবুব ভাইকে একইভাবে ঘটনার বর্ণনা দিল। সেখান থেকে হাসানকে নিয়ে মাহবুব ভাইসহ আমরা গেলাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাড়িতে। সব শুনে তিনি বললেন, এ তো ভয়ঙ্কর কথা! এদের অবশ্যই গ্রেপ্তার করতে হবে। তিনি ওখানে বসেই এসপি মাহবুবকে লিখিত নির্দেশ দিলেন। মস্কো সফর শেষে বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে আমরা হাসানকে নিয়ে গেলাম ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। হাসান নিজ মুখে ঘটনাটি আবারও বলল। বঙ্গবন্ধু শুনে তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'এভাবে তো দেশ চলতে পারে না। দেশ তো ধ্বংস হয়ে যাবে।' তিনি এসপি মাহবুবকে নির্দেশ দিলেন, যেভাবেই হোক খুনীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।
>
> এরপর শুরু হলো অপরাধীদের খোঁজা। প্রথমেই ধরা হলো তাজুলকে, নীলক্ষেতের সামনের রাস্তা থেকে। একজনকে ধরা হলো নোয়াখালি থেকে, একজনকে ঝিনাইদহ থেকে। আরও কয়েকজন ধরা পড়ল।[৮৪]

শেখ মণি এবং আবদুর রাজ্জাকের মধ্যে বিরোধের একটা পূর্ব ইতিহাস আছে। ষাটের দশকে সিরাজুল আলম খানকে কেন্দ্র করে দলের তরুণদের মধ্যে একটা চক্র গড়ে উঠেছিল। রাজ্জাক এই চক্রের সদস্য ছিলেন। তখন থেকেই শেখ মণির সঙ্গে তাঁদের বনিবনা ছিল না। সিরাজুল আলম ও রাজ্জাক 'স্বাধীনতাপন্থী' হিসেবে পরিচিতি পান। অন্যদিকে শেখ মণিকে বলা হতো 'ছয়দফাপন্থী'। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁরা একসঙ্গে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ) গড়ে তুলেছিলেন। পরে এর নাম হয় মুজিব বাহিনী। দ্বন্দ্বটা যুদ্ধের সময় চাপা ছিল। বাহাত্তরে এটা আবার সামনে চলে আসে। সিরাজুল আলম খান বিদ্রোহ করে আওয়ামী বলয় থেকে বেরিয়ে এসে জাসদ তৈরি করেন। রাজ্জাক তাঁর অত্যন্ত আস্থাভাজন হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ছেড়ে যাননি। কিন্তু আওয়ামী লীগের ভেতর শেখ মণির সঙ্গে তাঁর ক্ষমতার একটা সূক্ষ্ম লড়াই অব্যাহত থাকে। রাজ্জাকের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে ছিল ছাত্রলীগ। শেখ মণি যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতার আলাদা একটা কেন্দ্র তৈরির চেষ্টা করেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক থাকার কারণে তাঁর বাড়তি সুবিধা ছিল। কিন্তু সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে রাজ্জাক ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগে তাঁর প্রভাব বজায় রেখেছিলেন।

৯

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনা ও ক্ষোভ ছিল। রক্ষীবাহিনীর কার্যকলাপ আদালতেও সমালোচিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে বলা হয়েছিল, 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী কোনো নিয়মনীতি বা আচরণবিধি ছাড়াই কাজ করছে... জাতীয় রক্ষীবাহিনীর প্রয়োজনীয় আইনী ভিত্তি আছে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'[৮৫]

এ সময় পিকিংপন্থী একটি কমিউনিস্ট উপদলের সদস্য ও প্রখ্যাত বাম নেতা শান্তি সেনের স্ত্রী অরুণা সেনের একটি বিবৃতি হইচই ফেলে দেয়। শান্তি সেন তখন আত্মগোপনে ছিলেন। বিবৃতিতে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন এবং এক্ষেত্রে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের দ্বারা রক্ষীবাহিনীকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার নির্মম বর্ণনা তুলে ধরা হয়। বিবৃতিটি পরে বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত মাসিক *সংস্কৃতি* ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল।

অরুণা সেনের ভাষ্য অনুযায়ী, ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিন রক্ষীবাহিনীর একটি দল শরিয়তপুরের একটি এলাকায় বাড়ি ঘেরাও করে

অরুণা সেনকে গ্রেপ্তার করে নড়িয়া রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং তাঁর স্বামী শান্তি সেন ও ছেলে চঞ্চল সেন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। রক্ষীবাহিনীর অভিযোগ, তারা রাষ্ট্রদ্রোহী এবং তাদের ধরিয়ে দিতে হবে। চার-পাঁচদিন পর তারা রাতের বেলায় আবার গ্রামে এসে তল্লাশি করে কয়েকজন যুবককে মারধর করে এবং কৃষ্ণ ও ফজলু নামে দুজন যুবককে ধরে নিয়ে যায়। তারা আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ রক্ষীবাহিনী তাদের গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে এবং গ্রামের অনেক তরুণকে ধরে এনে জড়ো করে। বাড়ি বাড়ি ঢুকে মহিলাদের পেটায় এবং অশ্লীল আচরণ করে। পুরো বিষয়টা তদারকি করেন থানা আওয়ামী লীগের সম্পাদক হোসেন খাঁ। রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার স্থানীয় মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন, 'মালাউনরা আমাদের দুশমন। তাদের ক্ষমা করা হবে না। তোমরা মুসলমানরা মালাউনদের সঙ্গে থেকো না। তোমাদের এবারকার মতো মাফ করে দেওয়া হলো।' তারপর, তারা ২০ জন যুবককে ধরে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তিনজন ছাড়া এরা সবাই জেলে। সন্ধ্যার সময় তাদের চারজন গ্রামে ফিরে আসে। তাদের সারা দেহে নির্যাতনের চিহ্ন। ৬ ফেব্রুয়ারি ভোরে রক্ষীবাহিনী অরুণা সেন ও তাঁর মেয়ে রীনাসহ কয়েকজনকে ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।[৮৬] বিবৃতিতে অরুণা সেন বলেন :

> ৮ ফেব্রুয়ারি রাতে প্রথমে আমাকে এবং পরে রীনাকে দোতলায় নেওয়া হয়। সেখানে দেখলাম ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি ফজলু মিয়া ও ভেদরগঞ্জ থানার সেক্রেটারি হোসেন খাঁ চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে বলল, তোমার স্বামী ও ছেলেকে ধরিয়ে দাও। অস্ত্র কোথায় আছে বলে দাও। তারা ডাকাত, অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি করে। আমি বলি, তারা ডাকাত না, তারা সৎ দেশপ্রেমিক। আমার স্বামী রাজনীতি করেন একথা কে না জানে।... ডামুড্যা ক্যাম্পের কমান্ডার করম আলী এবং ভেদরগঞ্জ ক্যাম্প কমান্ডার ফজলুর রহমান এরা সবাই আমাদের অশ্লীল গালাগালি দিতে থাকে এবং আমাকে ও রীনাকে একসঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে রীনার বস্ত্র খুলে নেয়। তারপর কমান্ডার দুজন দুদিক থেকে চাবুক মারতে থাকে। আমরা অজ্ঞান হয়ে পড়ি।... ১১ তারিখ রাতেও আবার রীনার ওপর চলল এই অত্যাচার। একজন সিপাই রীনা ও হনুফাকে বলে, তোরা তো মরেই যাবি, তার আগে আমরা প্রতি রাতে পাঁচজন করে তোদের ভোগ করব। তারা অবশ্য 'ভোগ' শব্দটি বলে নাই। বলেছিল অতি অশ্লীল কথা।... ১২ তারিখেও ওরা রাত্রিতে আবার রীনাকে ঝুলিয়ে দিয়ে হান্টার দিয়ে পেটায়।...[৮৭]

১৯ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে তাদের মাদারীপুর রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে এনে জেরা করা হয়। শেষ রাতে তাদের ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাদের

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারাগারে তাদের সঙ্গে দেখা হয় জাসদ নেত্রী মমতাজ বেগমসহ আরও কয়েকজনের। সবাইকে তৃতীয় শ্রেণির কয়েদি করে রাখা হয় এবং সাধারণ কয়েদিদের মতো কাজ করানো হয়।[৮৮]

রক্ষীবাহিনী নিয়ে অপপ্রচারও ছিল। এর সদস্য সংখ্যা নিয়ে ছিল নানা রকমের গুজব। অনেক অ্যাকাডেমিক গবেষণা গ্রন্থে রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ২০ হাজার[৮৯] থেকে ২৫ হাজার[৯০] পর্যন্ত উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যাটি ছিল ১২ হাজার।[৯১] তাঁদের পোশাক ছিল সবুজ রঙের। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাকও ছিল একই রঙের। অনেকেই গুজব রটিয়ে বেড়াতেন যে, রক্ষীবাহিনীর মধ্যে ভারতীয় সৈন্য ঢোকানো হয়েছে, সেজন্য একই রঙের পোশাক দেওয়া হয়েছে; এটা আসলে ভারতেরই একটি 'দখলদার বাহিনী'। এ প্রসঙ্গে একটি মজার উদাহরণ দিয়েছেন রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক আনোয়ার উল আলম। ৩ সেপ্টেম্বর মওলানা ভাসানী একটি ভুখা মিছিল নিয়ে রমনা পার্কের কাছে গণভবনের সামনে যান। সেখানে নিয়োজিত রক্ষীবাহিনীর একটি দল তাঁকে সামরিক কায়দায় সালাম জানায়। মওলানা ভাসানী খুশি হন এবং রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের খোঁজ খবর নেন। যেমন, তোমার বাড়ি কোন জেলায়, কোন গ্রামে ইত্যাদি। ওরাও জবাব দেয়। তখন মওলানা ভাসানী তাঁর পাশে দাঁড়ানো কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননকে বলেন, 'তোমরা না কও রক্ষীবাহিনীর সবাই ভারতীয়। আমি তো দ্যাখতাছি এরা আমাগো পোলা।' কাজী জাফর, মেনন কোনো কথা না বলে চুপ থাকেন।[৯২]

মওলানা ভাসানী

১০

এ দেশে মানুষের একটা সহজাত প্রবণতা হলো তিলকে তাল বানানো। এখানে গুজব তৈরি হয় প্রতি মুহূর্তে এবং তা ছোটে আলোর গতির চেয়েও দ্রুতবেগে। বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের মনে যে আন্দাজ বা পারসেপশন তৈরি হয়, তা অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যায় না। 'পারসেপশন' এমনই একটা ভয়াবহ ব্যাপার। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ সরকার নিয়েও নানা রকম আন্দাজ তৈরি হচ্ছিল এবং এসব ধারণার চারাগাছে জল দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না। ফলে অনেক ধারণা আকারে এবং প্রকারে দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে সত্য ছিল কিছু, কিন্তু গুজবও কম ছিল না। এ দেশের অনেক মানুষের কাছে গুজব তৈরি, রটনা এবং তা নিয়ে আলোচনা করা একটা বড় রকমের বিনোদন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের সঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল ইসলামের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি গণভবন তৈরির খরচ নিয়ে একটি তথ্য দিয়েছেন। পূর্ত মন্ত্রণালয় শেরেবাংলা নগরে গণভবন তৈরির জন্য একটা বাজেট দিয়েছিল। আর্থিক অনটনের কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা কমিশন মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাটছাঁট করার পরামর্শ দেয় মন্ত্রণালয়ে চাটুকারের অভাব ছিল না। কমিশনের 'প্রফেসর সাহেবদের' ধৃষ্টতার অভিযোগ করে তাঁরা শেখ মুজিবের কানভারী করার চেষ্টা করেন . ওই সময় সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের চেষ্টা চলছিল শেখ মুজিব ওই নীতি থেকে সরে আসতে চাননি। বাজেট কমানো হয়েছিল এবং গণভবনের বিদ্যমান কাঠামোটিই সংস্কার করে কাজটি সারা হয়। অথচ প্রচার হয়েছিল শেখ মুজিব বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।[৮৩]

নুরুল ইসলাম আরেকটি প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন, যাতে শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত জীবনের একটা দিক উঠে এসেছে। তাঁর ছেলে শেখ কামাল ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ড. ইসলাম শেখ মুজিবকে বললেন, কামালের কর্মকাণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর সম্মানহানির কারণ ঘটছে। ড. ইসলাম শেখ মুজিবকে অনুরোধ করলেন, তিনি কামালের জন্য বিদেশের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিতে চান। শেখ মুজিব জানালেন, এই খরচ চালানোর সামর্থ্য তাঁর নেই। ড. ইসলাম আশ্বস্ত করে বললেন, তিনি বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। শেখ মুজিব আপত্তি জানিয়ে বললেন, কামাল এমন আহামরি ছাত্র নয় এবং এ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠবে। ড. ইসলাম তখন ভাবলেন তিনি বিদেশি কোনো সরকার বা দাতা সংস্থার কাছে না গিয়ে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, যার সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের

কোনো আর্থিক লেনদেন নেই এবং কামালের পরিচয়টিও তারা গোপন রাখবে। তিনি টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ শিক্ষাবর্ষে কামালের ভর্তির ব্যবস্থা করলেন এবং এক বছরের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থাও হলো। বৃত্তি আরও এক বছরের জন্য নবায়ন হবে এমন প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল। কিন্তু শেখ মুজিব কামালকে রাজি করাতে পারলেন না। কামালের সঙ্গে দেখা হলে ড. ইসলাম তাঁকে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে পেশা হিসেবে সে যা-ই বেছে নিক না কেন, তার জন্য উচ্চশিক্ষার দরকার হবে। রাজনীতি করলেও একটা নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তার বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নে সাহায্য করবে। কামাল বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিল, সে এখন এর জন্য প্রস্তুত না এবং ভবিষ্যতে এ রকম সুযোগ পেলে সে তা গ্রহণ করবে। কামালকে রাজি করাতে না পেরে শেখ মুজিব দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু তার ওপর জোর খাটাননি।[১৪]

১৭ জুলাই ১৯৭৪ শেখ ফজলুল হক মণি একটা কাণ্ড করে বসলেন। তিনি নানাভাবে আওয়ামী লীগকে চাপে রাখতেন। ওই দিন একটা লম্বা বিবৃতি দিয়ে তিনি আওয়ামী লীগ, আওয়ামী যুব লীগ ও জাতীয় শ্রমিক লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। কারণ আওয়ামী লীগের একটি অংশের সঙ্গে দেশ চালানোর নীতির ব্যাপারে তাঁর মতের মিল হচ্ছিল না। রাত ১২টার দিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানের নির্দেশে বিবৃতিটি 'কিল' করা হয়। এমনকি শেখ মণি সম্পাদিত *বাংলার বাণী* এবং *বাংলাদেশ টাইমস*ও বিবৃতিটি ছাপেনি। মানে সমঝোতা হয়েছে।[১৫]

সরকারের অনেক কাজে অনিয়ম-দুর্নীতি হতো এসব কাজে শেখ মুজিবের নামও ব্যবহার করা হতো, যাতে কেউ কোনো প্রশ্ন না তোলে। তিনি হয়তো জানতেনও না, তাঁর নাম ব্যবহার করে, নিয়ম ভেঙে কীভাবে অন্যরা ফায়দা লুটছে। এরকম একটা ঘটনা জানা যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য (পরে মন্ত্রী) অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিকের বিবরণ থেকে।

অধ্যাপক এ আর মল্লিককে শেখ মুজিব ভারতে বাংলাদেশের প্রথম হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। দিল্লিতে দায়িত্ব পালনকালে তিনি রোজার সময় একবার ছোলা আর খেজুর আমদানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, ভারতে তখন ছোলার যে দাম তার চেয়ে কম দামে বাংলাদেশে ছোলা পাওয়া যায়। খেজুর ইরাক থেকে ভারত হয়ে আমদানির পরিকল্পনা হয়েছিল। মল্লিক জানিয়ে দিলেন, তিনি ভারত থেকে ছোলা কেনার অনুমতি দেবেন না। তাঁর মত হলো, 'ছোলা খেয়ে বাংলাদেশের লোককে রোজা ভাঙতে হবে না। খেসারির ডাল খেয়ে এরা পারবে রোজা রাখতে। ছোলা হলো বড়লোকের খাদ্য।

খেজুরও খায় বড়লোক।'[৯৬]

বাণিজ্যমন্ত্রী এম আর সিদ্দিকী মল্লিককে ফোন করে জানালেন, 'এটা ক্যাবিনেট ডিসিশন।' প্রধানমন্ত্রী তখন লন্ডনে। সিদ্দিকী লন্ডনে টেলিগ্রাম পাঠালেন। প্রধানমন্ত্রী জবাব পাঠালেন, 'মল্লিক সাহেব যেটা বলছেন সেটাই শোনো।' মল্লিকের মন্তব্য ছিল, 'বঙ্গবন্ধু যুক্তি মানতেন, ন্যায্য যুক্তি মেনে নিয়েই তিনি কাজ করতেন। আমার মনে হয় আমরা যদি সবাই ইমপার্শিয়েলি চিন্তা করে কাজ করতাম তাহলে বোধহয় অনেক ভালো থাকতে পারতাম।'[৯৭]

কাপড় আমদানি নিয়েও ঝামেলা হয়েছিল। ভারত সরকার চেয়েছিল কাপড় (শাড়ি) পছন্দ করা ও কেনা হবে তাদের বস্ত্রবিষয়ক একটি কমিটির মাধ্যমে। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত এমন ব্যবস্থা হলো যে কাপড় তারা সরাসরি নেবে। সরাসরি নেওয়ার কারণও ছিল। কিছু লোকের স্বার্থ সেখানে জড়িত ছিল, যারা নাকি বাংলাদেশে শাড়ি বিক্রি করবে। তার ফল হলো—একদম জালের মতো কাপড় নিয়ে গেল, এমন কাপড় যে শরীর দেখা যায়। বদনাম হলো ভারতের। এটা ছিল ভারতের অনুদান। দান করেও ভারত বদনাম কিনল। বাংলাদেশের একদল ব্যবসায়ী, যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তাদের সঙ্গে মিলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এ কাজ করেছিল। মল্লিকের বর্ণনা অনুযায়ী, 'জড়িতদের মধ্যে শেখ মুজিবের আশেপাশের লোকজনই ছিল। পরে এই ঘটনার তদন্ত হয়েছিল। তদন্তে দেখা গেছে যে, তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরাই এর মধ্যে জড়িত। তারা সরাসরি কেনার যুক্তি হিসেবে বলেছিল যে, সময় নেই। লোকজন কাপড়ের অভাবে রয়েছে। শেখ মুজিব যে সবসময় সব কথা শুনতেন তা নয়। তবে অনেক সময় তিনি অনুরোধের চাপে পড়ে কাজ করেছেন।...বঙ্গবন্ধুর আত্মা খুব বড় ছিল, মনটাও ছিল খুব বড়। তিনি ঘটনা বা কাজের ফলাফল কী হবে তা বিচার করে দেখার সময় পাননি। আর কাজের চাপও ছিল প্রচুর।'[৯৮]

১১

শেখ মুজিবের সঙ্গে নানা বিষয়ে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের মতবিরোধ ছিল। তাজউদ্দীন ক্রমেই আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে খাদের কিনারায় চলে যাচ্ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ৩০ অক্টোবর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ২০ ঘণ্টার এক সফরে ঢাকায় আসেন।

কিসিঞ্জারকে ঢাকায় মহাসমারোহে স্বাগত জানানো হয়েছিল। তিনি গণভবনে

একটা সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব স্বয়ং ওই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।[১১] মন্ত্রিসভা থেকে তাজউদ্দীনের বিদায় এবং কিসিঞ্জারের ঢাকা সফরের মধ্যে যোগসূত্র আছে বলে গুঞ্জন ছিল। তাজউদ্দীন এরপর রাজনীতিতে আর কখনোই সক্রিয় হয়ে ওঠেননি।

গণভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন হেনরি কিসিঞ্জার

ওই সময় শেখ মুজিবের সঙ্গে তাজউদ্দীনের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। আওয়ামী লীগের যুবনেতাদের মধ্যেও কোন্দল ছিল। শেখ মণি একদিকে আর রাজ্জাক-তোফায়েল অন্যদিকে। তাজউদ্দীনের প্রতি শেখ মণির বিতৃষ্ণা ছিল। অন্যদিকে রাজ্জাক ও তোফায়েল ছিলেন তাজউদ্দীনের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল। এ প্রসঙ্গে সংসদসদস্য আমীর হোসেন আমুর পর্যবেক্ষণটি প্রাসঙ্গিক। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> তখন থিকাই রাজ্জাক আর তোফায়েল বঙ্গবন্ধুর কনফিডেন্সে নাই। বঙ্গবন্ধুর অ্যাবসেন্সে তাজউদ্দীন কয়েকটা কৃষি ব্যাংক ওপেন করছে। প্রত্যেকটা ব্যাংক ওপেনিংয়ে তারা দুই পাশে ছিল। যে রাজ্জাক-তোফায়েল তাজউদ্দীনের নামও শুনতে পারত না, গালিগালাজ করত, তারা তাজউদ্দীন সাবের সঙ্গে কৃষি ব্যাংক ওপেনিংয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, রাজ্জাক স্বেচ্ছাসেবক লীগের একটা কনফারেন্স করে। সেখানে তাজউদ্দীন হইল চিফ গেস্ট। বহু ইতিহাস!

ওই যে, কন্সপিরেসি করে। তাজউদ্দীন সাব ক্যাবিনেটে থাইকা বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা শুরু করল না? তাজউদ্দীন সাব অ্যাকচুয়েলি ইন্ডিয়ার ব্লু আইড বয়। তার সবসময় একটা ইয়া ছিল, সে যদি বঙ্গবন্ধুর একটু ইয়া করতে পারে, তাহলে সে প্রধানমন্ত্রী হইতে পারে।[১০০]

বাহাত্তরের শুরুতেই তাজউদ্দীনের সঙ্গে শেখ মুজিবের সম্পর্কে ছন্দপতন ঘটেছিল। তাঁদের দুজনের মধ্যকার সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে অনেক মুখরোচক কথা চালু আছে। ভেতরের খবরটা জানা প্রায় অসম্ভব। কেননা জীবিত অবস্থায় কেউই এ ব্যাপারে তেমন মুখ খোলেননি। এ বিষয়ে সাংবাদিক আমানউল্লাহ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

বঙ্গবন্ধুর পার্সোনাল ফটোগ্রাফার ছিল ফটোজার্নালিস্ট মোহাম্মদ আলম। ওর কাছেই শোনা। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা তো আশপাশেই থাকতে। সব কনভার্সেশন শুনেছ। আমরা তো আর অত কাছে ছিলাম না। তোমরা তো ডাইনিং রুমেও গেছ, কিচেনের কাছাকাছিও গেছ। তো তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে শেখ সাহেবের ব্যাপারটা কী?

—আমান ভাই, বইলেন না। একদিন শেখ সাহেব সকালবেলা নাশতা করার পর চা খাচ্ছেন। তাজউদ্দীন সাহেব আসলেন, বসলেন। তাজউদ্দীন সাহেব গাজী গোলাম মোস্তফার কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটু অভিযোগ করলেন। শেখ সাহেব একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। বললেন, 'রাখো'। তখন তাজউদ্দীন খুব ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। একটা পর্যায়ে টেবিলের ওপর হাত দিয়ে জোরে একটা থাপ্পড় দিয়ে বললেন, 'যদি গাজী গোলাম মোস্তফাকে চান আপনি, তাহলে আমাদের দিয়ে দরকার কী? আমরা কী করব? আমাদের তো কোনো কাজ নাই?' টেবিলে এমন থাপ্পড় দিলেন যে, চায়ের কাপটা কাত হয়ে পড়ে গেল এবং শেখ সাহেবের পাঞ্জাবির ওপর চা পড়ল। শেখ সাহেব কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে চুপ করে রইলেন। দুজনই গম্ভীর। কেউ কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পর তাজউদ্দীন চলে গেলেন। এটা চুয়াত্তর সালের শেষ দিকের ঘটনা।[১০১]

তাজউদ্দীনের পদত্যাগ সম্পর্কে মস্কো রেডিওর মন্তব্য ছিল : 'মুসলিম বাংলা'পন্থী ডানপন্থীরা শক্তিশালী হলো। *পূর্বদেশ*, *অবজারভার*, *দৈনিক বাংলা*—এই তিনটি সরকারি পত্রিকায় তাজউদ্দীনের 'ব্যর্থতা' নিয়ে ২৮ অক্টোবর সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। *বাংলার বাণী* যে সম্পাদকীয় লিখেছে, তাতে সব দায় শেখ মুজিবের ওপর পড়ে। সেখানে লেখা হয়েছিল, সূর্য ছাড়া গ্রহগুলোর নিজস্ব কোনো আলো বা শক্তি নেই। *ইত্তেফাকে* এ বিষয়ে কোনো সম্পাদকীয় বা উপসম্পাদকীয় ছাপা হয়নি। *গণকণ্ঠেও* কোনো সম্পাদকীয় লেখা হয়নি। *গণকণ্ঠ*

বিরাট উপসম্পাদকীয় লিখে তাজউদ্দীনকে সবকিছু খুলে বলার আহ্বান জানিয়েছে এবং ব্যর্থতার জন্য আর কারা দায়ী তাদের নাম প্রকাশ করতে বলেছে।[১০২]

১০ নভেম্বর ১৯৭৪ ভারতের *স্টেটসম্যান* পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাজউদ্দীনের পদত্যাগের বিষয়টি উল্লেখ করে বলা হয়, মুজিব তার সরকারের দুর্নীতি এবং ব্যর্থতার দায়িত্ব ভারতের ওপর চাপাবার জন্য ভারতবিরোধী প্রচার চালাচ্ছেন।[১০৩]

দেশে ধর্মীয় উন্মাদনা ও জিগির দিনদিন বাড়ছিল। আওয়ামী লীগের অনেক নেতার ইন্ধন ছিল তাতে। ১০ নভেম্বর *ইত্তেফাক* প্রথম পাতায় দুই কলামব্যাপী একটি বিজ্ঞাপন ছাপে। এতে বলা হয় :

> আল্লাহ আকবর! আল্লাহর বান্দা এবং রসুলে করিম (দঃ)-এর বিরুদ্ধে নাস্তিক এনামুল হকের জঘন্য ও অশ্লীল উক্তির প্রতিবাদে ১০ নভেম্বর রবিবার নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া টাউন হল ময়দানে বেলা ২ ঘটিকার সময় বিরাট প্রতিবাদ সভা, প্রধান বক্তাগণ প্রবীণ রাজনীতিবিদ মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মাওলানা আলাউদ্দিন আল আজহারী ও আরো অনেকে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন জনাব আলী আহমেদ, চেয়ারম্যান, নারায়ণগঞ্জ (পৌরসভা)। উক্ত সভায় দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলিম মিছিল সহকারে যোগদান করে দৃপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ তুলুন : নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবর। দীন ইসলাম জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। জাগো জাগো মুসলিম জাগো, দুনিয়ার মুসলিম এক হও। ইসলামের শত্রু নাস্তিকের দল ধ্বংস হউক।[১০৪]

পাকিস্তান সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের সাবেক পরিচালক আকবর কবির শেখ মুজিবকে চিনতেন ১৯৫৪ সাল থেকে। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় সমাজকল্যাণমন্ত্রী থাকাকালে শেখ মুজিবের সঙ্গে ওই বিভাগের কর্মকর্তা আকবর কবিরের দেখা-সাক্ষাৎ হতো। শেখ মুজিব বয়সে ছোট হলেও আকবর কবির তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শেখ মুজিব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, মুজিব উদার মনের হলেও তাঁর সব কাজ রাষ্ট্রের অনুকূলে যায়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি দুটো উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথমত তাজউদ্দীনকে সরকার থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত রক্ষীবাহিনী তৈরি করা। আকবর কবির বলেছেন :

> আমার মনে হয় তিনি লোক চিনতে ভুল করেছেন।... তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের মতো অতি দক্ষ ব্যক্তিকে সরকার থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দিয়ে কী লাভ হয়েছিল জানি না। তিনি মোনাফেক মোশতাককে ঘনিষ্ঠ মনে করতেন। সমস্ত মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তি-আন্দোলনকে যুগপৎ ধরে রেখেছিলেন তাজউদ্দীন সাহেব। তাঁর মতো যোগ্য প্রশাসক আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া

আমাদের দেশে দুষ্কর। দ্বিতীয়ত কার পরামর্শে তিনি রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি করলেন জানি না। এটা আওয়ামী লীগকে গ্রামাঞ্চলে যত অপ্রিয় করেছে, আর কোনো কিছুই তার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এরা নিরীহ, নিরস্ত্র ব্যক্তিদের আওয়ামী লীগের পাতিনেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে হত্যা করতে দ্বিধা করত না।... গ্রামের লোক রক্ষীবাহিনীকে কী রকম ভয় পেত তার আরেকটি উদাহরণ দিই। ফরিদপুরের বিল নালিয়া গ্রামের চোবদার সাহেব পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন এবং সেজদার (জাহাঙ্গীর কবির) নির্বাচনী প্রচারণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এঁর সঙ্গে জমিজমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিরোধ বাধলে জনৈক ব্যক্তি এক আওয়ামী লীগ নেতার মারফত রক্ষীবাহিনীকে জানায় যে তিনি একজন কুখ্যাত রাজাকার। চোবদার সাহেব খবর পেয়েই ঢাকায় পালিয়ে আসেন এবং আমার শরণাপন্ন হন। তখন হেয়ার রোড এলাকায় ব্রিটিশ রানির জন্য যে বাসভবন নির্মাণ করা হয়েছিল, সেটাকে বঙ্গবন্ধু গণভবন হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং বিকেল চারটায় নিচের বিরাট হলঘরে সমবেত সবার বক্তব্য শুনতেন।

আমি চোবদার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ৪টা বাজার কিছুক্ষণ আগেই সেই হলে উপস্থিত হই এবং দরজার কাছে একটা চেয়ারে বসি। যথাসময়ে বঙ্গবন্ধু হলঘরে ঢুকে একটু পরে আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, আমি কেন ওপরে যাইনি এবং তাঁকে খবর দিইনি। তাঁকে জানালাম আমি একটা অভিযোগ নিয়ে এসেছি। আমি চোবদার সাহেবকে তাঁর বক্তব্য বলতে অনুরোধ জানাই। চোবদার সাহেব দাঁড়াতেই তিনি বললেন, আপনাকে তো আমি আগে দেখেছি, আপনার পদবি একটু ভিন্ন রকম, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। চোবদার সাহেব বললেন, ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে আপনি খুলনার সবুর খানসহ কয়েকজন ছাত্রনেতা নিয়ে ফরিদপুরের ছাত্র-যুবককে সঙ্গে নিয়ে জাহাঙ্গীর কবির সাহেবের মিটিং ভাঙতে গিয়েছিলেন, তখন আমরা কয়েকজন আপনার মুখোমুখি হই।... আমার পদবি চোবদার। এখন বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে আমার বিপক্ষ পার্টি আপনার এক স্থানীয় নেতার মাধ্যমে আমাকে রাজাকার হিসেবে রক্ষীবাহিনীর কাছে নাম দিয়েছে।

শেখ সাহেব শুনেই তৎক্ষণাৎ ফরিদপুরে জানিয়ে দিতে বলেন যে চোবদার সাহেবের গায়ে যদি একটি আঁচড়ও লাগে তিনি কাউকে রেহাই দেবেন না।[১০৫]

চুয়াত্তরের অক্টোবরে তাজউদ্দীন আহমদ পদত্যাগ করলে অধ্যাপক এ আর মল্লিককে অর্থমন্ত্রী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। একদিন তাঁর কাছে অনুরোধ এল, একটা নথিতে সই দিতে হবে। বন্যানিয়ন্ত্রণ ও সেচ মন্ত্রণালয়ের আসাফউদ্দৌলাসহ কয়েকজন কর্মকর্তা ব্রাসেলস-এ গেছেন ড্রেজার কিনতে। সেখান থেকে টেলিগ্রাম এসেছে ড্রেজার কেনার জন্য অবিলম্বে টাকা পাঠাতে

হবে। দরদাম করে ড্রেজার বুক করা পর্যন্ত হয়ে গেছে। এ সময় সরকারের ভীষণ অর্থসংকট ছিল। ড্রেজার কেনার জন্য টেন্ডারও ডাকা হয়নি। অর্থমন্ত্রী মল্লিক তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো টাকা না দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে নির্দেশ দিলেন। শেখ মুজিব তখন রাষ্ট্রপতি। তিনি ঢাকার বাইরে, কক্সবাজারে। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মল্লিককে ডেকে পাঠালেন। ওখানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সাইদুজ্জামানসহ অনেকেই বসা ছিলেন। সৈয়দ নজরুল বললেন, 'কর্মকর্তাদের যে দলটি ব্রাসেলসে গেছে, তারা মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেই গেছে। ড্রেজারের টাকা আসবে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। টাকা আসতে দেরি হচ্ছে, এখন অর্থ মন্ত্রণালয় টাকা ছাড় করলে পরে তা রিপ্লেস করা হবে।' মল্লিক টাকা দিতে অপারগতা জানালেন। সৈয়দ নজরুল বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলুন।' তিনি কক্সবাজারে টেলিফোন সংযোগ করিয়ে দিলেন। মল্লিকের সঙ্গে শেখ মুজিবের কথা হলো :

মল্লিক : ভাই, আপনি কয়েকটি কথার জবাব দিলে খুশি হই।

মুজিব : কী হয়েছে?

মল্লিক : ব্রাসেলসে যে দলটি ড্রেজারের জন্য গেছে, সেই দল এবং মন্ত্রী সেরনিয়াবাত নাকি আপনার সঙ্গে দেখা করে ড্রেজার কেনার অনুমতি নিয়েছেন? এটা কি সত্য?

মুজিব : তারা আমার সঙ্গে দেখা করেছে সত্য, তবে আমি তাদেরকে ড্রেজার কেনার কোনো কথা বলিনি।

মল্লিক : আপনি কি ড্রেজারের দাম পরিশোধের জন্য কাগজপত্র পেয়েছেন? সানাউল হক (ব্রাসেলস-এ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত) টেলেক্স পাঠিয়েছেন।

মুজিব : হ্যাঁ কাগজপত্র এসেছে। আপনার ডিসিশন আপনি নেবেন।

মল্লিক : হ্যাঁ, প্রশ্ন উঠতে পারে।

মুজিব : তবে আপনাকে বলছি ইউ টেক ইয়োর ওউন ডিসিশন। ড্রেজার কিনতে আমি তাদের বলিনি।

মল্লিক : সংযুক্ত আরব আমিরাতে আমাদের রাষ্ট্রদূত শামসুল আলমের সঙ্গে ড্রেজার ক্রয় বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। শামসুল আলম জানিয়েছেন, ড্রেজার ক্রয়ের সময় আমিরাতের প্রতিনিধিকে সঙ্গে রাখতে হবে। টাকা আমিরাত দেবে, তবে দিন নির্দিষ্ট করেনি এবং নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত কোনো টাকাও তারা দেবে না বলে জানিয়েছে। বঙ্গবন্ধু, আপনি আমাকে বলেছেন যে দেশের লোক

যেন আর না খেয়ে না মরে আমি সে চেষ্টা করছি। আর্থিক সংকটের কথা বিবেচনা করে এখন ড্রেজার ক্রয় বাবদ টাকা দিতে পারছি না।

মুজিব : না, না, টাকা দেবেন না। ইট্‌স ক্লিয়ার ফ্রম মাই সাইড যে আমি কাউকে ড্রেজার কিনতে বলিনি, বুঝলেন? দু'একদিনের মধ্যে আমি আসছি, তখন কথা হবে।[১০৬]

মল্লিক ফোন ছেড়ে দিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বললেন, 'শুনলেন তো পয়সাকড়ি দিতে না করে দিলেন!' এমন সময় ফোনটা আবার বেজে উঠলো। সৈয়দ নজরুল ফোনটা ধরে মল্লিককে বললেন, 'আপনার ফোন, বঙ্গবন্ধু কথা বলবেন।'

মুজিব : ড. সাহেব একটা নির্দেশ আছে। যারা ব্রাসেলসে গেছে তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করতে হবে অ্যাজ সুন অ্যাজ দে গেট ডাউন অ্যাট দি এয়ারপোর্ট।

মল্লিক : কেন?

মুজিব : তারা অন্যায় কাজ কেমন করে করলো? আর আমার নাম দিয়ে দিল যে আমি কিনতে বলেছি? তাদের অ্যারেস্ট করা হবে এবং তাদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হবে।

মল্লিক : ঠিক কাজ হবে না।

মুজিব : কেন?

মল্লিক : আপনি অ্যারেস্ট করে পরের দিনই ছেড়ে দেবেন আপনি অনেক বিশ্বাসঘাতক লোককেই ছেড়ে দিয়েছেন এরা তো ছেলেমানুষ, ইয়ং অফিসার ওরা। হয়তো কিনবে বলেছে, আপনি হয়তো তাদের কথা বুঝতে পারেননি। দাম ঠিক করেছে, কিনেছে—তাতে ওদের আবার বিচার করতে হবে কেন? আপনি কৈফিয়ত চাইতে পারেন। কৈফিয়ত আপনি চান বা সেরনিয়াবাতকে বলেন, কিংবা আমাকে বলেন আমি কৈফিয়ত চাই।

মুজিব : না, ঠিক আছে। ইউ সেন্ড সাইদুজ্জামান ইমিডিয়েটলি টু ব্রাসেলস টু এনকোয়ার।

মল্লিক : আপনি কি সন্দেহ করছেন যে, ওরা টাকা-পয়সা মেরেছে? আমি মনে করি যে, এ সন্দেহটা হয়তো অমূলক। বাচ্চা মানুষ গেছে, কিনেছে, হয়তো সেরনিয়াবাত সাহেব কিনতে বলেছেন—টাকা পাবে আমিরাতের কাছ থেকে। গিভ ইট আপ। আর সাইদুজ্জামানকে পাঠিয়ে আমি আবার পয়সা খরচ করবো? হোয়াই শুড আই স্পেন্ড মানি? ফরেন কারেন্সির কি দাম নেই স্যার?

মুজিব : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইউ আর রাইট। ঠিক আছে ইউ টেক ইয়োর ডিসিশন।[১০৭]

ব্যাপারটার এখানেই ইতি। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, শেখ মুজিবকে অন্ধকারে রেখে কিংবা ভুল বুঝিয়ে দেশের স্বার্থবিরোধী অনেক কাজ হয়েছে। অধ্যাপক মল্লিকের সঙ্গে শেখ মুজিবের সম্পর্কের ভিত্তি ছিল পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ। মল্লিকের ব্যক্তিত্ব ও যুক্তি এক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছিল। মন্ত্রিসভায় চাটুকার ও ব্যক্তিত্বহীন লোকের অভাব ছিল না। সঠিক তথ্যটি পেলে শেখ মুজিব যে অন্যায় আবদার সবসময় মেনে নিতেন না, এটাও সত্য।

সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ পাকিস্তান আমলে জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় সহযোগী বন্দি মুক্তাগাছার কবিরাজদার কাছে ফুটবল খাওয়ার গল্প শুনেছিলেন। প্রশ্ন ছিল ফুটবল আবার কী করে খায়। কবিরাজদার উত্তর ছিল—বাতাসটা খেয়ে ছাবাটা ফেলে দেবেন। এই গল্পটি ফয়েজ আহমদ পরে শেখ মুজিবকে গল্পচ্ছলে শুনিয়েছিলেন। ব্যাপারটা ছিল হাস্যরসের, প্রতীকী, কিন্তু নির্মম সত্য। ফয়েজ আহমদের বর্ণনায় :

> মুক্তিযুদ্ধের বিজয় লাভের পঁচিশ দিন পর তাজুদ্দিন সায়েব প্রধানমন্ত্রিত্ব হারালেন। তাঁর প্রায় চার বছর পর অর্থমন্ত্রিত্ব হারিয়ে তিনি একা।
>
> শেখ সায়েব আবার রাষ্ট্রপতি একটা হালকা মুহূর্ত আমার উপস্থিতি কথার সুযোগে বললাম : আপনিও ফুটবল খেতে জানেন!
>
> 'কি বললি, ফুটবল?'
>
> গল্পটা হাস্যরোলের মধ্যে বলতে হলো। আর কবিরাজদার উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করলাম : কেন? বাতাসটা খেয়ে ছাবাটা ফেলে দেবেন?
>
> এই রাজনৈতিক রূপকের অর্থ তাঁর পক্ষে বুঝতে না পারার কোনো কারণ নেই। কিন্তু কল্পিত প্রতিবাদী ও অঙ্কুরিত প্রতিপক্ষের ছায়ার সঙ্গে দ্বিমত ও দ্বন্দ্ব শেখ সায়েবকে তখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।[১০৮]

১২

১৯৭৫ সালের শুরুর দিকে আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাপক চোরাচালান ও কর ফাঁকি বন্ধ করার লক্ষ্যে একশ টাকার নোট অচল ঘোষণা করা হয়। এই পরিকল্পনার মূলে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এ কে নাজিরউদ্দিন আহমদ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মুস্তাফিজুর রহমান এবং অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক এ আর মল্লিক। শেখ মুজিব মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন। তাঁকে

বোঝানো হলো, মন্ত্রিসভায় বিষয়টা উঠলে তা জানাজানি হয়ে যাবে এবং সংশ্লিষ্টরা সাবধান হয়ে যাবে অর্থমন্ত্রী যুক্তি দিলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্ত অনেক সময় সরকারপ্রধান আর অর্থমন্ত্রীই নিয়ে থাকেন একশ টাকার নোট কীভাবে অচল করা হলো, তার একটা বিবরণ দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী মল্লিক :

> সব ঠিকঠাক করা হলো। পরিকল্পনা করা হলো, কাগজপত্রও তৈরি করা হলো। ঐ কয়েকজন, আমার সেক্রেটারি কফিলউদ্দিন মাহমুদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নাজির এবং মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে এসব কাজ করা হলো।... ঘোষণা দেওয়া হবে এমন সময় হঠাৎ করেই শেখ মুজিবের বাবা মারা গেলেন ... তিনি দেশের বাড়িতে হেলিকপ্টারে যাচ্ছেন।... তিনি আমাকে বললেন, 'ডক্টর সাহেব, রাষ্ট্রের স্বার্থে আমি কোনো বাধার সৃষ্টি করতে চাই না।... আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনি আগামীকাল ঘোষণা দেবেন।' আমি তাঁর হাত ধরে বললাম যে, 'বঙ্গবন্ধু, আপনি সেন্টিমেন্টাল হবেন না ... দশ-বারোদিন পরেও কাজটা করা যাবে। আপনি ফিরে আসুন।'... তিনি বললেন, 'না, পরে আপনি বা আপনার মতো আর কেউ যদি ভাবেন যে, আমার বাবার মৃত্যুর কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজ হলো না রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি হোক এটা আমি চাই না।'
>
> বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার পর একশ টাকার নোট অচল ঘোষণার তারিখ নির্দিষ্ট করা হলো। তিনি বললেন, 'ঘোষণার আগে অন্তত দুজনকে জানাতে হবে। প্রথমজন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, দ্বিতীয়জন প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তাঁদের আপনি সকাল সাড়ে আটটার দিকে ডাকেন। আমার লোকজন আটটার মধ্যে চলে আসবে। কিন্তু ভাই, আপনি কিছু মনে করবেন না—আই উইল কীপ দেম। সন্ধ্যার আগে বেরুতে দেব না।... তিনি তিনটা বিছানা আনালেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এখানে হবে সে খবরও বাসায় পাঠালেন।... তাঁরা দুজনেই কিছুক্ষণের মধ্যে চলে এলেন।... শেখ সাহেব তখন উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, 'ডক্টর সাহেব একশ টাকার নোট অচল করতে যাচ্ছেন।'... সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব লাফ দিয়ে উঠে বললেন, আমি তো গতকালই একশ টাকার নোট দিয়ে আমার সমস্ত এরিয়ার সেলারি ড্র করেছি। মনসুর আলী সাহেব বললেন, আমার এলাকা থেকে লোক এসেছিল। তারা বেশ কিছু একশ টাকার নোট আমার কাছে জমা রেখে গেছে। ব্যবসার প্রয়োজনে আবার নেবে। আমি তার উত্তরে বললাম, আমার বাসার পজিশন আমি জানি না, শেখ সাহেবের বাসার পজিশন তিনি জানেন না।... বিষয়টি আপনাদের কাছে বলারও প্রয়োজন ছিল না। এটা অর্থমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব।... আপনারা আজকে আর বেরুতে পারবেন না। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এখানেই

থাকতে হবে।... একশ টাকার নোট বাতিলের ঘোষণা হলো।...

ইতিমধ্যে টাকা জমা দেওয়ার সময় পার হয়ে গেল। অনেক টাকা পুড়িয়ে ফেলা হলো।... সকলে নানা প্রতিষ্ঠানের নামে টাকা জমা দিতে লাগলো। মাদ্রাসার নামে, স্কুলের নামে অনেক টাকা জমা পড়লো। চিন্তা করা যায় না এসব স্কুলের এত টাকা থাকতে পারে এসব মাদ্রাসার এত টাকা থাকতে পারে। দাউদকান্দির যে মাদ্রাসা—যেটি খন্দকার মোশতাক সাহেবের গ্রামে—সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বত্রিশ হাজার টাকা জমা হলো। খন্দকার মোশতাক পরে চাইলেন। আমি 'না' করে দিলাম। তিনি খুব রাগারাগি করলেন।

একশ টাকার নোট সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কমিটি করে দেওয়া হলো।... পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হিসাব ছাড়াই দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়।... শেখ মুজিবের গণভবনের অফিসে গেলাম দেখলাম তিনি বসে রয়েছেন। আমাকে দেখেই কতক্ষণ হা-হা করে হাসলেন। তারপর বললেন, 'এখন প্রমাণিত হলো ডক্টর সাহেব, আমরা রাজনীতি করলেও বিশ্বাসঘাতকতা করি না। না রাষ্ট্রের সঙ্গে, না সরকারের সঙ্গে। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'আমি কি তা বলেছি?' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তা বলেননি, কিন্তু আপনি ক্যাবিনেট ডিসিশন নিতে দেন নাই। আপনি রাইট, সবাই তো সমান হয় না. তবে আমি যে সন্দেহের উর্ধ্বে তা এক্ষুণি প্রমাণিত হবে।' 'কী রকম?' বললাম আমি। তিনি বললেন, 'আপনার ভাবি (বেগম মুজিব) যখন বললেন যে শাড়ির ভাঁজের মধ্যে টাকা আছে, তখন আপনি নিজেই সামনে ছিলেন। তিনি এখন টুঙ্গীপাড়া থেকে ফিরে এসে বলছেন যে সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা তাঁর কাছে আছে। এসব একশ টাকার নোট। এই নোটগুলি তাঁকে বদলিয়ে দিতে হবে। আমি বলেছি, তোমার টাকা গেছে সত্য, তবে যে মানুষ অর্থমন্ত্রী যিনি ঘোষণা দিয়েছেন—এখন কারো সাধ্য নেই টাকা ভাঙানো। কিন্তু এ টাকা পেলে কোথায়? তার উত্তরে তিনি জানালেন, তুমি তো ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে কোনো টাকা-পয়সা দিতে পারবে না, যা হাতে থাকে তা লোককে দিয়ে দাও—তোমার ওয়ার্কারদের দাও, আর নিজে খরচ করো। তাই বিয়ের জন্য আত্মীয়-স্বজনরা যে সাহায্য করেছে তাই আছে।'[১০৯]

কালবেলা

আওয়ামী লীগের জন্য পরিবেশ দিন দিন বৈরী হয়ে উঠছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একমাত্র ন্যাপ (মোজাফফর) এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) আওয়ামী লীগকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানাবিধ ইস্যুতে নীতিগত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। তেহাত্তর সালে এই তিনটি দল মিলে একটি রাজনৈতিক জোট তৈরি করে। অন্যরা এই জোটের প্রচণ্ড সমালোচক ছিল। জোটের তিন দলের প্রধান নেতাদের নিয়ে বিরোধীরা এ সময় একটি স্লোগান তৈরি করেছিল : 'মুজিব, মণি, মোজাফফর—বাংলার মীরজাফর'।

আওয়ামী লীগ সচরাচর একলা চলো নীতি অনুসরণ করে থাকে। পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকলে প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯ আগস্ট (১৯৭৩) তিন দলের একটি ঐক্যজোট গঠনের আহ্বান জানান। এর ধারাবাহিকতায় ৩ সেপ্টেম্বর গণভবনে শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) ও সিপিবি এক সভায় তিন দল একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ১৩ সেপ্টেম্বরের সভায় প্রস্তাবিত তিন দলের জোটের নাম 'গণঐক্যজোট' অনুমোদন করে। এই পটভূমিতে ৯ অক্টোবর জোটের সাংগঠনিক কাঠামো ঠিক করা হয় এবং ১৪ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ঐক্যজোটের ঘোষণা দেওয়া হয়। গণঐক্যজোটের ১৯ সদস্যের নির্বাহী কমিটিতে আওয়ামী লীগের ১১ জন, ন্যাপের পাঁচজন এবং কমিউনিস্ট পার্টির তিনজন ছিলেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জোটের আহ্বায়ক মনোনীত হন।'[১]

সরকারে জোটের কোনো ভূমিকা ছিল না। জোট গঠনের ফলে সংসদের ভেতরে শক্তির ভারসাম্যেও কোনো পরিবর্তন আসেনি। এর রাজনৈতিক গুরুত্বই বা কী, এ নিয়ে প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও বিশ্লেষক আবুল মনসুর আহমদ তির্যক মন্তব্য করেন :

> আওয়ামী লীগ যত বড় পার্টিই হউক, একা তারা একটা দলমাত্র। ন্যাপও তাদেরই গৃহত্যাগী শরিক। তাদের মিলনে দলীয় ঐক্য হইত মাত্র। কিন্তু যেই তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে যোগ করা হইল, অমনি ঘটনাটা হইয়া গেল 'গণঐক্য'। গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ হইয়া গেল।... আর যে আট-দশটা তথাকথিত পার্টি বাহিরে পড়িয়া রহিল, ওরা কিছু না।[২]

১৯৭৩ সালের এপ্রিলে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং দুষ্কৃতী দমন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য সরকার সেনাবাহিনী ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ২য় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির একটি ইউনিট অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে 'অপারেশন সিলভার লাইনিং'-এ অংশ নিতে ময়মনসিংহে যায়। এই ইউনিটের একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন জুবায়ের সিদ্দিকী (পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল)। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানটি বেশ সফল হয়েছিল। 'পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বিবেচনায় সেই অভিযান থেকে সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করা হয়। অবৈধ অস্ত্র রাখার জন্য বেশিরভাগ যাঁরা অভিযুক্ত হচ্ছিলেন তারা তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের সদস্য বা সমর্থক ছিলেন তাই এই অভিযানকে সমাপ্ত ঘোষণা করে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে প্রত্যাহার করতে হয়।'[৩]

কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা ১৯৭৩ সালে ছিলেন কুমিল্লা সেনানিবাসের ব্রিগেড কমান্ডার তাঁর দায়িত্ব ছিল কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেটে অভিযান পরিচালনা করার। মেজর শরিফুল হক ডালিম, মেজর এ টি এম হায়দার এবং মেজর খন্দকার আবদুর রশীদকে যথাক্রমে কুমিল্লা, সিলেট ও নোয়াখালীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। কুমিল্লায় অপারেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত মেজর ডালিম তাঁর অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে সরকারের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপট আন্দাজ করা যায় :

> দলবিশেষের প্রতি আমাদের কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই আমাদের কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। ধর-পাকড় করা হলো অপরাধীদের স্থানীয় বেসামরিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এবং প্রশাসনের সহায়তায়। যারা ধরা পড়েছিল তাদের বেশির ভাগই হোমরাচোমরা চাঁই এবং নেতা-নেত্রী এদের মধ্যে সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম এবং জহিরুল কাইয়ুমও ছিলেন।
>
> হঠাৎ সেনা সদর থেকে কয়েকজন আটক অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠালেন জেনারেল সফিউল্লাহ। কর্নেল হুদা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন কাউকে ছেড়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। জেনারেল

সফিউল্লাহকে সঙ্গে করে আমরা গেলাম ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে সেখানে পৌঁছে দেখি প্রধানমন্ত্রী এবং জনাব তোফায়েল আহমেদ আমাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। ঘরে ঢুকতেই কর্নেল হুদা এবং আমাকে দেখামাত্র শেখ মুজিব গর্জে উঠলেন। জেনারেল সফিউল্লাহকে উদ্দেশ করে তিনি বলে উঠলেন,

–কিছু একটা কর, নইলে দেশে আওয়ামী লীগ একদম শেষ হইয়া যাইব।

জেনারেল সফিউল্লাহ দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললেন,

–স্যার। আপনি অস্থির হবেন না। আমি অবশ্যই একটা কিছু করব।

ইতিমধ্যে জনাব তোফায়েল শেখ সাহেবের কানে কানে নিচুস্বরে কিছু বললেন। তাঁর কানপড়ায় হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলে উঠলেন,

–কুমিল্লার ক্যাপ্টেন হাই, ক্যাপ্টেন হুদা, লেফটেন্যান্ট তৈয়ব, সিলেটের লেফটেন্যান্ট জহির–এদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে হইব। তারা বন্দিদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করছে হুদা ভাইকে উদ্দেশ করেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন শেখ মুজিব।

–স্যার, ওরা জুনিয়র সাব-অর্ডিনেট অফিসার ওরা যা করেছে আমার হুকুমেই করেছে। আমাকে ডিঙিয়ে জুনিয়র অফিসারদের শাস্তি দিলে সেটা আমার জন্য অপমানকর হবে।

কর্নেল হুদার জবাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি এবং বললেন,

–ঠিক আছে। আইজ তোরা যা, ডালিম তুই রাইতে খাইয়া যাইস। আমাকে রেখে বাকি সবাই চলে গেলেন। শেখসাহেব ও আমি বাড়ির অন্দর মহলে ঢুকলাম। খেতে খেতে শেখসাহেব বললেন,

–তুই থাকতে কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের এই দশা অইল ক্যান?

–চাচা বিশ্বাস করেন, আমরা কোনো দল দেখে অপারেশন করিনি।

পরদিন সকালে জেনারেল সফিউল্লাহ সেনা সদরে আমাকে ডেকে পাঠালেন।... চিফের সঙ্গে একই হেলিকপ্টারে ফিরে এলাম কুমিল্লায়। চিফ নিজে গিয়ে বন্দিদের মুক্তি দিলেন। আমাদের সামনেই ফুলের মালা গলায় পরিয়ে সমবেত আওয়ামী লীগাররা সদর্পে মিছিল করে চলে গেল শেখ মুজিবের জয়ধ্বনি করতে করতে। ঢাকায় ফেরার আগে জেনারেল সফিউল্লাহ আমাদের সারমন দিলেন, প্রাইম মিনিস্টারস ডিজায়ার ইজ অ্যান অর্ডার।

এ ঘটনার ফলে সারা দেশে ডেপ্লয়েড আর্মির মনোবল একদম ভেঙে পড়েছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়ল, শেখ মুজিব শিগগিরই আর্মি অপারেশন বন্ধ করে দিচ্ছেন। এরপর আমরা নামেমাত্র অপারেশনে ডেপ্লয়েড ছিলাম [৪]

মেজর ডালিমের বয়ান একান্তই তার ব্যক্তিগত এবং এটা একপেশে মনে হতে পারে। কুমিল্লার ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগ নেতাদের ওপর তার যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। ডালিমের আচরণ ও মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য তার ক্ষোভের প্রেক্ষাপট জানা দরকার। ডালিম ১৯৬০-এর দশকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন। কুমিল্লার ওই সময়ের ছাত্রলীগ নেতা সৈয়দ রেজাউর রহমান এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন :

> ডালিম এনএসএফ করত। আমি তাকে ছাত্রলীগে নিয়া আসি। সে আমার জুনিয়র। আমাকে রেজা ভাই বলত। ওর বাবা কুমিল্লায় ডেপুটি ডিরেক্টর অব ফিশারিজ ছিল। ওদের একটা সংগঠন থেকে, কী একটা সংগঠন, একজন অভিনেত্রী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাড়ি, নামটা আবছা আবছা মনে আছে, বলব না, তাকে আনে নাটক করার জন্য। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো ছিল। অভিনয়ও ভালো করত। নাটক-টাটক শেষ। নাটকের পরের দিন এই মেয়েটিকে নিয়া ডালিম কোটবাড়ি যায়। এইটা আফজাল খান, রউফ (প্রিন্সিপাল রউফ) আর আমি খবর পাই। আফজাল খান কুমিল্লার একজন আওয়ামী লীগ নেতা। তখন ছাত্রলীগ করত। সে আমার সমসাময়িক বন্ধু। রউফ আমাদের এক বছরের জুনিয়র।
>
> আফজাল বলল, রেজা চল। বদমাইশটা নাকি কোটবাড়ি। আফজাল আর আমি কোটবাড়ি দুই পাহাড়ের মধ্যে খুঁজে দেখি ডালিম আসতেছে। তখন আফজালের নেতৃত্বেই, আমি সঙ্গে ছিলাম। তারে কান ধরে ওঠা-বসা, সাতবার না কয়বার মনে নাই। মাটিতে থুতু ফেলে ওখানে নাকে খত দেওয়ানো আর মেয়েটিকে মা বলতে হবে। মারে নিয়া আসছিস এখানে? বল, মা বল? এই ঘটনাটা ঘটে। পরে কম্বিং অপারেশনের সময় মেজর ডালিম সম্ভবত এটা মনে রাখে। আফজালকে মার্সিলেসলি মারে, এবং প্রিন্সিপাল রউফকেও।
>
> রউফ, আফজাল আর মাইনুল হুদাকে মারল। আমাকে তুলে নিল। তুলে ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের একটা ভালো রেস্ট হাউস আছে কুমিল্লায়, দোতলায় রেখে সে কোথায় জানি চলে গেল। ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনার কাছে এক ক্যান্টনমেন্ট আর্মস আছে; এগুলি কোথায় রাখছেন?
>
> —মেজর হিসাবে বলব, না ডালিম হিসাবে বলব?
>
> —আপনাকে তো কলেজে আমি শ্রদ্ধা করতাম। ডালিম হিসেবেই বলেন।
>
> —তোমার কাছে কি সুনির্দিষ্ট ইনফরমেশন আছে যে, আমার কাছে এক ক্যান্টনমেন্ট আর্মস আছে?

—হ্যাঁ, সবাই বলে।

—তাহলে তো তারা জানে কোথায় রাখছি? কেউ না কেউ তো জানে? কিছু আর্মস ছিল, যখন আমি মুজিব বাহিনীর (কুমিল্লা জেলার) চিফ ছিলাম। সেটাতো কুমিল্লার এসপি, পরবর্তীকালে নোয়াখালীর এসপি, টি আলীর বাসা থেকে নিয়ে গেছে।

—এখন তাইলে অস্ত্র নাই?

—থাকলে নিয়া যাও।

—অন্যদের খবর তো আপনি জানেন? (অন্য বন্দিদের নির্যাতন করা হয়েছে)

—শুনেছি, বিশ্বাস করি নাই।

—ক্যান বিশ্বাস করেন নাই?

—আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না, বঙ্গবন্ধু কি এখনো ক্ষমতায় আছে না নাই?

—এইটা কী বলেন আপনি?

—বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় আর এদিক দিয়ে এরা এইভাবে টর্চারড হইছে, আমাকে গ্রেপ্তার করে...

—না না, আপনি তো গ্রেপ্তার না। ভুল বুঝছেন আপনি।

—যা-ই হোক, আমি যেটা বুঝছি, সেটা বললাম।

আধঘন্টা পর আমাকে বাসায় পাঠায়া দিল। এর দুইদিন পরে আমি এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, আপনি জীবিত থাকতে এই অবস্থা? আমি তো বিশ্বাস করি নাই, ক্ষমতার বদল হয়ে গেছে কি না।

—তুই চুপ থাক হু ইজ হু অ্যান্ড হোয়াট ইজ হোয়াট আমি দেখতাছি।

এই হচ্ছে মেজর ডালিমের বিষয়টা।[৫]

জহিরুল কাইয়ুম, মমতাজ বেগম প্রমুখকে গ্রেপ্তার বিষয়ে ডালিমের দাবি অস্বীকার করেছেন সৈয়দ রেজাউর রহমান। লেখকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ছিল এ রকম :

—সে লিখেছে, তার লেখায় আছে, ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়, অনেককে অ্যারেস্ট করেছিল। তাদের মধ্যে জহিরুল কাইয়ুমের নাম আছে, মমতাজ আপার নাম আছে।

—না, একদম বোগাস। আজিজ খান সাহেবকে সম্ভবত বাসা থেকে নিয়ে গেছিল। আমার নাম দেয় নাই?

—না, আপনার নাম নাই। লিখেছে, আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাদের মধ্যে জহিরুল কাইয়ুম আর মমতাজ বেগমের নাম আছে।

—আমার নাম দিলে সেটা গ্রেপ্তার। সে অবশ্য বলে নাই গ্রেপ্তার। কিন্তু আমি বুঝছি যে গ্রেপ্তার।

—তার লেখায় আছে যে, সে এদের সবাইকে অ্যারেস্ট করেছে। পরে ঢাকা থেকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

—রউফ, আফজাল এই দুই জনকে ক্যান্টনমেন্টে, সিএমএইচে নিয়া যায়। পরে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সিএমইচ থেকে তাদের মুক্ত করা হয়। এটা ঠিক আছে। কিন্তু কাজী জহিরুল কাইয়ুম না, মমতাজ বেগমও না। আর আমাকে গ্রেপ্তার করছিল। আটকায়া রাখা মানেই তো গ্রেপ্তার। আপনারে গ্রেপ্তার করছি—এইটা বললে তো হবে না। আমাকে নিউ হোস্টেলের সামনে থেকে তুলে এনেছিল।

—ওই সময় আপনি তো যুবলীগে?

—আমি যুবলীগে, প্রেসিডিয়ামের এক নম্বর মেম্বার।

—আপনাদের ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত ক্ষোভ ছিল।

—ওর ধারণা, আমরা সবাই মিলে তাকে হ্যারাস করছি। সবার যোগসাজশ ছিল মূলত সবার ছিল না রউফ, মাইনুল, আফজাল আর আমি জানতাম। তবে আমার ভূমিকা ছিল আফজালকে সাপোর্ট দেওয়া মেইনলি আফজালই।

—ওই সময় আফজাল খান...

—আফজাল সম্ভবত পৌরসভার চেয়ারম্যান

—আপনি অভিনেত্রীর নামটা বলবেন না? উনি কি এখন পলিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট?

—না না, ইম্পর্টেন্ট না। এখন কী করে জানি না।

—যা হোক, তাকে নিয়া ডালিম কোটবাড়ি চলে গেছে ফুর্তি করতে।

—ফুর্তি শব্দটা ব্যবহার কইরেন না।

—অবভিয়াসলি এটা বোঝা যায় এটা শুনে আপনাদের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল—তারে ধর।

—বিষয়টা ওই রকমই।[৩]

২

রাজনীতিকদের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সমন্বয়টা ভালো ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছিল। ১৯৭৩ সালে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও চোরাচালানবিরোধী অভিযানে সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হলে দেশের বিভিন্ন

জায়গায় ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সেনা সদস্যদের বিরোধ ও সংঘাত দেখা দেয়। চুয়াত্তরের জানুয়ারি মাসের একটি ঘটনায় সেনাবাহিনীর অনেক সদস্যের মনে হয়েছিল যে, তাদের মর্যাদায় আঘাত করা হয়েছে। ঘটনাটি ছিল তুচ্ছ, কিন্তু তা পরে বিস্ফোরণের পর্যায়ে চলে যায়।

ঘটনার সূত্রপাত একটি বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। ঢাকার ইস্কাটন লেডিজ ক্লাবে মেজর ডালিমের খালাতো বোন তহমিনার সঙ্গে কর্নেল রেজার বিয়ের অনুষ্ঠানে ডালিমের শ্যালক বাপ্পির সঙ্গে আমন্ত্রিত কয়েকজন কিশোরের বচসা হয়। এরা ছিলেন বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির (বর্তমান নাম রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি) চেয়ারম্যান ও ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে। এক পর্যায়ে ডালিম তাদের অনুষ্ঠানস্থল থেকে বের করে দেন। ডালিমের ভাষ্য অনুযায়ী, কিছুক্ষণ পর একটি গাড়িতে করে গাজী নিজেই উপস্থিত হন। দুটো মাইক্রোবাসে ১০-১২ জন অসামরিক সশস্ত্র লোক তার সঙ্গে এসেছিল। তারা ডালিম, তার স্ত্রী নিম্মি, তার শাশুড়ি এবং আলম ও চুল্লু নামের দুজন অতিথিকে গাড়িতে তুলে রওনা হয়। ডালিমের ছোট ভাই স্বপন, যে একজন 'বীরবিক্রম' মুক্তিযোদ্ধা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত সামরিক পুলিশ (এমপি) ইউনিট ও ব্রিগেড অফিসার্স মেসে ডালিমদের 'অপহরণ' করে নিয়ে যাওয়ার খবর দেয়। তারপর সে বেইলী রোডে তাদের ভগ্নিপতি আবুল খায়ের লিটুকে সংবাদটি দিতে যায়। লিটু পুলিশের এসপি মাহবুবউদ্দিন আহমদকে নিয়ে রওনা হন। মাহবুব এবং ডালিম মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন গাজী ডালিমদের ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের বাসার সামনে গাড়িতে বসিয়ে ভেতরে ঢোকেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে তার মতন করে ঘটনাটি বলেন। এ সময় এসপি মাহবুব প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করলে প্রধানমন্ত্রী নিজেই রিসিভার তোলেন। ডালিমের ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের কথোপকথন ছিল এ রকম :

মুজিব : মাহবুব, তুমি তাড়াতাড়ি আসো। গাজী একটা বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে একজন মেজর এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ধরে এনেছে। মেজরটি মাতাল এবং সে গাজীর স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে

মাহবুব : স্যার, গাজীকে বলুন ওই মেজর কোথায়?

মুজিব : গাজী তাদের এখানে নিয়ে এসেছে। তারা বাইরে গাড়িতে আছে।

মাহবুব : স্যার, গাজী সাহেব ডালিম আর নিম্মিকে লেডিজ ক্লাব থেকে ধরে এনেছে। আজ ডালিমের খালাতো বোনের বিয়ে হচ্ছিলো।

মুজিব : কী? আমাকে একি কথা বলছ!

মাহবুব : আমি সত্য বলছি। আপনি তাদের সামলান, আমি এখনই আসছি।[৭]

এরপর মাহবুব ও লিটু দ্রুত ৩২ নম্বর রোডে পৌছান। সব শুনে শেখ মুজিব ক্ষুব্ধ হোন এবং গাজীকে মাপ চাইতে বলেন। ডালিমরা এতে শান্ত হলেন না। এই ঘটনা জানতে পেরে ডালিমের সেনা বন্ধুরা আরেকটি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেন। তারা দুই ট্রাক সেনাসহ গাজীর বাড়িতে হামলা করে ওই বাড়ির সবাইকে ধরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আর্মি কন্ট্রোল রুমে নিয়ে আসেন। শেখ মুজিব সেনাপ্রধান মে. জে. সফিউল্লাহকে ডেকে পাঠান এবং তাকে বলেন সৈন্যরা যেন গাজীর পরিবারের লোকদের ছেড়ে দেয়। সফিউল্লাহ কন্ট্রোল রুমের মেজর মোমেনকে ফোন করে বলেন, 'সবাই বত্রিশ নম্বরে আছেন। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তুমি গাজীর পরিবারকে ছেড়ে দাও।' মেজর মোমেন এতেও শান্ত হলেন না। ডালিমের অনুরোধে তিনি ক্যাপ্টেন ফিরোজকে ৩২ নম্বরে পাঠালেন। ডালিম তাঁকে বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, গাজীর পরিবারকে ছেড়ে দাও।'[৮]

পরদিন সেনাসদরে এ নিয়ে অনেক গুঞ্জন চলে। ডালিম এবং তার বন্ধুদের এক কথা—তাদের সম্মানে আঘাত করা হয়েছে। এর একটা বিহিত করতে হবে। মেজর নূর চৌধুরী সেনাপ্রধান সফিউল্লাহকে বলে উঠলেন, 'আমাদের তিনটা দাবি : গাজীকে সব দায়িত্ব থেকে সরাতে হবে এবং তার অস্ত্রধারী সঙ্গীসহ তাকে বিচারের জন্য সেনাবাহিনীর কাছে পাঠাতে হবে, এই খবরটা প্রধানমন্ত্রী গণমাধ্যমকে জানাবেন; এবং গাজী যেহেতু আওয়ামী লীগের লোক, দলের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবেন। এই দাবিগুলো আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মানতে হবে বলে আপনি প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেন। যদি না পারেন, তাহলে আপনার ওই চেয়ারে ফিরে আসার দরকার নেই, আপনি সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা আর রাখেন না।'

সফিউল্লাহ অসহায়ের মতো বসে থাকলেন। তিনি কিছু বলতে চাইলে তার আগেই মেজর সমশের মুবিন চৌধুরী বীরবিক্রম কোমর থেকে বেল্ট খুলে সেনাপ্রধানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'আমরা সম্মান আর মর্যাদার জন্য সেনাবাহিনীতে কাজ করি। ওটাই যদি না থাকে, তাহলে এই সেনাবাহিনীতে আর থাকতে চাই না।'

এ সময় উপসেনাপ্রধান মে. জে. জিয়াউর রহমান এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, 'চুপ করো এবং শোনো। সমস্যাটি আমি বুঝেছি এবং তোমাদের দাবি ন্যায্য। সফিউল্লাহ, তুমি নিশ্চয়ই এই দাবিগুলো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবে এবং তাঁকে সমস্যার গুরুত্বটি বোঝাবে।' কয়েক মিনিটের মধ্যেই সফিউল্লাহ গণভবনের উদ্দেশে রওনা হলেন।[৯]

ওই সময় সেনা সদরের অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল ছিলেন কর্নেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ (পরে সেনাপ্রধান ও রাষ্ট্রপতি)। পিএসওদের এক সভায় জেনারেল সফিউল্লাহ এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, 'স্যার, আমার মনে হয় এই দাবিগুলো ন্যায্য। আপনার উচিত হবে প্রধানমন্ত্রীকে এটা বুঝিয়ে বলা এবং দাবি মেনে নিয়ে ওদের মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পরামর্শ দেওয়া।' এরশাদের এই মন্তব্যে ডালিমরা অবাক হয়েছিলেন। 'পাকিস্তান প্রত্যাগত অনেক কর্মকর্তাই ছিলেন তাঁর মতো জাতীয়তাবাদী এবং সাহসী। সেদিন থেকে এরশাদ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব পাল্টে যায়।'[১০]

ওই সময়ের সেনা-মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য এই ঘটনাটিকে একটি উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। প্রধানমন্ত্রী একটি সামরিক তদন্ত কমিটি করে বিচারের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। আটজন তরুণ সেনা কর্মকর্তাকে শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগে জুলাই মাসের (১৯৭৪) শেষদিকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। এদের মধ্যে ডালিম ও নূরও ছিলেন। এই ঘটনার ফলে সেনাবাহিনীতে প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল।[১১] চুয়াত্তরের জানুয়ারিতে যে সেনা কর্মকর্তারা দুই ট্রাক বোঝাই সৈন্য নিয়ে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাকে সাময়িক উত্তেজনার বশে একটা নিয়ম ভাঙার বা বন্ধুর (ডালিমের) প্রতি সহানুভূতির উদাহরণ হিসেবে হালকাভাবে দেখা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ এবং একটি অভ্যুত্থানের মহড়া। ওই দিনই একটি অভ্যুত্থান হয়ে যেতে পারত।[১২]

মার্চ মাসে (১৯৭৪) গণঐক্যজোটের এক সভায় নিম্ন পর্যায়ে কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা ঘোষণা দিলেন, স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিগুলো আওয়ামী লীগের লোকদের দিয়েই গঠন করা হবে।[১৩] ফলে গণঐক্যজোট আর সক্রিয় হতে পারেনি। আওয়ামী লীগ অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতজন ছাত্রের হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত গড়ায়। প্রধানমন্ত্রী মজুতদার ও বেআইনি অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সামরিক বাহিনীর অভিযান নিয়ে জোটের মধ্যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয় এবং একপর্যায়ে জোট ভেঙে যায়। এ বিষয়ে জোটের অন্যতম শরিক সিপিবির মূল্যায়ন এখানে তুলে ধরা হলো :

> ...সামরিক বাহিনীর অভিযানের ফলে শাসকদলের লোকজনের কেউ কেউ গ্রেপ্তার হয়ে যান। ফলে আওয়ামী লীগ সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে চাপ দিতে থাকে। সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে

ফেরত নেওয়ার দাবিতে তারা গণঐক্যজোটের বৈঠক আহ্বান করে। আমরা অবশ্য সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি সমর্থন করিনি, তবে সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে নির্দোষ সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হোক এবং বাড়াবাড়ির কোনো ঘটনা না ঘটুক এই দাবি করেছিলাম।... গণঐক্যজোটের এই বৈঠকে সামরিক বাহিনীর অভিযান বন্ধ করার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য সৃষ্টি হয়. গণঐক্যজোটের সেটাই ছিল শেষ বৈঠক। এভাবে বাস্তবে ঘোষণা ছাড়াই গণঐক্যজোটের পরিসমাপ্তি ঘটে।[১৪]

৩

কাজের আশায় গ্রাম-গঞ্জের গরিব মানুষেরা ঢাকায় ভিড় করছিল। ঢাকা শহর গড়ে উঠছিল কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই। খোলা জায়গাগুলো বস্তিতে ভরে উঠছিল। সরকারি জায়গায় এবং খাস জমিতেও ছিল অনেক বস্তি। একদল লোক এসব জায়গার দখল নিয়ে কোনোরকমে একটা ছাপড়া তুলে ভাড়া দিতেন। বেশির ভাগ দিনমজুর, রিকশাওয়ালা এবং গৃহকর্মী এসব বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন করলেও তারা কর্মস্থলের কাছাকাছি থাকতে চাইতেন। ১৯৭৪ সালে এক সরকারি সিদ্ধান্তে বুলডোজার দিয়ে অনেক বস্তি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। শহর পরিচ্ছন্ন রাখার নামে ঘরহীন মানুষেরা নতুন করে উদ্বাস্তু হন। সরকার তাদের তিনটি জায়গায় পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিয়েছিল—নারায়ণগঞ্জের ডেমরা, মিরপুরের ভাসানটেক এবং টঙ্গীর দত্তপাড়া। কিন্তু নতুন জায়গাগুলো তখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। এসব দীনহীন মানুষের দুর্দশা নিয়ে আহমদ ছফা লিখলেন 'বস্তি উজাড়'। তার কয়েকটি লাইন এ রকম :

...ইত্যাকার বার্তা শুনে বুলডোজারেরা এলো
নরোম মাটির বুকে এঁকে দিলো সুগভীর দাগ
ক্ষুব্ধ রুষ্ট লোহার গন্ডার, ঘুমভাঙা কুম্ভকর্ণ
অন্ধরাগ নির্মম হিংসায় ছোট ছোট স্নেহনীড়ে
তুলে দিলো ক্ষমতার ভার
দলামোচা হয়ে ভাঙ্গে ঘরহারা মানুষের ঘর।[১৫]

দেশে-বিদেশে আওয়ামী লীগ সরকার অগণতান্ত্রিক এবং দুর্নীতিবাজ হিসেবে প্রচার পাচ্ছিল। সমাজে অনাচার আর দুর্বৃত্তায়নে ক্ষমতাসীন দলের মদদ থাকার অভিযোগ ছিল। চুয়াত্তর সালের মার্চে নরসিংদী কলেজে নারায়ণগঞ্জ জেলা

পূর্বাঞ্চলীয় শাখা ছাত্রলীগের সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ অভিযোগ করেন, বাংলাদেশের কয়েকজন নেতা দেশ থেকে মুদ্রা পাচার করে দিচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'পুলিশ চোর-ডাকাত-হাইজ্যাকারদের ধরে আনে, আর অন্য দিকে মন্ত্রিপরিষদ থেকে কিংবা ঊর্ধ্বতন মহল থেকে টেলিফোন আসে ছেড়ে দেওয়ার জন্য।'[১৬]

দৈনিক *জনপদ* সরকারপন্থী পত্রিকা না হলেও এর সম্পাদক আবদুল গাফফার চৌধুরীকে সরকার-সমর্থক হিসেবে মনে করা হতো। ২৭ চৈত্র ১৩৮০ তাঁর পত্রিকায় ছাপা হওয়া উপসম্পাদকীয়তে তিনি বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে হতাশা জানিয়ে বলেন :

> ...আমরা বড় বেশি আশা করেছিলাম ক্ষমতা যারা হাতে পেয়েছেন, তাঁরা তা ব্যবহার করতে শেখেননি তাই অপব্যবহারের মাত্রা বেড়েছে। পুরোনো শাসকদের পরিত্যক্ত প্রশাসনিক যন্ত্র আর গদী নিজেদের দখলে পেয়ে তাঁরাও পুরোনো কায়দায় ক্ষমতা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন, ভাবছেন এটাই বুঝি নিয়ম. ব্যবহার না জানলে অপব্যবহারটাও কেউ দক্ষতার সঙ্গে করতে জানে না। এখন ক্ষমতার নির্যাতন তাই মাত্রাহীন।[১৭]

১৯৭৪ সালের ১৫ জুলাই সাপ্তাহিক *নিউজউইক* বাংলাদেশ পরিস্থিতির ওপর একটি প্রতিবেদন ছাপে। প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয় :

> শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিপর্যয়ের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে।...
>
> রক্ষীবাহিনী নামক একটি আধা সামরিক বাহিনী পুনরায় নির্যাতন এবং হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে।
>
> আড়াই বছর আগে বাংলাদেশ সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী দেশ ছিল।... কিন্তু আজ এ দেশে সুখ এক অবলুপ্ত আবেগ মাত্র।
>
> ...বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আজও পাকিস্তানি আমলের মতোই জনগণ ভয়ে কেঁপে ওঠে। বাংলাদেশ এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে তফাত মাত্র এইটুকু যে জনগণ এখন আগের চেয়েও দরিদ্র হয়ে পড়েছে এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের বদলে স্বজাতির দ্বারা লাঞ্ছিত হচ্ছে।...
>
> এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য যে ব্যক্তিকে সরাসরি দোষারোপ করতে হয়, তিনি হলেন বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবুর রহমান।
>
> কিছুসংখ্যক চাটুকার পরিবেষ্টিত শেখ মুজিবের অবস্থা এমন হয়েছে, নিজের ভুলভ্রান্তিগুলো পর্যন্ত জানতে পারা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এ চাটুকারের দল কেবল সেই সংবাদগুলোই তাঁর কানে তোলে, যে সংবাদগুলো

তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে জানতে চান। শুধু বৈদেশিক নীতি ছাড়া শেখ মুজিবের নেতৃত্ব প্রায় সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। এমন একটি সরকারের তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার মধ্যে রয়েছে যোগ্যতাহীন আমলা, যতসব দুর্বৃত্ত এবং কিছু ভালো কিন্তু অনভিজ্ঞ মন্ত্রীর দল।...

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হচ্ছে : বাংলাদেশ মনে করে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সারা দুনিয়ার একটা গরজ পড়ে আছে।... তারা মনে করে, যুদ্ধের সময় যেহেতু বিশ্ব জনমত তাদের পক্ষে থেকেছে, অতএব সব সময়ই সে রকমটিই থাকতে হবে।[১৮]

পরিকল্পনা কমিশন চালাচ্ছিলেন শিক্ষাবিদেরা. তাঁরা সবাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা বলতেন। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার যাত্রা শুরু হয় এর কার্যকারিতা নিয়ে কমিশনের সদস্যরা কখনোই খোলামেলা আলোচনা করেননি। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মেলনে প্রবীণ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মাযহারুল হক ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, ‘আমাদের অর্থনীতিবিদরা, যাদের সুনাম পশ্চিমা জগতেও আছে, তাঁরা কি আজ বুদ্ধিহীন, সাহসহীন, রুদ্ধবাক হয়ে গেছেন?’ তাঁর মতে, সরকার-আশ্রিত কিছু লোক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তারা অক্টোপাসের মতো দেশের অর্থনীতিকে নিজেদের কবলে নিয়ে গেছে। ‘সমাজকে শোষণহীন করার নামে বাংলাদেশে যে লুণ্ঠন চলছে, তার নজির ইতিহাসে নেই।’[১৯] ‘মুজিববাদ কী’—পরিকল্পনা কমিশনের কাছে এটা জানতে চেয়ে তিনি বলেন :

প্রত্যেক বড় বড় রাজনৈতিক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব এই স্লোগানটি দিয়ে থাকেন। আমি টেলিভিশন সেটের সামনে বসে বহুবার দেখেছি। কোনবার যে শতবার ‘মুজিববাদে আমাদের মুক্তি’ এই স্লোগানটি উচ্চারণ করেননি, আমি জানি না সুতরাং ‘মুজিববাদ’ যদি বাংলাদেশের সোশ্যালিজমের রূপরেখা হয়, পরিকল্পনা কমিশনের উচিত ছিল সেটা বিষদভাবে আলোচনা করা। আমরা আমাদের দারুণ দুরবস্থার মধ্যে ‘মুজিববাদে আমাদের মুক্তি’ এবং ‘আমার সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করব’ এই বিভ্রান্তিকর স্লোগান শুনে শুনে মূঢ়, হতবাক হয়ে যাচ্ছি।[২০]

যুক্তরাজ্যের *গার্ডিয়ান* ১৯৭৪ সালের ৯ আগস্ট ‘ডেথ অব এ নেশন’ শিরোনামে পিটার প্রেসটনের একটি নিবন্ধ ছাপে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের আসন্ন ঢাকা সফরের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে নিবন্ধকার লেখেন :

কিসিঞ্জার বাংলাদেশের প্রতি আস্থাশীল নন। তিনি ইতিপূর্বেই বাংলাদেশকে একটি ‘আন্তর্জাতিক বাস্কেট কেস’ বা তলাবিহীন ঝুড়ি বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর বর্তমান সফরে তিনি সহজেই ওই বাস্কেট কেসের তলা

পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন...

ঢাকা বর্তমানে একটা বিশাল ত্রাণশিবিরের শামিল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ অপরিমিত বিদেশি সাহায্য পায়। প্রায় ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ডের মতো. কিন্তু এই বিপুল সাহায্য কোথায় ব্যয় হয়েছে তার কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

পর্যবেক্ষক ও রাজনীতিবিদ সকলের তরফ থেকে দাবি উঠেছে, সব কিছুর মূলে রয়েছে বাস্কেটের তলার বিরাট গর্তটি। আর তা হলো দুর্নীতি।... বাংলাদেশকে সাহায্য দেওয়া মানে হলো হারিয়ে ফেলা।[২১]

এসব প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবনতিশীল অবস্থার করুণ ছবি ফুটে উঠছিল। মনে হয়, পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এর সঙ্গে যোগ হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

চুয়াত্তরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। এর সঙ্গে বেড়ে যায় মুদ্রাস্ফীতি এবং খাদ্যঘাটতি। জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে পড়ে। খাদ্যঘাটতি অবশ্য আগে থেকেই ছিল। ওই সময়ের সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল জনজীবনের দুর্দশার ছবি। কয়েকটি শিরোনাম এখানে উদ্ধৃত করা হলো[২২] :

যশোহরে ভুখা মিছিল (*গণকণ্ঠ*, ১২ আগস্ট ১৯৭২)।

দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—সংসার চালাইতে আমরা হিমশিম খাইতেছি (*ইত্তেফাক*, ২৪ আগস্ট ১৯৭২)

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে জাতিসংঘপ্রধানের আবেদন—আসন্ন দুর্ভিক্ষ থেকে বাংলাদেশকে বাঁচান (*গণকণ্ঠ*, ৭ জানুয়ারি ১৯৭৩)।

একদিকে মানুষ অনাহারে দিন যাপন করিতেছে অপর দিকে সরকারি গুদামের গম কালোবাজারে বিক্রয় হইতেছে (*ইত্তেফাক*, ৭ এপ্রিল ১৯৭৩)

কোনো কোনো এলাকায় মানুষ আটা গুলিয়া ও শাক-পাতা সেদ্ধ করিয়া জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছে (*ইত্তেফাক*, ৩ মে ১৯৭৩)

অনাহারে ১০ জনের মৃত্যু : বিভিন্ন স্থানে আর্তমানবতা'র হাহাকার : শুধু একটি ধ্বনি : ভাত দাও (*গণকণ্ঠ*, ১০ মে ১৯৭৩)

ন্যায্যমূল্যে দাফনের কাপড় কোথায় পাওয়া যায় (*ইত্তেফাক*, ৫ আগস্ট ১৯৭৩)

উদ্বেগজনক খাদ্য পরিস্থিতি (*ইত্তেফাক*, ২৩ মার্চ ১৯৭৪)

গ্রাম-বাংলায় হাহাকার : কচুঘেঁচুই বর্তমানে প্রধান খাদ্য (*ইত্তেফাক*, ১৬ এপ্রিল ১৯৭৪)

কুড়িগ্রামে চাউলের দোকান লুট (*ইত্তেফাক*, ২৮ এপ্রিল ১৯৭৪)

এক মুঠ নুন দ্যাও (*ইত্তেফাক*, ১ আগস্ট ১৯৭৪)

জামালপুরে অনাহারে ১৫০ জনের মৃত্যুর খবর (*ইত্তেফাক*, ১৩ আগস্ট ১৯৭৪)

খাদ্যাভাব : শহরে ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড় : অবিলম্বে লঙ্গরখানা খোলার দাবি (*ইত্তেফাক*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)

৪ হাজার ৩ শতটি লঙ্গরখানা খোলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ। দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান (*ইত্তেফাক*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)

রাজধানীর পথে পথে জীবিত কঙ্কাল (*ইত্তেফাক*, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮ জন শিক্ষকের বিবৃতি দেশ মন্বন্তরের করাল গ্রাসে : জরুরি ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি প্রণয়ন করিতে হইবে (*ইত্তেফাক*, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)

৭০ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি—দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্ন (*ইত্তেফাক*, ১ অক্টোবর ১৯৭৪)

রংপুর জেলায় প্রতিদিন অনাহার ও কলেরায় সহস্রাধিক লোক মরিতেছে (*ইত্তেফাক*, ২৩ অক্টোবর ১৯৭৪)

প্রধানমন্ত্রীর উক্তি অবাস্তব : বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির উদ্যোগ ৫৭ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি (*গণকণ্ঠ*, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৪)

বরিশালে অনাহারে ১২৬ ব্যক্তির মৃত্যু (*ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বর ১৯৭৪)

দুর্ভিক্ষে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু (*ইত্তেফাক*, ২ নভেম্বর ১৯৭৪)

খাদ্যমন্ত্রীর হিসাব মোতাবেক অনাহারে ও রোগে সাড়ে ২৭ হাজার লোক মারা গিয়াছে (*ইত্তেফাক*, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪)

উল্লিখিত শিরোনামগুলো থেকে এটাই মনে হয়, দুর্ভিক্ষ হঠাৎ করে আসেনি। অনেক দিন ধরেই তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল. এ সময় রফিক আজাদের একটি কবিতা নিয়ে হইচই পড়ে যায়। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের হাহাকার ফুটে উঠেছিল তার 'ভাত দে হারামজাদা' কবিতায়। এই কবিতার কয়েকটি লাইন ছিল এ রকম :

যদি না মেটাতে পারো আমার সামান্য এই দাবি,
তোমার মস্ত রাজ্যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটে যাবে;
ক্ষুধার্তের কাছে নেই ইষ্টানিষ্ট, আইন-কানুন—
সম্মুখে যা-কিছু পাবো খেয়ে যাবো অবলীলাক্রমে
থাকবে না কিছু বাকি -চ'লে যাবে হা-ভাতের গ্রাসে ...
দৃশ্য থেকে দ্রষ্টা অব্দি ধারাবাহিকতায় খেয়ে ফেলে

অবশেষে যথাক্রমে খাবো : গাছপালা, নদী-নালা,
গ্রাম-গঞ্জ, ফুটপাথ, নর্দমার জলের প্রপাত,
চলাচলকারী পথচারী, নিতম্ব-প্রধান নারী,
উড্ডীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়ি—
আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ
ভাত দে হারামজাদা, তা-না-হলে মানচিত্র খাবো।[২৩]

গুঞ্জন উঠলো, শেখ মুজিবকে ইঙ্গিত করে এটা লেখা হয়েছে। রফিক আজাদ ছিলেন জাতীয় রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক আনোয়ার উল আলমের বোন আদিলা বকুলের স্বামী। তারা সবাই তখন ঢাকার মোহাম্মদপুরে আসাদ অ্যাভিনিউয়ে আনোয়ার উল আলমের বাসায় থাকতেন। পুলিশ, হুলিয়া—পরিবারে আতঙ্কিত অবস্থা। রফিককে নিয়ে আনোয়ার প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেলেন।[২৪] এক সাক্ষাৎকারে রফিক আজাদ বলেছেন :

> শেখ সাহেব আমার সব কথা শুনলেন। আমাকে যেতে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এরপর আমার সামনেই ফোন দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বললেন, ওরে পাঠাইলাম। ওর কথা শুনে এই গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। পরে মনসুর আলী সাহেবের কাছে গেলে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলে তখনকার ডিআইজি সাহেবকে টেলিফোন দিলেন। এরপর এসবির অফিসে নিয়ে আমাকে আটকে রাখল। এই কবিতা কেন লিখেছি? কী লিখেছি কবিতায়, তার ব্যাখ্যা চাওয়া হলো আমার কাছে। বলা হলো, মুখে বললে হবে না, কাগজে লিখে দিতে হবে। কাগজ-কলম দেওয়া হলো আমাকে। সঙ্গে দুই কাপ চা। এরপর আমি লিখলাম ৬১ পৃষ্ঠার মতো দীর্ঘ এক লেখা।... লিখতে লিখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি আরও লিখেছিলাম, মানুষ যেন না খেয়ে মরে না যায় এ জন্য দেশ স্বাধীন করেছি। এখন না খেয়ে ভাতের অভাবে একটা মানুষও মরতে পারবে না। লেখা শেষ হলে আমাকে বের করে দেওয়া হলো। আমি চলে এলাম। আমি ওখানে আপস করি নাই। কবিরা কার সঙ্গে আপস করবে?[২৫]

চারদিকে অভাব আর দারিদ্র্য। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ছে হু হু করে। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ দৈনিক *পূর্বদেশে* ছাপা হওয়া উপ-সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে গেছেন প্রায় ৩০ জন সহকারী নিয়ে। কোনো দরকার ছিল না, কামাল হোসেন প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন। এদিকে ১৩৫০-১৯৪৩ সনের অনুরূপ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। রোজ লোক মরছে সারা দেশে খাদ্যাভাবে। ঢাকায় গত দুদিনে চাউলের দর (মোটা) ৫ টাকা সের থেকে ৮/৯ টাকা সেরে উঠেছে। আজ নাকি রায়েরবাজার, কারও খবর

অনুযায়ী শ্যামবাজারে, চাউলের বাজার লুট হয়েছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক।'[২৬]

ওই সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন মুহম্মদুল্লাহ। ১৯৭৪ সালের বন্যা এবং তার ফলে সৃষ্ট জনদুর্ভোগ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায় তাঁর স্মৃতিকথায়। পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত করা নিয়ে কিছু গাফিলতি থাকতে পারে বলে তাঁর লেখায় ইঙ্গিত আছে। ১৯৭৪ সালে বন্যা যখন কেবল শুরু হয়েছে, তখন বার্মার (মিয়ানমার) প্রেসিডেন্ট নে উইন রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন। ওই সময় শেখ মুজিবের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় তিনি দুই লাখ টন চাল ঋণ হিসেবে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহকেও তিনি একথা বলেছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব রাজি হননি। বলেছিলেন, 'ফসল ভালো হয়েছে এবং বিদেশি সাহায্য পেতে পারি, তখন ওই চাল শুধু শুধু নেব কেন?' মুহম্মদুল্লাহর মনে হয়েছিল, বার্মা থেকে ওই চাল নিলে দেশে চালের একটা বাফার স্টক মজুত থাকত। কিন্তু কেউ হয়তো শেখ মুজিবকে বার্মা থেকে চাল না কেনার সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করেছিল।[২৭]

পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান ড. নুরুল ইসলাম চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা), সম্ভাব্য শস্য উৎপাদন-ঘাটতি নিয়ে বাজারের অস্থিরতা, বৈরী বৈদেশিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সঙ্কটের সময় খাদ্য সাহায্য না পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এসব কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, দিনমজুরির ওপর নির্ভরশীল মানুষেরা খাবারের সংস্থান করতে পারেননি। মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রান্তিক চাষী, খেতমজুর এবং শহরের গরিব মানুষের প্রকৃত মজুরি দারুণভাবে কমে গিয়েছিল।[২৮]

বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সাহায্য পেয়ে আসছে। ১৯৭৩ সালের আগস্টে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবারও খাদ্য সাহায্যের অনুরোধ জানান। ওই সময় অনুদান ও আমদানি মিলিয়ে ২২ লাখ টন খাদ্যশস্য জোগাড়ের চেষ্টা চলছিল। যুক্তরাষ্ট্রকে তিন লাখ টন খাদ্য সাহায্য দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। পরে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এই সাহায্যের অনুরোধ দুই লাখ ২০ হাজার টনে নামিয়ে আনা হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য দেওয়ার বদলে শস্য বিক্রি করতে চেয়েছিল। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময় বিষয়টি আবারও তোলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিএল-৪৮০ বিধির আওতায় বাংলাদেশ খাদ্য সাহায্য পেত। এই সাহায্যের অন্যতম শর্ত ছিল যে, সাহায্য গ্রহণকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কোনো 'শত্রু' দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখবে না। যুক্তরাষ্ট্র সরকার জানতে পারে যে,

বাংলাদেশ শর্ত ভেঙে কিউবাতে চটের ব্যাগ রপ্তানি করছে। উল্লেখ্য যে, কিউবার সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি ছিল না। বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটে পড়ে বাংলাদেশ কিউবায় কিছু চটের ব্যাগ রপ্তানি করেছিল। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশকে কোনো আগাম সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রকে বলা হলো, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল কিউবায় পণ্য রপ্তানি করা সত্ত্বেও পার পেয়ে গেছে। বাংলাদেশকে বলা হলো যে, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো করপোরেশন বা তার অধীনস্থ কোনো সংস্থা এসব আমদানি-রপ্তানির সঙ্গে জড়িত থাকলে তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না। খাদ্য সাহায্য যেহেতু দুই সরকারের মধ্যকার বিষয়, বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।[২৯]

বাংলাদেশ থেকে কিউবায় চটের ব্যাগের শেষ চালানটি যায় চুয়াত্তরের অক্টোবরে। কিউবা বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু এবং বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া দেশগুলোর মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও কিউবায় আর কোনোকিছু রপ্তানি করা হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তটি ছিল বাংলাদেশের জন্য খুবই দুঃখজনক। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আইনের বেড়াজালে পড়ে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের এই আবদার হজম করতে হয়েছিল। শেষমেশ ১৯৭৪ সালের ৮ নভেম্বর বাংলাদেশকে দুই লাখ টন গম এবং ৫০ হাজার টন চাল সাহায্য দেওয়ার চুক্তি হয়। কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। বাজারে খাদ্যশস্যের দাম খুব বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হন। খাদ্য সাহায্য সময়মতো এলে বাজারে তার একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ত বলে অনুমান করা হয়।[৩০]

দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে দুর্ভিক্ষের খবর ফলাও করে ছাপা হচ্ছিল। হংকং থেকে প্রকাশিত *ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউর* প্রতিবেদক লরেন্স লিফশুলজ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার আগে শেখ মুজিবের ঘোষণা উদ্ধৃত করে লেখেন, প্রতি ইউনিয়নে একটি করে লঙ্গরখানা খোলা হবে; কিন্তু প্রতি ইউনিয়নের জন্য রোজ বরাদ্দ হলো মাত্র দু'মণ আটা, যা এক হাজার লোকের জন্য মাথাপিছু দৈনিক একটি রুটিও জুটবে না। ২৫ অক্টোবর ১৯৭৪ ছাপা হওয়া এই প্রতিবেদনে লিফশুলজ বলেন, সরকারি গুদাম থেকে যে খাদ্যশস্য বের হয়, তার বেশির ভাগই সাধারণ ও অসামরিক লোকদের কাছে পৌঁছায় না।[৩১]

কত লোক মারা গেছে, তার হিসাব নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। সরকারি হিসেবে দুর্ভিক্ষে ২৬ হাজার থেকে ৩৭ হাজার লোক মারা যায়। বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক মহিউদ্দিন আলমগীর মৃতের সংখ্যা ১৫ লাখ বলে উল্লেখ করেছিলেন। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, মৃতের সংখ্যা

ছিল আরও বেশি এবং ত্রাণ তৎপরতা ছিল খুবই কম।[২২] গ্রাম থেকে অভাবী মানুষ খাবার ও কাজের আশায় ঢাকায় ভিড় করছিল, বাড়ি বাড়ি ভাতের ফ্যান চেয়ে বেড়াচ্ছিল। বাজারে দশ টাকা সের দরে চাল পাওয়া গেলেও অনেকেরই তা কিনে খাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। পথে-ঘাটে না খাওয়া মানুষের লাশ পড়ে থাকত। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক আমানউল্লাহ এক সাক্ষাৎকারে কিছু তথ্য দিয়েছেন যা হৃদয় ছুঁয়ে যায় :

> ওই সময় আমি তথ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ডেমরার কাছে নদীর মধ্যে একটা দ্বীপ বা চর আছে। কয়েকঘর বসতিও আছে, আর আছে একটা কবরস্থান। শুনলাম ওখানে নামধামহীন লোকের লাশ দাফন করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের এ ব্যাপারে কোনো তথ্য দেওয়া নিষেধ। আমি সেখানে গিয়ে কবরস্থানের কেয়ারটেকারের সঙ্গে কথা বললাম। একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হলো। সাংবাদিক পরিচয় গোপন করলাম। নোটবই ও কলম বের করলাম না. ঠিক করেছি, মেন্টাল নোট নেব। শুরু করলাম আলাপ।
>
> —ভাই, সাংবাদিকরা নিশ্চয়ই আপনাকে খুব বিরক্ত করে?
>
> —হ্যাঁ, ঠিক বলছেন।
>
> —তাই তো, এত খবরের দরকার কী? তা এখানে নিশ্চয়ই বেশি লাশ দাফন হয় নাই? কী বলেন? এটা কি ইদানিং বেড়েছে?
>
> —হ্যাঁ, না, এখন একটু বেশি।
>
> আমি দেখলাম, তার সামনে একটা রেজিস্টার খাতা, সে ওটাতে চোখ বুলাচ্ছে। পাতার পর পাতায় কী সব লেখা। মনে হলো, আমাকে সে আস্থায় নিয়েছে।
>
> —হ্যাঁ, দাফন হইছে বেশ কিছু। আপনাকে বলতে অসুবিধা নাই। এই দেখেন সব পাতা ভইরা গেছে। অনেক লাশ।
>
> আমি ইউপিআই-এর জন্য কয়েকটা রিপোর্ট তৈরি করেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম আইল্যান্ড অব ডেথ, গ্রেভস অ্যান্ড গ্রেভস : নো হিউম্যান বিইংস, ইত্যাদি।
>
> তখন তো আমি একই সঙ্গে *ভয়েস অব আমেরিকা* আর *ডেইলি টেলিগ্রাফের*ও করেসপনডেন্ট। আরও রিপোর্টের জন্য তাগাদা এল। হঠাৎ মনে হলো, বেওয়ারিশ লাশ তো দাফন করে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম। ওদের কাছে গেলে হয়তো অনেক তথ্য পাব। গেলাম ওদের অফিসে, পুরান ঢাকায়। কর্তৃপক্ষকে বললাম, ভাই, আপনাদের লাশবাহী গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে আমাকে বসার অনুমতি দেন। ওরা রাজি হলো. ওদের লাশবাহী গাড়িতে চড়ে ঘুরতে থাকলাম। দেখলাম, পথের পাশে লাশ পেলেই ওরা

> গাড়িতে তোলে। সবই বেওয়ারিশ। এক সময় এলাম সদরঘাটে। ড্রাইভার গাড়িটা রাস্তার ডান দিক ঘেঁষে পার্ক করল দেখি একটা লোক কোনোমতে হেঁটে এল ধুঁকতে ধুঁকতে। অস্থিচর্মসার দেহ, পেট-পিঠ একাকার। গাড়িতে সে একটা হাত রাখতে না রাখতেই কলাপ্স করল, পড়ে গেল রাস্তায়। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই সব শেষ। হি লেফট দ্য গভর্নমেন্ট, দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। আঞ্জুমানের লোক আমার সামনেই তাকে গাড়িতে তুলল। এটা মনে হলে এখনো আমি শিউরে উঠি।[৩৩]

এ সময় কুড়িগ্রামের এক অজপাড়াগাঁয়ের মেয়ে বাসন্তীর জাল গায়ে দেওয়া ছবি *ইত্তেফাক*-এ ছাপা হলে হইচই পড়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, ছবিটি ফরমাশ দিয়ে তোলা হয়েছে সরকারকে বিব্রত করার জন্য, শাড়ির চেয়ে জালের দাম তো বেশি ইত্যাদি। সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন খোঁজখবর নেওয়ার জন্য বাসন্তীর গ্রামে যান এবং তার সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত করেন যে, ছবিটি আসল। গেরস্তের ঘরে দু-একটা জাল থাকেই। ঘটনাটি তিনি তাঁর *পথ থেকে পথে* বইয়ে উল্লেখ করেছেন। এর ২২-২৩ বছর পর *ইত্তেফাকে*র আলোকচিত্রী আফতাব আহমদ বলেছিলেন, ছবি তোলার ব্যাপারটি ছিল সাজানো। আফতাবের কোন কথাটি সত্য, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

চুয়াত্তর সালের দিকে কাপড়ের অভাবে অনেক মেয়ে যে ঘর থেকে বেরোতে পারতেন না তার একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায় অধ্যাপক মো. আনিসুর রহমানের ভাষ্যে ওই সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের একটি রিলিফ টিম নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কয়েকটি গ্রামে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও একজন শিক্ষক এবং ২০ জন ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> একটি গ্রামে নেমে মহিলাদের আলাদা করে ডেকেছিলাম। মাত্র সাত-আটটা শাড়ি আছে আমাদের কাছে, এই গ্রামে বড় জোর দুটো শাড়ি দিতে পারি। কাকে দেব?
>
> বন্যার পানিতে ভেজা শতচ্ছিন্ন শাড়ির আঁচল তুলে দেখায় মহিলারা। বড় বড় ফুটো, শরীর দেখা যায় চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়
>
> 'আপনার শাড়ির অবস্থা সত্যিই খারাপ, তাকাতে লজ্জা লাগে। কিন্তু কোনো ঘরে কি এমন সোমত্ত মেয়ে আছে যে, এটুকু দেখাতেও আসতে পারে না তার পরনে কিছুই নেই বলে? যদি থাকে, আপনি তো খালাম্মা, তার কথা কি আগে বলবেন না?'
>
> আস্তে আস্তে মাথা নামায় খালাম্মা। দুই হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে ভেজা ছেঁড়া আঁচলের প্রান্তটা আস্তে আস্তে একবার এদিক একবার ওদিক পাকাতে

থাকে। যেন নিজেরাই সত্তার একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরে দেখছে। কিছুক্ষণ পরে এমনিভাবে পাকাতে পাকাতে বলে, 'হেই দুই ঘরে দুডা সেয়ানা মাইয়া আছে। তাগো পরনে কিছু নাই, বার হতি পারে না। শাড়ি দুইডা তাগো দ্যান, আমি চাই না শাড়ি।'[৩৩]

জালপরা বাসন্তী, সঙ্গে দুর্গতিরানি

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ সর্বস্তরের মানুষকে নাড়া দিয়েছিল। ১১ অক্টোবর ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক নাগরিক সমাবেশে বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ সভায় 'মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলনের' ব্যাপারে নভেম্বরে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে একটি গণজমায়েত অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়। সভার উদ্যোক্তারা এক বিবৃতিতে বলেন :

> গত তিন বছর ধরে মানুষ নামধারী একশ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতাবান অমানুষের নির্লজ্জ শোষণ, তস্করবৃত্তি, সন্ত্রাসবাদ, চাটুকারিতা, প্রতারণা ও দুঃশাসনের যে প্রতিযোগিতা চলেছে, তারই ফল বর্তমান মন্বন্তর। এক কথায় বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক সংকট গত তিন বছরের লুটেরা শাসন, শোষণ ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণেরই ফল।[৩৫]

বিবৃতিতে ৮২ জন স্বাক্ষরদাতার মধ্যে ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর, মো. আনিসুর রহমান, ড. আহমদ শরীফ, মির্জা গোলাম হাফিজ, কামরুন্নাহার লাইলী, ড. মহিউদ্দিন আলমগীর, বদরুদ্দিন উমর, প্রাণেশ সমাদ্দার, গিয়াস কামাল চৌধুরী, আলী আশরাফ, মওদুদ আহমদ, আমেনা বেগম, হেলাল হাফিজ, ওয়াহিদুল হক, এনায়েতুল্লাহ খান, আহমদ ছফা, নাজিমুদ্দিন মানিক, আবুল কাসেম ফজলুল হক, মনসুর মুসা, ফয়েজ আহমদ, বিনোদ দাশগুপ্ত, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, আবরার চৌধুরী, স্বপন আদনান, মো. মনিরুজ্জামান মিয়া, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনোয়ার জাহিদ, আফতাবউদ্দিন আহমাদ, গাজিউল হক, সায়েরা আহমেদ, রেখা আহমেদ, বিলকিস রহমান, আসমা রহমান, রীতা রহমান প্রমুখ।[৩৬]

মানুষের দুঃখ-দৈন্য এবং বিরাজমান সঙ্কটের ছবি সমসাময়িক কথাসাহিত্যেও ফুটে উঠেছিল। চুয়াত্তরের নভেম্বরে শাহরিয়ার কবিরের একটি উপন্যাস ছাপা হয়েছিল সাপ্তাহিক *বিচিত্রায়*। পরে এর একটি বর্ধিত সংস্করণ বের হয়। 'ওদের জানিয়ে দাও' উপন্যাসের একটি বর্ণনা এ রকম :

> ট্রেনের মতো বাসেও একই আলোচনা—জিনিসপত্রের দাম, দুর্ভিক্ষ, চোরাচালান এইসব। কুমিল্লায় দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হার সবচেয়ে কম। সম্ভবত মৃত্যুর হার কম বলেই ভিক্ষুকের সংখ্যা বেশি। চলন্ত বাসেও কয়েকজন ভিক্ষে করছে। রাহেলা বাস থেকে নামার পর ওর সাজগোজ দেখে ভিখিরিরা হামলে পড়েছিল। দুঃখের ভেতরও পূরবীর হাসি পেল। কলেজে থাকতে পড়া মানিক বন্দোপাধ্যায়ের একটি গল্পের কথা মনে পড়ল—'কেড়ে খায়নি কেন?' এই মানুষগুলো যেদিন ভিক্ষে না চেয়ে গ্রাম থেকে লাখে লাখে শহরে ছুটে যাবে সব কিছু কেড়ে নেয়ার জন্য তখন কী হবে? বেশি দূর ভাবতে পারল না পূরবী।

বাসের একজন যাত্রী, সম্ভবত আওয়ামী লীগের কোনো পাতিনেতা হবে, পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির ওপর মুজিব কোট, তার ওপর উড়ুনির মতো গলায় চাদর ঝোলানো। স্থূলবপু লোকটা দুজনের জায়গা দখল করে পান চিবোতে চিবোতে গল্প করছিল। আশেপাশে অনুগত কয়েকজন গোগ্রাসে সেই গল্প গিলছিল। মুখের ভেতর পানের পিকটুকু অদ্ভুত কৌশলে জমিয়ে রেখে লোকটা বলল, 'বুঝলা লাতুর বাপ, কাফনের কাপড় কিনতে কিনতেই আমি শ্যাষ হইলাম, ফকিরগুলো মরণের আর জায়গাও পায় না। সব আইসা মরে আমার এলাকায়। গতকালও চাইরটা মরছে ভেদবমি হইয়া।'

যাকে উদ্দেশ্য করে বলা, থুতনিতে ছাগুলে দাড়িওয়ালা টাউট ধরনের লোকটা তোষামোদের সুরে বলল, 'আপনের এলাকায় মরলে তো কাফনের কাপড় পায়। আমাগো এলাকায় মরলে কাফন আর কপালে জুটে না, হিয়াল কুত্তায় কামড়াইয়া খায়। আল্লার মর্জি, যাগো কপালে কাফনের কাপড় লেখা আছে হেরা আপনের এলাকায় গিয়া মরে। আল্লার নেক বান্দারাই কাফন পায়।'[৩৭]

২২ নভেম্বর ১৯৭৪ খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী আবদুল মমিন জাতীয় সংসদে একটি বিবৃতি দেন বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, 'স্বাভাবিক অবস্থা মোকাবিলার জন্য আমাদের হাতে যদিও যথেষ্ট খাদ্য মজুত ছিল, কিন্তু ভয়াবহ অবস্থা মোকাবিলার জন্য আমাদের যথেষ্ট খাদ্য মজুত ছিল না।' খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতির পর জাসদের সাংসদ আবদুল্লাহ সরকার 'অনাহার ও ব্যাধির কারণে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে সংসদে পাঁচ মিনিট নীরবতা পালনের' প্রস্তাব দেন। জাসদের অপর সাংসদ ময়নুদ্দিন আহমদ মানিকও প্রস্তাবটির পক্ষে বক্তব্য দেন। আওয়ামী লীগের সাংসদ ডা. আসহাবুল হক ও শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। স্পিকার আবদুল মালেক উকিল সিদ্ধান্ত দেন, 'অনেস্ট উইশেস অব দ্য হাউজ হিসেবে প্রসিডিংসে প্রস্তাবটি এভাবে উল্লেখ করা হবে : দুর্ভিক্ষজনিত কারণে, অনাহারে বা বন্যায় অথবা ব্যাধিজনিত কারণে বাংলাদেশে যেসব মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তাদের প্রতি এই সংসদ সহানুভূতি প্রকাশ করছে'।[৩৮]

৪

আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার মিত্রদের দূরত্ব এ সময় আরও বেড়ে যায়। অবলুপ্ত গণঐক্যজোটের অন্যতম শরিক বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ২৭-২৯ অক্টোবর (১৯৭৪) অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদের রিপোর্টে বলা হয়, 'দেশে গভীর সংকট বিরাজ করিতেছে। সরকার কেবলমাত্র শাসক দল আওয়ামী লীগ ও প্রশাসনযন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল থাকিয়া বর্তমানে প্রচলিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মাধ্যমে সংকট মোকাবিলা করিয়া দেশকে অগ্রগতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিতেছে না। তাই অনতিবিলম্বে দেশে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা একান্ত জরুরি বলিয়া বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করিতেছে।'[৩৯]

একদিকে মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থা, অন্যদিকে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, এর মধ্যে পর্দার আড়ালে অনেক কিছুই ঘটে যাচ্ছিল। এ বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য দিয়েছেন পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নুরুল ইসলাম :

> অবনতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এই সময়ে চুয়াত্তরের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত আঁদ্রে ফোমিন একদিন আমার অফিসে এলেন। এই সময়ের চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করা যায় এ বিষয়ে তিনি কথা বলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এখন দরকার শক্ত নেতৃত্ব। শেখ মুজিব খুবই দয়াবান, দুর্বল এবং প্রায়শ দোদুল্যমান। এই পরিস্থিতিতে ক্ষমতার কেন্দ্রে উচ্চগুণসম্পন্ন এবং লক্ষ্যে অবিচল একজন নেতার প্রয়োজন। শেখ মণির এসব গুণ আছে। শেখ মুজিবের উচিত তাঁকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া এবং দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হিসেবে দৈনন্দিন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া।... সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত খুব রাখঢাক করে কথাটা বলেননি। ওই সময় শেখ মণির রাজনীতিতে অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে ওঠা নিয়ে গুজব ছিল। রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য ওই গুজবকেই সমর্থন করে।...
>
> কিছুদিন পরে শেখ মণি সম্পাদিত *বাংলার বাণী*তে ছাপা হওয়া এক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, দেশের অর্থনৈতিক অব্যবস্থার জন্য দায়ী হলো বাজে পরিকল্পনা। অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ-হার্ভার্ডের মতো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেওয়া লোকেরা আমাদের দেশের জন্য অপ্রয়োজনীয়। আমাদের দেশি রোগের চিকিৎসার জন্য দরকার হেকিমী বা আয়ুর্বেদ জানা দেশি ডাক্তার।... আমি ওই সম্পাদকীয়ের একটা কপি নিয়ে

> গেলাম শেখ মুজিবের কাছে। মনে হলো, তিনি আগে এটা দেখেননি। তিনি এই বিষয়ে গুরুত্ব না দিতে আমাকে পরামর্শ দিলেন।[৪০]

আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারাও স্বস্তিতে ছিলেন না। ১২ নভেম্বর ১৯৭৪ ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের অফিসে এক কর্মীসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে দলের সভাপতি এ এইচ এম কামারুজ্জামান আক্ষেপ করে বলেন, 'জাতি সংকটের মধ্যে অবস্থান করিতেছে এবং আমরা সমস্যার সমাধান করিতে পারি নাই—এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে।'[৪১]

শেখ মুজিব ধীরে ধীরে একা হয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীও এ সময় তাঁর কড়া সমালোচনা করতে পিছপা হননি। আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ তাঁর সমাধি প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবুল ফজল বলেন, 'সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না; তিনি প্রধানমন্ত্রীই হোন আর বঙ্গবন্ধুই হোন।'[৪২]

মেজর শরিফুল হক ডালিম আর মেজর নূর চৌধুরী সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত হয়েছেন, লে. ক. আকবর হোসেন সদ্য অবসরে গেছেন। ডালিমের ভাই স্বপন আগে থেকেই ব্যবসা করতেন। এবার তারা সবাই মিলে তৈরি করলেন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তাদের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে তৈরি SANS International-এর যাত্রা শুরু হলো। এটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় মালামাল সরবরাহ করতেন। এ কাজে তাঁরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। ফলে সেনানিবাসগুলোতে তাঁদের যোগাযোগ ও যাতায়াত অব্যাহত থাকল। পুরোনো সম্পর্কগুলো তাঁরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে কাজে লাগালেন। অফিস ছিল মতিঝিলে, টয়েনবি সার্কুলার রোডে। সেখানে আসতেন নানা ধরনের মানুষ। রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদেরও আনাগোনা ছিল।[৪৩]

তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রিত্ব হারান ২৬ অক্টোবর ১৯৭৪। ওই দিন সন্ধ্যায় ডালিম তাঁর বাসায় যান। সরকারি বাসা ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাজউদ্দীন তখন জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করে দিয়েছেন। লনে বসে তারা দুজন কথাবার্তা বলেন। ডালিম বিদায় নেওয়ার সময় তাজউদ্দীন জানতে চাইলেন, ভবিষ্যতে দেখা হবে কি না। ডালিম বললেন, কোনো সমস্যা নেই। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, মাঝে মধ্যে তাঁরা দেখা করবেন। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাজউদ্দীনকে ডালিম শ্রদ্ধা করতেন।[৪৪]

ডালিম একদিন বসে আছেন তাঁর অফিসে। এমন সময় এসে হাজির হলেন তার শ্বশুরের বড় ভাই *পাকিস্তান টু ডে*-এর সাবেক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম

চৌধুরী। তার স্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীনের স্ত্রী জোহরা তাজউদ্দীনের বোন। তাদের কথোপকথন ছিল এ রকম :

—কাকু, কী মনে করে?

—আমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। তাজউদ্দীন তোমাকে যেতে বলেছে, এটা খুব জরুরি।

—কোথায়?

—তাঁতিবাজারে, আমার বাসায়।

—ঠিক আছে, কাল লাঞ্চের পর নূর আর আমি যাব।

পরদিন ডালিম আর নূর যথাসময়ে তাঁতিবাজারে সিরাজুল ইসলামের বাসায় উপস্থিত হলেন। তাজউদ্দীন সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো।

—দেশের অবস্থা কেমন দেখছ?

—যে দেশ আপনি তৈরি করেছেন, আমার মনে হয় তার সমস্যার অন্ত নেই।

—তোমরাই তো দেশ স্বাধীন করেছো।

—তাই কি? আমরা যে এভাবে স্বাধীন হতে চাইনি তা আপনার চেয়ে বেশি কে জানে? একাত্তরে আমরা যা আশঙ্কা করছিলাম, এখন কি তাই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে না? যা হোক, পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। বলুন, কেন ডেকেছেন?

—দেশটাকে বাঁচাতে হবে।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু কীভাবে?

—কেবল সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই মানুষের সার্বিক মুক্তি সম্ভব।

—এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। আপনারা তো সব সময় বুর্জোয়া পলিটিকস করেছেন। এখন চাচ্ছেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। কেমন করে সম্ভব? মানুষ আপনাদের বিশ্বাস করবে কেন? আওয়ামী লীগ তো একটা বুর্জোয়া সংগঠন। শেখ মুজিবকে দোষ দিয়ে কী লাভ? এ ধরনের দল দিয়ে তো কেউ সমাজতন্ত্র আনতে পারবে না। আমি নিশ্চিত যে আপনি এটা স্বীকার করবেন। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, সমাজতন্ত্র শব্দটাকে আপনারা যেভাবে কুখ্যাত করেছেন, এদেশের মানুষ ভয়ে আর তার নাম নেবে না সামনের বছরগুলোতে। বলুন, আপনার রাজনীতিটা এখন কী হবে।

—রাজনীতি নিয়ে তোমরা কি ভাবো?

—জানি না, 'তোমরা' বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন। তবে এটা সত্য যে সশস্ত্র বাহিনীর একটা বড় অংশ কিন্তু রাজনীতি-সচেতন।

—শুনে খুশি হলাম। কালো মেঘের মধ্যে রুপালি রেখা দেখতে পাচ্ছি। আমি

সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। কীভাবে এর প্রয়োগ হবে তা একটি দেশের বা সমাজের বাস্তব অবস্থার ওপর নির্ভর করে। ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতে সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ সোভিয়েত মডেলে হচ্ছে না। নীতিগত প্রশ্নে ভারত মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সমর্থন দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নও দিয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুক্তি সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন সব রকমের সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী এবং মৌলবাদী শক্তিগুলো এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে। তাদের এ চক্রান্ত কি আমাদের দেশের জন্য ভালো হবে?

—মৌলবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, এগুলো নিয়ে কথাবার্তা কেবল শহুরে মধ্যবিত্তের ড্রয়িংরুমের মধ্যেই আছে। তাদের সংখ্যা এক বা দুই শতাংশের বেশি না। ভারত যদি বাংলাদেশকে কবজা করতে পারে, তাহলে ভারতের অন্যান্য জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলো হোঁচট খাবে। ভারত তো একটা বহুজাতিক দেশ।[৪৫]

ডালিমের সঙ্গে আলাপ তখনকার মতো শেষ হলো। তাজউদ্দীন বললেন, এ নিয়ে আরও কথা হবে। তিনি আরও বললেন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) হবে তার রাজনীতির বাহন। এসব কথা বিস্তারিতভাবে ওঠে এসেছে ডালিমের লেখা *বাংলাদেশ—আনটোল্ড ফ্যাক্টস* বইয়ে। ডালিমের বর্ণনায় আছে :

> একদিন আমরা কর্নেল তাহেরের সঙ্গে দেখা করতে নারায়ণগঞ্জে গেলাম। কথাবার্তা বলার সময় আমরা তাজউদ্দীনের সঙ্গে জাসদের সম্পর্ক কী, তা জানার চেষ্টা করলাম। তাহেরের ব্যক্তিগত ধারণা, তাজউদ্দীনের সঙ্গে জাসদের দলগত কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হলো। মনে হয়, তাহের বিষয়টা জানেন না। অথবা এমনও হতে পারে, জাসদের হাইকমান্ডের অন্য কারও সঙ্গে তাজউদ্দীনের গোপন যোগাযোগ আছে, যা অন্য নেতারা জানেন না।[৪৬]

কয়েকদিন পর তাজউদ্দীনের সঙ্গে ডালিমের দ্বিতীয় দফা বৈঠক হয়। তাঁরা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন। ডালিমের ভাষ্য মতে, তাঁরা আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, কামারুজ্জামান, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, এ আর মল্লিক, আবদুল মালেক উকিল, ফণীভূষণ মজুমদার, মনোরঞ্জন ধর, দেওয়ান ফরিদ গাজী এবং আবদুল মান্নান। তাঁরা সবাই শেখ মুজিব এবং তার সরকার পরিচালনার ব্যাপারে আস্থা হারিয়েছেন। মন্ত্রিসভা থেকে তাজউদ্দীনের বিদায়ের পর তাঁরা অনেকেই ঝুঁকিতে পড়েছেন। শেখ মুজিব তরুণ নেতাদের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় তাঁরা অনেকেই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন।[৪৭]

এ সময় আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাসদের একটা সমঝোতার চেষ্টা হয়। শেখ মুজিব নিজেই এটা চেয়েছিলেন। জাসদের সঙ্গে যোগাযোগের কাজটি করেন ব্যবসায়ী সাইদুর রহমান। শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। একই সঙ্গে তিনি জাসদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাসদের যোগাযোগের এই পর্বটি সম্পর্কে দুই দলের কোনো নেতা আজ পর্যন্ত মুখ খোলেননি। সাইদুর রহমানের দেওয়া বিবরণে জানা যায় :

> শেখ সাহেব আমারে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিল। জাসদের রি-ইউনিয়ন উইথ আওয়ামী লীগ। বললেন, 'আপনি সিরাজুল আলমরে নিয়া আসেন।' সিরাজুল আলম খানের লগে ডিটেইলস আলাপ করলাম।
>
> এরপর তিন মাস বহু ডায়ালগ-ফায়ালগ হইল। সিরাজ বলল যে, 'সমঝোতা হবে না।' পরে বলল, 'রব, ইনু, মার্শাল মনি, আম্বিয়া-টাম্বিয়া এরা যারা আছে, এদেরকে আমি যদি বলি, তাইলে আমি দালাল হইয়া যাই। আমার দিক থিকা আপনারে ক্লিয়ারেন্স দিলাম। কিন্তু আমার লগে কথা হইছে, এইটা বলতে পারবেন না। ওরা যদি বলে আমার লগে কথা বলতে, পরে দেখব। তখন আমি একটা ইয়া টিয়া কইরা'—এই একটা নাটক তারপর রব-টবরে বললাম। ওরা কয়, 'আমরা রাজি হইলেও সিরাজ ভাই রাজি হইব না। সিরাজ ভাইরে যদি রাজি করাইতে পারেন, তাইলে আমাদের আপত্তি নাই।' সিরাজরে কইলাম বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। এক কাজ করেন। ওদেরকে বলেন আমারে বলতে।' তারপর আবার ওদেরকে বললাম।
>
> সিরাজ বলল, 'আপনে শেখ সাহেবের লগে কথা বলেন।' সেই নেগোসিয়েশনটা তিন মাস চলল। একদিন ফাইনাল মিটিং। শেখ সাহেব বলল, 'সিরাজরে বাসায় নিয়া আসেন।' 'বাসায় নিয়া আসলে তো লোকে দেইখা ফেলবে।' বলল, রাত এগারোটার পর নিয়া আসতে। 'গেইট দিয়া ঢুকলে তো দেখবে।' বলল, 'আমার বাসায় কেমনে ঢুকতে হয় সিরাজ জানে।' ওনার বাসার পিছনে যে ওয়ালটা ছিল, আলাদা ইট দিয়া একটা জায়গা আছিল, আলগা ইট। ইট সরাইয়া ওইখান দিয়া ঢুকা যাইত। পাকিস্তান আমলে তারা রাত্রিবেলা ওইভাবে দেখা করত। সিরাজ জানে, কোনখান দিয়া যাইতে হইব।
>
> সিরাজরে নিয়া সামনের গেট দিয়া ঢুকলাম। গেটে আমার কথা বলা ছিল। আমাকে বলছিল, উপরে চইলা আসেন, ছাদে। ওইখানে বইসা কথাবার্তা হইব। সিরাজ একটা কাগজ নিয়া গেছিল। সিঁড়ির মুখে উনার বেডরুমটা ছিল। আমি সামনে, সিরাজুল আলম পিছনে। উইঠা ডাইন দিকে ঘুইরা ওপরের তলায় যাব। উনি চোখ টিপ দিলেন। আমি মনে করছি, উনি বুঝি রুমে ঢুকতে বলছে। আমি ঢুকলাম। আমার পিছে সিরাজ। উনি খুব

এমব্যারাস্‌ড হইয়া গেলেন। 'সিরাজ, কী রে তোর যে দেখা নাই, কী মনে কইরা আইলি?' এমন ভাব যে, তার লগে কোনো কথা নাই। ওইখানে ভাবী বইসা রইছে। ডাইনিং রুমটা ছিল অপজিটে। সেইখানে জামাল আর শেখ শহীদ। ওরা সিরাজরে দেখল। তার মানে জিনিসটা এক্সপোজড হইয়া গেল। অর্থাৎ এই তিন মাস যে শ্রম দিলাম, গাড়ি চালাইলাম, তেল পুড়াইলাম, সব শেষ হইল। এরপরে উপরে উঠলাম। কথাবার্তা হইল। উনিও বুঝল যে, এইটা আর হবে না। ওরা মণিরে (শেখ ফজলুল হক মণি) খবর দিছে। মণি এইটার বিরুদ্ধে।

সিরাজ বলল, 'আপনি যে পথে যাইতে আছেন, অনেক ঝামেলার মধ্যে পড়বেন।' উনি বললেন, 'ইমার্জেন্সি দিমু।' সিরাজ কইল, 'ইমার্জেন্সি দিলে এরপর...।' বলল, 'তুই বেশি কথা কস।'[৪৮]

শেখ মুজিবের সঙ্গে খোলামেলা কথা হয়েছিল সিরাজুল আলম খানের। দুদিক থেকেই সমঝোতার উদ্যোগ এবং ইচ্ছে ছিল। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিরাজুল আলম খান বলেন :

মুজিব ভাই আমার হাত ধরে বললেন, 'সিরাজ, তুই জলিল আর রবকে আমার দলে দে। তোরা তো এটাই চেয়েছিলি?' আমি বললাম, আমি তো আপনারই ছিলাম। জাসদ তো আপনারই দল। কিন্তু আপনি যেটা করতে চাচ্ছেন, তার সঙ্গে আমরা একমত না।[৪৯]

২ জানুয়ারি (১৯৭৫) শেখ মুজিবের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের আরেকবার বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। শেখ মুজিব সাইদুর রহমানকে দিয়ে বার্তা পাঠালেন, ২ তারিখের মিটিংটা হবে না। ২৮ ডিসেম্বর (১৯৭৪) রাতে সরকার সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে। এরপর সিরাজুল আলম খান সড়কপথে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যান। শেখ মুজিবই তাঁকে কলকাতা চলে যেতে বলেছিলেন।[৫০]

সমঝোতা

একাত্তরের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়াটা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি সচেতন সিদ্ধান্ত। এর ফলে প্রবাসী সরকারের কর্মকাণ্ডের দায় যেমন তাঁকে নিতে হয়নি, তেমনি একাত্তরে এ দেশের ওপর দিয়ে কী তাণ্ডব বয়ে গেছে, এটাও তিনি দেখার সুযোগ পাননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর নামেই দেশটা স্বাধীন হয়ে যায়।

কেউ কেউ মনে করেন, একাত্তরে জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল। এটা একটা মিথ বা ভ্রান্ত ধারণা. দেশের ভেতরে অবরুদ্ধ মানুষ ছিল সন্ত্রস্ত। মুজিবনগর সরকারে ছিল নানা রকম দলাদলি। সত্তরের নির্বাচনে ৪২ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ ভোট দেননি। যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ২৫ দশমিক ১ শতাংশ ভোটার আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেননি। যাঁরা আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের ভোট দিয়েছিলেন, তাঁরা কয়জন স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন, তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। ২৫ মার্চ-পরবর্তী পরিস্থিতি নতুন বাস্তবতার জন্ম দিয়েছিল। বাহাত্তর সালে বাংলাদেশে পুরোনো রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

১৬ ডিসেম্বর নতুন গজিয়ে ওঠা নকল মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় ছিলেন সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে অনেক বেশি। তাদের বাড়াবাড়ি আচরণের কারণে মুক্তিযুদ্ধ অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। একাত্তরে অনেকেই ভারতে গিয়েছিলেন, যাঁদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সামান্যতম সম্পর্ক ছিল না। তাঁদের অনেকেই দেশে ফিরে অবরুদ্ধ মানুষদের দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ করতে শুরু করেন। তাঁরা এমন একটা ধারণা তৈরির চেষ্টা করেন যে, যাঁরা সীমান্ত পাড়ি দিয়েছেন, তাঁরা সবাই 'মুক্তিযোদ্ধা', আর যাঁরা দেশের ভেতরে ছিলেন, তাঁরা সবাই 'রাজাকার'। একাত্তরের যুদ্ধের সময় ঢাকা বেতারের অনেক শিল্পী নানান অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে দালালি করেছেন—এই অভিযোগে তাঁদের হয়রানি করা হয়। এঁদের মধ্যে আবদুল আহাদ, আতিকুল ইসলাম, আবদুল আলীম এবং ফেরদৌসী রহমানের মতো জনপ্রিয় শিল্পীও ছিলেন। ৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৭২) সাপ্তাহিক *হলিডে* পত্রিকায়

সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান 'সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন কলাবরেটরস' শিরোনামে একটা নিবন্ধ ছাপলেন। দেশটা যেন দুই ভাগ হয়ে গেল।

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি 'রাষ্ট্রপতির ৮ নং আদেশ' নামে 'বাংলাদেশ যোগসাজশকারী বা দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ, ১৯৭২' জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর অনুরোধে এই আইনের খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন প্রবীণ আইনজীবী খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন আহমদ। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিনের যোগাযোগের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন খান বাহাদুরের দৌহিত্র সাংবাদিক সালিম সামাদ। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> আমি তখন লক্ষ্মীবাজারে ঋষিকেশ দাস রোডে নানার বাসায় থাকি। ঘরে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল ছুটে গিয়ে ধরলাম। ওপাশ থেকে একজন বললেন, 'বঙ্গভবন থেকে বলছি, খান বাহাদুর সাহেব আছেন'? জিজ্ঞেস করলাম, কে বলছেন? উত্তর এল, 'মাননীয় রাষ্ট্রপতি কথা বলবেন।' আমি ছুটে গিয়ে নানাকে ডেকে আনলাম। তাঁরা কিছুক্ষণ কথা বললেন আমি নানার ব্যাগ গুছিয়ে দিলাম। ব্যাগে অনেক বইপত্র থাকত। তিনি ব্যাগ হাতে আট আনা ভাড়ায় একটা রিকশা নিয়ে বঙ্গভবন রওনা হলেন।[১]

নাজিরউদ্দিন আহমদ ১৯৩৭-৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার এবং ১৯৪৭-৫১ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। ভারতের সংবিধান তৈরিতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ঢাকায় ১৯৬৮ সালে যখন 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হয়, তাতে তিনি অভিযুক্তদের পক্ষে অন্যতম কৌঁসুলি ছিলেন। দালাল আইনের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।[২] এই আইনের দ্বারা পাকিস্তানি 'দখলদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের ওপর অবৈধ দখল রক্ষা করা, বজায় রাখা, জোরদার করা, সমর্থন করা বা ব্যাপকতর করার কাজে দখলদার বাহিনীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করিয়াছে বা এইরূপ বাহিনীকে সাহায্য বা প্ররোচনা দান করিয়াছে' এমন ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[৩]

পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে সরকার ১৫ জন প্রখ্যাত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। এদের মধ্যে ছিলেন নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, খান আবদুস সবুর, মাহমুদ আলী, ওয়াহিদুজ্জামান খান, খাজা খয়েরউদ্দিন, কাজী আবদুল কাদের, অধ্যাপক গোলাম আযম, শাহ আজিজুর রহমান, এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, আবদুল জব্বার খদ্দর, রাজা ত্রিদিব রায়, অধ্যাপক শামসুল হক, ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও অং শু প্রু চৌধুরী।[৪] এক সপ্তাহ পরে 'দালালদের' আরও বড় একটি তালিকা

প্রকাশ করা হয়।[৫] এই আইনের মাধ্যমে কতজনকে গ্রেপ্তার ও সাজা দেওয়া হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। পুলিশ বাহিনী দুর্বল থাকায় এবং দেশের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আওয়ামী লীগের হাতে থাকায় দালাল আইনের আবরণে অনেকেই নিজেদের স্বার্থ হাসিলের সুযোগ পেয়ে যান। আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ হাজার ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং প্রায় সমানসংখ্যক ব্যক্তি পলাতক ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। দালাল আইনের সমালোচকদের অন্যতম ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি ও জাতীয় লীগ নেতা আতাউর রহমান খান। দালাল আইনের অপব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন, জাতি পুনর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমাধা না করে সরকার সারা দেশে দালাল ও কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে; যারা ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন, অথচ খুন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ কিংবা লুটপাটের মতো জঘন্য কাজে প্রবৃত্ত হননি, তাদের গুরুতর শাস্তি দিয়ে দেশের কোনো উপকার হবে না।[৬]

১৯ মে ১৯৭২ বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার শুরু হয়।[৭] অভিযুক্তদের অন্যতম ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর ডা. আবদুল মোতালেব মালেক। নাজিরউদ্দিন আহমদ আদালতে ডা. মালেকের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন।[৮] বিচারে মালেক এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। পরে তাঁরা সবাই ১৯৭৩ সালে সাধারণ ক্ষমার আওতায় ছাড়া পান।

১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে 'সংবিধান (প্রথম) সংশোধন আইন' জারি করা হয় সংশোধনীতে ৪৭ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নতুন একটি দফা (৩) যুক্ত হয়। এতে বলা হয়, 'এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধানসংবলিত কোনো আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী এই কারণে বাতিল বা বেআইনি বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।' রাষ্ট্র যাতে আইন তৈরি করে গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধে অভিযুক্তদের বিচারের ব্যবস্থা করতে পারে, সেজন্য সংবিধানে এই সংশোধনী আনা হয়।[৯]

দালাল আইনের বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার ছিলেন। জাসদসহ কয়েকটি

রাজনৈতিক দল এ সম্পর্কিত রাষ্ট্রপতির ৮ নং আদেশ বাতিলের দাবি জানিয়েছিল।[১০] মওলানা ভাসানী ১৯৭৩ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে দালাল আইন বাতিলের দাবি জানিয়ে আলটিমেটামও দিয়েছিলেন। ৩০ নভেম্বর (১৯৭৩) সরকার দালাল আইনে অভিযুক্ত ও আটক ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। এর ফলে ৩৪ হাজার ৪০০ জন আটক ব্যক্তি জেল থেকে ছাড়া পান।[১১] এঁদের অনেকেই মুসলিম লীগ, পিডিপি, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছিল যে, যাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই বা অভিযোগে বিচারাধীন নন, কেবল তারাই সাধারণ ক্ষমার সুবিধা পাবেন। বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ১৫ ডিসেম্বর (১৯৭৩) বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া এক বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন :

> ...আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই মুক্তিযুদ্ধের শত্রুতা করে যাঁরা দালাল আইনে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাভাবিক জীবনযাপনে আবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, অন্যের প্ররোচনায় যাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং হিংসার পথ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা অনুতপ্ত হলে তাদেরও দেশ গড়ার সংগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।[১২]

সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিরা দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ছড়িয়ে দেবেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন বদরুদ্দীন উমর। তাঁর মতে, দেশে ভূঁইফোঁড় রাজনৈতিক দলের অভাব নেই এবং এসব লোকের পক্ষে এক বা একাধিক রাজনৈতিক সংগঠন খাড়া করা এমন কিছু অসুবিধার ব্যাপার নয়। 'এ ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম এখন প্রায় অবধারিত বলা চলে।' ৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩ *বঙ্গবার্তায়* তিনি লেখেন :

> এই সংগঠনগুলোর প্রথম কাজ হবে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার। এই প্রচার করতে গিয়ে ভারত বিরোধিতাকে তারা একটা হাতিয়ার হিসেবে ধরে নিয়ে তাকে একটা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক চরিত্র দান করবে। একটি শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের পরিচয় উদঘাটন না করে, ভারতীয় শোষণকে সেইভাবে চিত্রিত না করে তারা ভারতকে একটি 'হিন্দু' রাষ্ট্র হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের ভারতবিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে এদেশে আরও জোরদার করার চেষ্টা করবে। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা দরকার যে, ভারতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং এই সমস্ত সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে মৌলিক কোনো তফাৎ নেই।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতা বিবৃতিতে প্রায়ই বলে থাকেন যে, ভারতবিরোধিতার অর্থই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। এ কথা একমাত্র সেই সমস্ত ব্যক্তি অথবা দলের পক্ষেই বলা সম্ভব যারা ভারতকে একটা হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করে। কিছু লোক সাম্প্রদায়িক কারণে ভারতবিরোধী এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এ কথা আরও কঠিন সত্য যে, অন্যান্য অনেকেই ভারতীয় পুঁজির শোষণের জন্যই ভারতবিরোধী। এই শেষোক্ত ব্যক্তিরা ভারতকে একটি 'হিন্দু' রাষ্ট্র বলে বিবেচনা না করে তাকে একটি 'পুঁজিবাদী' ও শোষণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করার ফলেই ভারতীয় জনগণের নয়, ভারতীয় সরকারের নানান নীতির বিরোধিতা করেন। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, ভারতকে যাঁরা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করেন তাঁদের অপেক্ষা ভারতকে যাঁরা 'হিন্দু' রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করেন, তাঁদেরকেই বাংলাদেশের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমার যোগ্য বিবেচনা করে, অন্যদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আটক রাখলেন এবং তাদেরই সমশ্রেণীর লোকদেরকে আরও ব্যাপক হারে আটক রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের কারাগারসমূহ খালি করে স্থান সৃষ্টি করলেন।[১১]

শেখ মুজিব কি সত্যি সত্যিই 'দালাল'দের বিচারের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন? ১৯৭১ সালে যেসব রাজনৈতিক নেতা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন তাঁর বন্ধু কিংবা একসময়ের রাজনৈতিক সহকর্মী। এঁদের একজন হলেন ন্যাপের (ভাসানী) নেতা মসিয়ুর রহমান (যাদু মিয়া)। এ প্রসঙ্গে তাঁর বড় ভাই মোখলেসুর রহমান (সিধু মিয়া) চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন। সরদার ফজলুল করিম ও মুস্তাফা নূরউল ইসলামের নেওয়া সিধু মিয়ার এক সাক্ষাৎকার থেকে এ কথা জানা যায় :

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের দিকে যাদু মিয়া ঢাকায় আসে। আসার পর আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী শেখ মুজিবের ওপর যাদু মিয়াকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেন। যাদু মিয়া এবং শেখ মুজিব আসলে খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ফার্স্ট ফ্রেন্ড বলতে যা বোঝায়, তাই ছিলেন তাঁরা। এই সময় আমার কাছে একটা খবর এল (একজন দায়িত্বশীল নেতাই তিনি)। আমাকে এসে জানালেন যে তিনি শেখ সাহেবের ওখানে বসেছিলেন। তখন কয়েকজন লোক শেখ সাহেবকে বলতে শোনেন যে, মসিয়ুর রহমান তো এখন ঢাকাতেই আছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোক। জবাবে শেখ সাহেব বলেছিলেন, 'আচ্ছা, সে হবে।'...

আমি যাদুকে এসে বললাম, 'তুমি ঢাকায় এসে বসে আছো কেন? তোমাকে নিয়ে তো এ ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে তুমি একটু সরে থাকো।'

আমার এ কথা শোনার পর আমাকে অবাক করে দিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তুলে শেখ মুজিবের নাম্বারে ডায়াল করে। লাইন পেয়ে যেতেই সে শেখ মুজিবকে বলে, 'এই... তুই নাকি আমাকে অ্যারেস্ট করবি?'

ওদিক থেকে মুজিব কী বলেছিলেন, আমি জানি না, কিন্তু দুজনের মধ্যে খুবই হাসি-ঠাট্টা হয়েছিল সেদিন। যা-ই হোক অনেক দিন পর্যন্ত শেখ মুজিব জানতেন যে, যাদু মিয়া ঢাকায় আছে। কিন্তু দলের চাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকে গ্রেপ্তার করেননি।

পরে যাদু মিয়া উত্তেজিত হয়ে এ রকমের একটা উক্তি নাকি করেছিল যে 'আমি কদিনের মধ্যেই এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারি', কেবল তখনই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের কথা এসব।[১৪]

স্বাধীনতাবিরোধীদের অন্যতম ছিলেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাবেক স্পিকার ও কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অনেক অভিযোগ ছিল। দালাল আইনে তিনিও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় ১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। ফজলুল কাদেরের পরিবারের খোঁজখবর রাখতেন শেখ মুজিব। মাঝেমধ্যে তাদের আর্থিক সাহায্যও করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মেজো ছেলে সাইফুদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেছেন :

আমরা মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম। ঈদের সময় তিনি টাকা দিয়ে বলতেন, 'কোরবানি দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় গরুটা কিনবি।' তাঁর কলিজাটা ছিল এত বড় (দুই হাত প্রসারিত করে দেখালেন)। আমাদের শরীরে তো মুসলিম লীগের রক্ত, তাই শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে বলতে হয়[১৫]

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের পক্ষ নেন। একপর্যায়ে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁকে মন্ত্রিসভার সদস্য করেছিলেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ যখন জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, সেই সময় ভুট্টো জাতিসংঘে বাংলাদেশের বিরোধিতা করার জন্য ত্রিদিব রায়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন। ভুট্টো এক ঢিলে দুই পাখি মারার ফন্দি এঁটেছিলেন : বাংলাদেশের বিরোধিতা করা এবং বিশ্ববাসীকে দেখানো যে বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধি পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

ত্রিদিব রায়কে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ত্রিদিব রায়ের মা রাজমাতা বিনীতা রায়কে নিউইয়র্কে পাঠিয়েছিলেন। শেখ মুজিব বিনীতা রায়কে বলেছিলেন, 'সে (ত্রিদিব রায়) তো

আমার মতোই, পাকিস্তানে তাকে জোর করে আটকে রেখেছে। তাকে ফিরে আসতে বলুন। আমরা তাকে একজন বীর হিসেবে গ্রহণ করব।' ত্রিদিব রায় আসেননি এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশবিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত হননি।[১৬]

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও পরে দলত্যাগী মাহমুদ আলীকে পাঠিয়েছিলেন। দলের অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য শাহ আজিজুর রহমান এবং বেগম রাজিয়া ফয়েজ। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শাহ আজিজ গ্রেপ্তার হন। মাহমুদ আলী পাকিস্তানে ছিলেন। তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়, রাজিয়া ফয়েজ তখন খুলনায়। তার স্বামী ছিলেন খুলনা শিপইয়ার্ডের জেনারেল ম্যানেজার। রাজিয়া ফয়েজের বাবা সৈয়দ বদরুদ্দোজা ১৯৪৩-৪৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। শেখ মুজিব তাঁকে খুব সম্মান করতেন। মুক্তিযুদ্ধের পরপর রাজিয়া ফয়েজ গ্রেপ্তার হন। ওই সময় তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এ খবর জানতে পেরে শেখ মুজিব ক্ষুব্ধ হন এবং তাকে মুক্ত করার নির্দেশ দেন।[১৭] শাহ আজিজ সাধারণ ক্ষমার আওতায় ছাড়া পান ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে।

শাহ আজিজ যখন জেলে, শেখ মুজিব তার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিতেন। এ প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমেদ বলেছেন :

> শাহ আজিজ তো জেলে। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'ওর ফ্যামিলি খাবে কী?' আমি প্রতি মাসে সাত হাজার টাকা পাঠাতাম।
>
> —উনার ফ্যামিলিকে তো গাড়িও দেওয়া হয়েছিল?
>
> সেটা পরে, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর, ২২ হাজার টাকার একটা ভিভা ভক্সহল গাড়ি, প্রগতির অ্যাসেম্বল করা। বঙ্গবন্ধু আরও অনেককে টাকা দিতেন। মওলানা ভাসানীকে ২০ হাজার টাকা, সঙ্গে লুঙ্গি-গামছা। আমি পাঠাতাম।
>
> জিল্লুর রহমান দলের কাজে থাকতেন। উনাকে ১০ হাজার, মনসুর আলী ১০ হাজার, সাজেদা চৌধুরী ১০ হাজার। আমার কাছে একটা খাতা ছিল। সেখানে সব লেখা থাকত। একদিন বঙ্গবন্ধু ডাকল—সব হিসাব রাখস তো? আমি খাতা নিয়ে আসলাম। দেখে উনি রেগে গেলেন।
>
> —কী করছস?
>
> কেন? নাম লিখে টাকার অঙ্ক লিখে রাখছি।
>
> —এইভাবে নাম লেখে? কারও চোখে পড়লে এদের মান-সম্মান থাকবে? মওলানা ভাসানী লিখতে হইলে লিখবি এমবি।

আমি বুঝলাম। এরপর ওইভাবেই লিখতাম। বঙ্গবন্ধু সব ব্যাপারে চিন্তা করতেন, সতর্ক থাকতেন।[১৮]

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি' তৈরি হলে কাউন্সিল মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি খাজা খয়েরউদ্দিন এর আহ্বায়ক মনোনীত হন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পুরান ঢাকার একটি আসনে তিনি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং হেরে যান। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে তিনি গ্রেপ্তার হন। তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ৭ ডিসেম্বর সাধারণ ক্ষমার আওতায় তাঁকেও মুক্তি দেওয়া হয়। পরে তিনি পাকিস্তানে চলে যান।

শেখ মুজিবের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে যাঁরা বেশির ভাগ সময় তাঁর বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের একজন হলেন ন্যাপ (ভাসানী)-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা। শেখ মুজিব এবং মোহাম্মদ তোয়াহা একই প্রজন্মের রাজনৈতিক অবস্থান বিপরীত মেরুর হলেও তাঁরা ছিলেন পরস্পরের বন্ধু। তোয়াহার ভাষ্যমতে, বাহাত্তরের জানুয়ারিতে দেশে ফিরেই শেখ মুজিব তোয়াহার খোঁজ করেছিলেন। মুজিবের ধানমন্ডির বাসায় দুজনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়—আওয়ামী লীগ নেতা পাইওনিয়ার প্রেসের মালিক আবদুল মোহাইমেনের মাধ্যমে। তোয়াহা শর্ত দিয়েছিলেন, সাক্ষাৎ হবে গোপনে এবং চতুর্থ কেউ যেন জানতে না পারে। মোহাইমেন তাঁকে এক রাতে গাড়িতে করে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে হঠাৎ করেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় 'শেখ মুজিবের সর্বাধিক বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি' সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে।[১৯] সিরাজুল আলম খানকে দেখে চমকে উঠলেও তাঁর জানা ছিল না, এই সাক্ষাতের ব্যবস্থাটি সিরাজই করে দিয়েছিলেন। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিরাজ বলেছেন, তিনিই উদ্যোগ নিয়ে মোহাইমেন সাহেবকে দিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। তিনি চেয়েছিলেন, দুজনের মধ্যে একটা সমঝোতা হোক।[২০]

ওই সাক্ষাতে তোয়াহা তাঁর সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শেখ মুজিবকে বলেছিলেন, 'তুই তো দেশ স্বাধীন করতে গিয়েছিলি! দেশ স্বাধীন হয়েছে? হয়নি ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে গিলে ফেলেছে।' তোয়াহার বয়ানে জানা যায়, 'আমাদের স্বাধীনতায় ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে শেখ মুজিবের উপলব্ধি অত্যন্ত পরিষ্কার। কথা হয়ে গেল, ভারতের কবলিত অবস্থা থেকে বাংলাদেশকে উদ্ধার করার কাজে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব। গঙ্গার পানি এবং ছিটমহল সমস্যা নিয়ে আমরা *গণশক্তিতে* ভারতের বিরুদ্ধে লিখব। কিন্তু মুজিব ও তাঁর

সরকারকে আক্রমণ করব না। মুজিবও আমাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পানির ন্যায্য হিস্যা এবং ছিটমহল সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতায় ঠান্ডাভাবে দু'এক কথা বলবেন। ব্যাস রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তব্যকে পুঁজি করে আমরা ভারতের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলব।'[২১]

তোয়াহার এই বক্তব্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তারিখ উল্লেখ না করলেও বোঝা যায়, তাঁদের দুজনের দেখা হয়েছিল বাহাত্তরের জানুয়ারি বা বড়জোর ফেব্রুয়ারি মাসে। তখনো ফারাক্কা কিংবা ছিটমহল কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেনি। ফারাক্কা বাঁধের পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালের শুরুর দিকে।

১৯৭২ সালের ৫ মার্চ ঢাকার ইংরেজি সাপ্তাহিক *হলিডে* ও তাঁর দলের মুখপত্র *গণশক্তি*তে তোয়াহার একটি বিবৃতি ছাপা হয়। বিবৃতির ভাষা ছিল বেশ আক্রমণাত্মক। বিবৃতিতে বলা হয় :

> পূর্ব বাংলা আজ বাংলাদেশ নামে ভারতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিন ক্ষমতাসীন শ্রেণীর একটি অংশের সামরিক হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতায়। সংক্ষেপে, আমাদের দেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর যৌথ নয়া ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। একমাত্র দৃশ্যমান পরিবর্তনটি হলো, বিদেশি শোষকের সংখ্যা বেড়েছে।[২২]

এই বিবৃতির প্রতিক্রিয়া হলো মারাত্মক। তোয়াহার দাবি অনুযায়ী, শেখ ফজলুল হক মণি *গণশক্তি* অফিসে তালা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং অতি উৎসাহী পুলিশ তাঁর মেয়ে শাহানা চিনু এবং রেহানা পুষ্পকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে তোয়াহার স্ত্রী ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে যান। তোয়াহার বর্ণনায় জানা যায় :

> রাষ্ট্রপতির অফিসে (এটা হবে প্রধানমন্ত্রী) যেকোনো আগন্তুকের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই কর্তব্যরত পুলিশ আমার স্ত্রীকে বাধা দিয়েছিল। আমার স্ত্রী শিউলি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং সাহসী মেয়ে। পুলিশকে ধমকে দিতেই অপরিচিত মহিলার ধমকে পুলিশ বেচারা ভড়কিয়ে গিয়ে সরে দাঁড়ালে তিনি ভেতরে রাষ্ট্রপ্রধানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বন্ধুবর শেখ মুজিবের ভদ্রতাজ্ঞানের অভাব ছিল না। আমার স্ত্রীকে দেখেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এবং কোনো কথা বলার আগেই, শিউলি মেয়েদের কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং মেয়েদের ছাপাখানা কেন আটক করা হয়েছিল তার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। শিউলির মুখে শুনেছি মুজিব তখনো ওই ঘটনার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানতেন না। আমার স্ত্রী ব্যাপারটা

বুঝিয়ে বলতেই মুজিব দুই হাত জোড় করে বলেছিলেন, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না ভাবী! আমি এখনই ব্যবস্থা করছি শিউলিকে বসতে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে টেলিফোনে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রেসের তালা খুলে দেওয়ার জন্য। শিউলি বাসায় ফিরে এসে দেখতে পেল যে, থানার লোকজন এসে ইতিমধ্যে প্রেসের তালা খুলে দিয়ে গেছে। এদিকে আমার *গণশক্তির* কর্মকর্তারা ভয়ে কেটে পড়েছিল। কাজেই *গণশক্তির* প্রকাশনার কাজ কয়েক বছরের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুনেছি শেখ মুজিব নাকি এই কাজের জন্য শেখ মণিকে অনেক বকাবকি করেছিল।[২৩]

এই ঘটনার পর তোয়াহা এবং তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীরা আত্মগোপনে চলে যান। আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় তোয়াহা একবার ধানমন্ডিতে শেখ মুজিবের বাড়িতেই লুকিয়ে ছিলেন, যা তিনি নিজে কখনো প্রকাশ করেননি। তাঁর ওই সময়ের একটি অভিজ্ঞতা পরে তিনি শ্রমিক নেতা রায় রমেশ চন্দ্রের কাছে বর্ণনা করেছেন। রমেশের বয়ানে তা উদ্ধৃত করা হলো :

আমরা ১৯৮৪ সালে ডব্লিউএফটিআই-এর একটি সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লি যাই। আমাদের দলে ছিলেন তোহা ভাই, আবুল বাশার ভাই, আবদুল্লাহ সরকার। আমি ছিলাম সেই ডেলিগেশনে সর্বকনিষ্ঠ দিল্লিতে নানা সময় আলাপ-আলোচনা হতো গল্পচ্ছলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোহা ভাই, আন্ডারগ্রাউন্ডে পলিটিকস করছেন, এটা করার প্রক্রিয়া কীভাবে? তোহা ভাই বললেন, এই ধরো, আমি যখন নোয়াখালী বা বিভিন্ন জায়গায় গেছি, লাউ হাতে নিছি, নারিকেল নিয়া গেছি, যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। শেখ মুজিবের সময় তো আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম এক-দেড় বছর। একদিন আমি সাইকেল চালায়া এলিফেন্ট রোড দিয়া যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি যে একটা গাড়ি এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। এর মধ্যে ভাবী। বেগম মুজিব বললো যে, 'তোহা ভাই, অন্যের চোখকে ফাঁকি দিলেও আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব না।' গাড়িতে একজন কেউ ছিল। তাকে সাইকেলটা নিয়ে যেতে বলে আমাকে উনি গাড়িতে উঠিয়ে বাসায় নিয়া আসলেন। ওখানেই কয়েকদিন ছিলাম। তারপরে আর ভালো লাগে না বিকেলে একদিন বেরোবো। কাপড়-চোপড় পরে শুয়ে আছি। শেখ মুজিব এসে বলল, 'এই তুই কোথায় যাবি এখন?' বললাম, 'আর ভালো লাগে না, আমি বাইরে যাব।' কয়, 'এখন যাইস না, একটু অন্ধকার হোক। নইলে পুলিশ দেইখা ফেলবে।'[২৪]

মুক্তিযুদ্ধের সময় যাঁরা পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী ছিলেন এবং এ দেশে আর ফিরে আসেননি, বাংলাদেশ সরকার তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছিল। এঁদের অন্যতম ছিলেন পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি

নূরুল আমীন, নূরুল আমীনকে ভুট্টো ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করেছিলেন। শেখ মুজিব চেয়েছিলেন, নূরুল আমীন যেন পাকিস্তানে না থাকেন, দরকার হলে তিনি লন্ডনে তার ছেলের কাছে গিয়ে থাকুন। তাঁর ছেলে আনোয়ারুল আমীন লন্ডনে ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। ১৯৭৪ সালে নূরুল আমীনের মৃত্যু হলে করাচিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমাধি চত্বরে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের মে মাসে লন্ডনে গিয়েছিলেন। ৭ মে ফেরার সময় তিনি জানতে পারেন নূরুল আমীনের নাতনি (মেয়ে রুনু আহমেদের সন্তান) রুমু আহমেদও একই বিমানে ঢাকায় যাচ্ছে। তিনি রুমুকে ডেকে এনে তাঁর পাশে বসিয়ে কথাবার্তা বলেন। ফ্লাইটে বসে তিনি রুমুকে একটা শুভেচ্ছাবাণীও লিখে দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে রুমুর একটা ছবিও আছে, তাঁরা বিমানে পাশাপাশি বসে আছেন। রুমু কিছুদিন আগে ওই ছবি ও শুভেচ্ছাবাণীটি তার ব্যক্তিগত ফেসবুকে দিয়েছেন। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, 'আ রেয়ার মোমেন্ট উইথ দ্য ফাদার অব দ্য নেশন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, হোয়াইল কামিং হোম ফ্রম ইংল্যান্ড (ইংল্যান্ড থেকে বাড়ি ফেরার পথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে একটি দুর্লভ মুহূর্ত)।'[২৫]

২

শেখ মুজিব পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৪) লাহোরে অনুষ্ঠেয় ইসলামী ঐক্য সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনের আগে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ নিয়ে সংস্থার সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় আসে। প্রতিনিধিদলটি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর একটি বার্তা নিয়ে এসেছিল। বার্তায় বলা হয়েছিল, শীর্ষ সম্মেলনেই পাকিস্তান বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়।

লাহোরে ইসলামী ঐক্য সংস্থার সম্মেলনে যোগ দেওয়া নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে মতভেদ ছিল। এ নিয়ে দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের নিয়ে শেখ মুজিব একটি বৈঠক করেছিলেন। এই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন সংসদের চিফ হুইপ শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন। সভায় যেসব কথাবার্তা হয়, ওই প্রসঙ্গে মোয়াজ্জেম বলেন :

বাংলাদেশ বিমান Bangladesh Biman

DACCA AIRPORT, DACCA. PHONES : 312111-7 LINES. CABLE : AIRBANGLA

বিমানে লন্ডন থেকে ঢাকার পথে শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলছেন
নূরুল আমিনের নাতনী রুমু আহমেদ

সরকারের একটি অংশ দ্বিমত পোষণ করল। তাজউদ্দীন সাহেব, সামাদ সাহেব, ড. কামাল হোসেন প্রমুখ ইসলামিক সম্মেলনে যোগদানকে সমর্থন করতে পারলেন না। এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের জন্য সেদিন সন্ধ্যার পর তদানীন্তন গণভবনে নেতৃবৃন্দের বৈঠকে বসল।...

সভায় উভয়পক্ষ থেকে প্রচুর যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করা হলো। এক পক্ষের মূল বক্তব্য ছিল আমরা ইসলামিক দেশ নই—আমরা ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশ।... অন্যদিকে অধিকাংশের মত,... পৃথিবীতে আমরা দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলমানদের রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে যোগদান না করা এ দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠির ধর্মানুভূতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনেরই নামান্তর।... বঙ্গবন্ধু নিজেও এই অভিমত পোষণ করতেন।...

অধিকাংশের অভিমত যখন গৃহীত হতে যাচ্ছে, তখন আপস ফর্মুলা হিসাবে একটি প্রস্তাব এল ওদের তরফ থেকে। ঠিক আছে, যেতে চান, যান, কিন্তু যাত্রাপথে দিল্লিতে নেমে ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে গেলে সবদিক রক্ষা হয়।

বঙ্গবন্ধু টেবিল চাপড়িয়ে রীতিমতো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, আমি কারও মাথা তামাক খাই যে আমাকে মাঝপথে নেমে কারও মত নিতে হবে? তোমরা ভেবেছ কী? আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। কী করব, না করব আমরাই সাব্যস্ত করব। কাউকে ট্যাক্স দিয়ে চলার জন্য দেশ স্বাধীন হয়নি। পিন্ডির গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আমবা দিল্লির গর্তে ঢুকব—আমার জীবদ্দশায় তা হবে না। তোমরা যে যা মনে কর, আমি ইসলামাবাদ যাব এবং সরাসরি যাব—দিল্লি থামব না।[২৬]

শেখ মুজিব সম্মেলনে যোগ দিতে লাহোরে যান। সেখানে ভুট্টো এবং অন্যান্য মুসলমান দেশের নেতারা তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেন। শেখ মুজিবের পাকিস্তান যাওয়া ভারত ভালোভাবে নেয়নি। বাংলাদেশে ভারতের উপহাইকমিশনার জে এন দীক্ষিত বলেছেন, বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিগুলো জোর পায় এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরও জেঁকে বসে।[২৭] এ প্রসঙ্গে শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের মন্তব্য ছিল, 'যেদিন তিনি লাহোর যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, সেদিনই তিনি তাঁর মৃত্যু পরোয়ানায় সই করেন।[২৮]

একাত্তর সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিচ্ছিন্নতা এড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার অন্যতম ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিষয়টি নিয়ে নানান জটিলতা তৈরি হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান ঘোষণা করেন যে, ৩০ জন পাকিস্তানি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে

লাহোর বিমানবন্দরে শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল টিক্কা খান পাশে দাঁড়ানো (বামে)
প্রেসিডেন্ট ফজল এলাহী এবং (ডানে) প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো

আটক করা হয়েছে এবং গণহত্যার দায়ে শিগগিরই তাদের বিচার করা হবে। বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেন। এই সিদ্ধান্তে পাকিস্তানে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়। ওই সময় পাকিস্তানে প্রায় চার লাখ বাঙালি আটকা পড়েছিলেন। পাকিস্তান তাদের একপ্রকার জিম্মি করে রেখেছিল। ভারতে আটক যুদ্ধবন্দিরা পাকিস্তানে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের দেশে ফেরা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ২ জুলাই ১৯৭২ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 'সিমলা চুক্তি' সই হয়। উভয়পক্ষই বন্দি বিনিময়ের ব্যাপারে নমনীয় হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যুদ্ধবন্দিদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে পাকিস্তান চীনের সমর্থন পায়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার আবেদন করলে ২৫ আগস্ট ১৯৭২ চীন এর বিরুদ্ধে ভেটো দেয়।[১১]

১৯৭২ সালের ২ জুলাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে স্বাক্ষরিত 'সিমলা চুক্তি'তে উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুদেশের কাজ করে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সিমলা চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল।

বাহাত্তরের নভেম্বরে বাংলাদেশ ও ভারত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের পরিবারের

ছয় হাজার সদস্যকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিনিময়ে পাকিস্তান তাদের দেশে আটকেপড়া ১০ হাজার বাঙালি নারী ও শিশুকে ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আসা প্রথম দলটি ছিল তবলীগ জামাতের। ১৪ নভেম্বর (১৯৭২) ৮০ জন বাঙালিকে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে তবলীগ জামাতের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য মুক্তি দেয়।[৩০] বাংলাদেশ অবশ্য ১৯৫ জন পাকিস্তানিকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে বিচারের ব্যাপারে অটল থাকে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পাকিস্তান ২০৩ জন বাঙালির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সম্পর্কে জুলফিকার আলী ভুট্টোর মন্তব্য ছিল, 'এসব বাঙালির বিচারের পক্ষে পাকিস্তানে জনমত আছে। আমরা জানি যে, যুদ্ধের সময় তারা তথ্য পাচার করেছিল।'[৩১]

২৮ আগস্ট ১৯৭৩ দিল্লিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়। ফলে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালিদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। দুই দেশ একমত হয় যে, ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের বিষয়টি বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান বসে সিদ্ধান্ত নেবে। পাকিস্তান কথিত ২০৩ জন অভিযুক্ত বাঙালিকে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তান প্রস্তাব দেয় যে, ১৯৫ জন অভিযুক্তকে পাকিস্তানে বিশেষ আদালতে বিচার করা হবে। বাংলাদেশ এই প্রস্তাবে রাজি হয়। সব বাঙালিকে পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যই বাংলাদেশ এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল। এই সমঝোতার ফলে ১৫ এপ্রিলের (১৯৭৪) মধ্যে সব যুদ্ধবন্দির ভারত থেকে পাকিস্তানে এবং সব বাঙালির পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসার পথ খুলে যায়।[৩২] দুদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় এবং ৯ এপ্রিল দিল্লিতে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সই হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে যে বেশিদূর এগোনো যাবে না, তা বোঝা গিয়েছিল অনেক আগেই। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের ভাষ্যে বিষয়টি উঠে এসেছে। তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের আলোচনার সূত্র ধরে তিনি বলেন :

> ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ মুজিবনগর মন্ত্রিসভার শীর্ষস্থানীয় সদস্যবৃন্দ রাজধানী ঢাকায় ফিরে আসেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেছেন—'তার দুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দুটো বিষয়ে কথা হয়েছিল। একটি ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রসঙ্গ ধরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দোসরদের শাস্তি

দেওয়ার বিষয়ে। তিনি বলেছিলেন, "চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তবে কাজটি সহজ হবে না।" আমি জানতে চাই, কেন। তিনি বলেন, যুদ্ধবন্দি হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাউকে বিচার করা সম্ভবপর হবে বলে তিনি মনে করেন না। আমি আবার জানতে চাই, কেন। তিনি বলেন, "মার্কিনদের চাপ আছে। তারা পাকিস্তানকে চাপ দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে ছেড়ে দিতে, ভারতকে চাপ দিচ্ছে যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দিয়ে উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তুলতে। তিনি আরো বলেন, যুদ্ধবন্দিদের বিচারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইচ্ছুক নয়, এমনকি, ভারতও উৎসাহী নয়। এই অবস্থায় কার জোরে আপনি বিচার করবেন? আর মূল অপরাধীদের বিচার করতে না পারলে তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের বিচারের প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য।"...

যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য ন্যূন্যতম যে দক্ষতা ও নিবেদিতপ্রাণ প্রসিকিউরেটরের প্রয়োজন ছিল তার বড়ই অভাব ছিল। যুদ্ধাপরাধ ট্রায়ালের জন্য যাঁদের সরকারি কৌসুলি নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের শীর্ষস্থানীয় একজন যখন আমাকে বললেন, 'আমার ...কে বাঁচাতে হবে' তখন আমার মনে হয়েছিল যুদ্ধাপরাধের আর বিচার হচ্ছে না। আমি আমিনুল হককে (পরে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল হন) বলেছিলাম, 'আপনারা ওয়র ক্রাইমের ট্রায়াল করতে পারবেন না।'[৩৩]

পাকিস্তানি 'যুদ্ধাপরাধী'দের যে তালিকাটি পাওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে তাতে ২০৯ জনের নাম আছে। প্রথম নামটি লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজির।[৩৪] 'অপারেশন সার্চলাইটের' মন্ত্রণাদাতা, পরিকল্পনাকারী ও বাস্তবায়নকারীদের অনেকের নাম এই তালিকায় ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই তালিকায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল আবদুল হামিদ, লে. জেনারেল টিক্কা খান, মে. জেনারেল এ ও মিঠাসহ অনেকেই ছিলেন অনুপস্থিত। ওই সময়ের নাটের গুরু লে. জেনারেল পীরজাদা এবং জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান মে. জেনারেল গোলাম উমরকেও তালিকায় রাখা হয়নি।

লে. জেনারেল গুল হাসানকে ভুট্টো ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। পরে তাকে পদচ্যুত করে রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিদেশে পাঠিয়ে দেন। ভুট্টো প্রায়ই তাকে বলতেন যে, গুল যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় আছেন এবং তিনিই তার বিচার ঠেকিয়ে রেখেছেন। ভিয়েনায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় গুল হাসান ঢাকায় জেনারেল ওসমানীকে চিঠি লিখে তাঁর 'অপরাধের' তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। ওসমানী পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকার সময় গুলের অধীনে কাজ করেছেন। ওসমানী তাঁর চিঠির জবাবে জানিয়েছিলেন, গুল মোটেও যুদ্ধাপরাধী নন। ওসমানীর চিঠিটি ছিল এ রকম :

জেনারেল এম এ জি ওসমানী
পিএসসি, এমএনএ
২৭, মিন্টু রোড, ঢাকা।
জুন ৩, ১৯৭২
প্রিয় জেনারেল গুল,
আপনার ১৪ মে ১৯৭২-এর চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ।... আশ্চর্য হয়েছি ওটা পেয়ে।...

পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের ৭ কোটি ৫০ লাখ মানুষের ওপর চরম অমানবিক ধরনের গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও লুণ্ঠন চালিয়েছে। বাঙালি ভ্রাতৃপ্রতিম অফিসার ও জওয়ানদের নিরস্ত্র অবস্থায় ঠান্ডা মাথায় হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা প্রদর্শন করেনি।... ২৫/২৬ মার্চের রাত থেকে আত্মসমর্পণের আগের দিন পর্যন্ত আমাদের জনগণের সঙ্গে তারা যে পাশবিক আচরণ করেছে তার সমান একটি নজিরও ইতিহাসে পাওয়া যাবে না তাই ইতিহাসের সবচেয়ে অসম্মানজনক পরাজয়, বিপুল সংখ্যক জেনারেল অফিসারসহ অন্যান্য অফিসারের নেতৃত্বে প্রায় ৯৩ হাজার পেশাদার ও অস্ত্রশস্ত্রের সুসজ্জিত সৈন্যের অবনত মস্তকে অস্ত্র সমর্পণ, তাদের র‍্যাংকের ব্যাজগুলো ছিঁড়ে নেওয়া এসবই খোদার বিচার। এ রকমই তিনি করেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাংলাদেশে কেউ আপনার নাম যুদ্ধাপরাধীদের তালিকাভুক্ত করেনি। আপনি এ কথা বলেছেন দেখে আশ্চর্য হলাম। পাকিস্তান নামে যে দেশটি ছিল সেখানে কোনো হারামজাদা...আপনার অনিষ্ট করতে চায় না তো?

আপনাকে যাঁরা জানে, তাঁদের পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে আপনার সততা, সৈনিকোচিত এবং সর্বোপরি মানবিক গুণাবলির প্রতি। এগুলোর জন্য একজন মহৎ ভদ্রলোক হিসেবে আপনি সকলের প্রিয়।

নেতাসহ আমাদের সকলের শুভকামনা।[৩৫]

যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় শুধু তাঁদেরই নাম রাখা হয়েছিল, যাঁরা যুদ্ধবন্দি হিসেবে ভারতে আটক ছিলেন। যুদ্ধবন্দি না হওয়ার কারণে প্রকৃত অপরাধীদের অনেকের নাম তালিকায় ছিল না। শেখ মুজিব ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী। যুদ্ধবন্দিদের বিষয়টিকে তিনি দর-কষাকষির জন্য তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করেন। পাকিস্তান থেকে যেকোনো মূল্যে তিনি বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। এ কাজে তিনি সফলও হয়েছিলেন। পাকিস্তানের সঙ্গে তিনি অমীমাংসিত দ্বিপক্ষীয় বিষয়গুলোরও আশু সুরাহা করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লিতে সই হওয়া চুক্তিতে তার প্রতিফলন দেখা যায়। চুক্তির

১৩, ১৪ ও ১৫ ধারায় বলা হয় :

> আপসরফার জন্য সরকারত্রয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে উপমহাদেশে শান্তি ও মৈত্রীর স্বার্থে তিনজন মন্ত্রী (কামাল হোসেন, শরণ সিং ও আজিজ আহমদ) ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির প্রশ্ন আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, এ সকল বন্দি বহুবিধ অপরাধ ও বাড়াবাড়ি করেছে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব, আন্তর্জাতিক কানুনের বিধি অনুসারে তা যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরুদ্ধ অপরাধ ও গণহত্যা এবং এ ব্যাপারে বিশ্বজনীন সাধারণ মতৈক্য রয়েছে যে, ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির মতো অপরাধের অভিযোগে আনীত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, তারা যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তাঁর দপ্তর তার নিন্দা করেছে এবং গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে ...
>
> ... অতীতের ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ক্ষমা করে দেওয়ার কার্যক্রম হিসেবেই বাংলাদেশ সরকার বিচারের ব্যাপারে অগ্রসর না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্থির করা হয় যে, ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে দিল্লি চুক্তির অধীনে বর্তমানে সম্পাদনাধীন লোক বিনিময় প্রক্রিয়ায় অন্যান্য যুদ্ধবন্দির সঙ্গে পাকিস্তানে চলে যেতে দেওয়া যেতে পারে।[৩৬]

ভাবাবেগ দিয়ে জনগণের মধ্যে উন্মাদনা তৈরি করা যায়। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টি একেবারেই আলাদা। এ জন্য পদে পদে আপস করতে হয়। শেখ মুজিব দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল পাননি। তিনি সমঝোতার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেও ভুট্টো তাঁকে নিরাশ করেছিলেন। এমনকি দেশের ভেতরেও তিনি বৈরী সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন।

৯ এপ্রিল (১৯৭৪) নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদের স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় ঘোষণায় বলা হয়, উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি গড়ে তোলার স্বার্থে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাতিল করে দেওয়া হবে। যুক্ত ঘোষণার ১৪ নং ধারায় বলা হয় :

> ...পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ পেলে তিনি বাংলাদেশ সফরে যাবেন এবং সৌহার্দ্য এগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশে অতীতকে ভুলে যেতে এবং ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশের জনগণের কাছে আবেদন জানাবেন। একইভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পরিচালিত বর্বরতা ও ধ্বংসযজ্ঞের

ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন, তিনি চান জনগণ অতীতকে বিস্মৃত হয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করুক। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের মানুষ ক্ষমা করতে জানে।[৩৭]

দৈনিক ইত্তেফাক

াহিনীর অপরাধের নিন্দায় পাকিস্তান ॥ ১৯৫
পরাধীর প্রতি বাংলাদেশের ক্ষমা প্রদর্শন
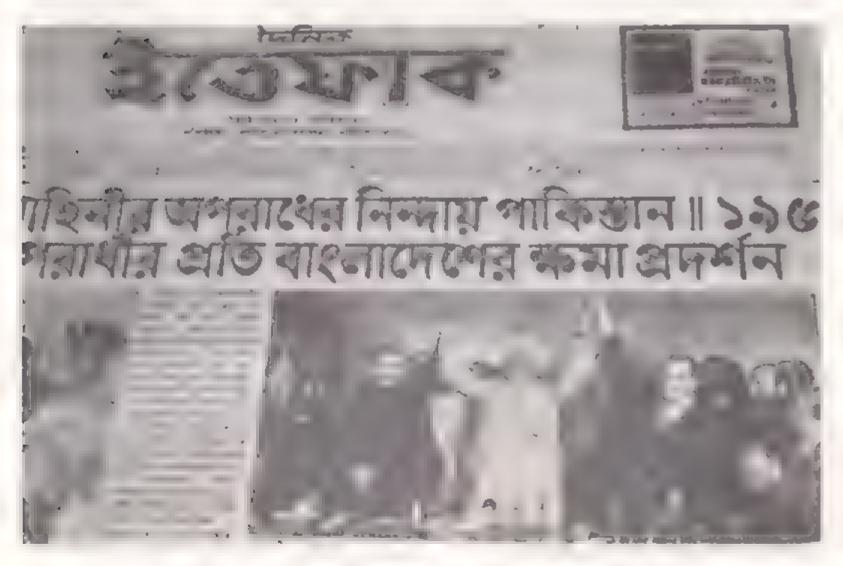
১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর মুক্তির সংবাদ দিয়ে
ব্যানার হেডলাইন করেছিল দৈনিক ইত্তেফাক

চুক্তি সই করার পর দিল্লি থেকে ফিরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন শেখ মুজিব ছিলেন বিষণ্ন। তিনি কামাল হোসেনকে বলেন, 'বাঙালিরা উদারতা দেখিয়েছে। এই অঞ্চলে একটি নতুন ধারা সৃষ্টির জন্য আমরা সর্বোচ্চ ছাড় দিয়েছি। কিন্তু আমি ভাবছি, জীবনে প্রথমবারের মতো আমি জনগণকে দেওয়া ওয়াদা রাখতে পারলাম না। আমি বলেছিলাম বাংলাদেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে। আমি আমার কথা রাখতে পারিনি। আশা করি এই সিদ্ধান্ত আমাদের জনগণের জন্য ভালো কিছু নিয়ে আসবে।'[৩৮]

৩

শেখ মুজিব ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে ইসলামী ঐক্য সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভুট্টো তিন দিনের সফরে ২৭ জুন (১৯৭৪) ঢাকায় আসেন। ভুট্টোর ঢাকা সফরের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার সুবিমল দত্ত পদত্যাগ করেন। তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে আরও এক বছর বাকি ছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে পদত্যাগের কারণ উল্লেখ করে তিনি লিখেছিলেন :

> ভুট্টোর হাতে বাংলাদেশের মানুষের রক্তের দাগ লেগে আছে। (তাকে স্বাগত জানাতে আমি বিমানবন্দরে হাজির হতে পারব না) আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছি না এবং ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে আমি বিব্রত করতে চাই না। আমার বয়স হয়েছে এবং আমি নিজের কাছে পরিচ্ছন্ন থাকতে চাই। জীবনের এই প্রান্তে এসে এমন কিছুর সঙ্গে জড়াতে চাই না, যা আমার শান্তি নষ্ট করবে।[৩৯]

পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের অমীমাংসিত বিষয়গুলোর অন্যতম ছিল বৈদেশিক দায়দেনার ভাগাভাগি। ১৯৭২ সালের আগস্টে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সদস্য হওয়ার সময় একাত্তর-পূর্ববর্তী পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণের দায় কে নেবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিশ্বব্যাংক ছিল বড় ঋণদাতা সংস্থা। ওই সময় দাতাদের চাপে বাংলাদেশে চলমান প্রকল্পগুলোর ঋণের দায় নিতে রাজি হয়েছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ অবশ্য বরাবরই বলে এসেছে আগের সব দায়দেনা পাকিস্তানকেই মেটাতে হবে।

১৯৭৪ সালে করা এক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৭১-৭২ সালের মূল্যমান অনুযায়ী পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের প্রাপ্য ছিল ৫০০ থেকে ৫৫০ কোটি ডলার। একাত্তরে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় পাকিস্তান বেশ কিছুদিন তার দেনা শোধ করেনি এবং একপর্যায়ে দেনা শোধ করতে অস্বীকার করে। দাতাগোষ্ঠী পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং বেশ কয়েকবার দেনা শোধের সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে দেনার একটি অংশ যেন বাংলাদেশ বহন করে, সেজন্য আন্তর্জাতিক চাপ ছিল। ওই সময় বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের কথা হয়। শেখ মুজিব এই দায় নিতে অস্বীকার করেছিলেন। দাতাগোষ্ঠী বাংলাদেশকে সাহায্য দেওয়া অব্যাহত রাখলেও দেনা শোধের জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। চুয়াত্তরের শেষ দিকে

বাংলাদেশ বাধ্য হয়ে একাত্তর-পূর্ববর্তী পাকিস্তানি ঋণের মধ্য থেকে ৩৫ কোটি ৫৬ লাখ ডলারের দায় মেনে নেয়। বিশ্বব্যাংক অবশ্য বাংলাদেশ থেকে ১২০ কোটি ডলার আদায় করতে চেয়েছিল।[৪০]

পাকিস্তান বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশ আশা করেছিল, পাকিস্তানের সম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে একটা সুরাহা হবে। চুয়াত্তরের জুনে ভুট্টোর ঢাকা সফরের সময় বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল : পাকিস্তানের সব সম্পদ ও দায়দেনা উভয় দেশ সমান ভাগ করে নেবে, ভাগ-বাটোয়ারার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি যৌথ কমিশন গঠন করা হবে; এবং পাকিস্তান সৌজন্য দেখিয়ে দুই মাসের মধ্যে প্রতীকী অর্থে ২০ থেকে ৩০ কোটি ডলার দেবে। এই হিসাবটা করা হয়েছিল দৃশ্যমান সম্পদকে বিবেচনায় রেখে, যেমন সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রার মজুত, অসামরিক বিমান এবং সমুদ্রগামী জাহাজ। দূতিয়ালি করার জন্য প্রয়োজনে সৌদি আরব, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত—এই তিনটি দেশের যেকোনো একটিকে জড়াতে অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ। ভুট্টো এ নিয়ে কোনো আলোচনা করতে রাজি হননি এবং এ প্রসঙ্গে কোনো যৌথ বিবৃতিও প্রকাশিত হয়নি।[৪১]

এক শ্রেণির মানুষ ভুট্টোকে নিয়ে মাতামাতি করেছিল। তাদের উচ্ছ্বাস ছিল বাড়াবাড়ি রকমের দৃষ্টিকটু। এর একটি বিবরণ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতির সহকারী প্রেস সচিব মাহবুব তালুকদার। ২৯ জুন ভুট্টোর দেশে ফেরার দিন। রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিব এম কেরামত আলী বঙ্গভবন থেকে মাহবুব তালুকদারকে নিয়ে বের হলেন। তাঁরা দেখলেন অনেক মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ভুট্টোকে দেখার জন্য। দুপুর আড়াইটার দিকেও পথের দুপাশে মানুষ উপচে পড়ছে। ভিড় সামলাতে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী ছিল তৎপর। তারা জনতাকে পেটাতে থাকল। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে রক্ষীবাহিনী প্রেসক্লাবের সামনে এসে রাইফেলের বাট দিয়ে মানুষকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। অনেক সাংবাদিক নাজেহাল হন, বিশেষ করে ফটো সাংবাদিকরা। *অবজারভার* হাউজের সামনে দৈনিক *পূর্বদেশ* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক কবি মহাদেব সাহাকে বেদম পেটানো হলে আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।[৪২]

ভারতের রাষ্ট্রপতি বরাহগিরি ভেংকটগিরির বাংলাদেশ সফরের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হাইকমিশনার সুবিমল দত্ত তাঁর অনেক আগেই ঢাকা ছেড়ে চলে যান। ভুট্টোকে স্বাগত জানাতে প্রটোকল অনুযায়ী ডেপুটি হাইকমিশনার জে এন দীক্ষিত ঢাকার তেজগাঁ বিমানবন্দরে যান। ভুট্টোর সফর, পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলি এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের টানাপোড়েন প্রসঙ্গে দীক্ষিতের বর্ণনা

বেশ খোলামেলা :

বিমানবন্দরে মুহুর্মুহু স্লোগান উঠল—বাংলাদেশ-পাকিস্তান মৈত্রী জিন্দাবাদ, জুলফিকার আলী ভুট্টো জিন্দাবাদ। অভ্যর্থনাকারীদের সারিতে থাকা আমাকে যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো, আমার সঙ্গে করমর্দন করে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'অ, তিনি ওই দেশের প্রতিনিধি, যে দেশটি একাত্তরে উপমহাদেশের মানচিত্র বদলে দিয়েছে।' তারপর আমাকে বললেন, হয়তো তিনি (দীক্ষিত) দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা কাশ্মির সমস্যা মিটিয়ে ফেলে দ্বিতীয়বার মানচিত্র বদলাতে সাহায্য করবেন।' আমি বিরক্তি চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, 'মান্যবর, আপনি যদি চান, ভারত একাত্তরে যেমনটি করেছিল তা আবার করতে পারে এবং আমরা কাশ্মির সমস্যার সমাধান করতে পারলে খুশি হব।' তিনি আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালেন এবং সরে গিয়ে আমার পাশে দাঁড়ানো মালয়েশিয়ার হাইকমিশনারকে স্বাগত জানালেন। ভুট্টোর আচরণ ছিল খাপছাড়া এবং একগুঁয়ে। তিনি মনে করতেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে পাকিস্তান দয়া দেখিয়েছে। আটকেপড়া পাকিস্তানিদের ফিরিয়ে নেওয়া এবং সম্পদ ভাগাভাগির ব্যাপারে তিনি অঙ্গীকার করলেন না। তাঁর মধ্যে কোনো অনুতাপ ছিল না। ভাষা আন্দোলনের স্মারকস্তম্ভ শহীদ মিনারে গিয়ে ফুল দিতে তিনি অস্বীকার করেন। সাভারে শহীদ স্মৃতিসৌধে যেতেও তাঁর আগ্রহ ছিল না। অনেক অনুরোধের পর তিনি সাভারে যান তাঁর পরনে ছিল টি-শার্ট এবং মাথায় গলফ ক্যাপ।

বিমানবন্দর থেকে যাত্রাপথটি ছিল অস্বস্তিকর। যখন আমাদের গাড়িগুলো যাচ্ছিল, তখন রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে জনতা ভুট্টো ও পাকিস্তানের পক্ষে স্লোগান দিচ্ছিল। শেখ মুজিবকে কটাক্ষ করেও অনেক স্লোগান দেওয়া হয়। পরে আমি জানতে পারি, প্রেসিডেন্ট ভবনে যাওয়ার পথে শেখ মুজিবুর রহমানের গাড়ি লক্ষ্য করে জুতার মালা ছোড়া হয়েছিল। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের মোড়ে গাড়ির গতি যখন কমে গিয়েছিল, তখন তারা আমার গাড়িতেও আঘাত করে এবং গাড়িতে লাগানো ভারতীয় পতাকা মুচড়ে দেয়। বলতে দ্বিধা নেই, রাগে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল এই সফরে ভুট্টো একটি বার্তাই দিতে চেয়েছেন যে, ভারত থেকে দূরে থাকো। তাঁর সফরসঙ্গীরা বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর পাকিস্তানপন্থি লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। ভুট্টোর সঙ্গে আসা মন্ত্রীরা শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার দুজন, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল বলে আমরা প্রামাণ্য তথ্য পেয়েছিলাম।

এই সফরের পুরো সময়টা মুজিবকে অবদমিত এবং রক্ষণাত্মক মনে হয়েছিল। ভুট্টো এবং পাকিস্তানের প্রতি মানুষের মনোভাব দেখে তিনি চমকিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এবং আওয়ামী লীগের প্রতি সাধারণ মানুষের এবং একশ্রেণির গণমাধ্যমের বিরূপ মনোভাব দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন।

এই সফরের ফলে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ব্যাপারে মুজিবের মনোভাব বদলে গিয়েছিল। এর পরিণতি হয়েছিল করুণ। চুয়াত্তরের শেষ দিকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। রাজনৈতিক সংঘাত গিয়েছিল বেড়ে। প্রায় এক দশক পর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ফাটল ধরেছিল। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে গিয়েছিল এবং অন্যান্য জায়গায় পূজা অনুষ্ঠানে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।[৪৩]

দেশে ভারতবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানকে সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে দেখতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে জাসদের সভাপতি মেজর জলিল ভয়েস অব আমেরিকার প্রতিনিধি আমানউল্লাহকে বলেছিলেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো ও তাঁর দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি যেন জলিলের সঙ্গে থাকেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন। আমানউল্লাহ জলিলকে স্বাধীনতার আগে থেকেই চিনতেন। জলিল তাঁকে বড় ভাইয়ের মতো জানতেন এবং নানান প্রয়োজনে তাঁর পরামর্শ চাইতেন। ভুট্টোর ঢাকা সফরের আগে পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর কর্মকর্তাদের একটি অগ্রবর্তী দল ঢাকায় এসেছিল। ওই সময় জলিল আমানউল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। অফিসে না পেয়ে জলিল তাঁর বাসায় ফোন করেন। আমানউল্লাহ তখন বাসায় ছিলেন না। ফলে তাঁকে ছাড়াই জলিল পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন ও কথাবার্তা বলেন। জলিলের এই সাক্ষাৎপর্ব নিয়ে জাসদ-নেতৃত্বের মধ্যে কিছুটা হইচই হয়েছিল। জলিল ছিলেন সাঁজোয়া বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি নবম সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ভারতবিরোধী রাজনীতি তাঁর মন বদলে দিয়েছিল।[৪৪]

ভারতবিরোধী রাজনীতির আরেক দিকপাল ছিলেন সিরাজ সিকদার ও তাঁর নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া যেকোনো শক্তিকে তাঁরা মিত্র মনে করতেন এবং তাদের সহযোগিতা নিতে উদগ্রীব ছিলেন। এটা ছিল তাঁদের রাজনৈতিক কৌশল। এ

ব্যাপারে সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেতা আকা ফজলুল হক রানা লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য দিয়েছেন :

> আমি ছিলাম ময়মনসিংহ জেলার দায়িত্বে। চুয়াত্তর সালে ঢাকায় আসি। সিকদার আমাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ধরিয়ে দিল। ঢাকায় পাকিস্তানের কোনো দূতাবাস ছিল না। মাদারিপুরের খন্দকার মহতাব উদ্দিন ছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসূত্র। তিনি ছিলেন 'মাশরেকি গ্রুপ'-এর কর্ণধার। তিনি ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে মালপত্র সরবরাহের ব্যবসা করতেন। চুয়াত্তরের জুনের শেষদিকে আমি তাঁর মতিঝিলের অফিস থেকে একবার ৩০ হাজার এবং পরে আরও ২০ হাজার টাকা এনেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন মহসিন আলী। জানতাম, টাকাটা ভুট্টো পাঠিয়েছেন। আমরা ওই টাকা দিয়ে পার্টির জন্য একটা পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম।[৪৫]

শেখ মুজিব তারপরও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন।

১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্য হয়। ওই সময় নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন চলছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে যান। ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন। ভাষণটি ছিল বাংলা ভাষায়। জাতিসংঘের ইতিহাসে এই প্রথম একজন সরকারপ্রধান বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। ভাষণে পাকিস্তানের সঙ্গে সব ধরনের ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার লক্ষ্যে তাঁর চেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলেন :

> পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোনো উদ্যোগ বাদ দেই নাই এবং সবশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ওই সব যুদ্ধবন্দি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোনো দর-কষাকষি করি নাই। আমরা কেবলমাত্র আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।[৪৬]

৪

শেখ মুজিব দেশে আপস-মীমাংসার মাধ্যমে একাত্তরের ক্ষত ভুলে জাতীয় ঐক্যের যে ধারার সূচনা করেছিলেন, তার একটি আভাস পাওয়া যায় তাঁর সহকারী একান্ত সচিব শাহরিয়ার ইকবালের বর্ণনা থেকে :

> ১৯ জানুয়ারি ১৯৭৫ অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গফ্ হুইটলাম রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন। সেদিন রাতে রাষ্ট্রাচারের নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়ার অতিথি প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে এক রাষ্ট্রীয় নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। ১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেছিলেন, রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে তাঁর দুজন অতিথি থাকবেন। অতিথিদের নাম তিনি আমাকে নৈশভোজের দিন সকালে জানাবেন। ১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি ফোর্সের কমান্ড্যান্ট কর্নেল জামিল আমার কাছে বঙ্গবন্ধুর দুজন অতিথির নাম জানতে চাইলেন। অতিথিদের সম্পূর্ণ লিস্ট তৈরি হওয়ার পরই টেবিল প্ল্যান প্রস্তুত করা হয় ঠিক করা হয় কোন অতিথি কোন টেবিলে বসবেন। আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে তাঁর অতিথিদের নাম জানতে চাইলাম। তিনি তাঁর অতিথিদের নাম বললেন, শাহ আজিজুর রহমান এবং জনাব জহিরুদ্দিন। এঁরা দুজনই দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে জেলে ছিলেন। সম্প্রতি ক্ষমা লাভ করে মুক্তি পেয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এঁরা দুজনই, বিশেষ করে শাহ আজিজুর রহমান হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে দালালি করেছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। আমি ওই দুজনের নাম কর্নেল জামিলকে জানালাম। তিনি এই দুজনকে নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠাতে বললেন।
>
> দুজনের ঠিকানা যোগাড় করা হলো। গোপীবাগ ও তোপখানা রোডে গণভবনের মোটরসাইকেল রাইডার কার্ড পৌঁছে দিয়ে এল। এমন সময় প্রধানমন্ত্রীর পুত্র শেখ কামাল আমাকে ফোন করে এই নিমন্ত্রণপত্র পাঠানোর সত্যতা জানতে চাইল। আমি তাকে জানালাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশানুযায়ী আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। কিছুক্ষণ পর গাজী গোলাম মোস্তফা আমাকে টেলিফোনে একই প্রশ্ন করেন এবং আমি একই উত্তর দিই। বিষয়টি আমি বুঝতে পারিনি। বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করার সাহস কারও ছিল না। এই দুজন সেই রাত্রিতে নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন। শেষের দিকের একটি টেবিলে তাঁদের বসানো হয়েছিল। পরে শুনেছিলাম শাহ আজিজকে পাকিস্তানে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হবে।[৪৭]

শেখ মুজিব যত দিন বেঁচে ছিলেন তত দিন গুরুত্বপূর্ণ দুটো দেশ চীন ও

সৌদি আরব বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়নি। এটাকে আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হতো। এমনকি এটাও প্রচার হয়েছিল যে বাংলাদেশ যেহেতু 'ভারতের একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র' সেহেতু এর সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সৌদি আরব ও চীনের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে শেখ মুজিবের সহকারী একান্ত সচিব শাহরিয়ার ইকবালের বিবরণটি ভিন্ন চিত্র তুলে ধরে :

> এক দিন সন্ধ্যায় ভারতে অবস্থানকারী একটি আরব দেশের রাষ্ট্রদূত অনির্ধারিতভাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। সেই রাষ্ট্রদূত সৌদি আরবের তখনকার বাদশাহ ফয়সলের পাঠানো কয়েকটি উপহার বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছিলেন। তিনটি উপহার ছিল. একটি অতি মূল্যবান জায়নামাজ, একটি সোনার হাতঘড়ি এবং এক বাক্স খেজুর। বঙ্গবন্ধু আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন খেজুরের বাক্সটি যেন গণভবনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের খাওয়ার জন্য দেওয়া হয়। সোনার ঘড়িটি সরকারি তোষাখানায় সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়। জায়নামাজটি বঙ্গবন্ধুর পিতার জন্য তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।... এই ঘটনা প্রমাণ করে যে সৌদি সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্য সৌদি বাদশাহ উপহার পাঠিয়েছিলেন। ১৯৭১ এর স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সঙ্গে সৌদি আরবের সেই প্রথম যোগাযোগ। সরকারি চিঠিটি (Dejure Recognition) ২৯-৮-১৯৭৫ তারিখে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পাঠানো হয়েছিল।[৪৮]

সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। গোড়া থেকেই সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার একটা চেষ্টা ছিল বাংলাদেশ সরকারের। সৌদি আরব তখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়নি। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণাও কাজ করেছে। বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরার জন্য ১৯৭৩ সালের মে মাসে শেখ মুজিব সৌদি বাদশাহ ফয়সলের কাছে একজন বিশেষ দূত পাঠিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলনে দুজনের দেখা হয়েছিল। বাদশাহ ফয়সল বলেছিলেন, তিনি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে 'দুটো চোখের মতো মূল্যবান' বলে মনে করেন। বাংলাদেশ একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশ হওয়ায় তিনি তাঁর শঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন। শেখ মুজিব তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, কোন পটভূমিতে পাকিস্তান ভেঙে গিয়েছিল।[৪৯]

শেখ মুজিব সৌদি আরবের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত হিসেবে সৌদি আরবে পাঠান। লাহোরে অনুষ্ঠেয় ইসলামিক ঐক্য সংস্থার (ওআইসি) আসন্ন শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশের যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গটি সৌদি বাদশাহর কাছে ব্যাখ্যা করাই ছিল এই সফরের উদ্দেশ্য। অক্টোবরের শেষে বা নভেম্বরের শুরুতে (১৯৭৪) কামাল হোসেন শেখ মুজিবের একটি বিশেষ বার্তা নিয়ে বাদশাহ ফয়সলের সঙ্গে দেখা করেন। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই সাক্ষাৎপর্ব ছিল উৎসাহজনক। এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার আগেই ফয়সল আততায়ীর হাতে নিহত হন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি শোকবাণী নিয়ে কামাল হোসেন সৌদি আরব যান এবং বাদশাহ খালেদ, যুবরাজ ফাহাদ এবং প্রয়াত বাদশাহর ছেলে সউদসহ (পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী) কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন। জুলাই মাসে (১৯৭৫) সৌদি আরবে ইসলামিক দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে কামাল হোসেন অংশ নেন। সম্মেলন শেষে তিনি বাদশাহ খালেদের সঙ্গে দেখা করলে খালেদ তাঁকে আশ্বস্ত করেন, দু মাসের মধ্যেই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে। তিনি কামাল হোসেনকে এ ব্যাপারে যুবরাজ সউদের সঙ্গে সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন। সম্মেলন শেষে যে বিশেষ রাজকীয় ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে প্রধান টেবিলে সৌদি রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ, ওআইসির মহাসচিব, আরব লীগের মহাসচিব ও প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) প্রতিনিধির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধি কামাল হোসেনকে আসন দেওয়া হয়। ব্যাপারটি সবার নজর কেড়েছিল। বাদশাহ খালেদ কামাল হোসেনকে বলেছিলেন, আগস্টের শেষভাগে পেরুর লিমায় জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে যাওয়ার পথে তিনি যেন জেদ্দায় থেমে কূটনৈতিক স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে যান। আগস্টের শেষে কামাল হোসেনের আর লিমা যাওয়া হয়নি।[৫০]

গণচীনের ঘটনাটিও অনুরূপ। এ ঘটনাটি শাহরিয়ার ইকবাল ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি হুমায়ুন কবীরের কাছে শুনেছিলেন। পরে তখনকার পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দিন আহমেদের কাছেও একই ঘটনা শুনেছিলেন। হুমায়ুন কবীর তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক প্রচার বিভাগের পরিচালক ছিলেন। একদিন তাঁকে গণভবনে রাষ্ট্রপতির দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ও পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দিন আহমেদ। হুমায়ুন

কবীরকে বলা হলো যে অতি জরুরি এবং গোপনীয় কূটনৈতিক কাজে তাঁকে হংকং যেতে হবে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে বার্মায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খাজা মোহাম্মদ কায়সারের সঙ্গে। রাষ্ট্রদূত কায়সার রেঙ্গুন থেকে হংকং হয়ে পিকিং যাবেন। সেখান থেকে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের বঙ্গবন্ধুকে লেখা একটি চিঠি নিয়ে হংকংয়ে ফিরবেন। হুমায়ুন কবীর সেই চিঠি কায়সার সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে ঢাকায় ফিরবেন। রাষ্ট্রদূত কায়সার ছিলেন হুমায়ুন কবীরের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়।

কূটনৈতিক গোপনীয়তা রক্ষার জন্য অনেক কিছুই করতে হয়। হুমায়ুন কবীরকে নির্দেশ দেওয়ার সময় শেখ মুজিব বলেছিলেন যে একজন সিনিয়র ডিপ্লোম্যাটকে এ কাজে পাঠালে অনুসন্ধিৎসু মহলের কৌতূহল বাড়বে। একজন জুনিয়র ডিপ্লোম্যাটকে পাঠালে সে বিষয়টির গুরুত্ব অতটা বুঝতে পারবে না। সে জন্যই একজন মিডসিনিয়র ডিপ্লোম্যাটকে হংকং পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। হুমায়ুন কবীর নিষ্ঠার সঙ্গে শেখ মুজিবের দেওয়া গুরুদায়িত্বটি পালন করেছিলেন। চৌ এন লাই সেই চিঠিতে শেখ মুজিবকে জানিয়েছিলেন, গণচীন সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আনুষ্ঠানিক চিঠি যথাসময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠিটি ৩১-৮-১৯৭৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে দেওয়া হয়। খন্দকার মোশতাকের পাকিস্তানপন্থী পররাষ্ট্রসচিব সম্পূর্ণ ঘটনাটি নিখুঁতভাবে পাল্টে দিয়েছিলেন।[৫১]

বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব যখন দেশে ফিরলেন, তখন তিনি দেখলেন দেশটা লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। ওই সময় উঠে দাঁড়ানোর জন্য দরকার ছিল প্রচণ্ড রকমের আত্মবিশ্বাস এবং জাতীয় ঐক্যের। শেখ মুজিব ঐক্যের একটি ধারার সূচনা করেছিলেন। ওই সময় বিরোধী দলের অনেক রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবকে আপসকামী এবং সুবিধাবাদী বলে সমালোচনা করতেন। এক রাতের মধ্যেই যাঁরা একটা বিপ্লব ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েমের খোয়াব দেখতেন, তাঁদের ক্রমাগত আক্রমণে শেখ মুজিবকে পিছু হটতে হয়েছিল। তিনি দিন দিন তাঁর দলের সুবিধাবাদী ও দুর্নীতিবাজ লোকদের হাতের মুঠোয় চলে যাচ্ছিলেন। তাঁকে নিঃসঙ্গতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

বিরোধী শিবিরের রাজনীতিবিদ, বিশেষ করে যাঁরা একাত্তরে জনগণের প্রতিপক্ষ ছিলেন, শেখ মুজিব তাঁদের প্রতি উদারতা দেখিয়েছিলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার চেয়ে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনাকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি

মনের মধ্যে প্রতিহিংসা পুষে রাখেননি। সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করেছিলেন। রাজপথের রাজনীতিবিদ থেকে একজন স্টেটসম্যান হয়ে ওঠার চেষ্টা ছিল তাঁর। কিন্তু চলতি ধারার রাজনীতি তিনি পাল্টাতে পারেননি। বিক্ষোভ আর হম্বিতম্বির মেঠো রাজনীতি সব দলই অব্যাহত রেখেছিল, এমনকি আওয়ামী লীগও। এর খেসারত দিতে হয়েছে পুরো জাতিকে।

বাকশাল

এদেশে চুরি-ডাকাতি বেশ পুরোনো পেশা, সবসময়ই ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে অপরাধের আকার ও প্রকার হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছিল। অপরাধীরা আগে লাঠি-সোঁটা, রাম-দা, বল্লম, বড়জোর গাদা বন্দুক ব্যবহার করত। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় অপরাধের ধরন গেল পাল্টে। এর পেছনে প্রকাশ্য ও গোপন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের প্রশ্রয় কিংবা অংশগ্রহণ কোনো লুকানো বিষয় ছিল না। কাগজের পাতায় ছিনতাই, ডাকাতি, রাহাজানি আর খুনের খবর নিত্যদিন ছাপা হতো। এর সঙ্গে যোগ হলো বাজার, থানা ও ব্যাংক লুটের ঘটনা। নিচের সংবাদ শিরোনামগুলো দেখলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করা যায় :

শহরে আর একটি ব্যাংক ডাকাতি (*ইত্তেফাক*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২)।

৯ মাসে রংপুরে ৩০২টি খুন : ২২৬টি ডাকাতি (*ইত্তেফাক*, ১৬ অক্টোবর ১৯৭২)।

ব্যাংকের টাকা ও গাড়ী ছিনতাই (*ইত্তেফাক*, ১০ জানুয়ারি ১৯৭৩)।

২৮ দিনে ২০ জন আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থক নিহত (*ইত্তেফাক*, ২ মার্চ ১৯৭৩)।

জয়দেবপুরে সশস্ত্র ব্যাংক ডাকাতি : সাড়ে আটাত্তর হাজার টাকা ছিনতাই (*ইত্তেফাক*, ৫ এপ্রিল ১৯৭৩)।

দুষ্কৃতিকারীরা পুলিশের হাত হইতে অস্ত্র ছিনাইয়া লইতেছে (*ইত্তেফাক*, ২৫ জুন, ১৯৭৩)।

আরেকটি পুলিশ ক্যাম্পে দুষ্কৃতিকারীদের হামলা (*ইত্তেফাক*, ২৮ জুন ১৯৭৩)।

বরিশালে থানা অস্ত্রশালা লুট (*ইত্তেফাক*, ৪ জুলাই ১৯৭৩)।

পুলিশ ফাঁড়ি আক্রান্ত : সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র লুট (*ইত্তেফাক*, ১২ জুলাই ১৯৭৩)।

লৌহজং থানা ও ব্যাংক লুট (*ইত্তেফাক*, ২৮ জুলাই ১৯৭৩)।

চট্টগ্রামে ব্যাংক ডাকাতি; লালদীঘিতে গ্রেনেড চার্জ ১৮ জন আহত :

পাথরঘাটায় রেঞ্জার অফিসের অস্ত্র লুট (*ইত্তেফাক*, ১৫ আগস্ট ১৯৭৩)।

সংসদে প্রশ্নোত্তর : এ পর্যন্ত ৭৩ জন পুলিশ ও বিডিআর খুন : ২টি থানা ও ১৭টি ফাঁড়ি লুট (*ইত্তেফাক*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩)।

রাজশাহীতে পুলিশ ফাঁড়ি ভস্মীভূত : দুর্বৃত্তের গুলীতে ৭ জন পুলিশসহ অন্যূন ১২ ব্যক্তি নিহত (*ইত্তেফাক*, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩)।

রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে গুলী বিনিময়ে ৮ জন নিহত (*ইত্তেফাক*, ৫ অক্টোবর ১৯৭৩)।

থানা, খাদ্য গুদাম, ব্যাংক, ডাকঘর ও অয়্যারলেস কেন্দ্র লুট (*ইত্তেফাক*, ৬ অক্টোবর ১৯৭৩)।

হরিণাকুণ্ডু থানায় অগ্নিসংযোগ : অস্ত্র-শস্ত্র লুট : সশস্ত্র হামলাকারীদের সহিত পুলিশের প্রচণ্ড গুলী বিনিময়, আহত অবস্থায় একজন নকশাল গ্রেপ্তার (*ইত্তেফাক*, ১১ অক্টোবর ১৯৭৩)।

১১টি থানা ও ফাঁড়ি লুট : পুলিশসহ শতাধিক নিহত : সহস্রাধিক ডাকাতি—অক্টোবরের খতিয়ান (*ইত্তেফাক*, ১ নভেম্বর ১৯৭৩)।

গুলীবর্ষণ : পোলিং অফিসার অপহরণ : সন্ত্রাস : ৫টি ইউনিয়নে নির্বাচন পণ্ড : ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও ব্যালট বাক্স ছিনতাই (*গণকণ্ঠ*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৩)।

জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর : ১০২৮০টি ডাকাতি হয়েছে, বাজার লুট হয়েছে ১৩টি, থানা থেকে প্রায় ৪শ আগ্নেয়াস্ত্র লুট, দুষ্কৃতিকারীর হামলায় ১৮০৯ জন নিহত (*গণকণ্ঠ*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪)।

গ্রেনেড বিস্ফোরণ : ছাত্রী আহত : ৩ জন গ্রেপ্তার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা (*ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল ১৯৭৪)।

বগুড়ায় থানা লুট : ২ জন পুলিশসহ ৩ জন নিহত (*ইত্তেফাক*, ২৪ জুন ১৯৭৪)।

সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তথ্য : এ পর্যন্ত ৯৫৬০টি নরহত্যা : ১২২৪টি ডাকাতি। ২৭১টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে ঘটেছে (*গণকণ্ঠ*, ২৯ জুন ১৯৭৪)।

গত ৩৩ মাসে দুষ্কৃতিকারীদের গুলীতে ৪ জন এমসিএসহ ৫২৪ জন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত (*ইত্তেফাক*, ২৩ আগস্ট ১৯৭৪)।

পাবনায় পুলিশ ও সশস্ত্র দলের মধ্যে গুলী : ১ ব্যক্তি নিহত (*ইত্তেফাক*, ২৫ আগস্ট ১৯৮৪)।

থানা আক্রমণ—২ ঘণ্টাব্যাপী গুলী বিনিময় : ১ জন পুলিশ নিহত (*ইত্তেফাক*, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)।

মানিকগঞ্জে ব্যাংক ডাকাতি (*ইত্তেফাক*, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৪)।[১]

রাজনীতি ক্রমেই সংঘাতময় হচ্ছিল। খুনোখুনি বাড়ছিল। সরকারি দলের

কর্মী-সমর্থক এবং রাষ্ট্রীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের হাতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানি, গুম এবং খুনের খবর মানুষের মুখে মুখে চাউর হতো। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মীও তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কিংবা অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের গণপরিষদ এবং প্রথম জাতীয় সংসদের আলোচনায় অন্তত ছয়জন সংসদ সদস্যের নিহত হওয়ার তথ্য উঠে এসেছে। তাঁদের নামে সংসদে শোক প্রস্তাব নেওয়া হয়।

গুপ্তহত্যার প্রথম শিকার ছিলেন ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদে খুলনা-৫ আসন থেকে নির্বাচিত মো. আবদুল গফুর। তিনি ৬ জুন ১৯৭২ নিহত হন। সওগাতুল আলম সগীরকে হত্যা করা হয় ৩ জানুয়ারি ১৯৭৩। তিনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে বাখরগঞ্জ-১৮ আসন থেকে সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে ফরিদপুর-১৭ আসন থেকে নির্বাচিত এ এফ এম নুরুল হক হাওলাদার নিহত হন ৩০ মে ১৯৭৩। বাখরগঞ্জ-৩ আসন থেকে ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদে এবং ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্য মোতাহার উদ্দীনকে ১৯৭৪ সালের ১০ জানুয়ারি হত্যা করা হয়। ১৯৭০ সালে ঢাকা-২২ আসন থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য গাজী ফজলুর রহমানও নিহত হন। সবশেষ হত্যাকাণ্ডটি ঘটে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ঈদের জামাতে। ওইদিন নিহত হন কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া।[২]

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি জাসদের জাতীয় কমিটির সহসভাপতি মোশাররফ হোসেনকে যশোরে অজ্ঞাত আততায়ীরা গুলি করে হত্যা করে। তিনি বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। স্থানীয় জাসদের দাবি, সরকারি দলের সমর্থনপুষ্ট লোকেরা তাঁকে হত্যা করেছে। সংসদে তাঁর নামে কোনো শোকপ্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি।

সশস্ত্র রাজনীতির প্রধান অনুঘটক ছিল পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ও জাসদ। সর্বহারা পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৭২ সালে সেনাবাহিনী ছেড়ে আসা লে. ক. (অব.) জিয়াউদ্দিন। আরেক সাবেক সেনাকর্মকর্তা লে. ক. (অব.) আবু তাহের যোগ দিয়েছিলেন জাসদে। দল দুটি 'বিপ্লবে'র কথা বলত। জিয়াউদ্দিনের ঘাঁটি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে। তাহের জাসদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা 'বিপ্লবী গণবাহিনী'র নেতৃত্ব দিলেও ফুলটাইম সরকারি চাকরি করতেন। মুক্তিযুদ্ধে একটি পা হারানোর কারণে তিনি সামরিক পরিভাষায় 'ডাউন কেটেগোরাইজড' হয়ে সেনাবাহিনী ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে একটি অসামরিক পদে

নিয়োগ দিয়েছিলেন, প্রথমে অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থায় এবং পরে পানি উন্নয়ন বোর্ডে।

মার্কিন সাংবাদিক ড্যানিয়েল সাদারল্যান্ডের একটি প্রতিবেদনে তাঁদের কর্মতৎপরতার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছিল বোস্টন থেকে প্রকাশিত *ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর* পত্রিকায়। বাংলাদেশে বিরাজমান দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৮ অক্টোবর ১৯৭৪ ছাপা হওয়া এই প্রতিবেদনে তিনি লেখেন, 'যত ক্ষুদ্র বা বিচ্ছিন্নই হোক না কেন, তারা বিপ্লব চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, কিছু সংখ্যক 'মুক্তিযোদ্ধা'—যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছে এবং এখন মনে করছে যে, শেখ মুজিব ও তার অনুচররা তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।' সাদারল্যান্ড জিয়াউদ্দিনের নাম উল্লেখ না করে বলেন, এইসব বিরোধী মুক্তিযোদ্ধাদের একজন হচ্ছেন জনৈক লেফটেন্যান্ট কর্নেল—যিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর ও পরে ঢাকার সামরিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন, মাস কয়েক আগে তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছেন। দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে সাদারল্যান্ডের মন্তব্য ছিল—দুঃস্থ মানুষের অসন্তোষ কখনো সংগঠিত বিরোধী আন্দোলনের দিকে যাবে কি না, ভবিষ্যতেই তা জানা যাবে।[৩]

২

আওয়ামী লীগের মধ্যে একতার বুননটা ক্রমশ ছিঁড়ে যাচ্ছিল। বিষয়টি উঠে এসেছে গওহর রিজভীর একটি গবেষণাপত্রে। দলের মধ্যে দলাদলি প্রসঙ্গে রিজভী বলেন :

> অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের ভেতরেও উত্তেজনা দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের ভেতরে উপদলীয় কোন্দল কোনো নতুন নয়। এতদিন এটা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে, প্রথমত, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম এবং দ্বিতীয়ত, শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বের কারণে। শেখ মুজিবের পর দলের নেতা কে হবেন, এর মীমাংসা হয়নি। মুজিবের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের কারণেই দলে প্রকাশ্য বিভক্তি দেখা যায়নি। মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য সরকার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করেন। কেবল মন্ত্রিসভায় নয়, তরুণ নেতৃত্বেও ফাটল ধরেছিল। তোফায়েল আহমেদ শেখ ফজলুল হক মণির কাছ থেকে সরে যাচ্ছিলেন এবং এর ফলে কেন্দ্রীয়, জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে যুব ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে বিভক্তি তৈরি হয়।[৪]

দেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা কায়েম হতে যাচ্ছে, এরকম গুঞ্জন ছিল। ১৭ নভেম্বর ১৯৭৪ ইংরেজি সাপ্তাহিক *হলিডে* পত্রিকায় অচিন্ত্য সেনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকার শিগগিরই রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতি, বিপ্লবী কাউন্সিল ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে কাঠামোগত পরিবর্তন আনবে বলে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বাগদাদ ও কায়রো সফরের পরপরই সরকারপদ্ধতি বদলানোর চিন্তা শুরু হয়েছে এবং একদলীয় ব্যবস্থা কেমন কাজ করছে এটা দেখতে ও বুঝতে তিনি ওই দেশ দুটো সফর করেছেন। ইতিমধ্যে একটি ইংরেজি দৈনিকে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার গুঞ্জন শুরু হয়েছে এবং বলা হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র এদেশের মানুষের জন্য উপযোগী নয়।[৫]

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহ সংবিধানের ১৪১ (ক) অনুচ্ছেদের (১) দফায় দেওয়া ক্ষমতাবলে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। কারণ হিসেবে বলা হয় : 'এমন ভয়াবহ জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন।'[৬]

নাগরিক সংগঠন মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমদ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার বিষয়টি আইনগতভাবে চ্যালেঞ্জ করার প্রস্তুতি নেন। রাতে *হলিডের* সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান এবং *ইত্তেফাকের* সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু তাঁর বাসায় আসেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। পরদিন সকালে মওদুদ গ্রেপ্তার হন। মওদুদের ভাষ্যে জানা যায় :

> ভোরবেলায় পুলিশ সুপার জব্বার সাহেব দরজায় বেল টিপলে দরজা খোলার পর আমার স্ত্রীকে জানালেন যে, তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। রাতের বেলায় ঘরে ঢোকেনি, ব্রিটিশ আমল থেকে দেশের আইনে মানা আছে বলে।
>
> ড. কামাল হোসেন আর ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলামকে খবরটা দিলাম। তাঁরা শুনে অবাক। তাঁরা প্রথমে গেলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী সাহেবের বাসায়। তিনিও কিছু জানেন না। শুধু বিস্মিত হলেন। খুব ভালো মানুষ ছিলেন। আমার কথা শুনে আশ্চর্য হলেন। তারপর ওরা যখন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গেলেন, শেখ সাহেব জানালেন আমাকে কারাবন্দি করার নির্দেশ তিনি নিজেই দিয়েছেন। টেলিফোনে যখন তাঁরা এই খবরটা দিলেন তখন আর দেরি করিনি। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে পড়লাম জেলখানায় যাওয়ার জন্য।

Registered No. DA-1

Extraordinary
Published by Authority

SATURDAY, DECEMBER 28, 1974

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF CABINET AFFAIRS

Cabinet Division

No. 3(50)/74-CD(CS), dated, December 28, 1974.

PROCLAMATION OF EMERGENCY

WHEREAS the President is satisfied that a grave emergency exists in which the security and economic life of Bangladesh are threatened by internal disturbance;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (*1*) of article 141A of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, the President is pleased hereby to issue this Proclamation of Emergency.

MUHAMMADULLAH
President.

Countersigned.

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
Prime Minister.

DACCA;
The 28th December, 1974.

(6441)
Price: 24 Paisa.

দেশে জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা সংবলিত সরকারি গেজেট, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য বিদেশ থেকে আইনজ্ঞ স্যার টমাস উইলিয়ামকে আনার ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম।... ১১ মাস তাঁর মামলায় নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে নানা কিছু আয়োজন করেছি। তাঁর অবৈতনিক একান্ত সচিবের কাজ করেছি। গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর সঙ্গে গিয়েছি তাঁকে সাহায্য করার জন্য।...

মাস ছয়েক আগে ১৬ জুলাই ১৯৭৪ শেখ সাহেব আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন রাগ করে—এদেশের বুদ্ধিজীবীদের মেরুদণ্ডহীনতার কথা। জিজ্ঞেস করেছিলেন পাবনার কমিউনিস্ট নেতা আবদুল মতিনের মামলা আমি কেন করি টিপু বিশ্বাস, ওয়াহিদুর রহমানের জন্য আমার সহানুভূতি কেন থাকবে। শান্তি সেন, অরুণা সেন কে আমার? তাঁর দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বের সামনে সাহস করে শুধু বলেছিলাম, পাকিস্তান সরকারের এক নম্বর শত্রু ছিলেন আপনি, অথচ আমরা আপনার পক্ষ সমর্থন করে ডিফেন্স টিম তৈরি করেছিলাম, আর এখন স্বাধীন দেশে নিজেদের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য কিছু করতে পারব না? যাই হোক শেষ পর্যন্ত মুজিবের নির্দেশেই আমাকে গ্রেপ্তার হতে হলো

স্পেশাল ব্রাঞ্চের এসপি জব্বার সাহেব গাড়ি করে আমাকে নিয়ে গেলেন প্রথমে আমার চেম্বারে। সমস্ত ফাইলপত্র ঘাঁটলেন। যত রাজনৈতিক কর্মীর মামলা করেছি তাঁদের হদিস নিলেন।... আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় টেলিফোনে আড়িপাতা হয়েছিল, গাড়ি করে আমাকে সব সময় অনুসরণ করা হয়েছে, কিন্তু পুলিশ কোনোদিন চেম্বারে ঢোকার সাহস করেনি। শেখ মুজিবকে ডিফেন্ড করার জন্য তো তখন আমাকে আটক করেনি? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এসব নিয়ম কানুনের পরিবর্তন হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশ স্বাধীন হলে নাকি এসবই ঘটে। নাগরিকদের স্বাধীনতা কমে যায়। নাগরিক অধিকার লোপ পায় ঔপনিবেশিক সরকারের চেয়ে জাতীয় সরকারগুলো বেশি নির্মম হয় এবং আইনের শাসনের প্রতি বেশি অবহেলা দেখায়। এসব জাতীয় সরকারের অধীনে আদর্শ এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে খুব দ্রুত। সমাজ হয়ে পড়ে মানদণ্ডহীন। যদিও এসব কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।[৭]

হংকং থেকে প্রকাশিত *ফার ইস্টার্ন ইকোনোমিক রিভিও*র ১০ জানুয়ারি ১৯৭৫ সংখ্যায় ডেভিড হার্স্ট-এর এক প্রতিবেদনে জরুরি অবস্থা জারির সমালোচনা করে বলা হয়, 'শেখ মুজিবুর রহমান অবশেষে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।... জরুরি অবস্থা বলবৎ করতে গিয়ে শেখ মুজিব সেই পুরোনো জুজুর ভয়ই দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে 'প্রো-পাকিস্তানি'রা এখনও সক্রিয়। কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষক একমত যে, যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকার ব্যর্থ হয়েছে, সে

জন্যই জরুরি অবস্থা চালু করা হয়েছে।'[৮]

১৭ জানুয়ারি লন্ডন থেকে প্রকাশিত *ডেইলি টেলিগ্রাফে* 'মুজিব একনায়কত্ব কায়েম করেছে' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে পিটার গিল মন্তব্য করেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন।'[৯]

পরিস্থিতি প্রকৃত অর্থেই সংকটজনক ছিল এবং জরুরি অবস্থা জারি করার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এটাই জরুরি অবস্থা জারির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। শেখ মুজিব চেয়েছিলেন 'শোষণমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে' প্রশাসনে এবং সংবিধানে সংস্কার এনে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথ সহজ করতে। এ প্রসঙ্গে মওদুদ আহমদের মন্তব্য হলো, শুধু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য নয়, সরকারের রাজনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।[১০]

১৭ জানুয়ারি ১৯৭৫ গণভবনে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক শুরু হয়। দলের নির্বাহী কমিটির সদস্যরাও বিশেষ আমন্ত্রণে এই সভায় যোগ দেন। সভায় জাতীয় সমস্যাগুলোর সমাধানের উপায় আলোচনা করতে গিয়ে প্রশাসনের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শেখ মুজিব বিরাজমান পরিস্থিতির কড়া সমালোচনা করে সমস্ত ব্যর্থতার জন্য সরকারকে দায়ী করেন। পরপর তিনদিন সাত ঘণ্টার তীব্র বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়। শেখ মুজিবের বিরোধিতা করার সাহস কারও ছিল না। কয়েকজন নেতা ঘটনার গতি সমর্থন করতে পারেননি এবং আলোচনায়ও তাঁরা অংশ নেননি। দুর্নীতিবাজ সংসদ সদস্যরা নিজেদের দুর্নীতি চাপা দেওয়ার ভয়েই তাঁকে সমর্থন দেন। দলের নেতারা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। 'শেখ মুজিবের তেজোদীপ্ত ভাবগম্ভীরতা ও ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেদের সত্তা বিসর্জন দেওয়া ছাড়া অন্যদের কোনো গত্যন্তর ছিল না।' এম এ জি ওসমানী ও মইনুল হোসেন সরকারের রাজনৈতিক ভূমিকার সঙ্গে একমত না হওয়ায় দল থেকে পদত্যাগ করেন। অন্যরা শেখ মুজিবের ওপর পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করে সংকট সমাধানের জন্য তাঁর হাতেই সব ক্ষমতা দেন।[১১]

আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সভায় বাকশাল ব্যবস্থার পক্ষে সংসদ সদস্যদের সমর্থন পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করেছেন আওয়ামী লীগদলীয় সদস্য মইনুল হোসেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, 'বলা হলো বঙ্গবন্ধু সকলের মতামত শুনেছেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব তাকেই দেয়া হলো।' সংসদীয় দলের সভায় কয়েকজন সদস্যের ক্ষোভ প্রকাশের বিষয়টি মইনুল হোসেন তুলে ধরেছেন

এভাবে :

> জেনারেল এম এ জি ওসমানী অত্যন্ত জোরালো ভাষায় শেখ সাহেবের উদ্দেশে বললেন, জনগণ আপনাকে 'মুজিব ভাই' হিসেবে দেখে থাকেন, তারা আপনাকে 'মুজিব খান' হিসেবে দেখতে চান না।... জেনারেল ওসমানী, নূরে আলম সিদ্দিকী ও আমি একইভাবে একদলীয় শাসনের বিপক্ষে ছিলাম।...
>
> বঙ্গবন্ধু সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন। সংসদ সদস্যদের ঢালাওভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলায় আমি বিশেষভাবে আহত ও অপমানিত বোধ করেছিলাম। তাই প্রতিবাদ করে বললাম, আমাদের সবাইকে 'চোর' না বলে যারা চুরি করেছে, যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে, তাদের বিচার করলেই তো হয়। বঙ্গবন্ধু উত্তর দিবার মতো কিছু পাচ্ছিলেন না।[১১]

শেখ মুজিব হঠাৎ করে একদলীয় সরকারব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেননি। অনেক দিন থেকেই তিনি এ নিয়ে ভাবছিলেন। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সিপিবির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর দলের নীতি ও কার্যক্রমের একটি পর্যালোচনামূলক দলিলে উল্লেখ করা হয় :

> ১৯৭৪ সালের জুন মাসে বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতৃত্বকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির জটিলতা ও সংকট—এই সব কিছু হইতে দেশকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য তিনি দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করিবেন, বিরাজমান সকল দলকে বাতিল করিয়া নতুন একটি দল গঠন করিবেন, পশ্চিমী সংসদীয় গণতন্ত্র বাতিল করিবেন এবং নতুন দলে তিনি আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশ, ন্যাপ ও আমাদের সমগ্র পার্টিকে পাইতে ইচ্ছুক। জুলাই মাসের মধ্যেই এই নতুন দল গঠিত হইবে বলিয়া তিনি আভাস দেন। তিনি এই বিষয়ে পার্টির অভিমত জানিতে চাহেন। অবশ্য বাকশাল আরো পরে গঠিত হয়।
>
> এই অবস্থায় জুলাই মাসের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে 'আমাদের পার্টির মে মাসের প্রস্তাব অনুযায়ী ত্রিদলীয় মৈত্রীজোট কার্যকর হইবে বলিয়া বঙ্গবন্ধু মনে করেন না। দেশের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য একটি প্রস্তাব বঙ্গবন্ধুর পক্ষ হইতে আমাদের নিকট আসিয়াছে। কেন্দ্রীয় কমিটি বঙ্গবন্ধুর এই প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করিয়াছে। দেশে একটি মাত্র আইনসিদ্ধ দল গঠনে আমাদের পার্টির প্রকাশ্যভাবে কাজ করিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে জানিয়াও বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করার সম্ভাবনা বিচার করিয়া নূতন দল গঠিত হইলে পার্টির সভ্য

কর্মী প্রভৃতির এই দলে যোগদান করা প্রয়োজন। কংগ্রেসে গৃহীত রণনীতিকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই নূতন দল কমরেডেদের যোগদানের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

এই সিদ্ধান্ত বাইরে প্রচারের জন্য নয়, পার্টির মধ্যে বুঝ সৃষ্টির জন্য এবং বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবের উত্তর ঠিক করার জন্য নেওয়া হয়। (অবশ্য বঙ্গবন্ধুকে ডিসেম্বর মাসের আগে পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু জানানো হয় নাই।) বাইরে প্রচারের জন্য 'সার্বিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন কর' এই দাবী তোলার কথা বলা হয়। কমিউনিস্ট পার্টিসহ সকল পার্টিকে বাতিল কর—এ রকম দাবি আমরা কখনোই তুলিতে যাইব না, এই কথা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু একদল করিলে আমরা সেই দলে গিয়া তাহার মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে উহা কাজে লাগাইব—ইহাই ছিল আমাদের বুঝ।[১৩]

বাংলাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতির ওপর মার্কিন প্রশাসনের নজরদারি ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টারকে বলেছিলেন, শেখ মুজিব ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতির গণতন্ত্র ছেড়ে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি গ্রহণ করবেন। ফলে প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার বাইরে গিয়ে পছন্দের দক্ষ লোকদের মন্ত্রিসভায় নিতে পারবেন। শেখ মুজিব তাঞ্জানিয়ার নেতা জুলিয়াস নায়ারের মতো সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের একটা দল বানাবেন এমন একটা গুঞ্জন থাকলেও পররাষ্ট্র সচিব তা নাকচ করে দেন। অথচ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পালাবদল ঘটে গেল।[১৪]

২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সংসদে চতুর্থ সংশোধনী বিল উত্থাপন করা হয়। এক নজিরবিহীন ন্যূনতম সময়ের মধ্যে বিলটি ২৯৪-০ ভোটে সংসদে পাস হয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিলটি নিয়ে সংসদে কোনো আলোচনা হয়নি। এই বিলের মাধ্যমে একদলীয় সরকারব্যবস্থা কায়েম করে রাষ্ট্রপতির ওপর নির্বাহী, আইন ও বিচারবিভাগের সকল নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত করা হয়। একই সংশোধনীবলে শেখ মুজিব দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা নেন। বিল পাশ হওয়ার পর পদত্যাগ করার সুযোগ না দিয়ে মুহম্মদুল্লাহকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে শেখ মুজিব তৎক্ষণাৎ স্পিকারের কাছে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন।[১৫] প্রকৃতপক্ষে এক দলের নিয়ন্ত্রণাধীন সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে একদলীয় সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটে।[১৬]

যেদিন চতুর্থ সংশোধনী বিল সংসদে পাশ হয়, ওই সময় সিপিবির মুখপত্র সাপ্তাহিক একতার সম্পাদক মতিউর রহমান সংসদের অতিথি গ্যালারিতে উপস্থিত থেকে পুরো বিষয়টা দেখেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল এ রকম :

> স্পিকার আবদুল মালেক উকিল অধিবেশন শুরু করলেন। চিফ হুইপ শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন বললেন, 'আপনাদের সামনে প্রস্তাব দেওয়া আছে। আমার প্রস্তাব হলো এটা পাঠ না করা।' সবাই মিলে প্রস্তাব পাঠ না করার প্রস্তাব পাশ করলেন। উনি আবার চতুর্থ সংশোধনী প্রস্তাব পাশের প্রস্তাব আনলেন এবং তা পাশ হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি নতুন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন—আমার অবাক লেগেছিল। পুরোটাই ছিল সাজানো।
>
> সংসদ ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রেস সেক্রেটারি তোয়াব ভাইয়ের (তোয়াব খান) কাছে আমি দু-একবার গিয়েছি। দেখি তাজউদ্দীনের ঘাড়ে হাত দিয়ে শেখ মুজিব বেরিয়ে আসছেন। তাজউদ্দীন মন্ত্রিসভায় নাই। বাট হি অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং অ্যান্ড ট্রাইড টু কনভিন্স আদার্স ইনক্লুডিং সিপিবি লিডারশিপ, 'আপনারা তাড়াহুড়ো করে এটাতে যাবেন না, বাধা দেন'। তাজউদ্দীন ওয়াজ সিরিয়াসলি কনভিন্সড যে এটা ঠিক পথ না। উনি মিটিংয়ে পার্টিসিপেট করেননি। সিপিবিকে বলেছেন, নিশ্চয় অন্যদেরকেও বলেছেন।[১৭]

চতুর্থ সংশোধনী বিল যখন পাস হয়, তখন প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিল খুবই কম। জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, জাসদের আবদুল্লাহ সরকার, মইনুদ্দিন মানিক ও আবদুস সাত্তার এবং স্বতন্ত্র সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সংসদ কক্ষ থেকে ওয়াক আউট করেছিলেন।[১৮]

'বিপ্লবী গণবাহিনী'র ডেপুটি কমান্ডার (পরে জাসদের এক অংশের সভাপতি) হাসানুল হক ইনুর একটি মূল্যায়ন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অবৈধ দখলদার ছিলেন না, তবে তিনি স্বৈরশাসকে রূপান্তরিত হন। তার স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপসমূহকে, যথা ২য় ও ৪র্থ সংশোধনী সংসদ বৈধতার ছাড়পত্র দেয় এবং তিনি নির্বাচন ছাড়াই একচ্ছত্র ক্ষমতায় অধিকারী স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হন।'[১৯]

সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিজ হাতে নেওয়ার বিষয়টা ভারতের গণমাধ্যমে যেমন প্রচার পেয়েছিল, সমালোচনাও হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) সমর্থিত সাময়িকী *ফ্রন্টিয়ার*-এর ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয় যে, সরকারের একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করা যায় না। 'অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের দুঃখ-কষ্ট নব্যশাসক শ্রেণির সৃষ্টি—শ্রেণিগত অসঙ্গতিরই ফল। কিন্তু বাংলাদেশের শাসক ও প্রশাসকরা অধিকতর অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ এবং লোভী—এরা রাতারাতি বড় হতে চায়।' মন্তব্যে আরও বলা হয়, 'জাতির প্রতি যা

সবচেয়ে অবমাননাকর, মুজিব তাকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' নামে অভিহিত করেছেন।'[২০]

একই দিন নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত *স্টেটসম্যান উইকলি*তে প্রকাশিত এক নিবন্ধে কুলদীপ নায়ার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করে বলেন, কূটনৈতিক শিষ্টাচার যা-ই হোক না কেন, বাংলাদেশের প্রতিটি কাজ ভারতের সমর্থন করার দরকার নেই; অভিনন্দন বার্তাটি দেরিতে পাঠানো যেত। অন্তত এটুকু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে, বাংলাদেশে যা ঘটেছে তাতে ভারত উৎসাহ বোধ করছে না। কুলদীপ নায়ারের মন্তব্য ছিল :

> নয়াদিল্লি হয়তো বিশ্বাস করছে যে, এই পরিবর্তন বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাবকে মোকাবিলা করতে শেখকে সাহায্য করবে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, শেখ ভারতের প্রতি অত্যন্ত বন্ধু-ভাবাপন্ন তাজউদ্দীন আহমদকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়েছেন। তিন বছর আগে তাজউদ্দীন আহমদ আমাকে বলেছিলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এত ভালো যে, ইচ্ছা করে এখনই মরে যাই, এর অবনতি দেখতে বেঁচে থাকতে চাই না।' ভারতবিরোধী মনোভাবের কারণ শেখ খুব ভালো করেই জানেন। জিনিসপত্রের অভাব এবং দুর্মূল্যের জন্য জনসাধারণ কষ্টে পাচ্ছে। কাজেই তারা বিশ্বাস করে যে, তারা অসুবিধা ভোগ করছে যেহেতু 'প্রতিটি জিনিস ভারতে চলে যাচ্ছে।' বস্তুত ভারতবিরোধী মনোভাব প্রতিরোধ করার জন্য ঢাকা কিছুই করেনি। সম্ভবত এর কারণ এই যে, ভারতবিরোধী মনোভাব মোকাবিলা করতে হলে সরকারকে জনসাধারণের রোষানলে পড়তে হবে।[২১]

ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের উপহাইকমিশনার জে এন দীক্ষিতের ভাষ্য অনুযায়ী, আওয়ামী লীগের মধ্যে দলাদলির কারণে শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছিল। তিনি কিছু মৌলিক সংস্কারের কথা ভাবলেন। তৃণমূলে আওয়ামী লীগ সমর্থন হারাচ্ছিল। পার্লামেন্টে এই দলের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় অন্যান্য দলের তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। তাঁর ধারণা হলো, এই সীমাবদ্ধতার কারণেই বিরোধী দলগুলো সহিংসতার পথে যাচ্ছে। তিনি উপলব্ধি করলেন সব দলের সমন্বয়ে নমনীয় কর্মসূচি নিয়ে আওয়ামী লীগের বদলে একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। তিনি ঠিক করলেন, বাকশাল হবে একটি জাতীয় মহাজোট, যা হবে জাতীয় সংহতি ও পুনর্গঠনের প্রধান হাতিয়ার। দীক্ষিতের ভাষ্যমতে :

> মুজিব একদলীয় ব্যবস্থা ঘোষণা করলেন। তিনি ইতিমধ্যেই তাজউদ্দীনকে বাদ দিয়েছেন। তিনি তাঁর ভাগনে শেখ মণি, ভগ্নিপতি সেরনিয়াবাত এবং অনুগত আমলাদের ওপর দিন দিন নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন।
>
> এ সময় রক্ষীবাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান তাঁর বাহিনীকে

ট্যাংক ও অন্যান্য সাঁজোয়া যানবাহন দেওয়ার জন্য মুজিবকে অনুরোধ করে বলেন, তিনি (মুজিব) যেসব পরিবর্তন এনেছেন, সেজন্য সামরিক বাহিনী ও অন্যরা তাঁর নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে। সামরিক অভ্যুত্থান ঠেকানোর জন্য রক্ষীবাহিনীর হাতে ন্যূনতম সামরিক সরঞ্জাম থাকা দরকার। শেখ মুজিব নূরুজ্জামানের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এরা সবাই তাঁর সন্তান এবং এরা তাঁর ক্ষতি করবে না, রক্ষীবাহিনী একটি আধা সামরিক বাহিনী হিসেবেই থাকুক। নূরুজ্জামানের পরামর্শে ভবিষ্যৎবাণী ছিল।[২২]

সংবিধান সংশোধন করে শেখ মুজিবের রাষ্ট্রপতি হওয়াকে ভারত প্রকাশ্যে সমালোচনা না করলেও ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব শেখ মুজিবের উত্তরোত্তর 'কর্তৃত্ববাদী' হয়ে ওঠার ব্যাপারে খুশি ছিলেন না। ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নেতাদের কাছ থেকে মুজিবের দূরে সরে যাওয়ায় ভারত নাখোশ হয়েছিল। পঁচাত্তরের গোড়ার দিকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াই বি চ্যাবনের ঢাকা সফরের সময় দুই দেশের সম্পর্ক ক্রমশ শীতল হয়ে পড়ার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল . মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, মুজিব ভারতের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্কের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসছেন। তিনি ভেবেছিলেন, স্বাধীনতা, স্বার্থরক্ষা এবং এই অঞ্চলে নিজের অবস্থান ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বদলানো দরকার।[২৩]

সরকারের দৃষ্টিতে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির প্রধান সিরাজ সিকদার ছিলেন 'মোস্ট ওয়ান্টেড টেররিস্ট'। পঁচাত্তরের পয়লা জানুয়ারি তিনি চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার হন। তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। পরদিন সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হয়েছেন। বিজ্ঞপ্তির ভাষ্য অনেকেই বিশ্বাস করেননি।

সিরাজ সিকদারের মৃত্যু নিয়ে অনেক হইচই হয়েছিল। জাতীয় সংসদে দেওয়া ভাষণে শেখ মুজিব কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'কোথায় সিরাজ শিকদার?' এ নিয়ে অনেকেই অভিযোগের তীর শেখ মুজিবের দিকে তাক করে বলেন, এ কথা বলে শেখ মুজিব সিকদার হত্যার দায় যেন নিজের কাঁধেই নিলেন।

দিনটি ছিল ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫। জাতীয় সংসদে চতুর্থ সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পর সংসদ নেতা শেখ মুজিব দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণে তিনি কথা প্রসঙ্গে সিকদারের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, যদিও তা ভাষণের একমাত্র বিষয় ছিল না। তিনি 'দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারীদের' উৎখাত করার আহ্বান জানিয়ে 'বিপ্লবীদের' কর্মকাণ্ড নিয়ে বিষোদগার করেন। ভাষণের ওই অংশটুকু ছিল এ রকম :

আর, একটা দল—তাদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, কোনো দেশে করে নাই, স্পিকার সাহেব আপনি তো ছিলেন, কোনো দেশের ইতিহাসে নাই। পড়ুন দুনিয়ার ইতিহাস, বিপ্লবের পরে যারা বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে, যারা শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, যারা দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, কোনো দেশ তাদের ক্ষমা করে নাই . কিন্তু আমরা করেছিলাম, সবাইকে ক্ষমা করেছিলাম। বলেছিলাম, দেশকে ভালোবাস, দেশের জন্য কাজ কর, স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নাও। থাকো। কিন্তু অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তারা গোপনে বিদেশিদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা মনে করে যে, খবর রাখি না। এত বড় তারা ব্যান্ডিট। মানুষকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে মনে করে যে, তাকে কেউ ধরতে পারবে না।

কোথায় সিরাজ শিকদার? তাকে যদি ধরা যায়, আর তার যে দলবল, তাদের যদি ধরা যায়, ধরতে পারব না কোন অফিসে কে ঘুষ খান? ধরতে পারব না অন্ধকারে বিদেশের থেকে কে পয়সা খান? ধরতে পারব না কে কোথায় পয়সা লুট করেন? ধরতে পারব না কোথায় কাবা হোর্ডার আছেন? ধরতে পারব না কারা ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার আছেন? নিশ্চয় ধরতে পারব। সময়ের প্রয়োজন। যেতে পারবে না কেউ। ইনশাআল্লাহ, পাপ একদিন ধরা দেবেই। এটা মিথ্যা হতে পারে না।

দুনিয়ায় কোনোদিন পাপ আর পুণ্য পাশাপাশি চলতে পারে না। পুণ্য চলে একদিকে, পাপ চলে অন্যদিকে। ভাইস অ্যান্ড ভার্চ্যু ক্যান নট গো টুগেদার। উই শুড নট ফরগেট ইট।

আজকে তাদের ক্ষমা করেছিলাম; তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে কটাক্ষ করে। বন্ধ করে দেওয়া হবে এসব। তাদের অধিকার দেওয়া হবে স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য? কোনো দেশে দেয় নাই। আমরা দিয়েছিলাম মাফ করে। মাফ যদি হজম করতে না পারা যায়, তাহলে কেমন করে কঠোর হস্তে দমন করতে হয়, তা আমরা জানি। আজকে দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হচ্ছে।...

যার যা ইচ্ছা লেখে, কেউ এ-নামে বাংলাদেশকে ডাকে, কেউ ও-নামে বাংলাদেশকে ডাকে, বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে তারা লজ্জাবোধ করে। তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার—যেমন নাই এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের—যারা মনে করে যে, তাদের কেউ ধরতে পারবে না। ভুলে যান, ভুলে যান। বাংলার মাটি, বাংলার নাড়ি আমি জানি।

স্পিকার সাহেব, এইভাবে রাত্রিবেলা দু'জনকে মেরে বিপ্লব করা যায় না। যদি তাই হত, তবে আওয়ামী লীগ বোধহয় দশ বছর, বিশ বছর আগেই

> আরম্ভ করতে পারত। দশটিকে মারলাম, পাঁচটিকে মারলাম--তাতে বিপ্লব হয় না। ওটা ডাকাতি হয় বা খুন হয়। এতে মানুষের জীবনকেই অতিষ্ঠ করা হয়।...[২৪]

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে ২৮ অক্টোবর পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে বেতার ও টেলিভিশনে দেওয়া লিখিত ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭-পরবর্তী মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী শাসনের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, 'তদানীন্তন ক্ষমতাসীন দল দেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, সে হীন চেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যই আমাদের মহান নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই আমরা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপসহীন সংগ্রাম শুরু করি। আমাদের সে সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি।'[২৫] মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় শেখ মুজিব নিজেই একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করলেন।

৩

রাজনীতিতে বিপরীত মেরুতে থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিব যে সবাইকে নিয়ে একটি জাতীয় দল বানাতে চেয়েছিলেন, তার একটি বিবরণ পাওয়া যায় ইউনাইটেড পিপলস পার্টির (ইউপিপি) সাধারণ সম্পাদক কাজী জাফর আহমদের লেখায়। শেখ ফজলুল হক মণি পঁচাত্তর সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কাজী জাফরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে 'বাকশালে' যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁদের কথোপকথন ছিল এ রকম :

> মণি : তুমি তো জানো বাকশাল গঠিত হচ্ছে।
>
> জাফর : এটা তো পত্র-পত্রিকায় এসে গেছে, এটা এখন সময়ের প্রশ্ন জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয়ে গেছে। এটা তো হবেই।
>
> মণি : হ্যাঁ বাকশাল, কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। প্রথমে একটা কমিটি গঠন করা হবে। এটাতে তুমি বিভ্রান্ত হয়ো না। এটা করা হবে প্রাথমিকভাবে আওয়ামী লীগের সংগঠনকে ধরে রাখার জন্য। মোজাফ্‌ফর ন্যাপ, মণি সিং-এর সিপিবি থেকে কিছু কিছু নেওয়া হবে। কিন্তু পরে নতুন একটা পলিটব্যুরো ঠিক করা হবে। এই পলিটব্যুরো ৭ জনকে নিয়ে গঠিত হবে। এর চেয়ারম্যান থাকবেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর দুজন প্রতিনিধি সদস্য থাকবে। এই ৩ জন আর আমরা ৪ জন।

জাফর : এই ৪ জন কে?

মণি : আমি, তুমি, মোহাম্মদ ফরহাদ এবং সিরাজুল আলম খান।

জাফর : এটা সম্ভব হবে?

মণি : কেন হবে না? অবশ্যই সম্ভব হবে। আমরা যারা '৬২-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেছি, যে '৬২-এর আন্দোলন ভাষা আন্দোলনের পরে সবচেয়ে বড় আন্দোলন, যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তরুণ নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে, সেই তরুণ নেতৃত্বই আগামী দিনে বাংলাদেশকে পরিচালনা করবে এবং কমপক্ষে ৩-৪ দশক নেতৃত্ব দেবে। কারণ আমাদের একটি নতুন চিন্তাভাবনা আছে।

জাফর : এই যে বিপরীতমুখী চিন্তাভাবনা, আদর্শ, নীতি, কর্মসূচি এগুলো কীভাবে সমন্বয় করা যাবে?

মণি : এগুলো করা যাবে। আলোচনার জন্য আমাদের বসতে হবে। কবে বসবে?

জাফর : ঠিক আছে, তোমার প্রস্তাব শুনলাম। আমাদের পার্টিতে এ নিয়ে আলোচনা করতে হবে।... রক্ষীবাহিনীর কী অবস্থা?

মণি : রক্ষীবাহিনী আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে।

জাফর : দেখলাম তোমার রক্ষীবাহিনী তোফায়েলের নেতৃত্বে অন্ধ।

মণি : রক্ষীবাহিনী আমার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

জাফর : সেনাবাহিনীর মধ্যে কী অবস্থা?

মণি: দেয়ার আর প্রবলেমস, উই উইল সল্‌ভ ইট আউট। এ আলোচনা থাক, তুই একটা কথা বল, আমরা যে চিন্তাভাবনা করেছি তার সঙ্গে আছিস কি না?

জাফর : তুই তো বললি এখন, আমাকে এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে না? আমি তো একা না। আমাদের দল আছে। সবার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

মণি : আর চিন্তাভাবনা করার কথা বাদ দে। দেখবে কোনোদিন তোমার লাশ রাস্তায় পড়ে থাকবে। আর আমাকে সে লাশ দাফন-কাফন করতে হবে। এমনকি তোমার পরিবারকেও আমাকেই চালাতে হবে। ঠিক আছে আবার দেখা হবে... তোমাকে নিয়ে মামার সঙ্গে দেখা করব।

জাফর : ঠিক আছে।

মণি : কোথায় থাকিস, কী খাস, কী করিস, কোথায় ঘুমাস? তোদের এ সমস্ত জিনিস আমি বুঝি না। আমরা কখনো এ সমস্ত আন্ডারগ্রাউন্ডের জীবন বিশ্বাস করি না। আমরা জেলে যাওয়াই পছন্দ করি। তোর কাছে টাকা-পয়সা আছে?

জাফর : দিবি নাকি?

মণি : দেখি।

বলেই সে ঘরের মধ্যে চলে গেল। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছে, যা হয় রাজনীতিবিদদের জীবনে। তারা যা আছে তা সব সময় উজাড় করে দিতে চায়। কিন্তু তাদের স্ত্রীদের তো সংসার চালাতে হয়। শেখ মণি আলমারি খুলে এক মুঠো টাকা নিয়ে আমার কাছে এলো।

আমি তখন গাড়িতে উঠব। বললাম, 'কত'?

সে বলল, 'আমি জানি না, তুই দেখ।' আমি চিন্তা করে দেখলাম আমার তো টাকার প্রয়োজন নেই। নেয়াটা ঠিক হবে না। কিন্তু মণির যে আবেগ এবং আমার জন্য হৃদয়মিশ্রিত তার যে ভালোবাসা তাকে অপমান করা যায় না। তাই টাকাটা আমি নিলাম। গাড়িতে আমি গুনে দেখলাম টাকার পরিমাণ ৮ হাজার।... আমাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য খুবই তীক্ষ্ণ ছিল; কিন্তু একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের একটা অভিব্যক্তি সেদিন ঘটেছিল শেখ মণির সঙ্গে আমার সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে।[২৬]

শেখ ফজলুল হক মণি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিলেন

কাজী জাফরের সঙ্গে শেখ মণি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই কথা বলেছিলেন বলে মনে হয়। শেখ মণি সম্ভবত তরুণ নেতৃত্বের মাধ্যমে নতুন দলের নিয়ন্ত্রণটি নিতে চেয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন, এতে তিনি শেখ মুজিবের সমর্থন পাবেন। বাস্তবে দেখা গেছে, শেখ মুজিব কথিত তরুণ নেতৃত্বের পথে হাঁটেননি। তাঁর পরামর্শেই সিরাজুল আলম খান দেশত্যাগ করেছিলেন। শেখ মুজিব তাঁর পুরোনো সহকর্মীদের ওপরই আস্থা রেখেছিলেন।

শেখ ফজলুল হক মণি দলের মধ্যে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিলেন। তাঁর অনুসারীরা 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' জন্য মরিয়া হয়ে উঠছিল। শেখ মুজিবের ওপর বাইরে থেকে বিভিন্ন বামপন্থী গ্রুপের চাপ যেমন ছিল, দলের ভেতরের চাপ তার চেয়ে ছিল বেশি। শেখ মণি দলের মধ্যে শুদ্ধি অভিযানের হুমকি দিয়ে শেখ মুজিবের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থলে তারা চেয়েছিলেন শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত শাসন। দলের প্রবীণ নেতারা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিলেন এবং তাঁরা এক বছর ধরে এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষমেশ তাঁরা হাল ছেড়ে দেন। শেখ মুজিব 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' পক্ষে অবস্থান নেন।[২৭] ২৫ জানুয়ারি সংসদে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন :

> ...আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি সংবিধানকে। কারণ, একটা সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা এ দেশে কায়েম করতে হবে,... আজ আমি বলতে চাই—দিস ইজ আওয়ার সেকেন্ড রেভল্যুশন।... সেজন্য আমরা এমেন্ডেড কনস্টিটিউশনে যে নতুন ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, এটাও একটা গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র, এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। এখানে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই।...[২৮]

এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ এক বিবৃতিতে বলেন :

> দেশবাসী এই রকম মৌলিক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য উদ্বেলচিত্তে অপেক্ষায় ছিলেন। কাজেই সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও আজ আনন্দ প্রকাশ করছি।... বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এই পরিবর্তন বাংলাদেশে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সমাজপ্রগতির বিপ্লব সাফল্য অর্জন করবে—এই দৃঢ় বিশ্বাস আজ আর একবার ঘোষণা করছি।[২৯]

কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রতিক্রিয়া ছিল তাৎক্ষণিক। পরে অবশ্য দলটি এই অবস্থান পরিবর্তন করেছিল। ১৯৮৭ সালে সিপিবির একটি মূল্যায়নে বলা হয় : 'দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলে আওয়ামী লীগ মেহনতি মানুষ ও মধ্যস্তরের বুদ্ধিজীবীদের যে প্রবল আস্থা অর্জন করেছিল তাতে চিড় ধরে। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সাংবিধানিক পরিবর্তন সে সময় আওয়ামী লীগ সরকারকে আরও বিচ্ছিন্ন করে।'[৩০] এ প্রসঙ্গে লেখক-গবেষক গোলাম মুরশিদের মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক :

> একদলীয় শাসন প্রবর্তন করে জাতির জনক হয়তো ব্যক্তিপূজারী একটা 'কাল্ট' গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতে দেশ ভেসে যেতে থাকে

ফ্যাসিবাদের দিকে। তাঁর আসল উদ্দেশ্য যা-ই হোক, দেশ সে দিকে এগিয়ে যায়নি। অথবা সূচিত হয়নি দেশের কোনো লক্ষণীয় উন্নতিও। বরং আপাতদৃষ্টিতে এ থেকে উল্টো ফল ফলেছিলো। চিরদিনের জনগণের প্রিয় নেতা শেখ মুজিব জনগণের থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বাস্তবতার মাটি থেকে তিনি সরে যান অনেক দূরে। এমনকি, তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি যে সরে যাচ্ছে, এ-ও তিনি অনুভব করতে পারেননি।[৩১]

জাসদ-সমর্থক দৈনিক *গণকণ্ঠের* ওপর খড়্গ নেমে আসে। 'অননুমোদিত সংবাদপত্র' প্রকাশের অভিযোগে ১৯৭৩ সালের মুদ্রণ, ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইনের অধীনে পুলিশের একটি দল ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৫ ঢাকার ৫৪-সি টিপু সুলতান রোডে অবস্থিত *গণকণ্ঠের* অফিসটি 'সিজ' করে।[৩২]

৩১ জানুয়ারি ঢাকায় রাষ্ট্রদূতদের জন্য শেখ মুজিব একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বোস্টার শেখ মুজিবকে বলেন, রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেওয়াতে প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড অভিনন্দন জানিয়েছেন। শেখ মুজিবের আশঙ্কা ছিল, বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক পালাবদলটি যুক্তরাষ্ট্রের না-ও পছন্দ হতে পারে। তিনি রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। ওয়াশিংটনে পাঠানো এক তারবার্তায় রাষ্ট্রদূত লেখেন :

> প্রেসিডেন্টের বার্তার জন্য মুজিব আমার মাধ্যমে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওয়াশিংটনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুখস্মৃতি স্মরণ করেছেন। প্রেসিডেন্টকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেছেন যে, নতুন পদ্ধতিতে বাংলাদেশের রাজনীতি বদলাবে না। তাঁরা আসলে চাচ্ছেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অধিকতর প্রশাসনিক দক্ষতা।[৩৩]

নতুন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে শেখ মুজিব সবার সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহী ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির' নেতা আবদুল হকের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। আবদুল হকের ছোট ভাই আবদুল হাই ছিলেন শেখ মুজিবের বন্ধু এবং খুলনা বিএল কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর বাসায় বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। কলেজের সরকার-সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা রায় রমেশ চন্দ্র আবদুল হককে আগের দিন রাতে নৌকায় করে কলেজের ঘাটে নিয়ে আসেন। রায় রমেশ বর্ণনা করেছেন :

> পরের দিন হাই সাহেবের বাসায় বঙ্গবন্ধুর খাবার দাওয়াত। কী আলোচনা হচ্ছে তা জানার জন্য অতি উৎসাহী হয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করলাম। বঙ্গবন্ধু হক সাহেবকে বললেন, 'হক ভাই, আপনারা যা চাইতেন সারা জীবন, আমি

তো সেই কাজটাই করতে যাচ্ছি—সমাজতন্ত্র আসেন আমরা একসঙ্গে এই দেশে সমাজতন্ত্র করি।' হক সাহেব বাংলায় কথা খুব কম বলতেন। উনি বললেন, 'মুজিব শোনো, তুমি যা করতেছ, প্রোগ্রাম ঠিক আছে। কিন্তু তোমার পার্টি এ কাজের জন্য প্রস্তুত না। অ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম ইজ সো পাওয়ারফুল, ওয়ান বুলেট ক্যান ডেস্ট্রয় অল ইয়োর অ্যাকটিভিটিজ। সো আই অ্যাম সরি। ইন দিস প্রসেস আই ক্যান নট বি আ পার্ট।'[৩৪]

শেখ মুজিব ইউনাইটেড পিপলস পার্টির (ইউপিপি) সংগঠক রাশেদ খান মেনন এবং হায়দার আকবর খান রনোকে ডেকে বাকশালে যোগ দিতে বলেছিলেন। ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাসায় তাঁদের মধ্যে ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা হয়। তাঁদের কথোপকথন ওঠে এসেছে রনোর বর্ণনায় :

মুজিব : হ্যাঁ, শোন তবে সিরাতুল মুসতাকিনের মানে বুঝিস? মানে হলো সিধা রাস্তা। আমি ঠিক করেছি সমাজতন্ত্র করে ফেলব। বিয়ের প্রথম রাতে বিড়াল মারার গল্প জানিস? আমি অলরেডি লেট। আর দেরি নয়। এবার সমাজতন্ত্র করে ফেলব। তোরা চলে আয় আমার সঙ্গে আমি পাঞ্জাবি ক্যাপিটালিস্ট তাড়িয়েছি, তাই বলে মাড়োয়ারি ক্যাপিটালিস্ট অ্যালাও করব না। আমি ক্যাপিটালিজম হতে দেব না। আমি সোশালিজম করব। তোরা চলে আয় আমার দলে।

রনো : সমাজতন্ত্রের জন্য তো আমরা সেই ছাত্রজীবন থেকেই লড়াই করছি। এর জন্য আমাদের ডাকতে হবে না। যদি সত্যিই সমাজতন্ত্র করেন, আমরা থাকব। কিন্তু এখন যা চলছে, তাতে সমাজতন্ত্রের কোনো লক্ষণ দেখি না। আপনি তো জানেন, আমরা ভয়ও পাই না, প্রলোভনে ভুলি না।

মুজিব : তা তো জানি, তোদের তো একটা নীতি আছে। সেই জন্যই তো তোদের চাই।

রনো : তাই, যদি এভাবে দেশ চলে, আমরা কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে নামব।

মুজিব : তোদের আগে আমিই নামব, যারা দেশটার সর্বনাশ করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমার আগে কে নামবে? তাহলে বলি, সিরাতুল মুসতাকিন, সোজা রাস্তা। তোদের একটা পরামর্শ দি, শুনবি? এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর বাসায় যাবি না, সোজা আন্ডারগ্রাউন্ড চলে যা, অস্ত্র নিয়ে রেডি হ আমাকে উচ্ছেদ করার জন্য।

রনো/মেনন : এ কথা কেন বলছেন, আমরা তো অস্ত্র হাতে নিইনি। আর আন্ডারগ্রাউন্ডেও যাব না। আপনার খুব কাছেই থাকি, ইচ্ছা করলে অ্যারেস্ট করতে পারেন।

মুজিব : অ্যারেস্ট? আমি পুলিশ অ্যাকশনে বিশ্বাস করি না। আমার জনগণ আছে।

রনো/মেনন : জাসদ নেতারা জেলে আছেন, সিরাজ সিকদারকে হত্যা করা হয়েছে, কাজী জাফর এখনো পলাতক।

মুজিব : বিরোধী রাজনীতি আমিও করেছি, জাসদের বাচ্চা ছেলেরা জানে না যে দেশে একটা লিগ্যাল সরকার আছে, তারা বিদেশের দূতাবাসে চিঠি লেখে... সিরাজ সিকদার একটা ডিবচ। আর কাজী জাফর। কী মনে করিস, আমি কি তাকে ধরতে পারি না? দাড়ি রেখে খুব আন্ডারগ্রাউন্ড সেজেছে। এখানে বসে থাক, আমি দুই ঘণ্টার মধ্যে তাকে ধরে নিয়ে আসতে পারি।... প্রতি ইউনিয়নে আমার কম করে হলেও দুইজন নিজস্ব লোক আছে, আমি এত কাজের মধ্যেও কর্মী ও জনগণের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখি।

রনো : আপনার দল তো নানা ধরনের লোকের খিচুড়ি। আপনার দলেই গাজী ভাইয়ের একদল, মণি ভাইয়ের আরেক দল, তার মধ্যে আবার মস্কোপন্থীদের নিয়েছেন।

মুজিব : কোন দলে উপদল থাকে না? তোদের দলে নাই, আমি খবর রাখি না? আর মস্কোপন্থীদের কথা বলেছিস—আমাকে একটু সময় দে, ওবা জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পালাবার সুযোগটুকু পাবে না।

রনো : বেশ! এবার আপনি বলেন, কোন উপদলের সঙ্গে থাকব, মণি ভাইয়ের সঙ্গে, রাজ্জাক-তোফায়েলের সঙ্গে? না আর কারও সঙ্গে? আর তাদের অধীনে থাকবই বা কেন?

মুজিব : তোরা নিজেরাই একটা গ্রুপ হয়ে যা, সোজা চলে আসবি আমার কাছে, একেবারে আমার বেডরুমে।

রনো : না, তা হয় না, আপনি অনেক বড়, অনেক উঁচুতে আপনার অবস্থান। আপনি ঐতিহাসিক পুরুষ। দুশ বছর পর ইতিহাসের ছাত্ররা পরীক্ষার খাতায় আপনার চরিত্র বিশ্লেষণ করবে। আমাদের যদি রাজনীতি করতে হয়, তবে আমাদের সমপর্যায়ের সমবয়সীদের সঙ্গেই করতে হবে।

মেনন : (ফারাক্কা ও সমুদ্রসীমা প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলতেই)

মুজিব : রাখ তোর মেরিটাইম ফেরিটাইম। ফারাক্কার পানি ওদের দিতে হবে। একটা কথা মনে রাখিস, আমি হলাম বর্ন লিডার, আমি কারোর দ্বারা লেড হবার লোক নই। ইশ! ইন্দিরা ভাবে মুজিবকে আঁচলে বাঁধবে, ব্রেজনেভ ভাবে পকেটে রাখবে। তারা এখনও চেনে না শেখ মুজিবুর রহমান কে?

কথা অনেক হয়েছিল। সবটা এখানে বলার অবকাশ নাই। মোট কথা আমরা খুব বিনয়ের সঙ্গে জানালাম, আমরা আর একদলীয় ব্যবস্থা সমর্থন করছি না; তার দলেও যাচ্ছি না। তিনি বেশি জোর করেননি। আর করবেনই

> বা কেন? তিনি যে উচ্চতায় অবস্থান করছেন তাতে আমাদের মতো তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য যতটা বলেছেন, তাই-ই যথেষ্ট। তবু তিনি আমাদের দুজনের জন্য এক ঘণ্টা ব্যয় করেছিলেন। শেষে বললেন, 'আচ্ছা বেশ, ওয়াচ অ্যান্ড সি।'[৩৫]

শেখ মুজিব সরল বিশ্বাসে সব রাজনৈতিক দলকে এক ছাতার তলায় টেনে আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথাবার্তায় এমনটাই মনে হয়। বাস্তবে দেখা গেল, অনেকেই এলেন না। আবার যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সবাই তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। পারস্পরিক আস্থার জায়গাটি অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতির এক আদেশে বলা হয়, দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে। একই তারিখে জারি হওয়া আরেকটি আদেশে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি নিজেকে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (BAKSAL-বাকশাল) নামে একটি জাতীয় দল গঠন করেছেন; জাতীয় সংসদে অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের সব সদস্য ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ বাকশালের সদস্য বলে গণ্য হবেন। রাষ্ট্রপতি দলীয় সংগঠন নির্ধারণ না করা পর্যন্ত অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যতীত অন্য সব কমিটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থায় বাকশালের কমিটি হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে।[৩৬] ২৫ ফেব্রুয়ারি জারি করা এক আদেশে বলা হয়, অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা বাকশালের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।[৩৭]

জাতীয় সংসদের সব সদস্যকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে বাকশালে যোগ দিতে বলা হয়। আওয়ামী লীগের এম এ জি ওসমানী ও মইনুল হোসেন এবং জাসদের আব্দুল্লাহ সরকার ও ময়নুদ্দিন মানিক বাকশালে যোগ দিতে অস্বীকার করায় সংসদে তাঁদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, ন্যাপের (ভাসানী) কামরুল ইসলাম সালাহ্উদ্দিন, জাসদের আবদুস সাত্তার এবং নির্দলীয় সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও চাইথোয়াই রোয়াজা বাকশালে যোগ দিয়ে সংসদে সদস্যপদ ধরে রাখেন।

বাকশাল করা না করা নিয়ে সিপিবির ভেতরে কিছু মতভিন্নতা ছিল। সিপিবি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং তাদের মতামতকেই শেষ বাক্য হিসেবে ধরে নিত। সিপিবির ওই সময়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও *একতা* সম্পাদক মতিউর রহমান লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সোভিয়েত পার্টির পরামর্শ ছিল, আওয়ামী লীগকে বোঝানোর চেষ্টা করো—এক দল নয়, ঐক্যফ্রন্টই সঠিক হবে। তবে মুজিব যদি

সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলে, তাহলে এটাকে ডিজাস্টার মনে না করে তোমরা যোগ দাও।' সে সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে একটা তত্ত্ব ছিল এবং ইরাক, সিরিয়া, আলজিরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন—এসব দেশে এই তত্ত্ব প্রয়োগের চেষ্টা ছিল—অপুঁজিবাদী পথে সমাজতন্ত্র, অর্থাৎ যেসব দেশে পুঁজিবাদ বিকশিত হয়নি—একটা অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান এবং তার সাহায্য করার সক্ষমতা—উদীয়মান দেশগুলোতে পুঁজিবাদকে বাইপাস করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। প্রমাণ হিসেবে মঙ্গোলিয়া ও মধ্য এশিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোর কথা বলা হতো। ওই রকম একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আলোকে সিপিবি অধনবাদী পথে সমাজতন্ত্রে যাওয়া এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে ঐক্য তথা এক দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ প্রসঙ্গে মতিউর রহমান তাঁর একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেন :

> ওই সময় আমরা কয়েকজন রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে গিয়েছিলাম. ফেরার পথে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির দুজন নেতার সঙ্গে আলোচনার সময় বাকশাল প্রসঙ্গ ওঠে। তাদের প্রশ্ন, 'তোমরা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ?' আমাদের নেতা ছিলেন অনিল মুখার্জি তাঁর সঙ্গে কথোপকথন ছিল এ রকম:
>
> —আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যোগ দেব।
>
> —(একটু অবাক হয়ে) তোমরা কি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কথা বলেছ?
>
> —হ্যাঁ, বলেছি।
>
> —সোভিয়েত পার্টির সঙ্গে কথা বলেছ?
>
> —হ্যাঁ, বলেছি।
>
> —কী বলেছে?
>
> —বলেছে, যোগ দিতে পারো।
>
> কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ওরা ওদের অভিজ্ঞতা বলেছিল—আমরা দেখেছি, যে দেশগুলোতে—ইরাক, সিরিয়া, আলজিরিয়াতে—ক্ষমতাসীন দল কর্তৃত্ববাদী; একদল করে তারা তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করে। কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা নির্যাতনের মুখোমুখি হয়। তারা স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। এটা তোমাদের ভাবা দরকার।[৩৮]

আওয়ামী লীগের অনেকেই ওই সময় বাকশালকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। কেউ কেউ মৌখিক প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু তারপরও বাকশালের সদস্য হয়েছেন। আবার কেউ কেউ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চুপ করে ছিলেন। তাঁরা

পরে অনেকেই মুখ খুলেছেন। এ প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন শেখ মুজিবের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন :

> আই ওয়াজ এগেইনস্ট বাকশাল। শেখ সাহেবকে বললাম, আপনি বাকশাল করলে আমি থাকব আপনার সঙ্গে, কিন্তু আপনাকে বাকশাল না করার জন্য অনুরোধ করব। সব পার্টি বন্ধ করে এক পার্টি করার অর্থ হচ্ছে অল দ্য গানস উইল বি অ্যাটেম্পটেড অ্যাট ইউ।[৩৯]

এ সময় শেখ মুজিবকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়, যা ছিল তাঁর স্বভাবসুলভ আচরণের ব্যতিক্রম কিংবা অসহিষ্ণুতার প্রকাশ। আবুল ফজলকে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর কিছু কাজে শেখ মুজিব বেশ বিরক্ত হন। আবুল ফজল সাংবাদিক সম্মেলন করে শিক্ষার মানের অবনতি সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন। ১২ এপ্রিল সকালে নববর্ষে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে পাঠানোর জন্য কার্ড সই করাতে রাষ্ট্রপতির সহকারী প্রেস সচিব মাহবুব তালুকদার তাঁর বাসভবনে গেলে তিনি তাঁকে এ বিষয়ে যা বলেছিলেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> ...তাঁকে এরকম রাগ করতে কমই দেখেছি। তিনি আমাকে বললেন, শিক্ষামন্ত্রীকে লাইন দিতে বল। আমি কথা বলব। শিক্ষামন্ত্রীকে বাসায় পাওয়া গেল না তিনি চট্টগ্রামে গেছেন। তাঁকে সার্কিট হাউজে পেলাম। বঙ্গবন্ধু ফোনে শিক্ষামন্ত্রীকে বললেন, আবুল ফজল সাহেবের সাংবাদিক সম্মেলন 'আন কন্ডফর'।
>
> এরপর তথ্যমন্ত্রী কোরবান আলীকে ফোন করলেন তিনি। বললেন, আবুল ফজল সাহেবের সাংবাদিক সম্মেলনের পক্ষে পত্রিকায় যেন কিছু না বেরোয়।
>
> আমাকে বললেন, আবুল ফজল সাহেবের ওপর একটা ফাইল তৈরি কর। তিনি ছেলের জন্য তদবির কইরা কাগজের এজেন্সী নিচ্ছেন। পেপার বোর্ড অফিসে ওয়াদুদ সাহেবের কাছে তার কাগজপত্র পাইবা।
>
> ইতোমধ্যে শেখ শহীদুল ইসলাম এলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বললেন, আবুল ফজল সাহেবের এগেনিস্টে একটা বিবৃতি দিতে বল।
>
> আমাদের উভয়কে উদ্দেশ্য করে বললেন, চট্টগ্রামে কাকে ভিসি করা যায়? শেখ শহীদ বললেন, মাহবুব ভাই (মাহবুব তালুকদার) বলতে পারেন। উনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন।
>
> বললাম, ডক্টর আবদুল করীমকে করা যায়। তিনি চট্টগ্রামের লোক। শেখ শহীদ বললেন, করীম সাহেবকে ভিসি করলে বিতর্ক হবে। তার চেয়ে আর

আই চৌধুরী সাহেবকে করা যেতে পারে।

আর আই চৌধুরী সাহেবের অসুবিধা হলো, তিনি চাটগাঁর লোক নন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাটগাঁয়ের লোক না হলে চলবে না। আমি জানালাম। বঙ্গবন্ধু একদিন নাটোর গেলেন। ফিরলেন দুদিন পরে। এর মধ্যে পত্রিকায় উপাচার্য আবুল ফজলের বিরুদ্ধে চার ছাত্রনেতার বিবৃতি বেরিয়েছে। কাগজের পারমিটের বিষয়ে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মতিঝিল পেপার বোর্ডের অফিস থেকে আমি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এনে ফাইল তৈরি করেছি। এগুলো দেখাতে বঙ্গবন্ধু বললেন, গুড।

অধ্যাপক আবুল ফজল ছাড়া আরও একজন সম্পর্কে একটি ফাইল তৈরি করতে বঙ্গবন্ধু আমাকে নির্দেশ দেন। তিনি হলেন সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী। ওই সময়ে রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্পর্কে পত্রিকায় আবদুল গাফফার চৌধুরী যেসব কলাম লিখতে শুরু করেন, তাতে বঙ্গবন্ধু খুব নাখোশ হন। ব্যক্তিগতভাবে এই দুজনের বিরুদ্ধে কিছু করতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না। তাঁদের পক্ষে বঙ্গবন্ধুকে কিছু বলতে যাওয়াও আমার পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। ফলে নির্দেশ পালন ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইল না আমার।[৪০]

৪

বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য হিড়িক পড়ে যায়। সাংবাদিকদের মধ্যেই এ ব্যাপারে মাতামাতি ছিল বেশি। ২৩ মে ঢাকার ২২৪ জন সাংবাদিক বাকশালের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেন। ২ জুন নয়জন সম্পাদক গণভবনে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে বাকশালের সদস্য হতে আগ্রহ দেখান। এঁরা হলেন ওবায়দুল হক (সম্পাদক, *বাংলাদেশ অবজারভার*), শামসুল হুদা (সম্পাদক, *মর্নিং নিউজ*), জাওয়াদুল করিম (সম্পাদক, বাসস), নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী (সম্পাদক, *দৈনিক বাংলা*), এহতেশাম হায়দার চৌধুরী (সম্পাদক, *পূর্বদেশ*), আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (সম্পাদক, *ইত্তেফাক*), শহীদুল হক (নির্বাহী সম্পাদক, *বাংলাদেশ টাইমস*), বজলুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, *সংবাদ*) ও মিজানুর রহমান (সাবেক সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রেস ইন্টারন্যাশনাল)।[৪১] বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) জুনিয়র সাব-এডিটর মো. শফিকুল করিম তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> ৪ জুন সকালে অফিসে গিয়ে দেখলাম অফিস প্রায় খালি। শুনলাম বাকশালে যোগ দিতে সবাই প্রেসক্লাবে গেছেন। সেখান থেকে বাসে করে গণভবন

যাবেন। আমি দ্রুত প্রেসক্লাবের দিকে দৌড় দিলাম। ভয় হচ্ছিল যদি বাস ছেড়ে যায়, আমি যাব কীভাবে।

ক্লাবে গিয়ে দেখি একটা ছোট জটলা। কয়েকটা বাস ছেড়ে গেছে। বাকিরা অপেক্ষায়। ৬ নম্বর রুটের একটা বাস এল। আমরা সেই বাসে চেপে গণভবনে গেলাম। পৌঁছে দেখি হলঘরে লোক গিজগিজ করছে। একটু পরে বঙ্গবন্ধু এলেন। একজন এক টুকরো কাগজে লেখা নামের একটা লম্বা তালিকা পড়ে কাগজটা বঙ্গবন্ধুর হাতে দিলেন। ব্যস, আমরা বাকশালের সদস্য হয়ে গেলাম।

ক্লাবে ফিরে খন্দকার মনিরুল আলমের সঙ্গে দেখা। গণভবনে তাঁকে লক্ষ করিনি। বললাম, 'কিরে তোকে দেখলাম না?' জবাবে সে বলল, 'আয়োজন করল কে? আমি আর ইকবালই (ইকবাল সোবহান চৌধুরী)' তো। পরে উনি জাতীয়তাবাদী দলে গিয়ে প্রেসক্লাবের সেক্রেটারি এবং সভাপতিও হয়েছিলেন, হয়েছিলেন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা।[৪২]

ওই দিন ঢাকার ৩০২ জন সাংবাদিক বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। গণমাধ্যমের সাধারণ সাংবাদিকদের সঙ্গে সাংবাদিক নেতারা যাননি। তাঁরা নিজেদের আভিজাত্য বজায় রেখে আলাদা আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি গিয়াস কামাল চৌধুরী এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ৯ জুন গণভবনে গিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে বাকশালে যোগ দেওয়ার আবেদনপত্র জমা দেন। আবেদনপত্রে তাঁরা দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করার জন্য কাজ করার সুযোগ চান। সমগ্র জাতিকে একই ব্যানারে নিয়ে আসার জন্য বাকশালকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁরা বলেন, 'বাঙালি জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাস্তবায়নই হবে বাকশালের লক্ষ্য'।[৪৩]

রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ তাঁর বাকশালে যোগ দেওয়ার পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন বিস্তারিতভাবে। তাঁর ভাষ্যে জানা যায় :

আমার প্রথম সন্তানের জন্মের অপেক্ষায় আমার স্ত্রী তার পিত্রালয়ে। আমি রাত সাড়ে ১০টার ট্রেন ধরবো। অবজারভারে কাজ করছি। তখনই ইকবাল সোবহান চৌধুরী একটা সাদা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটাতে একটা সই দিয়ে যান। বাকশালে যোগদানের জন্য। আমি আতংকিত হলাম।

ইকবাল সোবহানের সঙ্গে ছিল তখনকার *পূর্বদেশের* শামসুল হক আলী নূর। আমি তাদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে চট্টগ্রামে চলে যাই।...

ঢাকায় ফিরে শুনলাম নির্মল সেন, গিয়াস কামাল ও কামাল লোহানী সাহেব *অবজারভারের* মতিন সাহেবকে পাঠিয়েছেন তাঁর আত্মীয় প্রধানমন্ত্রী

মনসুর আলী সাহেবের কাছে। বাকশালে সাংবাদিকদের যোগদানটা ঠেকানো যায় কি না সেই চেষ্টায়। কিন্তু এর পেছনে শেখ মণির সমর্থন থাকায় কেউ বাধা দিতে সাহস পায়নি। নাজিমুদ্দিন মানিককেও পাঠানো হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর কাছে যাতে তিনি সাংবাদিকদের পাইকারি হারে যোগদান করতে না দেন। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। ইকবাল সোবহান, আলী নূর, বজলুর রহমান (*ইত্তেফাক*), মিজানুর রহমান (বাসস) প্রমুখের নেতৃত্বে প্রথম দলটি ঘটা করে বাকশালে যোগ দিলেন। আওয়ামী লীগ সমর্থক শফিকুল আজিজ মুকুল, নাজিমুদ্দিন মানিক, ফেরদৌস আলম দুলাল এর বিরোধিতা করলেন। অনেক সাংবাদিক কাঁদতে কাঁদতে সই দেন শুধু চাকরি আর জীবনের মায়ায়।

এর মধ্যে দ্বিতীয় তালিকা তৈরি হতে থাকলো। এবার প্রায় প্রতিযোগিতা। কেউ যেন পেছনে না পড়েন। সবচেয়ে তৎপর ইকবাল সোবহান, আলী নূর, বজলুর রহমান, ফখরুল আবেদিন দুলাল আর মিজানুর রহমান। দ্বিতীয় দলের তালিকা তৈরি। তারা যেদিন যোগ দিতে যাবেন সেদিন সকালে শেখ ফজলুল হক মণি আমাকে খবর দিলেন। আমি *বাংলার বাণী* অফিসে যাই। তখন তার কক্ষে বসে ছিলেন তোফায়েল আহমেদ ও সৈয়দ আহমেদ। এছাড়া আজিজ মিসির, ইকবাল সোবহান ও আলী নূর ছিলেন। শেখ মণি আমাকে দেখেই বললেন, 'আজ দ্বিতীয় দল যাচ্ছে, তোমাকে যোগ দিতে হবে।' আমি বললাম, আমরা বিএফইউজে আর ডিইউজের নেতৃবৃন্দ যে সিদ্ধান্তই নিই এক সাথেই নেব। আলাদাভাবে আমার পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়।...

আমরা বিএফইউজে'র সভায় বসলাম কী করা যায়?... অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হলো ইউনিয়ন বাকশালে যোগদান করবে না। আবার ইউনিয়নের কোনো সদস্য যোগ দিতে চাইলে বাধাও দেবে না। বাধা দেওয়ার মতো অবস্থা অবশ্য ইউনিয়নের ছিল না। হাতে-গণা কয়েকজনকে বাদ দিলে সব সাংবাদিক যখন চলে গেল, তখন আমরা চারজন—নির্মল সেন, গিয়াস কামাল চৌধুরী, কামাল লোহানী আর আমি আলোচনায় বসলাম। কামাল লোহানী সাহেব বললেন, 'আমি যাব না।' নির্মল সেন বরাবরই না যাওয়ার পক্ষে। বিপদে পড়লাম আমি আর গিয়াস কামাল চৌধুরী। নির্মল সেন আর কামাল লোহানীকে বাদ দিয়ে বসলাম আমরা দুজন। অনেক বিশ্লেষণের পর ঠিক হলো আমরা দুজন যোগ দেব বাকশালে। কোনো যুক্তি ছিল না আমাদের যোগদানের পক্ষে। শুধু ছিল ভয়। তবে আমি এই যোগদানকে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পরাজয় মনে করি। ভয়, ত্রাস আর আতংকের কাছে আত্মসমর্পণ। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যাত্রা। আমরা প্রেসক্লাবের পুরোনো ঘরের ইউনিয়ন অফিসে এলাম। সেখানে

বিদ্রোহী ভাব নিয়ে বসে থাকলেন আবেদ খান, সৈয়দ জাফর আর মানু মুন্সী। আবেদ খান যোগ দিলেন না বাকশালে। আমরা যাব শুনে দারুণ মর্মাহত হলেন। সৈয়দ জাফর, মানু মুন্সী আমাদের সাথে এতদিন প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। যখন শুনলেন আমরা দুজন যাব, মানু মুন্সী নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলেন না। তোয়াব খান তখন শেখ মুজিবের প্রেস সেক্রেটারি। তার সঙ্গে বরাবরই আমাদের সুসম্পর্ক। তাকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানালাম। পরের দিন সকাল ১১টায় আমাদের সময় দেয়া হলো। গিয়াস কামাল চৌধুরীকে নিয়ে শেরেবাংলা নগর নতুন গণভবনে গেলাম। তোয়াব খান আমাদের নিয়ে গেলেন রাষ্ট্রপতির কাছে। আমাদের দেখে শেখ মুজিব খুব খুশি হলেন। ৭/৮টি দরখাস্ত আমরা তাঁকে দিলাম। তিনি আমার এবং গিয়াস কামালের দরখাস্ত দুটি তোয়াব খানকে দিয়ে বললেন, 'এ দুটো রেডিও-টিভিতে দাও।' অনেক কথা বললেন তিনি। তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বললেন। কিন্তু কিছুতেই যেন তাঁর কথাগুলো যুক্তিগ্রাহ্য লাগছিল না। পরাজয়ের একরাশ গ্লানি নিয়ে সোজা বাসায় ফিরে এলাম। রাত ৮টায় টেলিভিশনের খবরে দেখলাম আমাদের যোগদানের খবর লীড নিউজ করা হলো।[৪৪]

বাকশালের সদস্য হওয়ার জন্য সাংবাদিকদের মধ্যে যে হিড়িক পড়েছিল, সদস্য না হওয়ার জন্যও চেষ্টা করছিলেন কেউ কেউ। ঘটনাটি কবি নির্মলেন্দু গুণ ও আবু করিমকে নিয়ে। তাঁরা দুজন *গণকণ্ঠে* সহকর্মী ছিলেন। করিমের ভাষ্য অনুযায়ী :

আমি ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির সামনে আড্ডা দিচ্ছি। গুণদা আমাকে পাকড়াও করলেন। তাঁর তাস খেলার সঙ্গী দরকার। আমি আমতা আমতা করতেই বললেন, চল, তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াবো। রিকশায় চড়ে গেলাম প্রেসক্লাব। গেটের মুখেই দাঁড়িয়ে শামসুল হক আলী নূর। তিনি দৈনিক *পূর্বদেশে* কাজ করেন। সাংবাদিকদের মধ্যে বাকশালের যে কজন পান্ডা ছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম। আমার হাতে একটা সদস্য ফরম ধরিয়ে দিলেন। বললাম, আমি তো ছাত্র, আমার বাকশালের সদস্য হওয়ার দরকার কী? আমি এটা ফিলআপ করব না। আলী নূর গুণদাকে ধরলেন, 'আপনি এটা পূরণ করে দিন।' গুণদা বললেন, 'আজ কী বার'? নূরের জবাব, 'মঙ্গলবার'। গুণদা উদাস কণ্ঠে বললেন, 'আমি তো মঙ্গলবারে কোনো কিছুতে সই দিই না'। আমরা দুজন আলী নূরকে পাশ কাটিয়ে ক্লাবের ভেতরে ঢুকে পড়লাম।[৪৫]

যথেষ্ট মনস্তাত্ত্বিক চাপ থাকা সত্ত্বেও অল্প কয়েকজন সাংবাদিক বাকশালে যোগ দিতে আবেদন করেননি। এদের অন্যতম হলেন *দৈনিক বাংলার* সহকারী সম্পাদক

শামসুর রাহমান ও নির্মল সেন এবং বাসসের শাহেদ কামাল। সাপ্তাহিক *বিচিত্রার* শাহাদৎ চৌধুরী, মাহফুজউল্লাহ, শাহরিয়ার কবির, চিন্ময় মুৎসুদ্দী—এরাও আবেদন করেননি।[৪৬] সরকারি পত্রিকায় কাজ করেও তাঁরা এই ডামাডোলে শামিল হননি। এজন্য তাঁদের যে কোনো বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল, তা-ও নয়। কিন্তু এমন একটা আবহ তৈরি হয়েছিল, যাতে মনে হতে পারে যে, বাকশালে যোগ না দিলে বুঝি মহা বিপদে পড়তে হবে। এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক আমানউল্লাহ ওই সময়ের পরিস্থিতির একটা বিবরণ দিয়েছেন :

> যেদিন ওরা সবাই যায়, আমি প্রেসক্লাবে বারান্দায় বসে আছি, ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে দেখার জন্য—হু আর দ্য পিপল হু আর জয়েনিং অ্যান্ড হু আর নট জয়েনিং। আমাদের এক ইয়াং ফ্রেন্ড ছিল আলী নূর। বরিশালের ছেলে, অর্গানাইজারদের একজন। আমার পাশে দাঁড়ানো একজন তাকে বলল, 'আলী নূর ভাই, আমান ভাইকে একটু বলেন না?' তখন আলী নূর বলেছে, 'না, আমার সাহস হচ্ছে না।' আমি বললাম, আলী নূর ঠিকই বলেছে। খুব মজা করে কথা হলো। আমি বুঝিয়ে দিলাম যে, আমি জয়েন করার জন্য আসি নাই, দেখতে এসেছি।
>
> যারা গেল না, তারা তো ওখানে ছিল না তবে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু শহীদুল হককে যখন দেখলাম যেতে, তখন আমার একটা বিশেষ অনুভূতি হলো। ওর ডাক নাম মোরশেদ। আমরা এক সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মোকাম্মেল হক, জাওয়াদুল করিম—আমরা সবাই এক ব্যাচের। শহীদুল হক ছিল আমাদের জেনারেশনের ওয়ান অব দ্য বেস্ট জার্নালিস্টস, ইংরেজি সাংবাদিকতায়। এত বড় একজন সাংবাদিক, তারও এই অবস্থা?
>
> শহীদুল হকের কথা ভাবলে আমার খুব কষ্ট হয়। যখন দেখলাম, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে বুকে বাকশালের একটা পোস্টার লাগিয়ে এসেছে, আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি এটা দেখেছি এনা অফিসের কাছে, পুরানা পল্টন চৌরাস্তার পাশে। বৃষ্টির মধ্যে মিছিল করে আসছে শহীদুল হকের মতো একজন সাংবাদিককে এটা করতে হচ্ছে, জাস্ট নিজেকে রক্ষার জন্য।[৪৭]

৬ জুন বাকশালের গঠনতন্ত্র প্রকাশ করা হয় এ ছাড়া বাকশালের ১৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ১১৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান (চেয়ারম্যান), সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী (সেক্রেটারি জেনারেল), খন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, আবদুল মালেক উকিল, মহিউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, মনোরঞ্জন ধর, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী,

শেখ আবদুল আজিজ, গাজী গোলাম মোস্তফা এবং শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক ও জিল্লুর রহমান (সেক্রেটারি)। এ ছাড়া পাঁচটি অঙ্গসংগঠনের কমিটিও ঘোষণা করা হয়। অঙ্গসংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান ফণীভূষণ মজুমদার (জাতীয় কৃষক লীগ), অধ্যাপক ইউসুফ আলী (জাতীয় শ্রমিক লীগ), তোফায়েল আহমেদ (জাতীয় যুবলীগ), বেগম সাজেদা চৌধুরী (জাতীয় মহিলা লীগ) ও শেখ শহীদুল ইসলাম (জাতীয় ছাত্রলীগ)। মন্ত্রিপরিষদ সচিব হোসেন তওফিক ইমামকে বাকশালের চেয়ারম্যানের সচিব নিযুক্ত করা হয়। এটা ছিল তাঁর নিয়মিত দায়িত্বের অতিরিক্ত।[৪৮]

বাকশালের কমিটিগুলোতে আওয়ামী লীগের সাবেক নেতাদের পুরোপুরি প্রাধান্য ছিল। ১৫ জনের কার্যনির্বাহী কমিটির সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগের। বাকশালের ১১৫ জনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ন্যাপের (মো) মোজাফফর আহমদ, পীর হাবিবুর রহমান, সৈয়দ আলতাফ হোসেন এবং মতিয়া চৌধুরী জায়গা পেয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে সিপিবির মাত্র একজন—মোহাম্মদ ফরহাদের স্থান হয়েছিল। সিপিবির প্রধান নেতা মণি সিংকে জাতীয় কৃষক লীগের ৬ নম্বর সদস্য হিসেবে রাখা হয়। সিপিবির অঙ্গ সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি চৌধুরী হারুনুর রশীদ, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক এবং মনজুরুল আহসান খানকে জাতীয় শ্রমিক লীগের ৩২ জনের কমিটিতে রাখা হয়। জাতীয় মহিলা লীগের ২৩ জনের কমিটিতে ছিলেন সিপিবির মালেকা বেগম ও আয়েশা খানম। জাতীয় যুবলীগের ২৭ জনের কমিটিতে সিপিবির নুরুল ইসলাম নাহিদ ও মতিউর রহমান ছিলেন। জাতীয় ছাত্রলীগের ২১ জনের কমিটিতে ছাত্র ইউনিয়নের বেশ কয়েকজনকে রাখা হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, নুহ-উল-আলম লেনিন, মাহবুব জামান, অজয় দাশগুপ্ত, কাজী আকরাম হোসেন প্রমুখ।[৪৯]

১৬ জুন জারি হয় নিউজপেপারস ডিক্লারেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে ২৯টি দৈনিক এবং ১৩৮টি সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাত্র চারটি দৈনিক পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। সরকার এই চারটি দৈনিকের সম্পাদক নিয়োগ দেয়।

নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন ওবায়দুল হক (*বাংলাদেশ অবজারভার*), শেখ ফজলুল হক মণি (*বাংলাদেশ টাইমস*), এহতেশাম হায়দার চৌধুরী (*দৈনিক বাংলা*) ও নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী (*ইত্তেফাক*)।

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত বিধিবিধানের খসড়া তৈরি করে দেন তোয়াব খান (রাষ্ট্রপতির প্রেস সেক্রেটারি), শহীদুল হক (নির্বাহী সম্পাদক, *বাংলাদেশ টাইমস*) ও এনায়েতুল্লাহ খান (সম্পাদক, *হলিডে*)। *দৈনিক বাংলার* সহকারী সম্পাদক

নির্মল সেন শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে শেখ মুজিব তাঁকে বলেছিলেন, টেলিভিশনে মিন্টুকে (এনায়েতুল্লাহ খান) আমার চাই। একমাত্র সে-ই টেলিভিশনে বাকশালের নীতি সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে।[৫০]

এর আগে এনায়েতুল্লাহ খান একবার গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কিছুদিন আটক ছিলেন। ২৯ জুলাই ১৯৭৫ তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য শেখ মুজিব দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। *বাংলার বাণী*র সম্পাদক এবং বাকশালের অন্যতম সেক্রেটারি শেখ ফজলুল হক মণি ৯ আগস্ট এনায়েতুল্লাহকে বলেছিলেন, তাঁকে (এনায়েতুল্লাহকে) *বাংলাদেশ টাইমস*-এর সম্পাদক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।[৫১]

শেখ মুজিবের সঙ্গে এনায়েতুল্লাহ খানের সাক্ষাতের প্রসঙ্গ ওঠে এসেছে পরবর্তীতে এনায়েতুল্লাহর লেখা 'শেখ মুজিবের উত্থান পতন' নিবন্ধে।

এনায়েতুল্লাহর মন্তব্য ছিল :

> আমার কারামুক্তির পর ২৯ জুলাই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বিক্ষিপ্ত পদচারণায় অস্থির শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন : পারহ্যাপস দ্য হোল থিং ওয়াজ অ্যা সাবোটাজ। আই অ্যাম সরি ফর হোয়াট হ্যাপেন্ড টু ইউ। বাট মাই হ্যান্ডস অয়ার টাইড। তাঁর রাজনীতির দ্বিচারণ সত্ত্বেও আমি তাঁর অসহায়তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম। কেননা, আমি জানি পুতুলের রাজনীতি কতো নিষ্করুণ যে সেখানে রাজা সাজা যায় কিন্তু ইচ্ছামতো রাজ্য শাসন করা যায় না।[৫২]

৫

চতুর্থ সংশোধনী করার আগে সরকারের হাতে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা ছিল না। শেখ মুজিব তাঁর কর্মসূচি আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা। যদিও এই সংশোধনী আনার দিন থেকে তা কার্যকর করার মতো কোনো আইন তৈরি করা হয়নি। শেখ মুজিবের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন পাওয়া যায় ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত দেওয়া তাঁর চারটি বক্তৃতা-বিবৃতিতে। এগুলো হলো—জাতীয় সংসদে দেওয়া বিবৃতি (২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫), সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দেওয়া ভাষণ (২৬ মার্চ ১৯৭৫), বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় দেওয়া ভাষণ (১৯ জুন ১৯৭৫) এবং নবনিযুক্ত গভর্নরদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণ (২১ জুলাই ১৯৭৫)।[৫৩]

২৬ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিব প্রত্যেক গ্রামে বাধ্যতামূলক সমবায় সমিতি গঠনের কথা বলেন; বিদ্যমান জেলাগুলোকে বিলুপ্ত করে প্রত্যেক মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরের ঘোষণা দেন। তিনি থানা পর্যায়ে একজন প্রশাসক নিয়োগের কথাও বলেন। সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য তিনি থানা পর্যায়ে আদালত ও ট্রাইব্যুনাল গঠনের ঘোষণা দেন।[৫৪] পরে মওদুদ আহমদকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব বিচার বিভাগের দীর্ঘসূত্রতার সমালোচনা করে বলেছিলেন, তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করেছেন এবং তা আরও কমিয়ে আনবেন। বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য থানা সদরই হবে মূল কেন্দ্র। তিনি আরও বলেছিলেন, প্রতিটি থানাকে আধুনিক শহরে রূপান্তরিত করা হবে এবং সেগুলোই হবে অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রাণকেন্দ্র।[৫৫]

'বাকশাল'কে পরবর্তীতে নানাভাবে কাটাছেড়া করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এটা কি একটি তাত্ত্বিক ধারণা (কনসেপ্ট) ছিল, না কি নিতান্তই একটি আপৎকালীন অন্তবর্তী রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে চালু করা হয়েছিল? শেখ মুজিব ছিলেন একজন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ। তৃণমূল থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে তৈরি করে শিখরে পৌঁছেছিলেন। না বুঝে না জেনে তিনি পা ফেলবেন, এটা মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। কমিউনিজমের প্রতি তাঁর কোনো অনুরাগ ছিল বলে জানা যায় না। সুতরাং কমিউনিস্ট ধাঁচের একনায়কতন্ত্রের দিকে তাঁর ঝুঁকবার কথা না। তিনি একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বলেই মনে হয়। তবে এর সফলতার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন এমনটা বলা যাবে না। ১৯ জুন ১৯৭৫ বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

> ...আত্মসমালোচনা না করলে আত্মশুদ্ধি করা যায় না। আমরা ভুল করেছি। আমি যদি ভুল করে না শিখি, ভুল করে শিখব না, সে জন্য আমি সবই ভুল করলে আমার সকলই খারাপ কাজ করবে, তা হতে পারে না। আমি ভুল নিশ্চয়ই করব, আমি ফিরিস্তা নই শয়তানও নই, আমি মানুষ আমি ভুল করবই। আমি ভুল করলে আমার মনে থাকতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ। আমি যদি রেকটিফাই করতে পারি সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গো ধরে বসে থাকি যে, না আমি যেটা করছি সেটাই ভালো। দ্যাট ক্যান নট বি হিউম্যান বিইং। ফেরেস্তা হইনি যে সবকিছু ভালো হবে। হতে পারে, ভালো হতে পারে। উই উইল রেকটিফাই ইট, এই সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করে যদি দেখা যায় যে খারাপ হচ্ছে, অলরাইট রেকটিফাই ইট। কেননা আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে।...[৫৬]

দৈনিক ইত্তেফাক

বিদেশ হইতে আমদানী করা 'ইজম' বা 'সিস্টেম' নহে, দেশের মাটির সাথে সংযোগ রাখিয়াই শোষণহীন সমাজ গড়িব

বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় দেওয়া
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণ সংক্রান্ত সংবাদ

২১ জুন রাষ্ট্রপতির আদেশে সব মহকুমাকে জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ওই দিন ঢাকা মেট্রোপলিটন জেলাসহ মোট ৬০টি জেলা গঠনের নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে আগেই তিনটি জেলা গঠন করা হয়েছিল। ফলে মোট জেলার সংখ্যা হলো ৬৩টি। ১৪টি থানা নিয়ে তৈরি হয় ঢাকা মেট্রোপলিটন জেলা।[৫৭]

এদিকে বাকশালে যোগ দেওয়ার প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এনামুল হকের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি ২৫ জুন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে বাকশালে যোগ দেন।[৫৮] ২৮ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সভায় এক প্রস্তাবে 'বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করার' ঘোষণা দেওয়া হয়। সভায় ১০২ জন সদস্যের মধ্যে ৭২ জন উপস্থিত ছিলেন।[৫৯] ৪ জুলাই রাষ্ট্রপতির এক আদেশে বাকশালের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা মন্ত্রীর পদমর্যাদা পান।[৬০] ৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলীর সঙ্গে দেখা করে ৪৯ হাজার ৫১ জন মাদ্রাসা শিক্ষকের পক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির বিভিন্ন জেলা শাখার ৫২ জন নেতা বাকশালে যোগ দেওয়ার আবেদন জানান।[৬১]

কামরুদ্দীন আহমদ অনেক বছর ধরে রাজনীতিতে নেই। তিনি সবকিছুর নীরব পর্যবেক্ষক। বাকশাল নিয়ে যে রকম মাতামাতি হচ্ছিল এবং লোকজন

যেভাবে এর সদস্য হওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল, সে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল এ রকম :

> বাকশাল গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ যেভাবে গণভবনে ভীড় করছিল তাতে শান্তভাবে সময় নিয়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব ছিল না।
>
> বাকশাল নীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, শ্রমিক, চাকুরিজীবী প্রভৃতি সর্বস্তরের জনগণ বাকশাল সদস্যপদের জন্য দরখাস্ত করতে থাকে। দরখাস্তের সংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে শেখ সাহেবের সচিব রহিম সাহেব সেগুলোকে ফাইলবন্দি করার চেষ্টা না করে চটের বড় বড় থলিতে ভরে রাখতে আরম্ভ করেন।[৬২]

১৬ জুলাই রাষ্ট্রপতি ৬১ জন জেলা গভর্নর নিয়োগ করেন। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ তাঁদের দায়িত্ব নেওয়ার কথা। গভর্নরদের মধ্যে ৪৪ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা। এদের মধ্যে ২৭ জন ছিলেন সংসদ সদস্য। ১৩ জন সরকারি কর্মকর্তা গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে ৭ জন সাবেক সিএসপি এবং ৬ জন সাবেক ইপিসিএস কর্মকর্তা। প্রত্যেক গভর্নরের অধীনে এক ব্যাটালিয়ন রক্ষীবাহিনী রাখার পরিকল্পনা হয়েছিল। গভর্নররা ছিলেন সরাসরি রাষ্ট্রপতির অধীন। তাঁদের 'রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের' ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ ১৬ আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত চলার কথা।[৬৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রি দেওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি এ সম্মান গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, চ্যান্সেলর হিসেবে এ ডিগ্রি গ্রহণ করা অনুচিত হবে।[৬৪]

৯ আগস্ট বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি সংযুক্ত পরিষদের ৩ লাখ ৫০ হাজার সদস্য বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। আবেদনকারীরা ১৫০টি অফিস ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নামের তালিকা দেন।[৬৫]

বাকশালের একটি ভাসা ভাসা আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি ছিল। তবে বাকশালের গঠনতন্ত্রে সাংগঠনিক কাঠামোর বিস্তৃত বিবরণ থাকলেও কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশলটি ছিল অনুপস্থিত। এটি একটি কাগুজে ঘোষণাই হয়ে থাকল। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে যেয়ে প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুর রহমান বলেন :

> পঁচাত্তরে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ধারার মধ্যে একটা 'ক্যু' হয়ে একদলীয় রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করে গ্রামীণ সমাজের ওপর সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা চাপিয়ে

দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা হয়, যার খেসারত হিসেবে জনগণকেই প্রাণ দিতে হয়। এই সমবায় নীতির সঙ্গে জনগণের মুক্তিযুদ্ধপ্রসূত স্বতঃস্ফূর্ত, সহজাত যৌথ উদ্যোগের নবজাগ্রত চেতনার কোনো সম্পর্ক ছিল না; উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া এ রকম কোনো সমবায় নীতি জনগণের সৃষ্টিশীলতাকে মুক্তি দেয় না, একে স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক শাসনে আরও অবরুদ্ধই করে। আর গণচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন এ রকম কোনো পদক্ষেপের পক্ষে তেমন জনসমর্থনও থাকে না...[৬৬]

একশ্রেণির মানুষ বাকশাল নিয়ে বেশ মাতামাতি করছিল। তাদের তখন একটাই স্লোগান—'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'। কেউ কেউ বলছেন, এটা এক দল নয়, অনেক দল নিয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম। এটা একধরনের জাতীয় সরকার। জাতীয়তাবাদের নামে উন্মাদনা তখন তুঙ্গে। কেউ কেউ ভাবছেন, দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে গেছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে তো একটাই দল থাকে। সমাজতন্ত্র তখন একটি অতি জনপ্রিয় শব্দ। যদিও এর ব্যাখ্যা নিয়ে আছে প্রবল মতভেদ। এ যেন অন্ধের হাতি দেখার মতো।

কুমিল্লার কোটবাড়িতে অবস্থিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে তখন অনেকের ভিড়। একাডেমির ভাইস-চেয়ারম্যান মাহবুবুল আলম চাষী সমাজতন্ত্রের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা তো আছেনই, আরও অনেক সংগঠন থেকে লোকজন আসছেন 'সমাজতন্ত্র' বোঝার জন্য। ঢাকা থেকে বুদ্ধিজীবীরা এসে ক্লাস নেন। তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আছেন। লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আহমদ ছফা বলেছেন, 'এ রকম একটা ক্লাস নেওয়ার জন্য আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। গিয়েছিলাম। এক ঘণ্টার একটা ক্লাসের জন্য পাঁচশ টাকা পেতাম।'[৬৭]

ছফার বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৯৭৫ সালের জুন মাসের শুরুর দিকে সমাজ উন্নয়ন বিষয়ে পড়াশোনার জন্য তিনি কুমিল্লা একাডেমিতে যান। সেখানেই মাহবুবুল আলম চাষীর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয়। চাষী সব সময় লুঙ্গি পরে থাকতেন। তখন সেখানে একাডেমির স্টাফদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ চলছিল। চাষী তাঁকে সমাজতন্ত্রের ইতিহাস এবং এর তত্ত্বগত বিষয়ে বক্তৃতা দিতে বলেন। সপ্তাহে একটি বক্তৃতা দেওয়ার কথা। ছফা সেখানে ছিলেন প্রায় দুমাস। মাঝখানে একবার ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি দেখেছেন, চাষী প্রায় সময় তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন। ছফার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাহেরউদ্দিন, খন্দকার মোশতাক ও তিনি কলকাতায় একসঙ্গে থাকতেন ও কাজ করতেন। জুলাই মাসের শেষের দিকে

রাষ্ট্রপতির প্রিন্সিপাল ইকোনোমিক সেক্রেটারি ড. সাত্তার একাডেমিতে এসেছিলেন। সাত্তার বলেছিলেন, একটি কি দুটি গ্রামে সমাজতন্ত্রের মডেল তৈরি করার জন্য রাষ্ট্রপতি তাঁকে বলেছেন। এ রকম একটি মডেল দাঁড় করানোর জন্য তিনি চাঁদপুরে তাঁর নিজ গ্রামে 'মেহেরপুর-পঞ্চগ্রাম সমবায় সমিতি' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ওই সমিতির সদস্যরা কুমিল্লা একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিত। ১০ আগস্ট রেডিওতে ছফা শুনতে পান, আগের দিন কবি সিকান্দার আবু জাফর মারা গেছেন। এই খবর শুনে ছফা ঢাকা চলে আসেন।[৬৮]

সাধারণ মানুষকে এড়িয়ে বা পাশ কাটিয়ে দেশ যে এগিয়ে যাবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুক্তিযুদ্ধের পর জাতিকে জাগিয়ে তোলার যে সুযোগ এসেছিল, তা কাজে লাগানো হয়নি বলে আক্ষেপ করেছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুর রহমান। তাঁর মতে, 'স্বাধীনতার পর যে লগ্নটি এসেছিল সে লগ্নটি হারিয়ে গেছে। এ দেশের মানুষের সৃষ্টিশীলতা চরিতার্থ করার সংগ্রাম আজ অনেক বেশি কঠিন হয়ে গেছে।'[৬৯]

বাকশালে আওয়ামী লীগের লোকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এটা অনেকাংশেই ছিল ১৯৭৩ সালে গড়ে ওঠা ত্রিদলীয় গণঐক্যজোটের একটি নতুন সংস্করণ। তথাপি অন্যান্য দলের অনেকেই এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক মতভেদ ছিল কয়েক দশকের। শেখ মুজিব অবশ্য মনে করতেন, তিনি একটি জাতীয় মঞ্চ তৈরি করেছেন। নতুন ব্যবস্থা চালুর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জুন মাসে মস্কোতে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে অংশ নিতে যাওয়া একটি প্রতিনিধিদলকে তিনি বলেছিলেন :

> ভাগ্যের কী পরিহাস, যে আমি সারা জীবন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছি এবং জেল খেটেছি অনেকগুলো বছর, আমাকেই কি না এক দল বানাতে হলো। বাকশাল আগস্ট থেকে পুরোদমে কাজ করবে। আমি এটা করতে বাধ্য হয়েছি পাকিস্তানপন্থী দলগুলো, জাসদের অস্ত্রধারী লোকেরা, সর্বহারা পার্টি এবং অন্য অনেকে আমাদের দেশের স্বাভাবিক রাজনীতি ও প্রশাসন ধ্বংস করতে উঠে-পড়ে লেগেছে... আর কোনো উপায় ছিল না বলে স্বাধীনতার পক্ষে সমমনা লোকদের নিয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেছি।... এই একদলীয় ব্যবস্থা নিতান্তই সাময়িক। দেশকে প্রতিবিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা করামাত্রই আমি বহুদলীয় গণতন্ত্র আবার বহাল করব।[৭০]

শেখ মুজিবের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বাকশাল গঠন ছিল একটি

উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাকশাল তৈরি করা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানান যুক্তি আছে। যাঁরা শেখ মুজিবের খুব অনুগত এবং তাঁর সামনে 'না' বলতে শেখেননি, তাঁদের যুক্তি একরকম। আর যাঁরা তাঁর ঘোরবিরোধী এবং সমালোচক, তাঁদের যুক্তি অন্যরকম। শেখ মুজিব আসলে কী চেয়েছিলেন, এ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে মওদুদ আহমদের পর্যবেক্ষণ আমলে নেওয়া যেতে পারে :

> ১৯৭৩ সালে মুজিব আমাকে একদিন বলেছিলেন যে 'জেনে রেখো এদেশে যদি কেউ কোনোদিন বিপ্লব করে সেটা শেখ মুজিবই করবে।' তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লব না হোক সমাজ সংস্কার বা জাতি গঠনের কাজে মুজিব ছাড়া যে অন্য কারও পক্ষে গণমানুষকে উদ্বুদ্ধ করা বা এদের সমর্থন আদায় করা সম্ভব ছিল না এটি সত্য এবং ঐ ধরনের কোনো পরিকল্পনা একমাত্র মুজিবই গ্রহণ করতে পারতেন।
>
> আমার মনে হয়, শেখ মুজিব ক্ষমতার জন্য নয় বরং জাতি গঠন করার একটি স্বপ্ন বা আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করেছিলেন। তবে সেই সিদ্ধান্ত ছিল ভুল, একটি বিপর্যয়কর, অদূরদর্শী ও অপরিণামদর্শী বিবেচনা (এরর অব জাজমেন্ট)। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তিনি বাকশাল সৃষ্টি করেছিলেন কথাটা বোধহয় ঠিক নয় দেশে তখন তাঁর কোনো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।... তবে সময়, প্রেক্ষিত এবং প্রস্তুতির কথা বিবেচনা করলে মনে হয় মুজিব তাঁর বুদ্ধিবিবেচনায় মারাত্মক একটি ভুল করেছিলেন। তিনি যে ঠিক কী করতে চেয়েছিলেন সেটা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি।
>
> দ্বিতীয়ত, এই যাত্রায় মুজিব ছিলেন অনেকটা একা এবং একার পক্ষে কোনো সমাজকেই যে পরিবর্তন করা সম্ভব নয় সেটা বোধহয় তিনি নিজেও জানতেন। তাঁর দলের লোকেরা, নেতৃবৃন্দ, পার্লামেন্ট সদস্যরা যদিও তাঁকে বাহ্যিক সমর্থন দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন এটির বিরুদ্ধে। তাঁরা সামনে তাঁর গুণকীর্তন করেছেন, আর পেছনে গিয়ে তাঁর সমালোচনা করেছেন।...
>
> তারপর তিনি যখন তাঁর এতদিনের আওয়ামী লীগকে বিলুপ্ত করে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন করার উদ্যোগ নেন তখন এটিই প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু আওয়ামী লীগ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং সেই দলের মাধ্যমে জনগণের মুক্তি আনা সম্ভব নয়, তাই নতুন শক্তি নিয়ে তিনি আর একটি রাজনৈতিক সংগঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই সংগঠনে নতুন মুখ ও সৎ, চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান নতুন কর্মীর আবির্ভাব হবে—এটিই ছিল সকলের প্রত্যাশা এ ব্যাপারেও দেশকে একটি নতুন দিকদর্শনের ভিত্তিতে গড়ে তোলার মুজিবের সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেনি। আওয়ামী লীগের

> পরিবেশ, আবহ এবং বেষ্টনি থেকে মুজিব শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারেননি ... অর্থাৎ কাগজে-কলমে মুজিব আওয়ামী লীগকে বিলুপ্ত করলেও আওয়ামী লীগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।...
>
> যুদ্ধোত্তরকালে দেশে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা দেওয়ার মতো উপযোগী নেতৃত্ব বা সংগঠন আওয়ামী লীগের ছিল না বা বাকশালেরও হয়নি এবং এই সীমাবদ্ধতাটিই ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট ট্রাজেডি।[৭১]

ন্যাপ (মো.) ও সিপিবি বাকশালে একীভূত হয়েছিল। যেহেতু আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের 'ঐক্য ও সমঝোতার নীতি' ছিল, এর ধারাবাহিকতায় সিপিবি-ন্যাপ বাকশালে যোগ দেয়। এ নিয়ে সিপিবিতে মতভেদ ছিল। বাকশালে যোগ দেওয়ার পক্ষে সবাই একমত ছিলেন না। তবে একটা আপসরফা হয়েছিল—যেহেতু অনিশ্চয়তা আছে, সিপিবি একীভূত হলেও নিজস্ব একটি কাঠামো অব্যাহত রাখবে। বাস্তবে এটা হয়নি। ঘটনার আকস্মিকতায় সব এলোমেলো হয়ে যায়। মতিউর রহমানের ভাষ্য মতে, 'স্বাধীনতার আগে ও পরের অভিজ্ঞতা এবং তিন বছরের আওয়ামী শাসন উৎসাহজনক ছিল না। আওয়ামী লীগ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছিল। আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্য-সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করে সিপিবি ভালো ফল পায়নি। আওয়ামী লীগ একলা চলার নীতি গ্রহণ করেছিল। বিপদে পড়লে তারা ঐক্য আর সমঝোতার কথা বলত, আমরা যোগ দিয়ে পরিস্থিতি বদলাতে পারিনি। তারা একলাই চলেছে, যখন প্রয়োজন তখন ন্যাপ আর সিপিবিকে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। আমরাও অনেক ক্ষেত্রে না বুঝে ব্যবহৃত হয়েছি। এখন মনে হয়, তখন আমাদের গভীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা জানা-বোঝার ক্ষমতা ছিল না।'[৭২] লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মতিউর রহমান আরও বলেন :

> আমি বাকশালে যোগ দিয়ে জাতীয় যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছিলাম। সিপিবির কোটা থেকে একজনকেই নেওয়ার কথা। সিপিবি নূরুল ইসলাম নাহিদকে দিয়েছিল। তোফায়েল আহমেদের ব্যক্তিগত পছন্দ ও আগ্রহে আমি কমিটিতে গিয়েছিলাম। আমাদের অনেকের মধ্যেই মিশ্র অনুভূতি ছিল।
>
> পরবর্তীতে আমার বিশ্লেষণে মনে হয়েছে, এক দল করা ভুল হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে পার্টি কনফারেন্সের আগে আমি কেন্দ্রীয় কমিটিতে একটা প্রস্তাব আনি যে, বাকশাল করা ভুল হয়েছিল আমার প্রস্তাবের পক্ষে আমি ছাড়া মাত্র একজনের, শ্রমিক নেতা শহীদুল্লাহর ভোট পেয়েছিলাম। বাকি সবাই বলেছিলেন ভুল হয়নি। এখানে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটা মিল আছে। আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগও বাকশাল সম্পর্কে পুনর্মূল্যায়ন করেনি বা ভুল

হয়েছে বলে মনে করে না। সিপিবির অবস্থানও একই রকম। এত পরিবর্তনের পরও সিপিবি কিন্তু বলে নাই যে এক দল করার এই ব্যাপারটা ইতিহাসের একটা ভুল পদক্ষেপ ছিল।[৭৩]

রাজনীতির ঘনায়মান সংকট এবং উথালপাথাল দিনগুলো খুব কাছে থেকে দেখেছেন ভারতের উপহাইকমিশনার জে এন দীক্ষিত। তাঁর মতে, সংবিধানে আমূল পরিবর্তন আনার ফলে শেখ মুজিবের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাটি অবলুপ্ত হয় এবং শেখ মুজিব সব সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত হন। চুয়াত্তরের জুনে ভুট্টোর ঢাকা সফরের পর থেকেই শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তায় ধ্বস নামে। চুয়াত্তরের ডিসেম্বর থেকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলোতে দীক্ষিত পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে :

বাংলাদেশের রাজনীতির মঞ্চ থেকে হারিয়ে যাওয়ার ভিত মুজিব নিজেই তৈরি করেছেন। আমি কোনো সহিংস পরিণতির কথা ভাবিনি। তাঁর ভাগ্নে শেখ মণিসহ তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ করে আমি পরিষ্কার একটা ধারণা পাই যে, শেখ মুজিব তাঁর বিরোধী শক্তিগুলোকে মোকাবিলা করতে পারবেন না এবং তিনি ক্ষমতাচ্যুত হবেন।[৭৪]

পঞ্চাশের দশকে এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বারবার হোঁচট খেয়েছিল। একদিকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে কোন্দলের ফলে স্থিতিশীলতার নাগাল পাওয়া যায়নি। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পর দেশে কার্যত একদলীয় গণতন্ত্র চালু হলো। গণতন্ত্রের মোড়কটা থাকল, কিন্তু জাতীয় সংসদে বিরোধী দল না থাকায় সংসদ কার্যকর হলো না। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বাইরে বিরোধী দলের মাত্র দুজন এবং স্বতন্ত্র তিনজন নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে উপনির্বাচনে বিরোধীদলের আরও দুজন নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁদের অবস্থান ছিল সাগরে বুদ্‌বুদের মতো। সংসদে এবং সরকারে এই একদলীয় আধিপত্য অন্য ধরনের সংকট তৈরি করেছিল। একদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে একদলীয় রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এই অবস্থার একটি আত্মসমালোচনামূলক বর্ণনা দিয়েছেন আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা এবং শেখ মুজিবের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী মিজানুর রহমান চৌধুরী :

স্বাধীনতাযুদ্ধে জয়ের জন্য রণকৌশল ও অস্ত্রশক্তি এবং তার যথাযথ প্রয়োগ অপরিহার্য কিন্তু যুদ্ধে সফল হওয়ার পর দেশ পরিচালনার জন্য আরও বেশি ত্যাগ, কৌশল এবং জনগণকে সংগঠিত করা যুদ্ধের চেয়েও দুরূহ ব্যাপার। অপ্রিয় হলেও এ কথা সত্য যে আমরা যারা দেশ পরিচালনা করেছি এবং

যেসব আমলা ও কর্মকর্তা এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের ইমাজিনেশন এবং ইনিশিয়েটিভ—এ দুটিরই প্রচণ্ড অভাব ছিল। বঙ্গবন্ধুর চারদিকে আমরা যারা বেষ্টন করেছিলাম এবং যাদের বুঝ-পরামর্শে তিনি দেশ পরিচালনা করতেন, তারা সবাই তাঁকে সঠিক পরামর্শ দিইনি।

...এ সময় আমরা দেখেছি, যাঁরা বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনপণ করতে প্রস্তুত—এ ধরনের অনেককেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে বা নিজ প্রচেষ্টায় দেখা করে বাকশাল প্রবর্তনের জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করছেন। সব মানুষই নিজের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে।... কিন্তু এটা যে প্রশংসাকারীকে চাটুকারে পরিণত করে, তা-ই নয়, প্রশংসিত ব্যক্তির যে কী সর্বনাশ করা হলো, তা তিনি উপলব্ধিও করতে পারেন না। প্রশংসা শুনতে শুনতে তিনি ভুলেই যান যে তাঁর কোনো দোষ বা ত্রুটি থাকা সম্ভব। এই ভুলে যাওয়ার কারণে সে ব্যক্তির মধ্যে অহং বা দম্ভ বা আত্মম্ভরিতা, অর্থাৎ ফারসি ভাষায় 'হাম দিগার ন্যস্ত', অর্থাৎ আমি সবার চেয়ে বড় বা আমার চেয়ে বড় কেউ নেই—এই মনোভাব বদ্ধমূল হয়ে একপর্যায়ে তাঁকে স্বৈরাচারী করে তোলে। নিজের অজান্তেই তিনি নিজের সৃষ্ট একটা বলয়ের মধ্যে একাকী হয়ে যান।... এ কথা ভুলে যান যে চাটুকার কেবল তাঁর আপন স্বার্থেরই বন্ধু।[৭৫]

১৫ আগস্ট সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের আসার কথা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আওয়ামী লীগবিরোধী অংশটি চায়নি শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসুন কিংবা তিনি যদি আসেনও, তাঁর মুখোমুখি যেন না হতে হয়। এ উপলক্ষে ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্রে একটা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী এবং সব অনুষদের ডিন ও সিনিয়র অধ্যাপকরা অতিথিকে স্বাগত জানাবেন। সিনিয়রদের মধ্যে ছিলেন বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও কলা অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক আহমদ শরীফ। তিনি ছিলেন ঘোরতর মুজিববিরোধী। শেখ মুজিবকে স্বাগত জানানোর বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তিনি ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[৭৬] বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর চাপ ছিল। পুরো বিষয়টি এক সাক্ষাৎকারে বর্ণনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক :

ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে উপস্থাপন করে পাস করার পর বাকশালের সদস্য সংগ্রহের জন্য ড্রাইভ দেওয়া হলো। আবদুল হক ছাড়া বাংলা একাডেমির সকলকেই বাকশালের সদস্য করেছে। এরপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ভাইস

চ্যান্সেলর আবদুল মতিন চৌধুরী হঠাৎ করে শিক্ষকদের সভা ডাকলেন সম্ভবত ৯-১০ আগস্ট (১৯৭৫)। তিনি বক্তৃতা দিলেন, 'সম্ভব হলে বঙ্গবন্ধু নিজেই আপনাদের সঙ্গে কথা বলতেন। কিন্তু নানা কারণে ব্যস্ততার জন্য আমার মাধ্যমে আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আগামী ১৫ আগস্ট সকাল দশটায় তিনি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবেন। টিএসসিতে সভা হবে। বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে আমি প্রত্যেক বিভাগে বাকশালের সদস্য হওয়ার ফর্ম পাঠাব এবং আমি বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছি বা দেব যাতে আপনাদের স্বাক্ষরিত ফর্ম আমার অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

মনে মনে খুব ভয় পেলাম। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ফিজিক্সের প্রফেসর হারুনুর রশিদ এর পক্ষে বা বিপক্ষে একটি কথাও বলেননি। সেক্রেটারি আখতারউজ্জামান সাহেব ছিলেন সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তিনি বাকশাল গঠনে অ্যাকটিভ ছিলেন। তিনি ফর্ম নিয়ে আসলেন বললেন, এটা না করলে বাঁচা যাবে না। এ দেশে হয় বাকশাল, না হয় নকশাল। যদি বাকশালের মেম্বার না হন, তাহলে ইউ উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ নকশালাইট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগের চেয়ারম্যান শিক্ষকদের মিটিং ডাকছেন আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়ে। তারপর টোটাল একটা ভীতির সৃষ্টি হয়। সরদার ফজলুল করিম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং আরও যারা গণ্যমান্য শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা মুহূর্ত দেরি না করে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন।

আমাদের বিভাগের চেয়ারম্যান ড. নীলিমা ইব্রাহিম ছিলেন আমাদের অধিকাংশের শিক্ষক। তিনি, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, জুনিয়র কলিগ আকরাম, এরা সঙ্গে সঙ্গে ফর্ম ফিলআপ করে দিয়ে দিয়েছে। আমি বললাম, আপা, বাকশাল হোক না, এখনই মেম্বার হতে হবে, এটা তো কথা না। পরেও হওয়া যাবে। আমি এখন ফর্ম ফিলআপ করব না। আমার দেখাদেখি সন্‌জীদা খাতুন বললেন, এখন করব না। মনসুর মুসা, আহমদ কবির, ওয়াকিল আহমদ, এই কয়জনও বললেন, আমরা এখন বাকশালের সদস্য হব না। আহমদ শরীফ সাহেব তখন বিশ্ববিদ্যালয়েই আসতেন না। ক্লাস থাকলে কোন দিক দিয়ে এসে ক্লাসটা নিয়ে চলে যেতেন, এখানে বসতেন না। আমরা তাঁর বাসায় গিয়ে আলাপ করেছি। তিনি বলেছেন, তোমরা সদস্য হতে চাও তোমাদের ইচ্ছা তবে আমি কোনোভাবেই বাকশালের সদস্য হব না, এটা জাতির জীবনে চরম অমঙ্গল ডেকে আনছে।

১৪ আগস্ট আমি ইউনিভার্সিটিতে আসি নাই। এর মধ্যে আমাদের যারা কলিগ ছিল, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বাকশালের ফর্ম স্বাক্ষর করবে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর এরা আমার কাছে ছাত্র পাঠিয়েছে। আমি বললাম, আমি

ইউনিভার্সিটিতে যাব না, বাকশালের ফর্মও সই করব না। কেউ যদি মারতে চায়, বাসায় এসে মেরে যেতে হবে। আমি তো কোনো অন্যায় কাজ করি নাই।

তত্ক্ষণে ওরা ডিপার্টমেন্ট থেকে ফর্ম জোগাড় করে ফিলআপ করে ভিসির অফিসে গিয়ে রেজিস্টারে নাম লিখে দিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত আমরা তিনজন রইলাম বাকশালের সদস্য না হয়ে। আহমদ শরীফ, সন্‌জীদা খাতুন আর আমি। এছাড়া ইসলামিক হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের মমতাজুর রহমান তরফদার, জিওলজি ডিপার্টমেন্টের আবদুল লতিফ, ইতিহাস বিভাগের আহমেদ কামাল, মুনতাসীর মামুন, তখন নতুন জয়েন করেছে, তাঁরা স্বাক্ষর করেনি।[৭৭]

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের ভাষ্যমতে, ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক আলবাব আখন্দ এবং অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক স্বপন আদনানও বাকশালে যোগদানের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেননি।[৭৮]

৬

বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুটো সমান্তরাল ধারা বয়ে যাচ্ছিল। একটি হলো সাংবিধানিক রাজনীতির নিয়মতান্ত্রিক ধারা, অন্যটি হলো সশস্ত্র রাজনীতির সন্ত্রাসবাদী ধারা। প্রথম ধারাটি ছিল 'গণতান্ত্রিক রাজনীতির' সমার্থক। দ্বিতীয় ধারাটিকে এ দেশে 'বিপ্লবী রাজনীতি' হিসেবে প্রচার করা হতো। এই দ্বিতীয় ধারার রাজনীতিতে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিল প্রধানত সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, আবদুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল এবং আলাউদ্দিন-মতিনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। জাসদও পরে এই ধারায় শামিল হয়। এই দলগুলো একে অপরকে চরম শত্রু মনে করত।

ইংরেজি ভাষায় প্যারানয়্যা বলে একটি শব্দ আছে। বাংলায় এর যথার্থ প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। বলা চলে এটা এক ধরনের মানসিক ভ্রম বা বৈকল্য। কিছু লোকের মগজে-মজ্জায় একটা ধারণা মিশে গিয়েছিল যে, বাংলাদেশ ভারতের একটি উপনিবেশ, শেখ মুজিব একজন 'জাতীয় বিশ্বাসঘাতক' এবং যেভাবেই হোক তাঁর সরকারকে 'উৎখাত' করতে হবে। আবদুল হক, সিরাজ সিকদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, জাসদ-গণবাহিনীর আবু তাহের প্রমুখ এই মনস্তত্ত্বের শিকার হয়েছিলেন। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তাঁদের বিষোদগার যত না রাজনৈতিক, তার চেয়েও বেশি ছিল

আক্রোশ। শেখ মুজিবের প্রতি সমসাময়িক অনেক রাজনীতিবিদের প্রচণ্ড ঈর্ষা ছিল। ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে সামরিক বাহিনীর অনেক কর্মকর্তাও চরমপন্থার দিকে ঝুঁকেছিলেন। রাজনীতিতে এই প্রবণতা ক্রমে জেঁকে বসেছিল এবং দেশে এক ধরনের বিস্ফোরণের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। পঁচাত্তরের ঘটনাবলি ছিল তারই অনিবার্য পরিণতি।

একদলীয় শাসনের জবাবে সন্ত্রাসবাদী ধারাটিকে রাজনৈতিক বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এখানে 'বিপ্লব' আর 'ষড়যন্ত্র' একাকার হয়ে গেছে। একটি জনগোষ্ঠীর কাছে যিনি 'বিপ্লবী', প্রতিপক্ষের কাছে তিনিই 'ষড়যন্ত্রকারী'। বিপ্লব ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে বিভাজনরেখাটি অতি সূক্ষ্ম। তার গায়ে আদর্শের চাদর চড়িয়ে ভালোবাসা অথবা ঘৃণা ছড়ানো হয়। সবকিছুর মূলে রয়েছে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ক্ষমতা দখলের নির্মম লড়াই। এ রকম একটি লড়াইয়ের জমি তৈরি হচ্ছিল ধীরে ধীরে। জমি তৈরি করছিলেন রাজনীতিবিদরা।

অভ্যুত্থান

ভয়ংকর একটা ঝড়ের আগে যেমন অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধতা থাকে, যেন মনে হয় কোনো বাতাস নেই, গাছের একটা পাতাও নড়ছে না, চারদিকে অস্বস্তিকর একটা গুমোট ভাব, বাংলাদেশের অবস্থা তেমনি দাঁড়িয়েছিল পঁচাত্তরের মাঝামাঝি। চারদিকে বাকশাল নিয়ে মাতামাতি, ক্যাম্পাসে-রাজপথে কোনো মিছিল নেই, বিক্ষোভ নেই। পল্টনে জনসভা হয় না।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এটা বুঝতে অক্ষম ছিল যে, মানুষ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বাকশাল নিয়ে ঢাকঢোল পেটানো এবং তাতে যোগ দেওয়ার ডামাডোলে সাধারণ মানুষের মনের রক্তক্ষরণ আওয়ামী নেতৃত্ব না বুঝলেও সচেতন মানুষের চোখে তা ধরা পড়েছিল। সিপিবির এক মূল্যায়নে এর প্রতিফলন দেখা যায় :

> বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এ দেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মূল ভূমিকা পালন করেছিল। তাই স্বাধীনতার পর জনগণ তাঁদের কাছে অনেক কিছু আশা করেছিল। এটা ঠিক যে একটা নতুন জাতি ও রাষ্ট্র গড়ে তোলা, বিশেষত যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থা থেকে, অত সহজ ও স্বল্পকালের ব্যাপার নয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে গরীব মেহনতি, স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সীমিত আয়ের লোকজন একশ্রেণির ধন-পিচাশের কারসাজিতে আগাগোড়াই নিস্পেষিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর জনগণের ঘরে স্বাধীনতার সুফল কখনোই পৌঁছেনি। বরং দুঃখ-কষ্ট ও সংকটই বৃদ্ধি পেয়েছে।... সাধারণ মানুষের ভাগ্য যখন ক্রমে অবনতির দিকে যাচ্ছিল, তখন শাসক দলের একাংশসহ মুষ্টিমেয় 'সৌভাগ্যবান' ব্যক্তির ধনস্ফীতি ঘটছিল। জনগণ এই অবস্থার অবসান কামনা করতে শুরু করেছিল।[১]

ভারতবিরোধিতা এবং সরকার তথা শেখ মুজিববিরোধিতা তখন প্রায় সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। ওই সময়ের পরিস্থিতির একজন নিবিড় পর্যবেক্ষক ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের উপহাইকমিশনার জে এন দীক্ষিত। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে

টানাপোড়েন তাঁর নজর এড়ায়নি। তাঁর মতে, এর দায় শেখ মুজিবেরও। ভারতের সঙ্গে ইতিবাচক সমীকরণ তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। একই সঙ্গে বিরোধীদলের প্রতি তাঁর কর্তৃত্ববাদী মনোভাব অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করেছিল।[২]

পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেনের মতে ভারতবিরোধিতার পেছনে ভারতেরও দায় ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য করলেও ভারত সরকারের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন যারা অখণ্ড পাকিস্তানকেই ভারতের জন্য সুবিধাজনক মনে করতেন। ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। পাকিস্তানি অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে যাওয়া, ফারাক্কা বাঁধ ও গঙ্গার পানি বণ্টনের সমস্যা, সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ, এসব বিষয় তাদের হাতকেই শক্তিশালী করেছিল যারা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক চায়নি।[৩]

২

জাসদ জন্মলগ্নেই সরকার উৎখাতের ঘোষণা দিয়েছিল। তারা একটা 'বিপ্লবের' লক্ষ্যে নিজেদের সংগঠিত করছিল। তৈরি করেছিল 'বিপ্লবী গণবাহিনী'। এর পাশাপাশি চলছিল সামরিক বাহিনীর মধ্যে 'সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ কর্মী সৃষ্টির প্রক্রিয়া'। এই প্রক্রিয়ার একপর্যায়ে সামরিক বাহিনীর মধ্যে গড়ে তোলা হয় 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'। এই সংগঠন 'দেশের সকল সেনানিবাসে ও ছাউনিগুলোতে অত্যন্ত সঙ্গোপনে এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যেতে থাকে।'[৪]

১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের এক সন্ধ্যা। হাজারীবাগ পানির ট্যাংকের কাছে বাড্ডানগরে গণি সাহেবের বাড়ির দোতলায় ঢাকা নগর গণবাহিনীর একটা সভা হচ্ছে। ওই বাড়ির ছেলে ফ ক ম ইকবাল ছিলেন জাসদের স্থানীয় কর্মী। সভায় হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন সিরাজুল আলম খান। চুয়াত্তরের ডিসেম্বরে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলে তিনি কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁর চিরপরিচিত দাড়ি-গোঁফ উধাও। এক হাতে শিখদের মতো স্টেইনলেস স্টিলের বালা। গণবাহিনীর অস্ত্রের মজুত নিয়ে কথাবার্তা হলো। তিনি আশ্বস্ত করলেন, 'অস্ত্র কোনো সমস্যা নয়। প্রয়োজনে চীন থেকে অস্ত্র আনা হবে'। এরপর তিনি আবার কলকাতা চলে যান। কাজী আরেফ আহমদ পরে বলেছিলেন, 'ইন্ডিয়ার অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে অস্ত্রের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, সিল-ছাপ্পর ছাড়া।' গণবাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ডাররা

সীমান্তের ধারেকাছের জেলাগুলোতে বসে থাকলেন। শুধু গণবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের ও ডেপুটি কমান্ডার হাসানুল হক ইনু রয়ে গেলেন ঢাকায়। নভেম্বরের দিকে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ছিল।[৫]

গণবাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুটো। শেখ মুজিবকে ক্রমাগত চাপে রাখা এবং অন্য কোনো বামপন্থী গ্রুপ যেন সুযোগ না নিতে পারে, তার খেয়াল রাখা। ২৬ মার্চ ১৯৭৫ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে শেখ মুজিবের ভাষণ দেওয়ার কথা। গণবাহিনীর ঢাকা নগর শাখায় সিদ্ধান্ত হলো, শেখ মুজিবের সভা পণ্ড করতে হবে। 'ডানো' দুধের কৌটা ব্যবহার করে ৭০টা বোমা বানানোর আয়োজন করা হলো। পরিকল্পনা ছিল, পান-বিড়ি-সিগারেট, ঝালমুড়ি, আইসক্রিমবিক্রেতা—এই ধরনের ফেরিওয়ালাদের দিয়ে মাঠের বিভিন্ন জায়গায় বোমাগুলো ফাটানো হবে। জনসভা যেদিন হবে, তার চার-পাঁচ দিন আগে ঢাকা নগর গণবাহিনীর পলিটিক্যাল কমিসার রফিকুল ইসলাম জানালেন, দলের উচ্চতর ফোরাম থেকে এই পরিকল্পনা স্থগিত রাখার নির্দেশ এসেছে। বলা হলো, সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।[৬]

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যে 'ষড়যন্ত্র' হচ্ছে, এ সম্পর্কে একটি তথ্য দিয়েছেন তাঁর সহকারী প্রেস সচিব মাহবুব তালুকদার। একটি সরকারি গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করতেন তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। অজ্ঞাত কারণে তিনি তাঁর আসল নামটি উল্লেখ করেননি। তার কাজের মধ্যে ছিল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিদেশিদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা এবং মাঝেমধ্যে তাদের টেলিফোন টেপ করে সন্দেহজনক কোনো তথ্য পেলে কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো। সে একদিন উত্তেজিত হয়ে বলল, 'বঙ্গবন্ধুকে সরানোর গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যেই খারাপ কিছু একটা ঘটবে।' তালুকদার তাঁর বন্ধু রফিকুল আনোয়ারকে বিষয়টা জানালেন। তাঁরা দুজন গেলেন শেখ ফজলুল হক মণির কাছে। মণি তালুকদারের বন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় তাঁরা কিছুদিন একসঙ্গে ছিলেন। মণির সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা ছিল এ রকম :

> ঘটনা অনুপূর্বিক বর্ণনা করলাম। মণি শুনে বলল, অ্যাবসার্ড! লোকটা মনে মনে একটা ঘটনা তৈরি করেছে।
>
> তবু বঙ্গবন্ধুকে ঘটনাটা বলে রাখা প্রয়োজন। রফিকুল আনোয়ার বললেন।
>
> কাল্পনিক ঘটনা তাঁকে বলে লাভ নেই। দেশে বিপ্লব ঘটেছে। বাকশাল নিয়ে আমরা খুবই ব্যস্ত। এ সমস্ত আজগুবি খবর বলে বঙ্গবন্ধুকে বিড়ম্বিত করা ঠিক না।

অগত্যা মণির অফিস থেকে ফিরে এলাম। আমাদের উভয়ের মনই ভারাক্রান্ত। রফিকুল আনোয়ার বললেন, বঙ্গবন্ধুকে তুমি সরাসরি কথাটা বলতে পার। তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে তুমি চিন্তা কর জানলে খুশিই হবেন।

কাউকে আর কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। অভিমান ভরে বললাম, এ সমস্ত আজগুবি খবর নিয়ে আমাদেরও মাথাব্যথার কোনো কারণ নেই।[৭]

এর মধ্যে মহা ধুমধামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা পালন করলেন র‍্যাগডে। জুন মাসের একটা দিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর নাচে-গানে, হইহল্লায়, উৎসবে রঙিন হয়ে উঠল। রাষ্ট্রপতির ছেলে শেখ কামাল ছিলেন কেন্দ্রীয় র‍্যাগডে উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক। তাঁর নিপুণ নির্দেশনায় কোনো খুঁত ছিল না। সবাই মিলে তাঁকে তকমা দিলেন 'র‍্যাগ মার্শাল'। বিকেলে কলাভবন চত্বরে বটতলায় মঞ্চ সাজিয়ে আন্তঃহল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতা হলো, চ্যাম্পিয়ন হলো মুহসীন হল। সন্ধ্যায় সবাই মিলে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সবুজ চত্বরে বসে প্রজেক্টরে ছবি দেখলেন। শেখ কামাল জোগাড় করেছিলেন হিন্দি ছবি *সত্যকাম*। অনেক রাত পর্যন্ত আনন্দে মেতে থাকলেন সবাই। মনেই হলো না, দেশে কোনো সমস্যা আছে।[৮]

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ শেষপর্বের পরীক্ষা শুরু হলো। ছাত্র-শিক্ষক সবাই ব্যস্ত। চ্যান্সেলর শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ আগস্ট সকালে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। সর্বত্র ঘষামাজা চলছে। একটা প্রচার ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে বাকশালে যোগ দেবেন।

চ্যান্সেলর শেখ মুজিবের আগমন ঠেকানোর জন্য ছক কষছিলেন প্রাণরসায়ন বিভাগের লেকচারার আনোয়ার হোসেন। তিনি ছিলেন জাসদের সামরিক সংগঠন বিপ্লবী গণবাহিনীর ঢাকা নগরের কমান্ডার। তাঁর আর একটি পরিচয় হলো, তিনি গণবাহিনীর কমান্ডার লে. কর্নেল (অব) আবু তাহেরের ছোট ভাই। শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষ করে গণবাহিনী কিছুটা ভীতি ছড়াতে চেয়েছিল। এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে গণবাহিনীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার মোশতাক আহমেদের বয়ানে :

আনোয়ার ভাই শিক্ষকদের একটা লিস্ট আইনা আমারে দিছে। তারপর আমি বাংলাবাজার যাইয়া এনভেলাপ কিনলাম। উনার ভাই বাহার কোথা থেকে একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিন আনল। ওখানেই কপি করা হয়। আপিলটা বাকশালে জয়েন না করার জন্য। কারও সই ছিল না। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের জন্য চিঠিগুলো আলাদা করছি। আমরা একই সময়ে সব

ডিপার্টমেন্টে দিয়া আসছি। এইটা ১৫ আগস্টের দুইদিন আগে। ১৫ আগস্ট টিচাররা সবাই বাকশালে জয়েন করবে এমন একটা কথা ছিল। এটা যেন না করে।

ফকিরাপুলের একটা ঢালাই কারখানায় বোমার খোল বানানো হইত। আনোয়ার ভাই আমারে একবার নিয়া গেছিল। একটা ছালার ব্যাগে ভইরা মোটর সাইকেলের পেছনে কইরা নিয়া গেল, মিরপুরে পাঠায়া দিল। হয়তো আরও ডেলিভারি হইছে, নিয়া তো 'নিখিল' বানানো হইছে (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিখিলচন্দ্র সাহা চুয়াত্তরের ২৬ নভেম্বর জাসদের হরতাল উপলক্ষে বোমা বানাতে গিয়ে দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর স্মরণে গণবাহিনী তাদের তৈরি বোমার নাম রেখেছিল 'নিখিল')।

১৪ আগস্ট তো ইউনিভার্সিটিতে হাই এক্সপ্লোসিভ ফাটানো হইল। এইটা বাকশালে জয়েন না করতে থ্রেট আর কি। সায়েন্স বিল্ডিং, অ্যানেক্স বিল্ডিং, কলাভবন, ভিসির অফিসের সামনে চারটা টাইম বোমা ফাটানো হইল। ভিসির অফিসের সামনে আর কলাভবনের দায়িত্বে ছিল বাহার।

আগের দিন আলাপ হইছে, আমি এলিফেন্ট রোডের বাসা থেকে ডেলিভারি নিব। সকালে যাইয়া আমার দুইটা ডেলিভারি নিলাম। সায়েন্স বিল্ডিং আর অ্যানেক্সের দায়িত্বে আমি ছিলাম। এস এম হলের আশরাফ ভাই আর আহসান ভাই, এই দুইজন গেছে অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে বোমা ফাটাইতে কার্জন হলের সামনেরটা করছে নূর মোহাম্মদ।

আনোয়ার ভাই সকালে আমারে বলল যে, তোমারে টাইম দিছি একটা-দেড়টা, ওই সময় দোয়েল চত্বরের দিকে দাঁড়াবা। হবে কি হবে না এইটা জানাব। ওই হিসাবে আমি এদেরকে সকালে জিনিস দিয়া দিছি। আমি একদম টাইমলি ওই জায়গায় আসছি। এমন বৃষ্টি! তখন রক্ষীবাহিনী ভরা জায়গাটা। আনোয়ার ভাই বাংলা একাডেমির দিক থিকা আইসা রিকশাটা থামাইল। এই পাশে আইসা আমারে গ্রিন সিগন্যাল দিল। তারপর ওই দিকে চইলা গেল। আমি ওখান থিকা জিমনেসিয়ামের দিকে গেলাম। আমি গ্যালারিতে বসা। দুইটা আওয়াজ শুনলাম। আমি এদেরকে মিলিত হওয়ার জায়গা দিলাম—মেডিকেল কলেজের ক্যান্টিন। দেখলাম আশরাফ ভাই। কোনো ক্ষয়ক্ষতি নাই। আমাকে রিপোর্ট করল, কেউ ধরা পড়ে নাই। তারপর ওইখান থিকা যে যার মতো চইলা গেলাম। আমি রাত্রে মুহসীন হলে ছিলাম।[১]

৩

ঢাকা সেনানিবাসে লেখা হচ্ছিল নাটকের নতুন স্ক্রিপ্ট। পরিচালক সাঁজোয়া বাহিনী বেঙ্গল ল্যান্সার্সের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর দেওয়ান ইশরাতউল্লাহ সৈয়দ ফারুক রহমান ও তাঁর প্রধান সহযোগী সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারির অধিনায়ক মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ। ফারুক চুয়াত্তর সালেই মন স্থির করেছিলেন, 'হি (মুজিব) মাস্ট গো' (মুজিবকে সরতেই হবে)।[১০]

ফারুক-রশিদ একা ছিলেন না। সরকার ও রাজনীতি সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর মধ্যে তৈরি হয়েছিল নেতিবাচক মনস্তত্ত্ব। এই মনস্তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন পাওয়া যায় সেনাবাহিনী থেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবসরে যাওয়া লে. কর্নেল আবু তাহেরের মধ্যে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী :

> পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ভূমিকা সবারই জানা, কীভাবে একটার পর একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছিল, কীভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল। আমাদের লালিত সব আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও মূল্যবোধ একের পর এক ধ্বংস করা হয়েছিল। গণতন্ত্রকে অত্যন্ত নোংরাভাবে কবর দেওয়া হয়েছিল। জনগণকে পায়ের নিচে পিষে জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র।...
>
> শেখ মুজিব জনগণের নেতা ছিলেন। অস্বীকার করার অর্থ হবে সত্যকে অস্বীকার করা। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাঁর ভাগ্য নির্ধারণের ভার জনগণের ওপরই বর্তায়। জনগণের উচিত হবে জেগে ওঠা এবং প্রতারণার দায়ে মুজিবকে উৎখাত করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জনগণ মুজিবকে নেতা বানিয়েছে, তারাই একদিন স্বৈরাচারী মুজিবকে ধ্বংস করবে. জনগণ কাউকে ষড়যন্ত্র করার অধিকার দেয়নি।[১১]

মার্চের মাঝামাঝি চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে একটা সামরিক মহড়ায় অংশ নিতে গোলাসহ ছয়টি ট্যাংক নিয়ে মেজর ফারুক রহমানের যাওয়ার কথা ছিল। ট্যাংকগুলো কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়ার কথা। একদিন মাঝরাতে তিনি মেজর নাসির উদ্দিনের ঘরে এসে হাজির। নাসির সাঁজোয়া বাহিনীর অফিসার ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পর পরিত্যাক্ত পাকিস্তানি কয়েকটা ট্যাংক আর ৪০০ সৈন্য নিয়ে বেঙ্গল ল্যান্সার্স-এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তেহাত্তর সালের শেষ দিকে পাকিস্তান থেকে বাঙালি সেনা সদস্যরা ফিরে এলে ট্যাংক ইউনিটটি আরও বড় হয় এবং ফারুক এর দায়িত্ব পান। ফারুক নাসিরকে বললেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ট্যাংক ট্রেনে তুলবো না।

আমি আজ রাতেই অভ্যুত্থান ঘটাতে যাচ্ছি। তুমি যদি রাজি থাকো তবে আসো এখনই পরিকল্পনা সেরে ফেলি।' নাসির ফোন করে চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের ঘুম ভাঙালেন। খালেদ ফারুকের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বললেন। তারপর নাসির ফোনের রিসিভারটা নিয়ে খালেদের নির্দেশ শুনলেন, 'হি ইজ ক্রেজি। হি ইজ আ মেন্টাল পেসেন্ট। নাও লিসেন টু মি কেয়ারফুলি। গো টু দ্য রেলস্টেশন। বি উইথ হিম। মেক সিওর ট্যাংকস আর লোডেড। ইফ ইউ সি এনিথিং আদারওয়াইজ, লেট মি নো। আই উইল সেন্ড মিলিটারি পুলিশ টু সর্ট হিম আউট।' নাসির সারারাত ফারুকের সঙ্গে কমলাপুর স্টেশনে থাকলেন। ট্রেন ছাড়ল সকাল দশটায়। বাসায় ফিরে এসে তিনি খালেদকে জানালেন, ট্যাংকসহ ট্রেন রওনা হয়ে গেছে।[১২]

নাসিরের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, ফারুক অনেক দিন থেকেই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছিলেন। তার সহকর্মীদের কেউ কেউ এটা জানতেন। সিজিএস খালেদ তো অবশ্যই জানতেন।

অদৃষ্টবাদী ফারুক ২ এপ্রিল (১৯৭৫) চট্টগ্রামের হালিশহরের বিহারি কলোনিতে আবদুল হাফিজের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ চান। জন্মান্ধ এই ফকির 'আন্ধা হাফিজ' নামে পরিচিত। তিনি ফারুককে তিন মাস অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। এই সব কথা উঠে এসেছে পরবর্তী সময়ে ফারুক ও রশিদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনে। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন লন্ডনের সানডে টাইমস-এর প্রতিবেদক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস।[১৩]

৪

১৪ আগস্ট ১৯৭৫, বৃহস্পতিবার। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠানে যাবেন। দিনটা কেমন কেটেছিল? তাঁর আশপাশে যারা ছিলেন, তাদের একজন হলেন সহকারী প্রেস সচিব মাহবুব তালুকদার। তিনি ঘটনাক্রম বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> দুপুরে তিনি ডেকেছিলেন আবদুল তোয়াব খান (রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব) ও আমাকে। বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা তৈরি করতে। আমি একটু বিস্মিত হয়েছিলাম, তিনি কি তাহলে লিখিত ভাষণ দেবেন? তোয়াব খান কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে। তিনি বললেন, লেখা বক্তৃতা নয়, মুখেই বলব। তবে হাতের কাছে লিখিত সমস্ত ডাটা ও ইনফরমেশন থাকতে হইব।

বিকালবেলা শিক্ষা সচিব এম মোকাম্মেল হক আসবেন গণভবনে। তাঁর কাছ থেকে সব তথ্য সংগ্রহ করে একটা খসড়া তৈরি করার নির্দেশ দিলেন প্রেস সচিব। আমি নির্ধারিত সময়ে শিক্ষা সচিবের জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি যথাসময়ে আসছেন না দেখে আমার উদ্বেগ বাড়ল। তথ্যাদি না পেলে বক্তৃতাই বা তৈরি করব কেমন করে?

ইতোমধ্যে এল দুঃসংবাদ। রামগতিতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়েছে। নিহত হয়েছেন কয়েকজন ভারতীয় সৈনিক। বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে আমাদের কিছুটা মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত বলছেন, সংবাদটা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া ঠিক হবে না। আবদুল তোয়াব খান বললেন, এ বিষয়টি আলাপ-আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত জানানো হবে। বিষয়টি নিয়ে প্রেস সচিব অত্যন্ত পেরেশানিতে পড়ে গেলেন।

সন্ধ্যার পরপরই বঙ্গবন্ধু ৩২ নম্বরের বাসভবনে চলে গেছেন। তাঁকে বলেছিলাম, আজ সন্ধ্যায় ফরাসউদ্দীনের ফেয়ারওয়েল ডিনার।

হ, জানি। বঙ্গবন্ধু বললেন, তার মানে আমারে এখনই ছুটি দিলা তোমরা। মৃদু হেসে বললেন, ফরাসের ডিনারে তো আমি থাকতে পারি না

বঙ্গবন্ধু বাসায় চলে যাওয়ার পরপর শিক্ষা সচিবের ফোন এল। জানালেন, কিছুটা অসুস্থ বোধ করছেন। এ অবস্থায় তিনি গণভবনে আসতে অপারগ। তথ্যগুলো টেলিফোনে লিখে নিতে অনুরোধ করলেন। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং এই নির্দেশ শিরোধার্য। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে তিনি আমাকে ডিকটেশন দিতে থাকলেন। আমি যাবতীয় তথ্য লিখে নিলাম। আমার উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত হল।

আবদুল তোয়াব খান রামগতির ঘটনা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। পরে তাঁর মনে হলো, এই সিদ্ধান্তটা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে আসা প্রয়োজন। তিনি ফোন করলেন বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধু বললেন, তুমি আমার অফিসে গিয়া রেড টেলিফোনে আমারে ফোন কর।

তোয়াব খান বঙ্গবন্ধুর অফিস কক্ষে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন তিনি। কি কথা হয়েছে আমি জানি না। এর মধ্যে আবার ভারতীয় দূতাবাস থেকে ফোন এল।

তোয়াব খান জানালেন, দুর্ঘটনার খবর পত্রিকায় জানাতে হবে। নইলে দেশবাসীর মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

ভারতীয় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জানালেন, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে দিল্লীর সঙ্গে কথা বলেছেন।

প্রেস সচিব বললেন, আমরা উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এমতাবস্থায়

আমাদের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।

প্রেস সচিব যখন বঙ্গবন্ধুর কক্ষে কথা বলতে গেছেন, ঠিক তখনই তাঁর ঘরের টেলিফোন বাজল। রাত ৯টা হবে। ফোন ধরে বুঝতে পারলাম তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দীন ঠাকুর। তিনি বললেন, এত রাতে কী করছ ওখানে?

বললাম, অফিসের কাজ করছি। আগামীকাল বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন, তাঁর বক্তৃতা তৈরি করছি।

তোয়াব সাহেব কোথায়?

তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গেছেন তাঁর অফিস ঘরে।

ওখানে কেন?

রেড টেলিফোনে কথা বলছেন। বললাম, তুমি একটু লাইনে থাক। আমি তোয়াব ভাইকে ডাকছি।

না, দরকার নেই। তাহেরউদ্দীন ঠাকুর ফোন ছেড়ে দিলেন।

প্রেস সচিব ঘরে ফিরলে আমি তাকে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর ফোনের কথা বললাম। তিনি বললেন, প্রয়োজন হলে তিনি আবার ফোন করবেন।

আমি নিজের অফিসে এলাম। ঘড়িতে প্রায় রাত সাড়ে ৯টা। লেখায় আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি। এরই মধ্যে ডিএফআই-এর নব নিযুক্ত চীফ কর্নেল জামিল আমার ঘরে এলেন। বললেন, আপনারা পেয়েছেন কী? সবাই খাবার সামনে নিয়ে আপনাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। ওদিকে তোয়াব সাহেব কি নিয়ে ব্যস্ত, এদিকে আপনিও লেখায় ব্যস্ত।

বললাম, জামিল ভাই, আপনি যান। আমি এখনই আসছি।

কর্নেল জামিল চলে গেলেন। সত্যি অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব ফরাসউদ্দীনের বিদেশ যাত্রা উপলক্ষে বিদায়ী নৈশভোজ। তাড়াতাড়ি কাগজপত্র ঠেলে রেখে উঠে পড়লাম। নৈশভোজে গিয়ে আমি বসলাম কর্নেল জামিলের পাশে। খেতে খেতে তাঁর সঙ্গে গল্প করলাম।

রাত ১১টার পর অফিস ছেড়েছি। গাড়িতে যাচ্ছি শেরে বাংলা নগরস্থ গণভবন থেকে বঙ্গভবন। এয়ারপোর্ট রোডে গাড়ি আসতেই দেখলাম দুটো বড় গাড়িতে ঠাসাঠাসি করে বিদেশীরা শাহবাগের দিকে যাচ্ছে। দুটো গাড়িতেই নম্বরের পূর্বে বাংলায় 'অ' লেখা। সম্ভবত আমেরিকানদের গাড়ি। কিন্তু এত রাতে এতগুলো লোক ঠাসাঠাসি করে যাচ্ছে কোথায়? হয়ত এরা বিদেশী সাংবাদিক, গাড়ি করে ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠী দেখতে বেরিয়েছে। আমার মনে মনে চিন্তা হলো বিদেশীদের রাতের বেলা এ রকম চলাচল তাঁদেরই নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাতে পারে। কথাটা আগামীকাল গণভবনে গিয়ে বলতে হবে।

গাড়ি দুটো বাঁ দিকে ঘুরে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের দিকে চলে গেল।

> আমি শাহবাগের মোড় হয়ে বঙ্গভবনে ফিরে এলাম।
>
> বাসায় এসেও কাজের কমতি নেই আমার। বঙ্গবন্ধুর একটি নিজস্ব টেপরেকর্ডার আছে। সেটি আমার কাছে থাকে। তিনি কোথাও বক্তৃতা দিলে ওটাতে টেপ করে সভা থেকে ফিরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শোনাই। কোন জায়গায় কোন কথা বাদ দিতে হলে তিনি বলে দেন। আমরা সম্পাদিত অংশটুকু সম্পর্কে প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দেই। সব স্থানেই বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আগে টেপ রেকর্ডারটা ঠিক আছে কি না চেক করি আমি। প্রতিবারই নতুন নতুন ব্যাটারী ভরে নিই আজ দুপুরে নতুন ব্যাটারী কিনেছি। সেগুলো ভরে নিয়ে টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দেখলাম সব ঠিক আছে।
>
> আবার বসলাম বক্তৃতার খসড়া নিয়ে। তিনটা পাতা লিখতে গিয়ে কাটাকাটি হয়েছিল। ওই অবস্থায় বঙ্গবন্ধুকে দেয়া যায় না। ওগুলো ভালো করে পুনরায় কপি করলাম। রাত প্রায় দেড়টায় আমার কাজ শেষ হলো।[১৪]

মাহবুব তালুকদারের বর্ণনায় জানা যায়, ১৪ আগস্ট গণভবনে সবাই মিলে অনেক রাত পর্যন্ত খানাপিনা ও গল্পে মশগুল ছিলেন . বঙ্গবন্ধু সেখানে ছিলেন না। রাত ৯টায় ফোন করে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর নিশ্চিত হয়েছিলেন যে রাষ্ট্রপতি তাঁর বাসায় আছেন। গণভবনে বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন কর্মকর্তারা যখন নির্ভার সময় কাটাচ্ছেন, তার কয়েক কিলোমিটার দূরে কুর্মিটোলায় সেনাবাহিনীর এক মেজর তার সৈন্যদের নিয়ে একটা অভিযানের ছক সাজাচ্ছেন।

১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন, এ জন্য যুবলীগের পক্ষ থেকে 'শোডাউনের' পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ওই দিন পরিস্থিতি একটু উত্তপ্ত হতে পারে, এ ধরনের একটা শঙ্কা কাজ করেছিল কারও কারও মধ্যে। যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা কাজী ফিরোজ রশীদ এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, শাহবাগ থেকে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পুবদিকের রাস্তাটি তারা সতর্ক পাহারায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ফিরোজ রশীদের নিজের বয়ান হলো :

> সেদিন ছিল ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ সাল। বাকশালের আদলে যুবলীগ কমিটি নতুনভাবে গঠন করতে সারাদিন মণি ভাই ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে ঢাকা শহর যুবলীগের নেতারা এসে অফিসে ভীড় করেছে। টানটান উত্তেজনা। কারণ এদিন দুপুরের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে তিনটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। যুবলীগ কর্মীদের ধারণা এটা 'জাসদ' করেছে। কারণ পরের দিন বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা। বঙ্গবন্ধু যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে না যান সে জন্য জাসদ বোমাবাজী করেছে। তাই যুবলীগ কর্মীরা খুবই উত্তেজিত।... আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর বাসায় গেলাম। তখন রাত ১১:৩০ মিনিট। আবদুর রাজ্জাক ভাই ও আদমজির মান্নান ভাই আমাদের

সঙ্গে যোগ হলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে অনেক ব্যাপারে মণি ভাই খোলামেলা আলোচনা করলেন।... বঙ্গবন্ধু মণি ভাইকে নির্দেশ দিলেন, যুবলীগ কর্মীরা যেন শান্ত থাকে।[১৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলারের শুভাগমন উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র

শেখ মুজিবের আগমন উপলক্ষে ১৫ আগস্ট *দৈনিক বাংলায়* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আট পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্র ছাপা হয়েছিল

৫

বেঙ্গল ল্যান্সার্সের নিয়মিত প্রশিক্ষণ-মহড়া হয় মাসে দুবার, বৃহস্পতিবার রাতে। ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ ছিল বৃহস্পতিবার। ওই রাতের একটি বিবরণ পাওয়া যায় এন্থনি ম্যাসকারেনহাসের ভাষ্যে। রাত ১০টায় ফারুক ও রশিদ অসমাপ্ত কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের টারমাকে গেলেন। রাত ১১টায় উপস্থিত হলেন মেজর শরিফুল হক ডালিম, মেজর আজিজ পাশা এবং ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা। ডালিম এবং পাশা সেনাবাহিনী থেকে আগেই অপসারিত হয়েছিলেন। ফারুক ও রশিদের বাহিনীর সদস্যদের মধ্য থেকে ৭৫ থেকে ১৫০ জনের তিনটি দল তৈরি করা হলো। একটি দল নিয়ে ডালিম গেলেন ইস্কাটনে আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়ির উদ্দেশে। একটি দলকে নিয়ে রিসালদার মুসলেহউদ্দিন গেলেন ধানমন্ডিতে শেখ ফজলুল হক মণির বাড়ির দিকে। মেজর মহিউদ্দিন ও সাবেক মেজর নূর চৌধুরীর নেতৃত্বে ১২০ জনের তৃতীয় দলটি গেল ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে শেখ মুজিবের বড়ির দিকে। ফারুক ট্যাংকের বহর নিয়ে ভোর চারটা ৪০ মিনিটে রওনা হলেন শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরের দিকে। মাত্র দুটো ট্যাংক নিয়ে তিনি পৌছালেন শেরেবাংলা নগরে। ট্যাংকে কোনো গোলা ছিল না। ভোর সোয়া পাঁচটায় ঢাকার তিনটি বাড়ির মানুষেরা আক্রান্ত হন। ভোর পাঁচটা ৪০ মিনিটে শেখ মুজিবের বুক ঝাঁঝরা করে দেয় ঘাতকের বুলেট। নিহত হন তাঁর পরিবারের সবাই, যাঁরা ওই দিন ওই বাড়িতে ছিলেন। ডালিম বেতারে ঘোষণা দেন, 'আমি মেজর ডালিম বলছি। খন্দকার মোশতাকের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বীর সশস্ত্র বাহিনী দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। স্বৈরাচারের পতন হয়েছে।' রশিদ বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের বাসায় যান এবং তাঁকে শাহবাগে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। মোশতাককে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে বেতারে ঘোষণা দেওয়া হয়।[১৬]

১৪ আগস্ট রাতে লেখক আহমদ ছফা সোবহানবাগের কাছে ম্যানেজমেন্ট সেন্টারের হোস্টেলে তাঁর বন্ধু সিরাজউদ্দৌলা চৌধুরীর আশ্রয়ে ছিলেন। ১৫ আগস্ট দুপুরে পথে বের হওয়া নিরাপদ মনে হলে তিনি হেঁটে হেঁটে মোহাম্মদপুরে ড. আখলাকুর রহমানের বাড়িতে যান। ড. আখলাখ ছিলেন জাসদের তাত্ত্বিক এবং এর সর্বোচ্চ ফোরামের সদস্য। বাড়িটি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছিল। ড. আখলাক বেরিয়ে এসে ছফাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। ওখানে অবস্থানকালে ছফা তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> ওখানেও দেখি সামরিক বাহিনীর লোকে ভর্তি, ওই পনেরই আগস্ট তারিখেই

ড. আখলাখের বাড়িতে। ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটেন, একজন প্রত্যয়দীপ্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আখলাক সাহেব আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম কর্নেল আবু তাহের। সেই কর্নেল তাহেরের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তারপরে আর কোনদিনই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। দু-একদিন পরে ড. আখলাককে মিসেস আখলাকের সঙ্গে বলাবলি করতে শুনেছি, সামরিক বাহিনীর লোকেরা তাঁকে দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। আখলাক সাহেব রাজি হননি।[১৭]

ড. আখলাকুর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা গণবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা ছিলেন সবাই 'ফুট সোলজার'। তাঁদের যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হতো, তাঁরা তা তামিল করতেন। ১৫ আগস্ট সকালে হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে তাঁরা হকচকিত হয়ে পড়েন। মোশতাক আহমেদের বর্ণনা থেকে জানা যায় :

> মুহসীন হলে গণবাহিনীর আমি, নূর মোহাম্মদ, ফখরুল, বাছেত, তাজুল ভাই এই রকম ছয়জন ছিলাম। বেলা দশটা-টশটার দিকে হবে, আমরা রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের সামনে দিয়া হাঁটতেছি। আমরা তো ফার্স্ট ইয়ারের। দুইজন

সেকেন্ড ইয়ারের। কী হইছে বুঝতেছি না। আমাদের সাথে কেউ যোগাযোগ করতেছে না। এইটুকু আমরা বুঝছি যে খারাপ কিছু। হলে আইসা এক রুমে আমরা শুইয়া রইছি। কখন কী অর্ডার আসে। তখন এমন ছিল, বলার সাথে সাথে নাইমা যাইতাম।

আবু আলম ভাই আমাদের সাথে শুরুতে ছিলেন, ইউনিভার্সিটির কমান্ডে। আবু আলম সাসপেন্ড, অব্যাহতি আর কি। ১৫ আগস্টের সময় আমি কমান্ডার। আমি ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে। অন্যরা সিনিয়ার। আনোয়ার ভাই এমনভাবে দায়িত্ব দিছে, সিনিয়ার-জুনিয়ার না বুইঝাই। পরে আনোয়ার ভাই দুইটা-আড়াইটার দিকে যোগাযোগ করছে। বাচ্চুরে দিয়া ইনফরমেশন পাঠাইছে একটা চিঠি দিয়া। (মীর নজরুল ইসলাম বাচ্চু ২৬ নভেম্বর ১৯৭৫ ভারতীয় হাইকমিশনে একটা অভিযান চালানোর সময় নিহত হন।) অবাস্তব চিঠি। লেখছে যে, 'অবস্থা ভালো, সব রকম চেষ্টা চলছে। স্বর্ণ এবং অস্ত্র জোগাড়ের চেষ্টা কর।' মানে এগুলা কোথাও থিকা পাইলে নিয়া নাও। সেন্সটা এই, এলিফেন্ট রোডে যোগাযোগ করতে বলল।

এলিফেন্ট রোডে গেলাম যাইয়া দেখি যে, ইউসুফ ভাইয়ের (কর্নেল তাহেরের বড় ভাই বিমানবাহিনীর সাবেক সার্জেন্ট আবু ইউসুফ) বাসায় এক জিপ আর্মি। এখানে আর্মি ঢুকে কেন? আমি ব্যাক কইরা মেইন রোডের দিকে চইলা আসতেছি। বাহার বাসা থিকা দৌড়ায়া আইসা আমারে জড়ায়া ধরল। আর্মিদের সামনেই নিয়া গেল। ভিতরে বসলাম। দেখলাম আনোয়ার ভাই আসল। আর্মিও কয়েকজন বসা। আমি তো বুইঝা উঠতে পারতেছি না, আর্মি এখানে কেন? তখন আনোয়ার ভাই বলল যে, সব জায়গায় যাইয়া খবর দাও। আমি বললাম, সব জায়গায় মুভ করতে করতে তো সন্ধ্যা হইয়া যাবে? পাঁচটা থেকে তো কারফিউ? কী করি? মিলিটারিরা বলল, স্যার একটা চিঠি লেইখা দিবে। স্যার মানে কর্নেল তাহের। তাহের ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই, আনোয়ার ভাই বলল যে, ধরা পড়লে বলবা কর্নেল তাহেরের লোক। উনি মিলিটারিদের সামনেই আমাদের সাথে কথা বলছে।[১৮]

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে খন্দকার মোশতাকের যোগাযোগের মাত্রা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। তিনি কি আগে থেকেই সব জানতেন? তিনি কি এই পরিকল্পনার অংশ ছিলেন? তার আগামসি লেনের বাড়ির উল্টোদিকের বাড়িতে থাকতেন ফজলুল হক খান মনা। ১৫ আগস্ট সকালে মোশতাক ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনার ছোট ভাই নাসির খান ধিলেনের বিবরণ কৌতূহল জাগায় :

(মোশতাকের প্রশ্ন) 'রাজু (ধিলেনের ভগ্নিপতি), কাজটা কেমন হইল'?

মোশতাক সাব গেঞ্জি, স্যান্ডেল, লুঙ্গি পরা। 'তোমরা সব চইলা যাও।' সামনে যুবলীগের (স্থানীয়) প্রেসিডেন্ট বসা মর্নিং ওয়াক করতে যাবেন। ভোরবেলা তো? মোশতাক দশ মিনিটের মতো ছিল। আসছিল ফোন করতে নিজের বাড়ি থিকা ফোন করব ক্যান? ওর (মনার) বাড়ি থিকা কবব। কোন জায়গায় ফোন করছে এইটা আমি জানি না। শেভ-শুভ কইরা বাইর হইছে। মোশতাক সাব যে প্রেসিডেন্ট হইছে এইটা আমি জানতাম না। লোকজন কইল, মোশতাক সাব তো প্রেসিডেন্ট! আরে শালা, এইটা ক্যামনে হয়? আর্মি-টার্মি আইসা স্যালুট দিয়া নিয়া গেল, সাড়ে সাতটা-পৌনে আটটার সময়।[১৯]

মেজর ডালিমের বেতার ঘোষণার কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা শাহবাগের বেতার ভবনে আসেন। তাঁরা এসেছিলেন পরিবর্তনের পক্ষে অভিনন্দন ও সমর্থন জানাতে. এদের মধ্যে ছিলেন আবু তাহের, আকবর হোসেন, শাজাহান ওমর, জিয়াউদ্দিন, রহমতউল্লাহ এবং মাজেদ।[২০]

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার বিভাগের পরিচালক লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের ভোর পাঁচটায় তাঁর বাবুর্চি মোতালেবকে আদেশ দেন গাড়িচালক গিয়াসউদ্দিনকে তাঁর নারায়ণগঞ্জের বাসায় ডেকে আনতে। গিয়াসউদ্দিন আসার পর নারায়ণগঞ্জে ডিসি অফিসসংলগ্ন একটি সেনা ক্যাম্প থেকে সেনাবাহিনীর গাড়ি ও লোকজন নিয়ে তাহের ঢাকা রওনা হন। পথে পুরান ঢাকার একটা বাড়ি থেকে তাঁর সহকর্মী হাসানুল হক ইনুকে সঙ্গে নেন। বেতার কেন্দ্রে আসার পর মেজর ডালিম ছুটে এসে তাঁকে সালাম করেন এবং বেতারে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। তাহের তাঁর গাড়িচালক গিয়াসউদ্দিনকে একদল সৈন্যসহ একটি সামরিক জিপে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে পাঠিয়েছিলেন পরিস্থিতি দেখে আসার জন্য। শেখ মুজিবের বাড়ির ভেতরে ঢুকে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে—চারদিকে শুধু রক্ত।[২১]

ডালিমের ভাষ্য অনুযায়ী, বামপন্থী অনেক রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে জাসদ চাচ্ছিল একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করে তাদের দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে। কিন্তু অভ্যুত্থানকারীরা তাতে সায় দেয়নি।[২২] ১৫ আগস্ট সকালে আবু তাহের নিজেই খন্দকার মোশতাক আহমদকে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ছিল অবিলম্বে সামরিক আইন জারি করা, সংবিধান বাতিল করা, রাজবন্দিদের মুক্তি দেওয়া এবং বাকশালকে বাদ দিয়ে একটি সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠন করা।[২৩] বাকশাল নেতাদের সমন্বয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মোশতাকের নেতৃত্বে সরকার গঠনের কৌশলটি কাজে দিয়েছিল।

অভ্যুত্থানকারীদের আশঙ্কা ছিল, তাঁরা বাইরে থাকলে কেউ কেউ ভারতে গিয়ে আবার একটি 'প্রবাসী সরকার' গঠন করতে পারেন এবং ভারত হস্তক্ষেপ করার একটি সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।

সেনাবাহিনীর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ মারুফ রশীদ ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি থেকে কমিশন পান। ১৫ আগস্ট রাতের ট্রেনে ছুটিতে সিলেটে তাঁর বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। ১৪ তারিখ রাতে ঢাকার মগবাজারে দিলু রোডে তাঁর বন্ধু ফাইসন্সের কর্মকর্তা আবদুল মুনিম ফারুকের ভাড়াবাড়িতে তিনি তাস খেলছিলেন. সঙ্গে আরও ছিলেন ব্যবসায়ী ইফতেখার হোসেন শামীম, ফাইসন্সের কর্মকর্তা আবদুর রহমান এবং সিলেটের জাসদ নেতা শওকত। তাঁরা প্রায়ই এ রকম আড্ডা দিতেন। মারুফ রশীদ ওই রাতের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> আমরা সারা রাত তাস খেলি। হঠাৎ গোলাগুলির আওয়াজ। ভাবলাম, বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটিতে যাবেন, ছেলেরা হয়তো আনন্দে পটকা ফাটাচ্ছে। পরে জেনেছিলাম ইস্কাটনে মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় গুলি চলেছিল। মুনিম ফারুকের সকাল সকাল অফিসে যাওয়ার কথা তখনো গাড়ি আসেনি দেখে সে মেইন রোডে গেল গাড়ির খোঁজে। রাস্তার ধারে লোকজন রেডিও শুনছে। খবরটা শুনে বাসায় ফিরে মুনিম বলল, 'ঘরে থাকেন।' আমি আইডি কার্ডটা পকেটে নিয়ে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ভেতরে গিয়ে দেখি বিদেশি কয়েকজন সুইমিংপুলে সাঁতার কাটছে। বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে এসে দেখলাম ট্যাংক যাচ্ছে রেডিও স্টেশনের দিকে। আমি এগোলাম। ওখানে সেকেন্ড লেফট্যানেন্ট কিসমত হাশেম এবং আনসারকে দেখলাম। মেজর শাহরিয়ার রশিদ সিভিল ড্রেসে কাঁধে স্টেনগান ঝুলিয়ে হাঁটাহাঁটি করছেন। আমাকে দেখেই ধমকে উঠলেন, 'সিভিল ড্রেসে কেন, ইউনিফর্ম পরে আসো।' উনি বিএমএতে ফিজিক্যাল ট্রেনিং স্টাফ অফিসার ছিলেন, আমাকে চিনতেন। ভেবেছিলেন আমি তাঁদের গ্রুপেরই লোক।
>
> আমি ভেতরে ঢুকতেই করিডরে দেখলাম খন্দকার মোশতাক। আমাকে দেখেই বললেন, 'ওয়েল ডান মাই বয়।' তিনিও ভেবেছিলেন, আমি এই দলেরই একজন।
>
> সেনাবাহিনীর লোকদের নাশতা নিয়ে সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারির একটা ট্রাক এল। পুরি আর এক মগ চা খেলাম। একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছি, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামান বললেন, 'কী, ক্যাপস্টেন খাও?' এই বলে একটা বেনসন দিলেন। ওনার বাবা সিলেটে জেইলার ছিলেন, ভালো পরিচয় আছে।

ওই সময় কর্নেল আবদুর রহমান ও মেজর মাসুদ জহির একটা গাড়িতে ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছিলেন। আমি ওদের সঙ্গে গেলাম। আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে নেমে হাঁটতে হাঁটতে সিগন্যাল মেসে এলাম। ইউনিফর্ম পরে নিলাম। মেজর ফজলুল হকের ভেসপা ছিল। ওটা নিয়ে আমরা আবার গেলাম রেডিও স্টেশনের দিকে। পৌঁছাতেই দেখি একটা গাড়ি থেকে কর্নেল তাহের নামছেন। ফজলুল হকের শার্টে প্যারাট্রুপারের ব্যাজ ছিল। কর্নেল তাহের তা লক্ষ করে বললেন, 'তুমি কখন প্যারা করেছ?' ফজলুল হক জবাবে বললেন, 'স্যার, আপনি যখন ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন।' 'গুড, গুড', বলে তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

ভেতরে গিয়ে করিডর দিয়ে হাঁটছি একটা বন্ধ দরজা, দরজায় গোল গ্লাস, ভেতরটা এক ঝলক দেখলাম। খন্দকার মোশতাক বসে আছেন। তাঁর পাশে দাঁড়ানো সফিউল্লাহ, জিয়া ও খালেদ মোশাররফ। খালেদ কনুই দিয়ে জিয়াকে একটা গুঁতো দিলেন। তাঁর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হলো, বলছেন, 'দেখো দেখো, সফিউল্লাহ কেমন কাঁদছে।' সফিউল্লাহ আসলেই কান্না কান্না ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সিগন্যাল মেসে ফিরে নাশতা করে অফিসে গেলাম আমার সিও ছিলেন লে. কর্নেল বাহার. তিনি মিটিং ডাকলেন। অপারেশনাল অর্ডার দিলেন, এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে টিঅ্যান্ডটি সিকিউর করতে মেজর মুসাকে পাঠালেন রমনা এক্সচেঞ্জে থার্ড গেটের (জাহাঙ্গীর গেট) সামনে দেখলাম রাস্তার ওপর দাঁড়ানো সানগ্লাস চোখে মেজর ফারুক, প্যান্টের পকেটে দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন বীরের মতো। জেড ফোর্সের লোকেরা আর রিপ্যাট্রিয়েটরা খুব ফুর্তিতে ছিল।[২৪]

১৫ আগস্ট যখন অভ্যুত্থান ঘটে, তখন ঢাকা সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার ছিলেন লে. কর্নেল এম এ হামিদ। সেনা অভ্যুত্থান নিয়ে লেখা একটি বইয়ে তিনি কিছু পর্যালোচনামূলক মন্তব্য করেছেন। এসব মন্তব্যে তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকা সেনা কর্মকর্তাদের ভূমিকা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন :

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসারদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না। একমাত্র শেখ সাহেবই সেনা অফিসারদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রাখতেন। অন্যরা এড়িয়ে চলতেন। অপর দিকে সেনাবাহিনীর তরুণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররাও আওয়ামী লীগ নেতাদের পছন্দ করত না। কারণ, তারা মনে করত দেশের মুক্তির জন্য তারা যখন যুদ্ধ করেছে, তখন এসব রাজনৈতিক নেতা, পাতিনেতারা কলকাতায় বসে ফুর্তি করেছে। এ ধরনের মানসিকতা যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার এতই অধঃপতন ঘটে যে সর্বস্তরের মানুষ তখন একটা

পরিবর্তন কামনা করছিল। অতঃপর সেই পরিবর্তন যখন হলো, তখন তা রক্তাক্ত হলেও সবাই যেন এটাকে বরণ করে নিল।...

ফারুক-রশীদের অভ্যুত্থান স্রেফ দুটি ইউনিটের 'একক' দুঃসাহসিক অভিযান মনে করা হলেও, তাঁদের পেছনে বড় র‍্যাংকের কিছু অফিসার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদ জুগিয়েছিলেন। ৪৬ ব্রিগেডের নিষ্ক্রিয়তাই এর একটি দৃষ্টান্ত। ফারুক-রশীদ অভ্যুত্থান ঘটানোর মতো কিছু একটা ঘটনা ঘটাতে পারে, এ রকম অস্পষ্ট ইনফরমেশন আলাদা আলাদাভাবে জিয়া, খালেদ, শাফায়েত, রউফের কমবেশি গোচরীভূত ছিল। তাঁরা খুব সম্ভব চেপে যান এই মতলবে যে, পাগলদের প্ল্যান যদি সত্যিই সাকসেসফুল হয়ে যায়, তাহলে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করার সহজ সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে তাঁরা যেন অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে না থাকেন।[২৫]

শেখ মুজিবকে নিয়ে দলের মধ্যে যে মাতামাতি ছিল, আগস্ট অভ্যুত্থানের পর নিমেষে তা উধাও হলো। সবকিছু যেন আমূল পাল্টে গেল। যাঁরা এতদিন তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ গর্তে লুকালেন, কেউ খুশিতে ডগমগ হলেন, কেউ-বা নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন। এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে পঞ্চাশের দশকে ইরাকের সামরিক অভ্যুত্থানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদাল করিম কাসেম রাজা ফয়সলকে ১৯৫৮ সালের ১৪ জুলাই ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। রাজা, তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মা এবং খালাকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। অথচ এর কয়েক সপ্তাহ আগে রাজা যখন কারবালায় ইমাম হুসেনের সমাধি দেখতে গিয়েছিলেন, তখন পথে জনতার ঢল নেমেছিল তাঁকে একনজর দেখতে। মানুষের ভিড়ে রাজার গাড়ি এগোতে পারছিল না। জনতা তখন গাড়িটি হাত দিয়ে তুলে সমাধির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তবে ইরাকে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম না। ইমাম হুসেন যখন বাগদাদের পাশ দিয়ে কারবালার দিকে যাচ্ছিলেন, তখনও বাগদাদের সব মানুষ ইমামের সমর্থনে পথে নেমে এসেছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন। নামাজ শেষে দেখা গেল, বাগদাদের মানুষের মন বদলে গেছে। তারা সবাই চলে গেছে। এটা ইরাকে প্রচলিত একটি লোকগাথা। কিন্তু এই কাহিনী একটি বার্তা দেয়।[২৬]

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত ছিলেন, তারা প্রায় সবাই ছিলেন 'মুক্তিযোদ্ধা'। তাদের অন্যতম মেজর ডালিম মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য 'বীরউত্তম' খেতাব পেয়েছিলেন। মেজর নূর পেয়েছিলেন 'বীরবিক্রম' খেতাব।

শেখ মুজিব অনেককেই নেতা বানিয়েছিলেন। কিন্তু বিপদের সময় তাঁরা কেউ

কাজে আসেননি। তাঁর অবর্তমানে সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অক্ষম আহাজারি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক সরোয়ার হোসেন মোল্লা ১৫ আগস্টে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> জেনারেল সফিউল্লাহর কাছে আমরা অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলাম. সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে উনি কী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন এবং আমাদের কী করা উচিত সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দিতে পারেন কি না। উত্তরে সফিউল্লাহ বললেন, 'আমি কর্নেল শাফায়াত জামিলকে পাচ্ছি না।'... আমি একটু পরে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।' পরে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি।
>
> যাহোক, এরপর আমরা টেলিফোন করলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে ... বললাম, স্যার, বঙ্গবন্ধু আর নেই। এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। আপনি এখন রাষ্ট্রের অস্থায়ী প্রধান এই অবস্থায় আমাদের জন্য আপনার কী নির্দেশ?... তিনি বললেন, আমি একটু জেনারেল সফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বলে আপনাদের জানাব। আমি বললাম, স্যার আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। জেনারেল সফিউল্লাহ কোনো কিছু করবেন কিংবা করতে পারবেন বলে আমাদের মনে হয় না ঠিক আছে, আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাঁর কাছ থেকে কোনো উত্তর না আসায় বন্ধু আনোয়ারুল আলম শহীদ (উপপরিচালক) তাঁকে পুনরায় টেলিফোন করে তাঁর সিদ্ধান্ত জানতে চায় এবং এ-ও বলে, সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, আমি একটু মনসুর আলী সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিই। ইত্যবসরে আমরাও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবের কাছে টেলিফোন করলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে যে কথা বলেছিলাম, ওনাকেও একই কথা বললাম এবং আমাদের প্রতি কী নির্দেশনা আছে জানতে চাইলাম। উনি বললেন, আমি সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে আপনাদের জানাচ্ছি এর পরে আবার সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে টেলিফোন করা হলো। এবারও টেলিফোন করল বন্ধুবর আনোয়ারুল আলম শহীদ তিনি শহীদকেও একই কথা বললেন, আমি তো সফিউল্লাহকে পাচ্ছি না। কিছুক্ষণ পরে আমরা আবার ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবের কাছে টেলিফোন করলাম তখন তিনি আর টেলিফোন ধরলেন না। অন্য একজন টেলিফোন ধরে বললেন, তিনি বাসায় নেই। টেলিফোন রেখে দিলাম. এ অবস্থায় আমাদের বুঝতে কষ্ট হলো না যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে হয়তো কোনো সিদ্ধান্ত আসবে না।...
>
> আনুমানিক সকাল ১০টা কিংবা সাড়ে ১০টার দিকে আমরা রাজ্জাক ভাইয়ের বাসায় টেলিফোন করি। সেখান থেকে জানানো হলো তিনি বাসায়

নেই। তারপর তোফায়েল ভাইয়ের বাসায় টেলিফোন করলাম। হঠাৎ দেখি উনি টেলিফোন ধরেছেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখনো বাসায় আছেন, কারণটা কী? তিনি বললেন, কী করব বুঝতে পারছি না। তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে পার তোমাদের ওখানে? আমরা একজন অফিসারের নেতৃত্বে কয়েকজন রক্ষীসহ একটি ট্রাক তোফায়েল ভাইয়ের বাসায় পাঠিয়ে তাঁকে সদর দপ্তরে নিয়ে আসি।[২৭]

ওই সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল ইসলাম চৌধুরী। সরকারপ্রধান ছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত এযাবৎকালে দেশের একমাত্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু ২৬ মে ১৯৭৫ তাঁকে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বলা চলে, তিনিই ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রশাসনিক অভিভাবক। ১৫ আগস্ট দিনটি তাঁর কেটেছিল উদ্বেগ আর হতাশায়। এক সাক্ষাৎকারে ওই দিনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন তিনি :

তখনো পুরোপুরি ভোর হয়নি। আমার স্ত্রী গোলাগুলির শব্দ শুনে আমাকে জাগিয়ে দিলেন। বললেন, কী যেন ঘটেছে। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে আমি একটু স্বাভাবিক হয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলাম কিসের শব্দ, কোন দিক থেকে আসছে। এমন সময় ফোন বেজে ওঠে। আমি চমকে উঠি! ফোন উঠিয়েই ওপারে শুনতে পেলাম উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের কণ্ঠস্বর। আমাকে বরাবর চৌধুরী সাহেব বলে ডাকতেন তিনি। উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'চৌধুরী সাহেব, বঙ্গবন্ধুর বাসায় কী হয়েছে? আপনি জানেন কিছু?' আমি বললাম, 'না।' 'বঙ্গবন্ধুকে নাকি হত্যা করা হয়েছে! আপনি আপনার বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত জানান।' এ কথা বলেই ফোন রেখে দিলেন তিনি।

আমি দ্রুত লাল টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোন করলাম। টেলিফোনের শব্দ হচ্ছে কিন্তু ফোন ধরছে না কেউ। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে সামরিক বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আমার ছিল সরাসরি যোগাযোগের বিশেষ টেলিফোন। আমি সেই টেলিফোনে প্রথম সেনাবাহিনী প্রধান সফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বললাম। টেলিফোন ধরেই জেনারেল সফিউল্লাহ বললেন, 'স্যার, সর্বনাশ হয়ে গেছে! সামরিক বাহিনীর কিছু বিদ্রোহী সদস্য বঙ্গবন্ধুর বাসায় ট্যাঙ্ক নিয়ে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেছে। বঙ্গবন্ধু আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, কিন্তু কিছু করার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।' আমি বললাম, 'আপনি অন্যান্য বাহিনীপ্রধানকে নিয়ে কী করছেন? আপনি কি বিদ্রোহ নির্মূল করবেন না? বিদ্রোহ নির্মূল করুন।'

সফিউল্লাহ আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আধঘণ্টার মধ্যেই বিদ্রোহ নির্মূল করব। অন্য দুই বাহিনীর প্রধানের সঙ্গেও আলোচনা করেছি।'

জেনারেল সফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বলার পর উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমি ফোনে কথা বলি। আমি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'স্যার, চিন্তা করবেন না, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহ নির্মূল হয়ে যাবে।' এর পরপরই আমি যোগাযোগ করি মন্ত্রী আবদুল মোমেন সাহেবের সঙ্গে। আমার আশ্বাসবাণী শুনে তিনি বললেন, 'কোথায় আছেন, আপনার বাহিনীর প্রধানগণ খুনিদের দ্বারা মনোনীত প্রেসিডেন্ট মোশতাকের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেছে!'

আমি তেমন রেডিও শুনতাম না। সেদিনও আমার শোনা হয়নি। মোমেন সাহেবের কথায় সন্দেহ হওয়ায় আমি সামরিক দপ্তরে যোগাযোগ করি। আমার কথা হয় ডিজিএফআই (সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ) প্রধান ব্রিগেডিয়ার রউফ ও চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সঙ্গে। তারা আমাকে বললেন, খুনিরা ডালিমের নেতৃত্বে এসে চিফকে নিয়ে গেছে। সফিউল্লাহ সাহেব প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু জেনারেল জিয়া ও অন্য আরো দু-একজনের পরামর্শে তিনি অন্য প্রধানগণের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। জেনারেল জিয়া নাকি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু যখন নেই তখন দুঃখ করে কী হবে। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আমাদের যাওয়াই উচিত। এ কথা শোনার পর আমি রেডিও খুলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের মোশতাক সরকারের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা শুনতে পাই। আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়ি!

এসব খবর জানার পর আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করি। বের হতে গিয়ে দেখি বাইরের গেট বন্ধ। সেনাবাহিনীর যারা আমার নিরাপত্তার জন্য বাসায় মোতায়েন ছিল, তারা আমাকে বলল, ক্ষমা করবেন স্যার, এ বাসার কাউকে বের হতে দিলে শেখ সাহেবের মতো আমাদের পরিণতি ঘটবে।' এ ঘটনায় আমি ও আমার পরিবারের লোকজন ভয় পেয়ে মানসিকভাবে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। সারা দিন আর বাসা থেকে বের হতে পারিনি। আতঙ্কে ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে সারা দিন অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়। এমনকি সাংসারিক বাজার করার জন্য কাজের লোককেও বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে আমি বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়েছি লাল টেলিফোনের মাধ্যমে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার লাল টেলিফোন ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের বিশেষ টেলিফোন লাইনটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। তবে নিচতলায় আমার বাসার অফিসের সাধারণ টেলিফোন লাইনটি চালু ছিল।

১৫ আগস্ট বিকেলে আমি ভীত আর চিন্তিত হয়ে বসে আছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। এমন সময় সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য আমার বাসা ঘেরাও করে। ভেতরে প্রবেশ করে আমার খোঁজখবর নিতে নিতে তারা দোতলার দিকে উঠতে থাকে। আমি সিঁড়িতেই তাদের মুখোমুখি হই আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আমাকে নিচে আসতে বাধা দিচ্ছিল। আমি তাদের বললাম, কোনো লাভ নেই, এতে সবার জীবন বিপন্ন হতে পারে আমি সিঁড়ির নিচের দিকে সৈন্যদের পাশাপাশি বেসামরিক পোশাকে একজনকে দেখতে পেলাম আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'স্যার, ভয় নাই, নিচে নেমে আসুন, কথা আছে।' নিচে নেমে আসতেই তিনি আমাকে বললেন, 'আপনাকে বঙ্গভবনে যেতে হবে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন? তিনি বললেন, 'সামরিক বাহিনী ও প্রেসিডেন্টের নির্দেশ।' তিনি আমাকে একটি তালিকা দেখিয়ে কয়েকজন মন্ত্রীর নাম দেখালেন, যাদের সবাইকে তিনি বঙ্গভবনে নিয়ে যাবেন তখন আমার পরনে ছিল লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি বেসামরিক পোশাকধারী লোকটির সঙ্গে যখন আমি কথা বলছিলাম তখন সৈন্যরা আমাকে ঘিরে ছিল আমি পোশাক পাল্টানোর কথা বলতেই তিনি সামরিক বাহিনীর লোকজনের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার কথা বললেন। দুজন সৈন্যসহ তারা আমাকে ওপরে যাওয়ার অনুমতি দিল। দুজন সৈন্য আমার সঙ্গে শোবার ঘর পর্যন্ত গেল আমি লুঙ্গি বদলে একটি পায়জামা পরে নিলাম ততক্ষণে বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গেছে বেসামরিক কর্মকর্তা আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আপনার কোনো ক্ষতি করা হবে না। বঙ্গভবন থেকে আবার ফিরে আসতে পারবেন '

তালিকা অনুযায়ী যাদের বঙ্গভবনে নিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে তাদের মধ্যে সোহরাব সাহেব ও আলতাফ হোসেন ছিলেন। আমাকে সঙ্গে নিয়েই সেনাবাহিনীর গাড়ি এ দুজনের বাসায় গেল। কিন্তু তাদের দুজনের কাউকেই বাসায় পাওয়া গেল না। এরপর আমরা গেলাম অধ্যাপক ইউসুফ আলীর বাসায় আমি গাড়িতে বসে। কিছুক্ষণ পর ইউসুফ আলীকে নিয়ে আসা হলো। তখন তিনি আমাকে গাড়িতে দেখে বললেন, 'চৌধুরী সাহেব, ফিরে আসতে পারব তো?' আমি বললাম, 'জানি না।' তার পরিবারের লোকজন ততক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। তিনি জমজম কূপের পানি পান করে কাবা শরিফের গিলাফের একটি টুকরো আমার ও তার মাথায় স্পর্শ করালেন। আমরা রওনা দিলাম বঙ্গভবনের দিকে।

বঙ্গভবনে পৌঁছানোর পরই দেখি কালো পোশাকধারী সশস্ত্র লোকজন পুরো বঙ্গভবন ঘিরে রেখেছে। এই কালো পোশাকধারীদের মধ্যে সেনাবাহিনীর নিয়মিত সৈন্যদের পাশাপাশি ছিল সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত

সদস্যরাও শপথগ্রহণ শেষে বঙ্গভবনে মোশতাক সাহেব সবাইকে ডেকে বললেন, 'শেখ মুজিবের লাশ টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। আপনারা কেউ যাবেন?' উপস্থিত সবাই চুপ। কিছুক্ষণ পর আবদুল মান্নান সাহেব বললেন, 'আপনি কি সত্যি এ কথা বলছেন, আপনি কি তা-ই চান?' খন্দকার মোশতাক চুপ হয়ে গেলেন। সবাই অন্য রুমে চলে যাওয়ার পর আমাকে ইশারায় কাছে ডাকলেন মোশতাক। আমাকে বললেন, 'মনে হচ্ছে তুমি মুজিবের খুব প্রিয় লোক ছিলে, তা না হলে কী করে তোমাকে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী করল। সরকারের প্রধান ছাড়া আর কারো প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা উচিত নয়। কাল থেকে তোমার দপ্তর হবে শিল্প, যা আগেও ছিল। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব শুধু আমার।'

শপথ গ্রহণের পর কথা হলো জেনারেল সফিউল্লাহর সঙ্গে। তিনি আমাকে বললেন, 'বিদ্রোহ দমন নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছে তা কাউকে জানাইনি। বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুই করতে পারিনি।' সফিউল্লাহ সাহেব তখন তার গলায় সব সময় একটি ছোট কোরআন শরিফ ঝুলিয়ে রাখতেন। কোরআন শরিফটি আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রহমতে বেঁচে গেছি।'[২৮]

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর মনসুর আলী ঢাকার টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে আত্মগোপন করেছিলেন। প্রতিমন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমান সেখান থেকে তাঁকে বঙ্গভবনে নিয়ে যান। খন্দকার মোশতাক মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মনসুর আলী রাজি হননি। মোশতাক ও মনসুর আলীর সাক্ষাতের ছবি পত্রিকা ও টেলিভিশনে যায়।[২৯]

সকাল ১০টার দিকে রাস্তাঘাটে লোকজনের ভীড় শুরু হলো। অনেকেই ইতস্তত হাঁটছেন, ফিসফিস করে কথা বলছেন। আব্দুর রাজ্জাক তাঁর ধানমন্ডির বাসা থেকে বেরিয়ে ১৫ নম্বর সড়কের কাছে তাঁর পূর্বপরিচিত মন্টু চৌধুরীকে দেখতে পান। মন্টুর বাড়ি মাদারীপুর। তিনি একজন ছাত্র। রাজ্জাকের পরনে লুঙ্গি, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। খালি পা। একটা বিছানার চাদরে মুখ ঢেকে রেখেছেন। মন্টুকে তিনি একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে বলেন। মন্টু রাজ্জাককে ঈদগাহ-এ তার আত্মীয় টুটুন চৌধুরীর বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে তিনি আধাঘণ্টার মতো ছিলেন। এক গ্লাস পানি খেয়ে তিনি মন্টুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ঢাকার পুব দিকে বুড়িগঙ্গা নদীর পারে বসিলা নামে একটা গ্রাম আছে। মন্টু তাঁকে বসিলায় নিয়ে গিয়ে একটা নৌকায় উঠিয়ে দেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পুলিশ রাজ্জাককে খুঁজতে টুটুনের বাবা চৌধুরী শামসুল আলমকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।[৩০] রাজ্জাক কেরানিগঞ্জের কলাতিয়া গ্রামে সংসদ সদস্য বোরহানউদ্দিন গগনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কলাতিয়ায় তিনি কয়েকদিন লুকিয়ে ছিলেন।[৩১] ৬ সেপ্টেম্বর রাজ্জাক, তোফায়েল এবং জিল্লুর রহমান গ্রেপ্তার হন।[৩২]

মোস্তফা মহসীন মন্টু ছিলেন নবগঠিত বাকশালের ঢাকা নগর শাখার একজন সংগঠক। ১৯৬২ সাল থেকে তিনি আপদে-বিপদে ছাত্রলীগের সঙ্গে ছিলেন। শেখ ফজলুল হক মণির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ১৫ আগস্ট সকালে তাঁর হলো বিচিত্র অভিজ্ঞতা, করুণ এবং ভয়াবহ। আহত শেখ মণিকে তাঁর ছোট ভাই মারুফ মন্টুর এলিফেন্ট রোডের বাসায় নিয়ে এসেছিল। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের কথোপকথন ছিল এ রকম :

—আপনি কি উনাকে জীবিত দেখেছিলেন?

—মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল উনি শ্বাস নিচ্ছেন। মনে হলো, উনাকে আক্রমণকারীরা যখন ধরতে গেছে, উনি তখন হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়েছে। তখন গুলি করেছে। কানের নিচ দিয়ে গুলিটা চলে গেছে। গুলিটা একদিক থেকে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে হাত ভেঙে বেরিয়ে গেছে।

—বোঝা যায় ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গুলি করেছে। আপনার বাসায় নিয়ে এল কে?

—উনার ড্রাইভার। ড্রাইভার ফোন করেছিল। আমার ওয়াইফ ফোন ধরল। বলল, তোমাকে ফোনে খুঁজতেছে। ফোনটা ধরলাম। ফোনটা কেটে গেল। পরে উনার পিএ ফোন করল। দু-একটা গুলির আওয়াজ পেলাম।

আমি বাসার দোতলায় থাকি। সিঁড়ির মধ্যে কে যেন হাউমাউ করে কাঁদছে। দরজা খুলেই দেখি মারুফ, মণি ভাইয়ের ছোট ভাই। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে কাঁদছে—মণি ভাই নাই।

কী হইছে মণি ভাইয়ের?

মণি ভাই তো নাই।

চল।

ওকে টান দিয়ে নিয়ে বের হলাম। আমি খালি গায়ে। আমার ওয়াইফ শার্টটা দিল। বলল, সাবধানে যাও। বিছানার নিচে আমার পিস্তলটা ছিল। সে এটা বের করে দিল। এটা সঙ্গে নিলাম। ভেবেছিলাম মণি ভাই বোধহয় তাঁর বাসায়। বেরিয়ে দেখি মণি ভাই গাড়িতে। দেখেই আমি হাউমাউ করেতেছি। শাহাবুদ্দিন নামে মণি ভাইয়ের একটা সিকিউরিটি ছিল। ওকে আমিই দিছিলাম। বয়সে ছোট। ও আমারে ধমক দিল—অ্যাই, দেরি করবেন না তো। আগে গাড়িতে ওঠেন। অ্যাবনরমাল অবস্থা।

আমি লাশটা কোলে নিয়া পিজি হাসপাতালে। খেয়াল নাই যে, পিজিতে

ইমার্জেন্সি নাই . গেটের কাছে কালো ড্রেসে কিছু লোক দাঁড়ানো।

শাহাবুদ্দিন বলল, এরাই মারছে।

কে মারছে, কারা মারছে, এখনো আমি ক্লিয়ার না। গেটের ভেতরে ঢোকার পর বলল যে, আমাদের এখানে তো ইমার্জেন্সি নাই। গাড়ি ঘুরায়া ঢাকা মেডিকেলের দিকে গেলাম। ইমার্জেন্সিতে যা যা করা দরকার ওরা করল অক্সিজেন দেওয়া, বুক চাপড়ে শ্বাস নেওয়ানোর চেষ্টা ইত্যাদি।

আমি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোন করলাম। এনগেজড টোন। এমন সময় সাদা একটা জিপ আসল। জিপে শেখ সেলিম আর মণি ভাইয়ের ওয়াইফ—ভাবি। ভাবিকে ধরাধরি কইরা নিয়া আসা হইল।

—ভাবি কি তখনও জীবিত?

—আমার সঙ্গে কথা বলে নাই সেলিমরে নাকি বলছে, আমার দুইটা বাচ্চা আছে। ওদের দেইখো। তাকে সেখানে রাইখা সিঁড়ির সামনে –একটা পাবলিক ফোন ছিল ডাক্তার-নার্সদের কাছ থেকে কয়েন নিয়া... ইন দা মিন টাইম হলুদ কালারের লম্বা একটা জিপ আসল জিপের ওপর দাঁড়ানো ওসি সরোয়ার। সামনে আরেকটা জিপ দেখে বলল, জিপটা সরান। আমি বললাম, রাখো সে আবার বলল, জিপ সরান আমি মনে করছি বঙ্গবন্ধু আসছে। পেছনে একটা মার্সিডিজ। পরে দেখলাম, গাড়িতে লম্বা হইয়া শুইয়া আছে সেরনিয়াবাত সাহেব সারা গেঞ্জিতে রক্ত। ব্রাশফায়ার করছে। তার লাশ নামাইলাম তার পাশে বাবু, হাসনাতের ছেলে আর হাসনাতের ভাই। দুইজনকে ধরাধরি কইরা... এরপর দেখি হাসনাতের মা, হাসনাতের বোন বেবী, একে একে সব আহতদের ইমার্জেন্সিতে দিয়া আসা হইল। আমি আর উপরে উঠি নাই।

ইন দা মিন টাইম সরোয়ার গাড়ির অয়ারলেস দিয়া ফোনে কথা বলল। পুলিশ কন্ট্রোলরুম থেকে বলতেছে আর্মি ক্যু হইয়া গেছে। বঙ্গবন্ধু, সেরনিয়াবাত, শেখ মণি কিল্ড। তোমরা যে যেখানে আছো বাইরে না থাইকা ইমিডিয়েটলি হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট কর।

এর মধ্যে হাসপাতালে একটা ট্রাক আর দুইটা জিপ ঢুকছে . আমি অন্য পাশ দিয়া দেয়াল টপকাইয়া চইলা আসলাম এলিফেন্ট রোডে, মল্লিকার পাশের গলিতে। আমার কোমরের পিস্তল যে কোথায় পড়ে গেছে খেয়াল নাই। পরে একজন এটা পেয়ে দিয়া গেছে।

তো সেখানে একটা বাসায় গেলাম। যুবলীগের এক সময় সেক্রেটারি ছিলেন সৈয়দ আহমদ, তার বাসায়। দরজা ধাক্কাইলাম। বললাম, দরজা খোলেন। উনি বের হলেন।

কী হয়েছে?

মণি ভাইকে তো মেরে ফেলেছে।

এখন কী করা?

একটা কিছু তো করা উচিত।

তখন খেয়াল হইল, ফোন করলাম তোফায়েল আহমেদকে। কোনো শব্দ নাই। এরপর ফোন করলাম শাহ্ মোয়াজ্জেমের বাসায়। সব বললাম। খবর শুনলাম, বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলছে। বঙ্গবন্ধুর বাসায় কেউ ফোন ধরে না। বললাম, আপনি বাইরে আসেন। আমি আপনাকে নিতে আসছি।

কীভাবে নিবা?

আপনি বাড়ির পেছন দিয়া বের হয়ে আসেন।

কোথায় আছিস?

সৈয়দ আহমদের বাসায়।

এরপর ফোন করলাম ওবায়দুর রহমানকে। ওবায়েদ ভাই বলল, কী হয়েছে? তুই কই? তুই বলে মেডিকেলে?

আপনাকে কে বলল আমি মেডিকেলে?

না, আমি শুনলাম তুই মেডিকেলে। তো তুই এখন কই?

আমি এলিফেন্ট রোডে আসছি।

তুই এলিফেন্ট রোডে থাকিস না। তোরে খুঁজবে। তুই মেডিকেলে গেছিস, মিলিটারির কাছে এই খবর আছে।

আপনি কী বাসায়?

হ্যাঁ, আমি বাসায়।

আমি আসতেছি। আপনাকে মেরে ফেলবে। আমি আপনাকে নিয়া আসব।

আমাকেও মারবে?

আমাদের ছাত্রলীগের যারা লীডার—তোফায়েল ভাইকে পাচ্ছি না, রাজ্জাক ভাইকে পাচ্ছি না, সিরাজ ভাই তো জাসদ... জাসদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো। সিরাজ ভাই আমাকে খুব লাইক করত। আমিও সিরাজ ভাইকে লাইক করতাম। আমি মণি ভাইয়ের রাজনীতির সঙ্গে ছিলাম। খসরু তো আমার বন্ধু। সিরাজ ভাই আবার খসরুর চাচাতো ভাই। ওই ক্রাইসিস পিরিয়ডে আমরা চব্বিশ ঘণ্টা সিরাজ ভাইকে—তাকে কান্ধে কইরা নিয়া দেয়াল পার করা, মোটর সাইকেলে করে দূরে কোথাও নিয়া যাওয়া, রাত্রে লুকায়া রাখা, তাকে পাহারা দেওয়া।

তখন বলল যে, তুই সাবধানে থাক। ধরা পরিস না।

—এটা ওবায়দুর রহমান বললেন?

—হ্যাঁ। বললেন, দেখি আমি কী করতে পারি। বললাম, আপনি কী

করতে পারবেন? আপনাকে তো মাইরা ফেলবে?

রাখ না।

তখন আমার একটু সন্দেহ হইল। সামথিং রং। বাসায় না গিয়া একজনকে পাঠায়া দিলাম। বললাম, মা আর আমার ওয়াইফ যেন বাসা থেকে বের হয়ে যায়। মা চলে গেলেন পাশেই তাঁর মেয়ের বাসায়।

অবস্থা দেখে মনে হলো সবাই হতভম্ব। হঠাৎ মানুষের গলা কাইটা ফেললে পুরা ধরটা যেমন লাফাইতে থাকে, সে রকম। কী করবে কেউ বুঝতেছে না। একাত্তরের পরের অবস্থাটা হয়েছিল এমন যে বঙ্গবন্ধু যদি হয় আশি ভাগ, অন্য নেতারা সবাই মিলে হবে বিশ ভাগ। নেতৃত্বের এই ডিফারেন্সের কারণে সাহস করে কিছু একটা করা, এটা তারা করতে পারে নাই।

—ওবায়দুর রহমানকে কি তখন আপনার সন্দেহ হয়েছিল?

—আমাকে যখন বলল, দেখি আমি কী করতে পারি, তখন আমি বলছিলাম, আপনাকে তো মেরে ফেলবে। উনি তখন বলছিলেন, না, নুরুল ইসলাম তো আছে।

—নুরুল ইসলাম মঞ্জু?

হ্যাঁ, বরিশালের। নুরুল ইসলামের সঙ্গে খন্দকার মোশতাকের সম্পর্ক ভালো। চাষী, খন্দকার মোশতাক, নুরুল ইসলাম, তাহের উদ্দিন ঠাকুর—এরা তো একটা গ্যাং।

এরপর আমি চলে গেলাম পরীবাগে হামিদ ভাইয়ের বাসায়। হামিদ সাহেব হলেন, এখন যে মন্ত্রী আছে, দীপু, তার বাবা। উনি ১৯৭০ সালে আমাদের এমপি ছিলেন। তেহাত্তরে নমিনেশন পান নাই। দেখলাম একটা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পইরা দাঁড়ায়া আছে।

তুই আইছস এতক্ষণ পরে? আমি এখন কী করব? কই যাব?

আমি সবকিছু বিস্তারিত বলার পর উনি ফিট হইয়া পইড়া গেল। ভাবি বললেন, তুমি চইলা যাও। তুমি থাকলে আরও এ রকম করবে।

বললাম, এখনই বাড়ি ছাইড়া চইলা যান। কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাইখেন। দেশের বাড়িতে রইলেন যে, কোথায় আছেন, কোথায় যাবেন। উনার বাড়ি দোলেশ্বর। বললাম, দেশের বাড়িতে গিয়া আত্মীয়ের বাড়িতে থাকবেন। নিজের বাড়িতে উঠবেন না।

যাহোক, ওখানে একটা গ্রাম আছে, জাজিরা। ওখানে দৌলত মেম্বারের বাড়িতে গিয়া উনি উঠলেন। আমিও এখানে কিছু করতে পারলাম না। পরে কেরানিগঞ্জে চইলা গেলাম। ওখানে গিয়া শুনি যে, রাজ্জাক ভাই কেরানিগঞ্জে। তাকে খুঁজতে থাকি। এক স্কুলমাস্টারের ছেলে বলল, রাজ্জাক

সাহেব এক বাসায় আছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কেরানিগঞ্জে আমার নাম ছিল মৌলবি সাহেব। কেউ আমার কাছে আসলে বলত, মৌলবি সাহেবের কাছে যাচ্ছি, যাতে নামটা প্রকাশ না হয়।

রাজ্জাক ভাই যার বাসায় উঠছিলেন, তার নাম মহেশ। চরে বাড়ি। আমি আর দেরি না করে দিনের বেলায়ই আর দুইজন ছেলেকে নিয়া চলে গেলাম মহেশের বাড়ি। এর আগে একটা ছেলে তাকে বলেছিল, মৌলবি সাহেব আসতেছে আপনার কাছে। এই কথা শুনে উনি ওই বাসা ছেড়ে আরেক বাসায় চলে গেছেন। জায়গা চেঞ্জ করে ফেলছেন।

—খসরু ভাই আর আপনি কি একসঙ্গে গেছেন?

—আমরা একটু আগে-পরে গেছি। এলিফেন্ট রোডে মাহবুব আলীর বাসা পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। খসরু বলল, চলো আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়া এক সঙ্গে নামি।

তুমি রাইফেল নিয়া এইসব ট্যাংক-ফ্যাংকের সামনে কী করবা?

আগে অর্গানাইজ করি।

তারপর ৩২ নম্বরের দিকে গেলাম। দূর থেকে দেখলাম। লোকজন দেখেই বলল, আপনারা সরেন।

কোরানিগঞ্জে থাকার সময় কর্নেল শাফায়াত জামিল খবর পাঠালো। খবরটা পাঠালো সার্জেন্ট জহুরুল হকের ভাই আমিনুল হক। পরে অ্যাটর্নি জেনারেল হয়েছিলেন। উনার বাড়ি তো এলিফেন্ট রোডে—চিত্রা। উনি খবর পাঠালেন দেখা করার জন্য।

আমাকে সবাই এমবার্গো দিয়া দিছে—আপনি এলিফেন্ট রোডে যাবেন না। আমিনুল হকের সঙ্গে দেখা করলাম আরেক জায়গায়। বললেন, তোমাকে তো শাফায়াত জামিল খুঁজতেছে।

ইন দা মিন টাইম আমরা একটা সাইক্লোস্টাইল মেসিন জোগাড় করছি। ছাত্রলীগের ঢালী মোয়াজ্জেম আর মানিকগঞ্জের রউফ—এরা সাইক্লোস্টাইল মেসিনে লিফলেট ছাপল। দিনের বেলা আমি একেক জায়গায় থাকতাম, ঘুমাতাম। বের হতাম রাতের বেলা। তখন তো কারফিউ। এক জায়গায় শাফায়াত জামিলের সঙ্গে মিটিং করলাম। সঙ্গে ছিল স্কোয়াড্রন লিডার ইকবাল। আমার খুব ক্লোজ ছিল। বলল, আমরা কিছু একটা করতে চাই। তোমরা বাইরে থেকে আমাদের সাপোর্ট দাও। এদের রেসিস্ট করার মতো অস্ত্র আমাদের কাছে নাই। আমরা করব। তোমরা আমাদের সাপোর্ট দাও।

একটা কথা বলি। তখন কিন্তু আমাদের প্রতি পাবলিক সাপোর্ট ছিল না। এর অবশ্য কারণ আছে। আমাদের কিছু ব্যর্থতা আছে। বাকশাল মনে

হয়—সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ হয় নাই। এটা হওয়া উচিত ছিল বাহাত্তরে। একটা জাতীয় সরকার। যদি তখন হইত, তাহলে অন্তত ১০ বছর সুন্দর একটা মুক্তিযুদ্ধের সরকার থাকত। পঁচাত্তরে বাকশাল—গণতন্ত্রের মানসপুত্র সোহরাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য বঙ্গবন্ধুর হাতে এইটা—শত্রুর হাতে একটা অস্ত্র চইলা গেছে। এটা একটা ফ্যামিলি রুল হিসাবে ইন্টারন্যাশনালি কাভার্ড হইছে। শেখ মুজিব পার্টির চেয়ারম্যান, মণি ভাই সেক্রেটারি। মণি ভাই তো সেক্রেটারিদের মধ্যে দুই নম্বরে। সেক্রেটারি জেনারেল হইল ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, জিল্লুর রহমান এক নম্বর সেক্রেটারি, মণি ভাই দুই নম্বর, রাজ্জাক ভাই তিন নম্বর।[৩৩]

শেখ মণির বাড়িতে লুটপাট হয়েছিল। জাসদ-গণবাহিনীর ঢাকা নগর শাখার একজন সদস্য তাঁর বাড়ির গ্যারেজ থেকে একটা জিপ নিয়ে আসে ১৫ আগস্ট সকালে। সে এটি চালিয়ে হাজারিবাগের গজমহলে একটা পরিত্যক্ত ট্যানারি কারখানার চত্বরে গাছপালার আড়ালে রেখে দেয়। ১০ দিন পর সে এটা নিয়ে যায়।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়া দেখে সেনাপ্রধান কে এম সফিউল্লাহ হতাশ হয়েছিলেন বলে পরে তিনি উল্লেখ করেছেন। ডালিম সকালে তাঁকে ঢাকা সেনানিবাসের ভেতর ৪৬ ব্রিগেডের দপ্তরে নিয়ে যান। তিনি ওখানে গিয়ে দেখেন, 'সৈন্যরা সবাই আনন্দ করছে। এমনকি বঙ্গবন্ধুর কিছু ছবিও ভাঙা হয়েছে।'[৩৪]

সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ যে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন, তা-ই নয়, তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বও হারিয়েছিলেন। বিষয়টি খুব কাছে থেকে লক্ষ করেছেন রাষ্ট্রপতির সহকারী প্রেসসচিব মাহবুব তালুকদার। ১৫ আগস্ট বিকেলে বঙ্গভবনে তিনি একটা কাজে খন্দকার মোশতাকের অফিস কক্ষে ঢুকেছিলেন। সশস্ত্রবাহিনীর তিন প্রধান সেখানে ছিলেন। ফারুক-রশিদও সেখানে ছিলেন। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাহবুব তালুকদার বলেছেন :

সবাই বসা। দেখলাম ফারুক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সফিউল্লাহও দাঁড়িয়ে গেলেন ফারুক পায়চারি করছেন, রশিদের সঙ্গে কথা বলছেন, বসছেন না। সফিউল্লাহও বসছেন না সময় কেটে যাচ্ছে। অগত্যা সফিউল্লাহ দেয়ালে ঝোলানো পেইন্টিং দেখতে থাকলেন। তিন মিনিট পর ফারুক চেয়ারে বসলেন। দেখাদেখি সফিউল্লাহও বসলেন।[৩৫]

আগস্ট-অভ্যুত্থানের আগের রাত পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একেকজনের অভিজ্ঞতা একেক

রকম। সরকার সমর্থক ছাত্ররা সবাই আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলেন। প্রথম বর্ষের ছাত্র শফিকুল ইসলাম ইউনুস থাকতেন সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে। তার নিজের কোনো সিট ছিল না। হলের ২৭০ নম্বর কামরায় তিনি তার এক দেশোয়ালি ভাইয়ের সঙ্গে ডাবলিং করতেন। ওই কামরায় ছিলেন গণিত বিভাগের ছাত্র আতাউর রহমান নুরু এবং আবদুল কাদির। ইউনুস এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

> ১৫ তারিখ বঙ্গবন্ধু আসবেন। আমি ভলান্টিয়ার। আমাকে একটা লাল রঙের স্কার্ফ আর এসপি মাহবুবের সাইন করা একটা চেস্ট কার্ড দেওয়া হইছিল। সকালে আমার ডিউটি ভিসির বাড়ির সামনে। আর্ট কলেজের পোলাপান রাস্তায় আলপনা আইক্কা রাখছে। সকালে একজন হলে আইসা বলল, 'আমি মেজর। আপনাদের কোনো অসুবিধা নাই। একটা অভ্যুত্থান হইছে। আপনারা হলে থাকেন।' ছাত্রনেতারা সব ভাইগ্যা গেছে। জিএস শফিকুল ইসলামও দেখলাম ভাইগ্যা গেল। তিন-চারদিন পর হল ছাইড়া চইলা আসলাম। আমার বন্ধু মিজানের বাবার একটা ওষুধের দোকান ছিল কামরাঙ্গীর চরে, টংঘর। ওইখানে ছিলাম।[৩৬]

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ১৫ আগস্ট সকালে তাঁর বাড়ি ছেড়ে, ওখানে মুরগির ঘর ছিল, সেখানে একজন সার্ভেন্ট ছিল দেখাশোনা করার জন্য, তার ঘরে ছিলেন। তার দু-একদিন বাদে কোনো এক ফাঁকে পালিয়ে অন্য জায়গায় যান। রোকেয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহীম হলের ভেতর পাঁচ তলায় কর্নারের লাস্ট রুমে তাঁর হাজব্যান্ড, ছেলেমেয়ে নিয়ে ছিলেন। 'যাঁরা বাকশালের জন্য মুভ করেছিলেন, ওদের একজনও সামনে আসেননি। ওপেনলি কেউ উল্লাস প্রকাশ করেনি। তবে অনেকেই বলেছেন, এটা অনিবার্য ছিল। যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। যাঁরা একটু বুদ্ধিমান, তাঁরা বলেছেন এটা একটা ট্র্যাজেডি।'[৩৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট ছিলেন মেহেরুন্নেসা চৌধুরী। ১৫ আগস্ট তাঁর দিন কেটেছিল উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তায়। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ১৪ আগস্ট হলের ছাত্রীরা উৎসুক ছিলেন, পরদিন বঙ্গবন্ধু হলের সামনে দিয়ে হেঁটে টিএসসিতে যাবেন। ছাত্রীরা রাতে বরণডালা সাজাচ্ছিল। পরদিন সকালে হলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানাবে, এমন পরিকল্পনা ছিল। ভোরে হলের ভিপি রাখী দাশ পুরকায়স্থ এবং জিএস নাজমুন্নাহার নিনা এসে খবর দিলেন, বঙ্গবন্ধুকে মেরে

ফেলেছে। ছাত্রীরা তখন উদ্‌ভ্রান্ত। এদিকে হলের গেটে দড়াম দড়াম আওয়াজ হচ্ছে, গেট খোলার জন্য। গেট দিয়ে সেনাবাহিনীর তিন-চারজন অফিসার ঢুকলেন। বললেন, 'মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারি?' প্রভোস্ট অনুমতি দিলে তারা বললেন, 'মুজিবকে নির্বংশ করা হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। আপনারা বের হবেন না।' ইতিমধ্যে প্রভোস্টের ঘরে ফোন বেজে উঠল। মোটা গলায় একজন বলছে, 'আরও প্রভোস্টগিরি করবেন?' তিনি নার্ভাস হয়ে ফোন রেখে দিলেন। বাসার বেডরুমে ছিলেন তাঁর স্বামী আমিনুল হক চৌধুরী। তাঁকে বরিশালের জেলা গভর্নর নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। প্রভোস্টের বাসভবনের পাশের বাসায় থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বদরুদ্দিন হোসেন। মেহেরুন্নেসার ভাষ্যমতে :

> আমার হাজব্যান্ড নাখালপাড়ায় আমার বোনকে ফোন করলেন বদরুদ্দিন হোসেনের বাসায় গাড়ি পাঠাতে। বোন তার দুই মেয়েকে সঙ্গে দিয়ে গাড়ি পাঠালো। ওরা আমার হাজব্যান্ডকে ওই বাসা থেকে নাখালপাড়ায় নিয়ে গেল। পরে উনি বরিশালে চলে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন তার বাড়িঘর সব লুট হয়ে গেছে। এরপর তিনি তাদের গ্রামের বাড়ি উলানিয়ায় চলে যান।
>
> রোকেয়া হলের প্রভোস্ট ছিলেন নীলিমা ইব্রাহিম। একদল ছাত্রী এসে তাঁকে ঘেরাও করে ধমকে গেছে—যাবি, যাবি?
>
> সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল এমন শিক্ষকদের অনেকেই হয়রানির শিকার হন। উপাচার্য আবদুল মতিন চৌধুরী গ্রেপ্তার হয়ে যান। আমাকে প্রভোস্টের পদ থেকে সরানোর জন্য অনেক চাপ আসছিল। ততদিনে অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরী উপাচার্য হয়েছেন। একদল ছাত্রী তাঁর কাছে, এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা আবুল ফজল সাহেবের কাছেও আমার বিরুদ্ধে নালিশ জানায়, আমি নাকি অনেক দুর্নীতি করেছি। আবুল ফজল সাহেবও উপাচার্যকে চাপ দিচ্ছিলেন, আমাকে যেন প্রভোস্টের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ফজলুল হালিম সাহেব জিয়াউর রহমানের সঙ্গে কথা বললেন। জিয়া বললেন, 'ইট'স ইয়োর প্রবলেম, ইউ হ্যান্ডেল ইট'। ইতিহাসের অধ্যাপক ওদুদুর রহমান আমাকে পরামর্শ দিলেন, ডিপার্টমেন্টে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে আমি যোগ দিতে পারি, অথবা টিএসসিতে স্টুডেন্টস কাউন্সেলিং অ্যান্ড গাইডেন্স-এর উপপরিচালক হিসেবে যেতে পারি। শেষমেশ উপপরিচালক হিসেবেই যোগ দিলাম। টিএসসিতে ১৮ বছর কাজ করেছি, পরিচালক হিসেবেই পরে অবসরে গেছি।[১৮]

১৫ আগস্ট অপরাহ্ণে *দৈনিক বাংলার* চিফ ফটোগ্রাফার গোলাম মওলার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পল্টনের কাছে সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্য একটি জিপে করে তাঁকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে শেখ মুজিবের বাড়িতে নিয়ে

যায়। মওলা বাড়ির ভেতরে ঢুকে তার রলিফ্ল্যাক্স ক্যামেরায় অনেকগুলো ছবি তোলেন। সেনা সদস্যারা ক্যামেরা খুলে ফিল্মগুলো নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়। সন্ধ্যায় দুজন সেনা কর্মকর্তা *দৈনিক বাংলা* অফিসে আসেন। তাদের একজন মেজর এবং একজন ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কের। তারা মওলাকে ছবিগুলো প্রিন্ট করে দিতে বলেন। তাদের পাহারায় মওলা ডার্করুমে ছবিগুলোর প্রিন্ট তৈরি করেন। সেনা কর্মকর্তাদের তীক্ষ্ণ নজরদারির কারণে মওলা কোনো ছবির ডুপ্লিকেট প্রিন্ট তৈরি করতে পারেননি। প্রিন্ট তৈরির কাজ শেষ হলে তিনি ছবিগুলো সম্পাদককে একটু দেখিয়ে আনার অনুরোধ করেন। কর্মকর্তারা রাজি হন। মওলা ছবিগুলো নিউজরুমে এনে টেবিলের ওপর রাখলে তাঁর সহকর্মীরা ছবিগুলো দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন। বিকেল পাঁচটা থেকে শহরে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছিল। সাংবাদিকরা অনেকেই তাঁদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে অফিসে এসেছিলেন। মওলার তোলা ছবিগুলো উপস্থিত সহকর্মীদের মধ্যে দেখেছিলেন ফজলুল করিম (বার্তা সম্পাদক), জহিরুল হক (রিপোর্টার), সৈয়দ আবদুল কাহহার (ফিচার এডিটর) মাহফুজ উল্লাহ (সহকারী সম্পাদক, *বিচিত্রা*) প্রমুখ। সেনা কর্মকর্তারা পরে সবগুলো ছবি নিয়ে যান [৩৯]

শেখ মুজিবের মরদেহ দাফন করা নিয়ে বঙ্গভবনে কথা কাটাকাটি হয়েছিল খন্দকার মোশতাক বলেছিলেন, 'যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর পিতা-মাতার কবরের পাশে গোপালগঞ্জে স্বগ্রামের বাড়িতে তাঁকে সমাহিত করা হোক।' একজন সেনা কর্মকর্তা ওই সময় প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'আমরা তাঁকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে হত্যা করেছি। আর এক্ষণে আপনি তাঁকে মর্যাদার সঙ্গে দাফন করতে চান—এটা কেমন কথা! এ হতে পারে না।' মোশতাক ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'ওয়েল, ইন দ্যাট কেইস, ইউ টেকওভার। ইফ আই অ্যাম দ্য প্রেসিডেন্ট, ইউ হ্যাভ টু ক্যারি আউট মাই অর্ডারস।'[৪০]

১৫ আগস্টে যাঁরা নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের দাফনের ব্যবস্থা ঢাকা সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার কর্নেল হামিদকেই করতে হয়েছিল। বঙ্গভবন থেকে খন্দকার মোশতাকের নির্দেশ পেয়ে তিনি এই কাজটি সমাধা করেন। তাঁকে বলা হয়েছিল, সব লাশ বনানী গোরস্থানে দাফন করা হবে। শুধু শেখ মুজিবের লাশটি আপাতত বাসায় থাকবে।[৪১] কর্নেল হামিদ দাফনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> রাত ছিল গভীর অন্ধকার।... শেখ সাহেবের পরিবারের সব লাশ কফিনবন্দী করে সাপ্লাই ব্যাটালিয়নের ট্রাকে তুলে আমার আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। শুধু শেখ সাহেবের লাশ কফিনবন্দী করে বারান্দার এক কোণে একাকী ফেলে রাখা হয়েছিল . আমি সুবেদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা

কি শেখ সাহেবের লাশ? তিনি স্মার্টলি জবাব দিলেন, জি স্যার, ওটা শেখ সাহেবের। কেন জানি কৌতূহলবশতই বললাম, কফিনের ঢাকনাটা খুলুন, আমি চেক করব। কী আশ্চর্য! দেখা গেল ওটা শেখ সাহেবের লাশ নয়, শেখ নাসেরের। আমি এবার ট্রাকে উঠে সবগুলো ঢাকনা খুলে ম্যাচ বাক্সের কাঠি জ্বালিয়ে শেখ সাহেবকে খুঁজতে থাকলাম। অবশেষে ট্রাকের এক অন্ধকার কোণে শেখ সাহেবকে পাওয়া গেল। তাঁর কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে সম্মানের সঙ্গে তাঁকে নিচে নামিয়ে বারান্দায় স্থাপন করা হলো। বারান্দা থেকে শেখ নাসেরের কফিন ট্রাকে নিয়ে তুলে দেওয়া হলো।...

শেখ মণির বাসায় পৌঁছে ঘরের ভেতর ঢুকে দেখি সব ফাঁকা, কেউ নেই। থানায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, শেখ মণির লাশ সম্পর্কে তারা কিছু জানে কি না। তারা বলল, গোলাগুলির পর কিছু সৈন্য এসে বোধহয় ডেডবডিগুলো মর্গে নিয়ে গেছে। অগত্যা আমি জিপ নিয়ে দ্রুত মেডিকেল কলেজের মর্গে পৌঁছালাম। মর্গেই সব লাশ আছে। ডোম এসে দরজা খুললে দেখা গেল মর্গে পূর্বের পুরোনো পচা গলিত অনেক লাশ একসঙ্গে স্তূপ হয়ে আছে। ওগুলোর মধ্য থেকেই সেরনিয়াবাত ও শেখ মণির পরিবারের সদস্যদের মৃতদেহগুলো শনাক্ত করা হয়। এতগুলো লাশ একসঙ্গে চাপাচাপি করে থাকায় ১২ ঘণ্টায়ই একেবারে পচে গিয়েছিল। লাশগুলো ট্রাকে উঠিয়ে বনানী গোরস্থানে নিয়ে যেতে বলি। আমি সেখান থেকে দ্রুত জিপ চালিয়ে বনানী ছুটলাম। সাপ্লাই ব্যাটালিয়নের সৈনিকেরা একটানা কাজ করে ১৮টি কবর খুঁড়ে রেখেছিল।...

শেখ পরিবারের সাতজন সদস্যের কবর আছে বনানীতে। প্রথম কবরটা বেগম মুজিবের। দ্বিতীয়টা শেখ নাসেরের। তৃতীয়টা শেখ কামালের। ১৩নং কবরটি শেখ মণির। লাশগুলো দাফনের পর আমি আমার অফিসে ফিরে এসে এক এক করে নামগুলো আমার অফিস প্যাডে লিপিবদ্ধ করি। রেকর্ডটি বহুদিন ধরে আমার কাছে রক্ষিত রয়েছে। কেউ কোনো দিন খোঁজও করেনি। এ ছাড়া আর কোথাও এই সমাধিগুলোর রেকর্ড নেই। আমি আমার অফিসে বসেছিলাম। বঙ্গভবন থেকে টেলিফোনে আবার মেসেজ পাঠানো হলো, শেখ সাহেবের ডেডবডি টুঙ্গীপাড়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। একটি এয়ারফোর্স হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

...তারা তেজগাঁও এয়ারপোর্ট থেকে বেলা আড়াইটা নাগাদ শেখ সাহেবের লাশ নিয়ে টুঙ্গীপাড়ার উদ্দেশে আকাশে পাড়ি জমাল।... মেজর মহিউদ্দিন পুলিশের সহায়তায় কোনোক্রমে ১৫-২০ জন লোক জানাজার জন্য জড়ো করতে সক্ষম হয়েছিল। একজন স্থানীয় মৌলভিকে ডেকে এনে শেখ সাহেবের লাশ গোসল করানো হয়। তাঁর গায়ে ১৮টি বুলেটের দাগ

দেখতে পাওয়া যায়। গোসল শেষে পিতার কবরের পাশেই তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।...

জাতির জনককে শেষ বিদায় জানাতে যেকোনো কারণেই হোক, টুঙ্গীপাড়ায় লোকজন সেদিন ভিড় করেনি যে ব্যক্তি সারাজীবন বাঙালি জাতির স্বাধীনসত্তার জন্য সংগ্রাম করে গেলেন, তাঁকে শেষ বিদায় জানানো হলো অতি নীরবে, নিঃশব্দে, টুঙ্গীপাড়ার একটি গ্রামে।[৪২]

ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের উপহাইকমিশনার জে এন দীক্ষিত পঁচাত্তরের শুরুর দিকে ওয়াশিংটনে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের খবরটি তিনি জানতে পারেন ওই দিন শেষ বিকেলে। সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আর সিদ্দিকী। দীক্ষিত তাঁর কাছে অভ্যুত্থানের খবরাখবর এবং এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চান। সিদ্দিকী দুঃখ প্রকাশ বলেন, বাংলাদেশের জটিল রাজনীতি সামাল দিতে গিয়ে মুজিব নিজেই এই পরিণতি ডেকে এনেছেন।[৪৩]

মুজিব হত্যা এবং সামরিক অভ্যুত্থান ভারতীয়দের হতবাক করে দিয়েছিল ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কেউ কেউ চেয়েছিলেন, বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির সুযোগ নিয়ে ভারত হস্তক্ষেপ করুক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ওই সময় বিদেশে থাকায় তাঁকে দিয়ে ভারতীয় হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানানোর সুযোগ ছিল। ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে পাশের দেশে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না। ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করে তিনি নানান ঝামেলার মধ্যে ছিলেন এবং চার বছরের মাথায় বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার ভারতীয় হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন পাবে না বলে মনে হয়েছিল[৪৪]

আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর যে পরিস্থিতি তৈরি হয়, তার ফলে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' সমালোচনার মুখে পড়ে। এটাকে ভয়ংকর গোয়েন্দা বিপর্যয় হিসেবে দেখা হয়। প্রশ্ন ওঠে, 'র' কেন মুজিববিরোধী এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বেখবর ছিল। ১৯৬৮ সালে ২১ সেপ্টেম্বর র-এর জন্মলগ্ন থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন বি রমন। এ ব্যাপারে তিনি 'র'-এর প্রধান আর এন কাও-এর কাছে জানতে চাইলে কাও বলেছিলেন, বাংলাদেশে 'র' কোনোভাবেই ব্যর্থ হয়নি। তাঁর মতে, মুজিবের জনপ্রিয়তা দিন দিন কমে গিয়েছিল। বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীতে তাঁর জনপ্রিয়তা তলানিতে ঠেকেছিল এবং সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল। কাও বিষয়টি ইন্দিরা গান্ধীকে জানিয়েছিলেন। ইন্দিরা তাঁর আশঙ্কার কথা শেখ মুজিবকে জানালে মুজিব তা আমলে নেননি। তিনি মনে

করতেন, তার জনপ্রিয়তা ১৯৭১ সালের মতোই আছে এবং তাঁর জীবনের প্রতি কোনো হুমকি নেই। কাও বলেন, 'মুজিব যদি নিজেই এগুলোকে গুরুত্ব না দেন, তাহলে 'র' কেন এ ব্যাপারে দায়ী হবে?'[৪৫]

ওই সময় বাকশালের অঙ্গ সংগঠন জাতীয় ছাত্রলীগের একজন নেতা ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নূহ-উল-আলম লেনিন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, '১৫ আগস্ট কিশোরগঞ্জে এবং তার পরদিন খুলনার একটা কলেজে মিছিল হয়েছিল। এছাড়া বাংলাদেশে আর কোনো প্রতিবাদ হয়েছে বলে আমার জানা নাই।[৪৬]

৬

শেখ মুজিবের মৃত্যুতে অতি উল্লাসে মিছিল করার ঘটনা ঘটেছিল বরিশাল শহরে। এটি ১৫ আগস্ট সকাল বেলার ঘটনা। বরিশালের ছাত্রলীগ সংগঠক এবং বিএম কলেজ ছাত্রসংসদের সাবেক সহসভাপতি খান আলতাফ হোসেন ভুলু তাঁর নিজের দেখা এই অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

> আমার একটা লাইসেন্স করা পিস্তল ছিল, এটা নিয়েই বের হলাম। তখন সারা শহর নিস্তব্ধ। সদর রোডে তৎকালীন আর্যলক্ষী ব্যাংকের সামনে এসে দেখা পাই আওয়ামী লীগ নেতা হেমায়েত উদ্দিন আহমেদের। তিনি আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, ছাত্রলীগের সবাইকে খবর দিতে হবে—বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে আমাদের রাজপথে নামতে হবে। এরপর বর্তমান সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড, যেখানে আওয়ামী লীগ অফিস ছিল, সেখানে গিয়ে দেখি কেশব বাবু ও কুট্টি মিয়া মন ভারাক্রান্ত হয়ে বসে আছেন। এরই মধ্যে মনসুরুল আলম মন্টু, মুশফিকুর রহমান, শেখ মোবারক, তরুণ দেব, জাহাঙ্গীর কবির নানকসহ নেতাকর্মীরা এসে গেছে। আমরা একটা মিছিল বের করে বিবির পুকুরের দিকে আসতেই পেশকারবাড়ির দিক থেকে একটি বিরাট মিছিল লাঠিসোঁটা নিয়ে এগিয়ে এসে আমাদের ওপর হামলার চেষ্টা করে এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন আ স ম ফিরোজ, আব্বাস হোসেন, শওকত, ফরিদ প্রমুখ। খুনি মোশতাকের সমর্থকরা আওয়ামী লীগ অফিস ভাঙচুর শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর ছবি রাস্তায় এনে ভাঙচুর করতে দেখা যায়. আওয়ামী লীগ অফিসে কেশব বাবু ও কুট্টি মিয়া আক্রান্ত হলেন। হামলাকারীরা শহরের যেসব দোকানপাটে বঙ্গবন্ধুর ছবি ছিল, সেগুলো টেনে নামিয়ে এনে ভাঙতে শুরু করে। সে সময় জাসদের

> নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও এদের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায়। হামলাকারীদের একাংশ বিএম কলেজ প্রিন্সিপালের রুমে গিয়ে প্রিন্সিপাল এমদাদুল হক মজুমদারকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে বঙ্গবন্ধুর ছবি পদদলিত করে। এমনকি এই সমর্থকরা যারা আনন্দ-উল্লাস করছিল, তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে প্রকাশ্যে গোসল করে খিচুড়ি রান্না করে খেয়েছে।[৪৭]

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের আকস্মিকতায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। ঢাকায় কাউকে প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানাতে দেখা যায়নি। পরে জানা যায়, ঢাকার বাইরে দু-একটা জায়গায় প্রতিবাদ হয়েছিল। এ রকম একটি বিক্ষোভের আয়োজন হয়েছিল খুলনা শহরে বিএল কলেজে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন খুলনার ছাত্রলীগ কর্মী নূর খান ঘটনাটি তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> আমি তখন সুন্দরবন কলেজে পড়ি, জাসদ-ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত। চুয়াত্তরের ১৭ মার্চের পর থেকেই আমাদের দলের নেতারা আন্ডারগ্রাউন্ডে। ধরপাকড় চলছিল। এর মধ্যে ঘটে গেল ১৫ আগস্ট রাতে গণবাহিনীর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কমান্ডার কামরুজ্জামান টুকু শহরে এসেছিলেন বলে শুনেছি। টুকু ভাই অনেকদিন ধরে আন্ডারগ্রাউন্ডে। তাঁর মন্তব্য ছিল, এই অভ্যুত্থান আমাদের পক্ষে না। তারপর আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলেন। সাংগঠনিক কাজে আমি বিএল কলেজে গিয়েছিলাম ১৬ আগস্ট সকালে বেলা দশটা হবে। দেখলাম আওয়ামী লীগসমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা রায় রমেশ ১০-১২ জন ছাত্রকে নিয়ে একটা সভা করছেন বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে এরপর তাঁরা কলেজ ক্যাম্পাসে ঝটিকা মিছিল করলেন। পুলিশ এসেছিল। মিছিলকারীরা দ্রুত সরে পড়লেন। রমেশদা আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলেন[৪৮]

মুজিব হত্যার খবর শুনে অনেক রাজনীতিবিদ খুশি হয়েছিলেন তাঁদের কাছে অসামরিক আওয়ামী লীগ-বাকশাল সরকারের চেয়ে সামরিক সরকার ছিল বেশি আদরের জাসদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তরুণদের একটা বড় অংশ 'বিপ্লবের' তাড়নায় টগবগ করে ফুটছিলেন ১৫ আগস্টের নৃশংসতা দেখে তাঁরা অনেকেই হকচকিত হয়ে পড়েন। তবে খুশি হয়েছিলেন অনেকেই। কুমিল্লার স্থানীয় এক জাসদ নেতা তাঁর রাজাপাড়ার বাড়িতে ১৫ আগস্ট গরু জবাই করে ভোজের আয়োজন করেছিলেন। বাড়িতে মাইক লাগিয়ে সারাদিন গান-বাজনা, হইচই আর আওয়ামী লীগকে গালিগালাজ চলে। কাছেই ছিল স্থানীয় সংসদ সদস্য অলি আহাম্মদের বাড়ি। মাইকটা তার বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। অলি আহাম্মদ তখন বাড়িতে ছিলেন না। প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে আগেই তিনি

সপরিবারে ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন। জাসদ একটা লিফলেট প্রকাশ করেছিল শিরোনাম ছিল—খুনি মুজিব খুন হয়েছে, অত্যাচারীর পতন অনিবার্য।[৪৯] তবে জাসদের নেতা-কর্মীদের এই উচ্ছ্বাস ছিল ক্ষণস্থায়ী। গণবাহিনীর সংগঠক মোশতাক আহমেদের মন্তব্য ছিল :

> আর্মির একটা ফ্যাকশনের সঙ্গে হয়তো আমাদের যোগাযোগ ছিল। তারপর তো খন্দকার মোশতাক গুছাইয়া পিটা শুরু করল আমাদের। মুজিব কী পিটাইছে? খন্দকার মোশতাকের বাড়িটা আরও বেশি। বগুড়ায় মরতেছে, রংপুরে মরতেছে, এই রকম শুরু হইল। তখন সিনেমা হলে দেখাইত, একটা বীভৎস লোক, হাতে স্টেনগান, গাট্টাগোট্টা, বাবরি চুল, নিচে লেখা—ওদের ধরিয়ে দিন।[৫০]

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের বাইরে জাসদ এবং সিপিবি ছিল দুটো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল। দল দুটোর মধ্যে নীতিগত ফারাক ছিল। অনেক বিষয়ে তাদের অবস্থান ছিল বিপরীত মেরুতে কিন্তু যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ঘটে, তার মূল্যায়নে এই দল দুটোর অবস্থান খুব কাছাকাছি মনে হয়েছে। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে জাসদের মূল্যায়ন ছিল এ রকম :

> ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ শুরু করে দিয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল আওয়ামী লীগ (পরবর্তীকালে বাকশাল)-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল সংশোধনবাদের বাংলাদেশস্থ এজেন্ট গণধিকৃত মণি-মুজাফফর চক্র। কিন্তু চরম ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ শেখ মুজিবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না ... বুর্জোয়াদের মধ্যে দেখা দিল অস্থিরতা ও অন্তঃকোন্দল দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিদেশি মুরব্বিরাও দিশাহারা হয়ে উঠল: কোন নেতৃত্বের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ প্রতিপত্তি কায়েম থাকবে—এ প্রশ্নে তারা দ্বিধান্বিত হয়ে উঠল . এই ডামাডোলের একপর্যায়ে এল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। এদিন শেখ মুজিব ও তাঁর কতিপয় সহযোগী নিহত হলো। সামরিক বাহিনীর একাংশের সহযোগিতায় শেখ মুজিবেরই অন্যতম সহচর খন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় বসল।[৫১]

জাসদের এই মূল্যায়নটি করা হয় ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সিপিবির মূল্যায়নটিও অনুরূপ, যদিও তা করা হয়েছিল তিন বছর পর, ১৯৭৯ সালে। সিপিবির মন্তব্যে বলা হয় :

> দেশে একটি প্রগতির ধারা সূচিত হলেও দলের নেতা, মন্ত্রী, এমপি এবং দলের কর্মীদের একাংশ ব্যাপক দুর্নীতি, লাইসেন্স-পারমিট, ব্যাংক-ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির মাধ্যমে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। এমনকি

জাতীয়করণকেও তারা নিজেদের বিত্ত সঞ্চয়ের কাজে ব্যবহার করতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর আমলে ৩৪০ কোটি ৩৮ লাখ ডলার বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশে আসে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় এই টাকার শতকরা ৩০ ভাগ দুর্নীতিবাজদের পকেটে চলে যায়। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের লোকজনও ছিল। এভাবে দলের মধ্যে বুর্জোয়া ও নব্য-ধণিকদের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়. বস্তুতপক্ষে ১৯৭৪ সালে দেশের প্রগতির ধারাকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।... শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদঘেঁষা আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল অংশ জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সঙ্গে শরিক হয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এবং আওয়ামী লীগের একাংশ খুনি মোশতাকের সহযোগী হয়।[৫২]

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকে দৈনিক *ইত্তেফাক* স্বাগত জানিয়েছিল। ১৬ আগস্ট দৈনিক *ইত্তেফাক* প্রথম পাতায় 'ঐতিহাসিক নবযাত্রা' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় ছাপে। সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় :

> দেশ ও জাতির এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণে ১৫ আগস্ট শুক্রবার প্রত্যুষে প্রবীণ জননায়ক খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সরকারের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ববর্তী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছে এবং এক ভাবগম্ভীর অথচ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।... বিগত সাড়ে তিন বছরের উর্ধ্বকালে দেশবাসী বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা লাভ করিয়াছে তাহাকে এক কথায় হতাশা ও বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সত্যিকার আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিতে আগাইয়া আসিতে হইয়াছে. তারও কারণ ছিল। পূর্ববর্তী শাসকচক্র সাংবিধানিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে কোনো দিন ক্ষমতালিপ্সার বাঁধ দিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় না। আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব অনেক। বাংলাদেশের এক মহাক্রান্তিলগ্নে জননায়ক খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী যে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে সুসংহত করিতে হইলে জনগণের প্রতি অর্পিত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আমাদের সকলকে আজ ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে।[৫৩]

১৬ আগস্ট লন্ডনের *গার্ডিয়ানে* মার্টিন উলাকট 'মুজিব নিজেই দায়ী' শিরোনামে এক প্রতিবেদনে বলেন :

'নির্মম পরিহাস এই যে, পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা করেনি, তাঁর দেশবাসীই তাঁকে হত্যা করেছে। এতে বোঝা যায়, কত দ্রুত বাংলাদেশ আশার উঁচু শিখর থেকে হতাশার অতল গহ্বরে নেমে এসেছিল, যার ফলে এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। এজন্য বহুলাংশে দায়ী মুজিব নিজে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র চলাকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুজিব কোনো সংস্কার সাধনে, এমনকি একটা যোগ্য, সৎ প্রশাসন গড়ে তুলতেও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সর্বোপরি, মুজিব সেনাবাহিনীকে আঘাত করে আসছিলেন। রক্ষীবাহিনী একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রহরী, গোয়েন্দা পুলিশ ও বিকল্প সেনাবাহিনী ছিল আয়ারল্যান্ডের ব্ল্যাক অ্যান্ড টেন্স ও জার্মানির ব্রাউন শার্টের সঙ্গে এদের তুলনা করা চলে। রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অসন্তোষই হচ্ছে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ এবং এক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আরেক সেনাবাহিনী গঠন করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার যে নীতি মুজিব গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে।'[৭৪]

ব্রিটিশ দৈনিক *দ্য টেলিগ্রাফ* 'ফল অব অ্যান আইডল' শিরোনামে একটি নিবন্ধ ছাপে এতে মন্তব্য করা হয় যে, শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে চলে যাওয়াতেই তাঁর কাল হয়েছে। শহুরে মধ্যবিত্তরা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতির সত্যিকার নিয়ামক শক্তি এবং যেদিন তিনি সংবিধান ছিঁড়ে ফেলেছিলেন সেদিনই তাঁর পতনের সূচনা হয় বলে মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়। নিবন্ধে আরও বলা হয়, 'মোসাহেব পরিবেষ্টিত থেকে তিনি তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে যে ক্রোধ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল সেটা না দেখে বরং এই স্লোগান আউড়ে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করতে চাইতেন : আমার দেশবাসী আমাকে ভালোবাসে, আমি তাদের ভালোবাসি ... পক্ষান্তরে সমালোচকদের অতীত রেকর্ড যা ই হোক না কেন, তাদের প্রতি মুজিবের আচরণ ছিল একেবারেই সহানুভূতিহীন।'[৭৫]

১৬ আগস্ট *বাংলাদেশ অবজারভার* একটা সম্পাদকীয় ছাপে, শিরোনাম, 'হিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি।' একই পত্রিকায় একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল, পিপল হেইল টেকওভার (জনগণ ক্ষমতা গ্রহণকে অভিনন্দন জানায়)। ২০ আগস্ট নতুন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ সামরিক আইন জারি করেন। সামরিক ফরমানে বলা হয় :

যেহেতু আমি, খন্দকার মোশতাক আহমদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সহায়তা ও করুণায় এবং জনগণের দোয়ার ওপর নির্ভর করিয়া ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের প্রাতঃকাল হইতে কার্যকর করিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল ও পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছি, এবং যেহেতু আমি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের প্রাতঃকালে রেডিও বাংলাদেশের সকল কেন্দ্র হইতে প্রচারিত এক ঘোষণাবলে সমগ্র বাংলাদেশে সামরিক আইন জারি

করিয়াছি;... অত্র ফরমান অনুসারে আমা-দ্বারা প্রণীত কোনো সামরিক আইন প্রবিধান বা আদেশবলে বা এর অধীনে কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা বা ইহাকে অবৈধ বা বাতিল ঘোষণা করিবার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট বা অন্য কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের থাকিবে না।[৫৬]

৭

১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে সেনাবাহিনীর ওই সময়ের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে পরে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। নানা কারণে জিয়ার মনে ক্ষোভ ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁকে সেনাপ্রধান করা হবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এতে জিয়া ক্ষুব্ধ হন। ঢাকা সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার লে. কর্নেল এম এ হামিদের বিবরণ থেকে জানা যায়, জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্রদূত করে পূর্ব জার্মানি অথবা বেলজিয়ামে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। জিয়া সেনাবাহিনী ছেড়ে যেতে চাননি। বদলি ঠেকানোর জন্য জিয়া তাঁর কোর্সমেট কর্নেল হামিদের শরণাপন্ন হন। হামিদ জিয়ার বিষয়টি সাইদুর রহমান নামে শেখ মুজিবের আস্থাভাজন একজন 'প্রভাবশালী মুক্তিযোদ্ধাকে' বলেন এবং জিয়াকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে সাইদুর রহমান তোফায়েল আহমেদ ও আবদুর রাজ্জাককে ধরে জিয়ার সিভিল পোস্টিং ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।[৫৭] লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাইদুর রহমান বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন :

> মংলা পোর্টের জেনারেল ম্যানেজার ক্যাপ্টেন নূরউদ্দিন কর্নেল হামিদসহ আমার কাছে আইল, জিয়াউর রহমানের ট্রান্সফারটা কীভাবে বন্ধ করা যায়। আমি যাইয়া তোফায়েলরে বললাম, রাজ্জাকরে বললাম। এই লোকটার স্বাধীনতা যুদ্ধে একটা বিরাট কনট্রিবিউশন ছিল। সে আর্মিতে থাকতে চায়। নতুন এই আর্মিটা হইতে আছে। এইখানে তার একটা কনট্রিবিউশন... আর্মিটারে রিবিল্ড করা। বঙ্গবন্ধু একটা পোস্ট বানাইয়া তারে এইখানে দিছে। একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়তো কোথাও আছে। খালেদ মোশাররফ আছিল, সবসময় জিয়াউর রহমানের এগেইনস্টে বলত। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অবদান, তাঁর প্রতি আমার একটা পার্সোনাল গ্র্যাটিচ্যুড ছিল। যদিও তাঁর লগে আমার পরিচয় খুব কম। তোফায়েল-রাজ্জাক বলল, 'আমরা যদি এইটা ডাইরেক্টলি বলি, উনি (বঙ্গবন্ধু), আবার ডিফেন্সের ব্যাপারে, এইটা ঠিক না।'

তোফায়েল বলল, 'এক কাজ করেন, এইটা আপনে বলেন।' আমি রাজ্জাক আর মনসুর আলীর সঙ্গে আলাপ করি। মনসুর আলী তখন হোম মিনিস্টার।

আমি গেছি শেখ সাহেবের কাছে। ছাদের ওপর বইসা আছে। গেলাম ওপরে। বললাম। বলল, কী? হি (মুজিব) ওয়াজ টেকেন অ্যাব্যাক (উনি চমকে উঠলেন)। মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়াউর রহমানের একটা ভালো রোল ছিল। কিন্তু এর যে একটা খারাপ রোল ছিল, এইটা শেখ সাহেব জানত। আমি তো জানতাম না।

যেদিন কিলিংটা হইয়া গেল, আমি ফার্স্ট টেলিফোনটা করলাম তোফায়েলকে। তোফায়েল তখন বাসায়। তোফায়েল বলল, 'আমার বাসার চাইরদিকে তো আর্মি আছে।' সে এর আগে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে গেছিল। রক্ষীবাহিনীরে অ্যাকটিভেট না করে সে চইলা আসে, আর আটকা পড়ে।

শেখ মুজিবের কিলিংয়ের সঙ্গে জিয়াউর রহমান ইনভলভ্‌ড ছিল, এইটা আমার সন্দেহ। জাসদও ছিল। কর্নেল তাহেরতো ইনভলভড ছিলই। কর্নেল তাহের থাকলে হাসানুল হক ইনু ওয়াজ ইনভলভড। ইনুরে জিজ্ঞাসা করলে ইনু আমতা আমতা করে। আর্মির সঙ্গে এরা কিন্তু মোটামুটি ইনভলভড ছিল, ডিসটেন্টলি হইলেও। অ্যাকটিভ পার্ট না নিলেও তাদের নলেজে ছিল। আর তাহেরের তো পুরাপুরি সম্মতি ছিল।[৫৮]

সেনা কর্মকর্তাদের বেশিরভাগই জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। কর্নেল কাজী মোহাম্মদ সফিউল্লাহকে ব্রিগেডিয়ার হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ করা হলে অনেকেই মনক্ষুণ্ন হন। কিছুদিন পর কর্নেল জিয়াউর রহমানকেও ব্রিগেডিয়ার পদ দিয়ে ডেপুটি চিফ অব স্টাফের নতুন একটি পদ তৈরি করে তাঁকে সেখানে বসানো হয়। পরে দুজন একই সঙ্গে মেজর জেনারেল হন। এই পদায়ন নিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে চাপা ক্ষোভ ছিল। বিষয়টা ঢাকায় ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদদাতা আমানউল্লাহর নজর এড়ায়নি। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

আমি নানান কাজে মাঝেমাঝে ক্যান্টনমেন্টে যেতাম। মেজর হাফিজকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনি। ওর বাবা ডা. আজহারউদ্দিন ছিলেন আমাদের হাউজ ফিজিশিয়ান, আমার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। ওর মায়ের সঙ্গেও আমার মায়ের খুব ভালো সম্পর্ক। বরিশাল শহরে একই গলির ধারে আমরা এক সময় থাকতাম। তো একদিন কী একটা কাজে গিয়েছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। ভাবলাম হাফিজের সঙ্গে দেখা করি। ওর বাসায় গেলাম, ক্যাজুয়াল ভিজিট। কথা প্রসঙ্গে ও বলল, 'সফিউল্লাহকে চিফ করা ঠিক হয়নি। শেখ সাহেব ভুল করেছেন। হি উইল হ্যাভ টু পে ফর ইট।'[৫৯]

সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে সফিউল্লাহর নিযুক্তির ব্যাপারে প্রথম থেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন জিয়াউর রহমান। প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী নূরুল ইসলাম চৌধুরী এ কথা জিয়াউর রহমানের মুখ থেকেই শুনেছেন অনেকবার। জিয়ার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন :

> স্বাধীনতা লাভের পর খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে নাখালপাড়ার এমপি হোস্টেলে আমি প্রায় ছয়-সাত মাস অবস্থান করেছিলাম। তখন জেনারেল জিয়া প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন, মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি জেনারেল সফিউল্লাহ ব্যাচমেট হলেও কৃতিত্বের দিক থেকে তিনি ওপরের দিকে ছিলেন। তাই সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের পদটি তারই পাওয়া উচিত ছিল।
>
> পদাতিক বাহিনীর কাঠামোবিন্যাস নিয়ে একদিন আমি প্রতিরক্ষা সচিব মুজিবুল হক, জেনারেল সফিউল্লাহ এবং জিয়ার সঙ্গে আলোচনাকালেই খবর পাই, বঙ্গবন্ধু সফিউল্লাহকে তিন বছরের মেয়াদ শেষে আরো তিন বছরের জন্য সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেছেন এটা জানার পর জিয়াউর রহমান অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি আমার অফিসে এসে আমাকে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে বলেন প্রতিরক্ষা সচিব মুজিবুল হককেও বিষয়টি জানান আমি জিয়াউর রহমানকে দু-এক দিন অপেক্ষা করতে বলি এবং বিষয়টি বঙ্গবন্ধুকে জানাই সেদিন বঙ্গবন্ধু খুবই রেগে গিয়ে বলেন, 'তুমি এখনই তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তুমি জানো না, জিয়া অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী সে অনেককে দিয়ে বাকশালের সদস্য হওয়ার জন্য আমার কাছে সুপারিশ করেছে. সে ধৈর্য ধরতে জানে না। আমি এখন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদেরই সদস্য করেছি, পরে হয়তো তাকেও করব ' এ কথা শোনার পর আমি বঙ্গবন্ধুকে বললাম, 'পদাতিক বাহিনীর কাঠামোবিন্যাসের জন্য জিয়াকে আমার আরো কিছুদিন দরকার ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে আপনার আদেশের জন্য পাঠিয়ে দেব।' এতে বঙ্গবন্ধু সম্মত হলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনের সবকিছু না বলে আমি জিয়াউর রহমানকে জানালাম যে, সফিউল্লাহর নিযুক্তির ব্যাপারে বর্তমানে কিছুই করতে চান না রাষ্ট্রপতি। আমি সেনাবাহিনীর কাঠামোবিন্যাস চূড়ান্ত করার জন্য পদত্যাগের আগ পর্যন্ত জিয়ার কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা করে বললাম, আগামী ১ সেপ্টেম্বর তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করা হবে। এতে জেনারেল জিয়া সম্মত হন।
>
> ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ঘটার দুদিন আগে সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ সেনাবাহিনীর মধ্যে কিছু ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরে আমাকে অবহিত করেছিলেন। আমরা বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে

আলোচনা করি। বঙ্গবন্ধুও মনে হয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের কাছ থেকে এর কিছু আভাস পেয়েছিলেন। ডিজিএফআই প্রধান ও আমার সঙ্গে আলোচনা করে বঙ্গবন্ধু সফিউল্লাহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন। কিন্তু কেন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলো না বা সম্ভব হয়নি তা আমার এখনো অজানা। এর দু-তিন দিন পরই ঘটে এ দেশের ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ।[৬০]

সেনাবাহিনীতে ক্ষোভ ছিল। সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জিয়াউর রহমান নিজেও ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছিলেন। এমনকি ভারতীয় দূতাবাসও বাদ যায়নি। ভারতীয় কূটনীতিক জে এন দীক্ষিতের ভাষ্য অনুযায়ী :

আমি এখনও ওই দিনগুলোর কথা স্মরণ করি, যখন জিয়াউর রহমান মাঝে মধ্যে কথাবার্তা বলতে আমার বাসায় আসতেন এবং মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের প্রাপ্য সম্মান না দেওয়ার কারণে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তিক্ততা প্রকাশ করতেন। এই ক্ষোভের কারণ ছিল। ক্র্যাকডাউনের (২৫ মার্চ ১৯৭১) আগে মুজিবের ঘোষণাগুলো বাদ দিলে জিয়াই প্রথম সেনা কর্মকর্তা যিনি চট্টগ্রাম রেডিও থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। যেসব কর্মকর্তা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তাঁদের রেখে দেওয়া নিয়েও ক্ষোভ ছিল।[৬১]

৮

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট ও লক্ষ্য নিয়ে নানান মত আছে। এ ব্যাপারে অভ্যুত্থানকারী ফারুক রহমান এক সাক্ষাৎকারে অনেক খোলামেলা কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারটি ১৯৯২ সালের ১৪ আগস্ট ধানমন্ডিতে ফ্রিডম পার্টির অফিসে নেওয়া হয়েছিল। ফারুকের বয়ান ছিল :

আমি স্বীকার করছি, শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যার ঘটনা মর্মন্তুদ না হলেও দুঃখজনক। শেখ মুজিব ইজ দ্য ভিকটিম অব দোজ হু আর বেনিফিসিয়ারিজ অব হিজ লাইফ লং পলিটিক্যাল একটিভিটিজ।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, বেসামরিক রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যদি সততা ও দায়িত্বজ্ঞান থাকত, তাহলে শেখ মুজিব আজও বেঁচে থাকতেন। তাঁকে মরতে হতো না। তিনটি বড় ভুল তাঁর পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। প্রথমত, দেশে ফেরার পর নিজেকে প্রধানমন্ত্রী না করে তাঁর উচিত

ছিল শুধু দলীয় প্রধান হিসেবে থাকা। দ্বিতীয় ভুলটা ছিল আওয়ামী লীগকে সবকিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরা অর্থাৎ শুধু একজন আওয়ামী লীগারই শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশি—এই ধারণা সৃষ্টি করা। তৃতীয়ত, নিজেকে তাঁর একজন 'গড'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ করা। যেকোনো ধরনের ফাইলে তাঁর সই লাগত।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এটাও সত্য যে, জনগণের সর্বোত্তম ইচ্ছায় তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই আমি পাকিস্তানিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।

পাকিস্তান থেকে ফিরে না এলে তিনি জনগণের হৃদয়ে চির অমর হয়ে থাকতেন। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি ছিলেন অযোগ্য। তিনি জাতিকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাঁর আসলে আর কিছুই দেওয়ার ছিল না।...

৩২ নম্বরে অভিযান চলাকালে শেখ মুজিবের টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। তিনি প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে জেনারেল সফিউল্লাহ, জিয়াউর রহমান, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখের সঙ্গে কথা বলেছেন। কথা বলেছেন ঢাকার বিদেশি মিশনগুলোর সঙ্গে। শুধু ভারতের সঙ্গে লাইন ডাউন ছিল। এটাও আমরা করিনি। আল্লাহ করেছেন। জেনারেল সফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বলার সময় কর্নেল রশিদ তাঁর কাছে ছিলেন।

১৫ আগস্টের আগে ১৫ মাস এ নিয়ে আমি ভেবেছি। শান্তিপূর্ণ কোনো পথ খুঁজে পাইনি। ওই সময় বামপন্থীরাও তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। রক্তপাত ছিল অনিবার্য। আমি না করলে অন্য কেউ করত। এড়ানো যেত না।

আমার পরিকল্পনার পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র নেই। আমিই এ ঘটনার একক নায়ক। ১২ আগস্টের আগ পর্যন্ত আমি, আমার স্ত্রী এবং চট্টগ্রামের হাফিজ (অন্ধ দরবেশ) ছাড়া অন্য কেউ জানত না। এ নিয়ে আসলে তৎকালীন সামরিক অফিসারদের কাউকে বিশ্বাস করার উপায় ছিল না।

আমার সামনে দৃষ্টান্ত ছিলেন লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন। জিয়াউদ্দিন এক পর্যায়ে জিয়াউর রহমান, শওকত আলীর মতো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সম্মতিক্রমে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'সকলের ইচ্ছা আপনি এখন সরে দাঁড়ান।' পরে শেখ সাহেব যখন তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, ওই অফিসাররা অস্বীকার করলেন। পরিণতিতে তাঁকেই চাকরি খোয়াতে হয়। ভায়রা বলেই কর্নেল রশিদকে দলে ভেড়াতে সাহস করেছিলাম।[৬২]

আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে রশিদ ও ফারুকের দেওয়া কয়েকটি সাক্ষাৎকারে ওই সময়ের পরিস্থিতির কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এ নিয়ে একমাত্র ডালিমই একটি বই লিখেছেন। তাঁদের বর্ণনার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি

লক্ষ্য করা যায়। ফারুক দাবি করেছেন, তিনিই অভ্যুত্থানের মূল হোতা। পরে তিনি বিষয়টি রশিদকে জানিয়েছিলেন তাঁর সমর্থন পাওয়ার জন্য। রশিদ দাবি করেছেন যে, তিনি অনেকদিন ধরেই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছিলেন। অভ্যুত্থানের পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য খন্দকার মোশতাককে তিনিই ভিড়িয়েছেন। খন্দকার মোশতাক দাবি করেছেন, তিনি আগে থেকে কিছুই জানতেন না। তাঁকে ডেকে আনা হয়েছে অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য। অভ্যুত্থানের আগে বা পরে তাঁরা সবাই স্বীকার করেছেন যে তাঁরা শেখ মুজিবের সরকারকে উৎখাত করতে চেয়েছেন। ডালিম এই অভ্যুত্থানের লক্ষ্যগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এভাবে :

> —বাকশালকে হটিয়ে প্রথমে একটি অসামরিক অন্তর্বর্তী সরকার ও পরে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা, জনগণ ও জাতীয় সংসদের মধ্যে যার পর্যাপ্ত সমর্থন আছে;
> —মে. জে. সফিউল্লাহকে সরিয়ে মে. জে. জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর প্রধান এবং জেনারেল ওসমানীকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা;
> —সামরিক আইন জারি ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি জাতীয় সরকার গঠনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে সাহায্য করা।[৩]

চুয়াত্তরের ডিসেম্বরের শেষে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলে সিরাজুল আলম খান গোপনে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। পঁচাত্তরের মার্চে একবার ঢাকায় এসেছিলেন। কয়েকদিন পর তিনি আবার কলকাতায় চলে যান। ১৫ আগস্টের পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাহিত্য সম্পাদক রায়হান ফিরদাউস মধু কলকাতায় যান। ছাত্রলীগের সভাপতি আ ফ ম মাহবুবুল হক বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সিরাজুল আলম খানকে ব্রিফ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁকে। মধু কলকাতায় পৌঁছে তিন-চারদিন পর ভবানীপুরের রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোডে চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে সিরাজুল আলম খানের দেখা পান। চিত্ত সুতার স্বাধীনতার আগে থেকেই কলকাতায় থাকতেন এবং ভারত সরকারের সঙ্গে শেখ মুজিবের যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বাড়িটি ছিল মুজিববাহিনীর যোগাযোগের কেন্দ্র। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে চিত্ত সুতার বরিশালের একটি আসন থেকে আওয়ামী লীগের টিকিটে জাতীয় সংসদের সদস্য হলেও থাকতেন কলকাতায়। মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতেন।

মধুর মনে হয়েছিল, 'সিরাজ ভাই খুবই কনফিউজড'। তাঁর সঙ্গে আলোচনা

করে মধু বাংলাদেশের পরিস্থিতি, জাসদের ভূমিকা এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ইংরেজিতে একটি চিঠির খসড়া তৈরি করেন। এরপর মধু গেলেন দিল্লি। সেখানে বাংলাদেশ হাইকমিশনের তৃতীয় সচিব ছিলেন মো. কামালউদ্দিন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং মুহসীন হল ছাত্রসংসদের সাবেক সহসভাপতি (১৯৭০-৭২)। কামালউদ্দিন বললেন, চিঠিটা তিনি দিল্লির চীনা দূতাবাসে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন।[৬৪]

৯

কোন পরিস্থিতিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে, তা নিয়ে অনেক অ্যাকাডেমিক আলোচনা আছে। শুধু ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব দিয়ে বিষয়টি বোঝা যাবে না। মোটা দাগে তিনটি কারণ নির্দিষ্ট করা যায়। (১) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রিকতা, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত কর্তৃত্বের পরম্পরা, শৃঙ্খলা, সংহতি, জাতীয়তাবোধ এবং কৃচ্ছ্রতা সামরিক বাহিনীতে এক ধরনের মনস্তত্ত্ব তৈরি করে যা তাদের 'দেশপ্রেমহীন লুটেরা' এবং 'দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের' কবল থেকে দেশকে রক্ষা করতে উৎসাহিত করে; (২) রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতা, যেমন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নড়বড়ে অবস্থান, বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন, নিচুমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি—এ সব কিছু সামরিক বাহিনীকে রাজনীতির মঞ্চে টেনে আনে; (৩) সামরিক বাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, উপদলীয় চক্র, গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও কারও কারও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়।[৬৫]

এটা ঠিক যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট। ১৯৭১ সালের চেতনা ১৯৭৪ সালে এসে হারিয়ে গিয়েছিল সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বাড়ছিল . সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট শৃঙ্খলা ছিল না। গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বও ছিল

সেনাবাহিনী নিয়ে শেখ মুজিব অস্বস্তিতে ছিলেন। একদিকে পেশাদারত্বের অভাব, অন্যদিকে দলাদলি ও কোন্দল, এসব তাঁর না জানার কথা না পাকিস্তান থেকে বাঙালি সেনাসদস্যরা ফিরে এলে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে জ্যেষ্ঠদের একজন মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে তিনি বিডিআর-এর মহাপরিচালক নিযুক্ত করেছিলেন। জেনারেল খলিল শেখ মুজিবের বন্ধুর মতো। তাঁরা দুজনই ছাত্রজীবনে কলকাতার বেকার হোস্টেলে সতীর্থ ছিলেন। চুয়াত্তরের শেষের দিকে বিডিআর-এর একটি প্যারেডে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী

শেখ মুজিব। ওই সময় আক্ষেপ করে জেনারেল খলিলকে তিনি বলেছিলেন, 'আমি রওয়ালপিন্ডিতে সিহালা ডাকবাংলোতে ওই শয়তান ভুট্টোকে বলেছিলাম যে, আমাকে অন্তত ২০ জন সামরিক অফিসার এখনই দিয়ে দাও। ভুট্টো রাজি হয়েছিল। কিন্তু কথা রাখেনি। যদি কথা রাখত তবে আজ আমাদের সেনাবাহিনীর এই অবস্থা হতো না।'[৬৬]

১৯৭৩ সালের শেষদিকে পাকিস্তান থেকে বাঙালিরা ফিরে আসতে শুরু করলে সেনাবাহিনীতে তাদের আত্মীকরণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান ফেরত সৈনিকদের নিয়ে একই সামরিক বাহিনী হওয়া উচিত কি না, এ নিয়ে বিতর্ক ছিল। মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের দ্রুত কয়েক ধাপ পদোন্নতি দেওয়ায় পাকিস্তানফেরত অনেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার অপেক্ষাকৃত জুনিয়রদের অধীনে কাজে যোগ দিতে হয়। মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানফেরত এই বিভক্তির ফলে সেনাবাহিনীতে বিভেদ ও বিদ্বেষ গড়ে ওঠে। লে. জে. খাজা ওয়াসিউদ্দিনকে জেনারেল ওসমানী সেনাপ্রধান করতে চেয়েছিলেন। শেখ মুজিব ও অন্য সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতারাও একজন সিনিয়র অফিসারের হাতে সেনাবাহিনীর ভার দিতে চেয়েছিলেন। এ অবস্থায় কিছু তরুণ কিন্তু প্রভাবশালী মুক্তিযোদ্ধা সামরিক কর্মকর্তা ও অসামরিক নেতা জোরালোভাবে এর প্রতিবাদ করেন এবং শেখ মুজিবকে সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে আলাপের সূত্র ধরে জেনারেল খলিলের দেওয়া বিবরণে জানা যায় :

> সেদিন তোফায়েল ও রাজ্জাক আলোচনা প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন, 'খলিল ভাই, আরেকটা মারাত্মক ভুলও আমরা করেছি! প্রধানত জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে কিছু সামরিক অফিসারের প্ররোচনায়। এঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর কাছে। বলেছিলাম, জেনারেল ওয়াসি সেনাবাহিনীর প্রধান হতে পারেন না। সেনাবাহিনীর প্রধান হবেন একজন বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধা। জেনারেল ওয়াসি বাঙালি নন। মুক্তিযুদ্ধে জেনারেল ওয়াসির অবদানের কথা এবং তাঁর জন্য তাঁর ব্যক্তিগত ত্যাগের কথা তুলে ধরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু আমরা মানিনি। অবশেষে অত্যন্ত অনিচ্ছায় তিনি রাজি হলেন। সফিউল্লাহ ও জিয়াউর রহমানকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে তাঁদের সেনাবাহিনীর প্রধান ও ডেপুটি প্রধান নিযুক্ত করলেন।'....
>
> আমি সেদিন তাঁদেরকে আরো প্রশ্ন করেছিলাম, যদি ওয়াসিকে সেনাবাহিনীর প্রধান করা হতো, তবে কি ইতিহাস অন্য রকম হতো না? তাঁদের উত্তর ছিল, 'নিঃসন্দেহে। ওয়াসি ছিলেন ইংরেজ আমলের নিয়মতান্ত্রিক ধারার সৈনিক। নিয়মতান্ত্রিকতা ছিল তাঁর রক্তে। দুদিনেই তিনি

পুরো সেনাবাহিনীকে বিশৃঙ্খলামুক্ত করে তাকে একটি সুশিক্ষিত সংগঠনে পরিণত করতেন।'[৬৭]

নানা কারণে সামরিক বাহিনীর প্রায় সবাই ছিলেন ভারতবিরোধী। তাঁরা মনে করতেন, তাঁরা একাত্তরে কাজ শেষ করার পর ভারতীয় বাহিনী স্রেফ ঢুকে পড়েছে। যুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনীর ফেলে যাওয়া উন্নতমানের সব অস্ত্রশস্ত্র ভারত নিয়ে যাওয়ায় সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ ছিল। ভারতবিরোধী মনোভাব ক্রমে মুজিববিরোধিতায় রূপ নেয়। সেনাবাহিনীর লোকেরা মনে করত তারা অবহেলার শিকার। প্রধানমন্ত্রীপুত্র শেখ জামাল যুক্তরাজ্যের স্যান্ডহার্স্ট থেকে চার মাসের একটা সংক্ষিপ্ত কোর্স শেষ করে ঢাকায় ফিরে এলে তাকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাকে গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে বসানো হবে বলে গুঞ্জন ছিল। সরকারি প্রশাসনের মতো সামরিক বাহিনীকেও বাকশালের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে বলে প্রচার ছিল। যখন অভ্যুত্থান হলো, দেখা গেল যে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুব্ধ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা মাত্র ১৪০০ সৈন্যের সমর্থন নিয়ে একটা সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। অভ্যুত্থানটি ছিল আচমকা, দ্রুত এবং নৃশংস।[৬৮]

ভারতের সঙ্গে 'গোপন চুক্তি' নিয়ে দেশে অনেক হইচই হয়েছে। ড. কামাল হোসেন এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, দুই দেশের মধ্যে কোনো গোপন চুক্তি ছিল না, যদিও এ নিয়ে অনেক প্রচার ছিল। অভ্যুত্থানকারীরা পরে পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়ে 'গোপন চুক্তি'র খোঁজ করেছিল। সেটা আর পাওয়া যায়নি।[৬৯]

পাকিস্তান আমলে সম্ভাব্য শত্রুর (ভারত) আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। ছয় দফায় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ওই পথে হাঁটেননি। বরং সনাতন ধারার সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার জাতীয় রক্ষীবাহিনী তৈরি করে তাকে সেনাবাহিনীর দৃষ্টিতে একটা প্রতিপক্ষ হিসেবে তুলে ধরেন। এর ফল হয়েছিল নেতিবাচক। ১৯৭৩ সালের শেষে পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনীর আটকেপড়া বাঙালি সদস্যরা ফিরে এলে শেখ মুজিব তাদের অবসরে পাঠাতে বা অন্য কোথাও নিয়োগ দিয়ে পুনর্বাসন করতে পারতেন। কিন্তু এটা না করে তিনি তাদের প্রায় সবাইকে সামরিক বাহিনীতে নিয়ে নেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পুরস্কার হিসেবে সামরিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা সদস্যরা চাকরিতে দুই বছরের সিনিয়রিটি পেয়েছিলেন। পাকিস্তান-প্রত্যাগত সেনা কর্মকর্তাদের অনেককেই তাঁদের জুনিয়রদের অধীনে যোগ দিতে হয়েছিল। ফলে সামরিক বাহিনীতে তৈরি হয়েছিল দ্বন্দ্ব। শেখ মুজিব সামরিক বাহিনীতে এক ধরনের 'ভালোবাসা ও ঘৃণার'

সম্পর্ক তৈরি করলেন। একটি স্বচ্ছ প্রতিরক্ষা নীতি তৈরি করতে না পারার কারণে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমার সেনাবাহিনী'। কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল অবহেলা আর বঞ্চনার ক্ষোভ।[৭০]

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তাঁর দলের মধ্যে ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। স্বাভাবিকভাবেই অভিযোগের তীরটি খন্দকার মোশতাকের বিরুদ্ধে। অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খন্দকার মোশতাক বলেছিলেন, অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। মেজররা শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি তাদের অনুরোধে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন; কেননা সরকার গঠনে বিলম্ব ভারতীয় হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিত।[৭১] এ ব্যাপারে সাবেক রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহ, যিনি খন্দকার মোশতাকের সরকারে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন, বলেছেন :

> আমাকে মোশতাক সাহেব দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলেন যে, তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জড়িত নন; কেবল ঘটনাচক্রের শিকার তবে একথা বলেছিলেন যে, তিনি জানতেন বঙ্গবন্ধুকে অন্তরীণ রাখা হবে। এটা বলেছিলেন আগস্টের শেষে কোনো এক শুক্রবারের জুমার নামাজের পর . কিন্তু পরে আমি অবগত হই যে, তিনি সবই জানতেন।
>
> কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে ইঙ্গিতে বলেছিলেন এরা অনেককিছুই জানতেন যাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন তাঁরা '৭৫-এর ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। এরা বিতর্কের উর্ধ্বে এবং উচ্চাসনেই আছেন।[৭২]

শেখ মুজিবের প্রতি মোশতাকের প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল, তা উঠে এসেছে সাংবাদিক আমানউল্লাহর ভাষ্যে। মোশতাক প্রকাশ্যে কখনো শেখ মুজিবের সমালোচনা করেননি। তবে তিনি নিজেকে অবহেলিত এবং অবদমিত মনে করতেন। মোশতাকের শ্বশুর ফকির সাহেব একসময় বরিশালের এসডিও ছিলেন। ওই সময় তাঁর সঙ্গে আমানউল্লাহর বাবা রাজনীতিবিদ-আইনজীবী বি ডি হাবিবুল্লাহর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেই সূত্রে মোশতাক আমানউল্লাহকে জানতেন। ১৯৮০ সালে মোশতাক আমানউল্লাহকে তাঁর বাসায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন কথা বলার জন্য। *বাংলাদেশ অবজারভারের* সাবেক সম্পাদক আবদুস সালামও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের আলাপচারিতার সূত্র ধরে আমানউল্লাহ লেখককে এক সাক্ষাতকারে বলেন :

> খন্দকার মোশতাক বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে কাঁচা মরিচের দাম অনেকগুণ

বেড়ে যায়। শেখ মুজিব বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে রক্ষীবাহিনী নামিয়েছিলেন। ফলে মরিচ বাজার থেকে একেবারে উধাও হয়ে যায়। মোশতাকের মতে, বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মতামত উপেক্ষা করে অন্য কোনো মহলের পরামর্শে রক্ষীবাহিনী নামানোর সিদ্ধান্তটি ছিল ভুল এবং স্বেচ্ছাচারিতার একটি উদাহরণ। মুজিব ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। এটা ছিল অ্যারোগ্যান্স অব পাওয়ার।

মোশতাক বলছিলেন, মুজিব ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবেই বাকশাল প্রবর্তন করেছিলেন। বামপন্থীদের প্রতি ক্ষুব্ধ মোশতাক বলেন, 'মণি সিং ও বামপন্থীরা কী মনে করে? তারাই শুধু দাস ক্যাপিটাল পড়েছে? দাস ক্যাপিটাল আমরাও পড়েছি। তবে তারা কমিউনিস্ট হয়েছে, আমরা হই নাই। তারা যেন মনে না করে, আমরা বুঝি সমাজতন্ত্র বুঝি না। আমরাও বুঝি, তবে তাদের ওই ধরনের সমাজতন্ত্র চাই না।'[৭৩]

খন্দকার মোশতাক আহমদ যে একজন 'বিশ্বাসঘাতক', একথা ১৫ আগস্টের আগে কেউ বলেননি। আওয়ামী লীগের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল ছিল। কিন্তু দলের কেউ মুজিব-হত্যা'র ষড়যন্ত্রে অংশ নেবে, এটা ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবেনি। মুজিব পরিবারের জীবিত দুই সদস্য, তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা তখন ব্রাসেলস-এ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সানাউল হকের অতিথি হিসেবে ছিলেন। মুজিব-হত্যার খবর প্রচারিত হওয়ার পর এক মুহূর্তেই তাঁদের পৃথিবীটা বদলে গেল। সানাউল হক শেখ মুজিবের দুই কন্যাকে যেন তাড়াতে পারলেই বাঁচেন। ওই সময় জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। ১৬ আগস্ট সন্ধ্যায় হাসিনা-রেহানা জার্মানিতে পৌঁছে রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে আশ্রয় নেন। হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর ভাষ্যে জানা যায় :

এক পর্যায়ে হাসিনা জানতে চাইল, কে এই ঘটনার নায়ক। আমি বললাম, রেডিও রিপোর্ট থেকে শুনেছি খন্দকার মোশতাকের কথা। হাসিনা কোনো মতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয়। সে বলছিল, তা কী করে হয়। আব্বার সঙ্গে মোশতাক চাচা কত ঘনিষ্ঠ। পরিবারের একজন সদস্যের মতো। তিনি এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডে জড়িত হতে পারেন না।[৭৪]

ব্রাসেলসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সানাউল হককে শেখ মুজিব স্নেহ করতেন। অনেকের অমতে তিনি তাঁকে রাষ্ট্রদূত করেছিলেন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাড়িতে হাসিনা-রেহানাকে আশ্রয় দেওয়া তো দূরে থাকুক, জার্মান সীমান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁদের গাড়ি দিয়েও সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী গাড়ি পাঠিয়ে তাঁদের আনার ব্যবস্থা করেন। সানাউল হক পরে ঢাকায় 'বঙ্গবন্ধু পরিষদের' সদস্য হয়েছিলেন।[৭৫]

মুজিব হত্যায় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র নিয়ে অনেক লেখাজোখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সন্দেহের তীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই তাক করা হয়। ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ এবং মুক্তিযুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। নিক্সন-প্রশাসন এবং নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানি সামরিক জান্তার পক্ষ নিয়েছিলেন। বলা চলে, যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছার বিপরীতেই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী সরকার সমাজতন্ত্রকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছিল। বিষয়টি মার্কিন প্রশাসন সুনজরে দেখেনি। খন্দকার মোশতাকের মার্কিন-ঘেঁষা মনোভাব কোনো লুকানো ব্যাপার ছিল না। আগস্ট অভ্যুত্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা কিংবা পরোক্ষ মদদ ছিল বলে অনেকেই ধারণা করেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদের মূল্যায়ন হলো :

> পনেরো আগস্টের অভ্যুত্থানকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের নানান তত্ত্বের সত্যতা যাই থাকুক না কেন, বাস্তবতা হলো এই যে, প্রায় সকল অভ্যুত্থান অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত হলেও বাইরের শক্তির উৎসাহ পাওয়া বা না পাওয়ার ওপর নির্ভর করে এর সফলতা বা ব্যর্থতা। মুজিব-পরবর্তী সরকারগুলোর সাফল্য যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের উষ্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে আগস্ট অভ্যুত্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।[৬]

সরকারের নানান কার্যকলাপ, বিশেষ করে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার মানুষকে এতটাই ক্ষুব্ধ করেছিল যে সাধারণ মানুষ মনে মনে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাইছিল। রক্ষীবাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হতো। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা তাদের ব্যক্তিগত বিরোধকে কাজে লাগিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষীবাহিনী লেলিয়ে দিত। এ রকম একটা উদাহরণ পাওয়া যায় রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক আনোয়ার উল আলমের বর্ণনায়। বরিশালের আওয়ামী লীগ নেতা আমীর হোসেন আমু ও আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ কোনো একটা গ্রামে কিছু লোকের কাছে বেআইনি অস্ত্র আছে, এই অভিযোগ করেন। আনোয়ার উল আলম যথাস্থানে গিয়ে বাড়ি তল্লাশি করে জানতে পারেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা একেবারে নিরীহ লোক। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ বা অন্য কোনো কারণেই তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। আলম বুঝতে পারলেন, 'রক্ষীবাহিনীর অল্পবয়সী সদস্যদের ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের স্থানীয় অসৎ নেতারা গ্রামের মানুষের মধ্যকার বিবাদ থেকে ফায়দা লুটতে চায়। এতে দুর্নাম হয় রক্ষীবাহিনীর।' আনোয়ার উল আলমের বর্ণনা থেকে জানা যায় :

বরিশালের সাধারণ মানুষের ওপর, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ওপর কী পরিমাণ নির্যাতন হয়েছিল তা বোঝা গিয়েছিল যেদিন বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়, সেদিন। দেশটা ছিল নীরব, নিথর, স্তব্ধবাক। কিন্তু বরিশাল শহরে কয়েক হাজার লোকের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ মিছিল বের হয়েছিল। তবে সেটা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে বলে নয়, তাঁরা আনন্দ মিছিল বের করেছিলেন বরিশালের নির্যাতনকারীদের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন ভেবে।[৭৭]

১০

অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে অনেকেই হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। যাঁরা ঢাকার বাইরে ছিলেন, তাঁরা ঘটনার আকস্মিকতায় কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ওই সময়ের একটি বিবরণ পাওয়া যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তরুণ ক্যাপ্টেন শচীন কর্মকারের কাছ থেকে. শচীন সেনাবাহিনীতে কমিশন পান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়। চুয়াত্তরে কুমিল্লা সেনানিবাসে তাঁর পোস্টিং হয়। ওই সময় কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন কর্নেল মাশহুরুল হক (পরে ব্রিগেডিয়ার)। তাঁকে রাষ্ট্রপতির মিলিটারি সেক্রেটারি করা হলে কর্নেল আমজাদ আহমদ চৌধুরী (পরে মেজর জেনারেল) কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডার নিযুক্ত হন। ১৫ আগস্ট ও তার পরের কয়েকদিনের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন শচীন কর্মকার :

> আমি ছিলাম মূল ক্যান্টনমেন্টের মেইন মেসে, যেটাকে বলে ডিভ মেস। পরের রুমটায় থাকত আর্টিলারির নুরুল ইসলাম। রিপাট্রিয়েশন যখন হয়ে যায়, তখন রুমের স্কেয়ারসিটি হয়ে যায়। আমার রুমে ভাগে পড়লেন আমার কোম্পানির অফিসার হামিদুল হোসেন বীরবিক্রম।
>
> সকালবেলা বাথরুমে। প্যারেডে, পিটিতে যাব। ছয়টা সাড়ে ছয়টা হবে। ওই সপ্তাহে আমি ছিলাম গ্যারিসনের ডিউটি অফিসার। আমাদের রুমে হিটার-টিটার, গিজার নাই। শাওয়ার অনেক ওপরে। আগের দিনের বিল্ডিং, ঝপঝপ শব্দ হয়। সে (হামিদুল) চিৎকার করছে, আমি শুনি নাই। তারপর দরজায় লাথি মাইরা বলল, স্যার, ভাইঙ্গা ফেলব। বাধ্য হইয়া কল বন্ধ করতে হইল। ভাঙবা, কী কারণে ভাঙবা? কয় যে, শেখ সাহেব মারা গেছে। টাওয়েল পেঁচাইয়া কোনো রকমে বাইর হইলাম। আমারে বিশ্বাস করানোর জন্য রেডিওটা জোরে ছাইড়া দিছে। শুনলাম, আমি মেজর ডালিম বলছি...। গলাটা চিনি। আমাদের সঙ্গে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ছিল। তাড়াতাড়ি কাপড়

পইরা আমার সিওরে ফোন করলাম। সিও ছিলেন সৈয়দ আবদুল হান্নান। সুনামগঞ্জ বাড়ি। বললেন, ইউনিফর্ম পরে তাড়াতাড়ি চলে আস। ব্যাটালিয়নে পৌঁছতে পৌঁছতে আমার সিও চইলা আসল। গ্যারিসন ডিউটি অফিসারের আলাদা একটা ফোন থাকে, হটলাইনে সব ক্যান্টনমেন্টে কথা বলার জন্য। মেজর আবেদ, সিলেটে বিডিআর-এর সেক্টর কমান্ডার। বললাম, স্যার, আপনি পিলখানায় বলেন। এভরি ওয়ান আওয়ার, হি ইউজড টু গিভ মি আ কল। আমিও ঢাকায় আমার হটলাইনে স্টেশন হেডকোয়ার্টার, এম এস ব্রাঞ্চ, সবখানে—যেখানে আমার অ্যাকসেস আছে, ফোন করলাম।

যখন কনফার্ম হইয়া গেলাম যে অ্যাসাসিনেশন হ্যাজ রিয়েলি হ্যাপেনড, তখন আমরা ডেপ্লয়মেন্ট করলাম। দেখলাম বারো থেকে তেরো জন সোলজার পালাইয়া গেছে। আতঙ্ক। যখন শুনছে বর্ডারে ভারতীয় সেনাবাহিনী আসছে—একটা রিউমার—আমাদের সেনাবাহিনীর অনেকে ডেজার্ট করল। ঘণ্টা দুয়েক পরে ব্রিগেড কমান্ডার আমজাদ খান চৌধুরী আমাকে ডাকলেন। বললেন, যদি সম্ভব হয়, তাহলে বিবিরবাজার, আমাদের কাছেই কুমিল্লা বর্ডারে, দেখ যে ভারতীয় সেনাবাহিনী কতদূর অগ্রসর হইছে এবং তারা আসলে সীমান্ত অতিক্রম করবে কি করবে না। ফিল্ড ইনটেলিজেন্সের আতিককে বললাম, চল যাই। আমরা ইউনিফর্ম খুইলা সিভিল ড্রেস পরলাম। একটা স্মাগলাররে ধরলাম। এতদিন পিটাইতাম, এখন স্মাগলার হইলাম। গিয়া দেখলাম যে ডেপ্লয়মেন্ট আছে। সতর্ক অবস্থা। দূর থেইকা ফরমেশন দেইখা বুঝতে পারলাম দুই-একটা সাঁজোয়া গাড়ি আছে, হালকা আর্টিলারি। মনে হইল, একটা ব্যাটালিয়ন প্লাস একটা ব্রিগেড পর্যন্ত মুভমেন্ট আছে। আমরা পাঁচটা-ছয়টার মধ্যে ব্যাক কইরা আসলাম। সন্ধ্যায় একটা স্টাডি পিরিয়ড টাইপের মিটিং ডাকলেন আমজাদ সাহেব, ফলোড বাই ডিনার। আমরা কী দেখলাম, এটা বললাম।

বিভিন্ন লোক, কেউ লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কী আছে, আমরা তো, এই সব। আবার কেউ বলল, আমরা ভারতীয় বাহিনীর কাছে প্রতিযোগিতায় কিছুই না। এইসব বিভিন্ন রকম কথা। সবাই জিজ্ঞেস করল, অ্যাজ আ কমান্ডার হোয়াইট ইজ ইয়োর ইনস্ট্রাকশন টু আস। উনি একটা চমৎকার ইংরেজি বলেছিলেন, যেটা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। দ্য মেয়ার প্রেজেন্স অব ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যাট দ্য সাইড অব দ্য বর্ডার ইজ এনাফ থ্রেট ফর দিস ফরমেশন। আই উইল নট পুট মাই আনআর্মড সোলজার্স ইন ফ্রন্ট অব আর্মড ট্যাংক, র‍্যাদার আই উইল ফলো দেয়ার ইনস্ট্রাকশন। এই ধরনের কোনো ইমপ্রপোরশনেট যুদ্ধের কথা আমি বলতে পারি না। যুদ্ধ কোনো সলিউশন না। এটা কূটনৈতিক সলিউশনের মাধ্যমেই

যা কিছু হইতে হবে। এবং সেটা পলিটিক্যাল নেতারাই করবে। আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমার জায়গায় তুমি হলে কী করতা? বললাম, স্যার, আমি এই দুইটার মধ্যে একটাও করতাম না। বলতাম, ইউনিফর্ম খুইলা লুঙ্গি পইরা আর্মস আর অ্যাম্যুনিশন নাও, বাড়িতে চইলা যাও। বললেন, তাতে কী লাভ হইত? বললাম, অন্য কিছু না করে প্রতিরোধ যুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ করার জন্য বলতাম। না হইলে কমসে কম ডাকাতি করতাম। ডাকাতি করলে ইন্ডিয়ান আর্মি থাকতে পারবে না। আইনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। আসাম-উলফা, ওদের অনেক সমস্যা আছে। বাঙালি তো সুস্থ থাকতে পারে না, ডাকাতি-টাকাতি করবে। শান্তিরক্ষী বাহিনী আসবে। সভরেনটি রক্ষা করার কাজ কিছু একটা হবে স্যার। জাতিসংঘ আসলে তো আমার সভরেনটি কাইড়া নিবে না। বললেন, ইট ইজ আ নটোরিয়াস আইডিয়া, নেভার থট অব। এই হইল ১৫ আগস্টে আমার অভিজ্ঞতা।

দুই বা তিনদিন পরে আমাকে কোনো একটা কাজে আর্মি হেডকোয়ার্টারে আসতে হলো। আর্মির গাড়ি দেখলে সবাই রাস্তা থেইকা দৌড় দেয়। মোটামুটি একটা আরামের মধ্যে আসলাম। ক্যান্টনমেন্টে ঢুকেই, ফার্স্ট থিং যেটা আমার কাছে সিগনিফিকেন্ট মনে হইছে যে, দেশে একটা ডাকাত পড়ছে। মনে হইল লুটেরার রাজত্ব। রেডিও অফিসে দেখলাম চেনাশোনা একটা অফিসার, নাম বলা ঠিক হবে না। কোনো এক আওয়ামী লীগ নেতার আত্মীয়, ক্যাপ্টেন। কিছুদিন আগে চাকরিচ্যুত হইছে। সে দেখি যে ইউনিফর্ম পইরা ওখানে আছে। বলল যে, বৃহত্তর কিছু অর্জন করতে হইলে ক্ষুদ্র কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। ওখানে আমার বন্ধু ছিল একটা, ডেপুটি ডাইরেক্টর আপেল মাহমুদ। তো আপেলের ওইখানে ঢুকলাম। সিঙ্গাড়া খাইলাম। ও আবার সব পক্ষের লোক। আমাদের যেমন প্যানিক আছে, ওর নাই। পিয়নটা চা আনতে দেরি করল। বাইর হইয়া তারে পিটান দিল। সুইট ঝাড়ি দিল। উর্দুতে গালি দিল, দেরি হচ্ছে কেন আনতে। আমি ইউনিফর্ম পরা, ঘাতকদের একজন না হইয়া যাই। ওর আচরণে আরও ভয় পাইয়া গেলাম। কোনো রকমে সিঙ্গাড়া-টিঙ্গাড়া খাইয়া মানে মানে কাইটা পড়লাম।

আর্মি হেডকোয়ার্টারে আইসা দেখলাম যে, আমাকে তো রিপোর্ট করতে হবে লগ এরিয়াতে। দেখলাম সিচুয়েশন কন্ট্রোলে। কে দায়িত্বে আছে বুঝা যায় না। এটা একটা স্বাস্থ্যকর সিচুয়েশন না আমার জন্য। সিজিএস খালেদ মোশাররফরে দেখলাম এক নজর। উনি আমারে ইশারা করলেন থাকতে। উনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ওখান থেকে বের হইয়া... ক্যান্টনমেন্টের ওখানে কয়টা ফলের দোকান ছিল, হাবিব ফ্রুটস ছিল। একটা ফোনের জায়গায় গিয়া জানালাম যে, চলে আসতেছি। বিমানের ক্যাটারিং

স্টেশন ছিল। সেখানে সাকের ভাই ছিলেন। ওনার ওইখান থেকে ফোন করলাম। উনি ক্যুর বিবরণ দিলেন। দেখলাম বিকাল হইয়া গেছে। ভাবলাম সকালে যাই, রাতটা কাটাই। ওয়াপদার ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন মাহফুজ আলম বেগ। উনি আমার যুদ্ধকালীন কমান্ডার ছিলেন। ওনি থাকতেন বনানী ওয়াপদা স্টাফ কোয়ার্টারে। আমি আইসা ওনাকে কানেক্ট করলাম। শাজাহানপুর-খিলগাঁয় থাকতেন বীর উত্তম শাজাহান উমর। যেহেতু আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করা লোক, কীভাবে যেন আমাদের মধ্যে একটা কানেকশন হইল। যদি কাছাকাছি থাকি, তারা সকালে ওয়াপদা বিল্ডিংয়ে আসবে। কর্নেল তাহের তখন ড্রেজারে চাকরি করতেন। ডাইরেক্টর ছিলেন।

বেগ সাহেব এবং শাজাহান উমর দুজনই আমার খুব ঘনিষ্ঠ। সেরনিয়াবাত তখন পানিসম্পদমন্ত্রী। বেগ সাহেব শাজাহান উমরের সামনে কর্নেল তাহেরকে জিজ্ঞেস করছে (ইতিপূর্বে সেরনিয়াবাত তাহেরের একটি উপকার করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে টেনে), তাঁকে আপনারা মাইরা ফেললেন? তাহের বললেন, কই, তাঁকে তো মারার কথা না। বেগ সাহেব আমারে বলছে। শাজাহান উমর আমার ঘনিষ্ঠ লোক। বলল, বুঝছিস, কাদের মারার কথা ১৫ আগস্ট, তুই (তাহের) তাহলে জানতিস? একেবারে ইনস্ট্যান্ট শাজাহান উমরের উক্তি। আমি বুঝে নিয়েছি যে, তাহের জানত। দে আর পার্ট অব ইট। এবং গণবাহিনীর ব্যাপারটা, তাহেরতো গণবাহিনীর লিফলেট দিতেন সেনাবাহিনীতে আমি লিফলেট পড়েছি তাদের প্যানিট্রেশন এ রকম! আবার ডিএফআইতে (এখন নাম ডিজিএফআই) তাদের প্যানিট্রেশন! রাজশাহী বিভাগের যে ইনচার্জ ছিল, তার নাম হইল মেজর সেলিম। সেলিম আমাকে ইন্টারোগেট করে, 'র' সম্পর্কে। তখন 'র' কী জিনিস বুঝি না। টু বি ভেরি ফ্র্যাংক। তার কথাবার্তার ধরন যা ছিল, সেই সময়টা, বুঝতে পারতাম। কিন্তু কী রিঅ্যাক্ট করতে হয় সেটা জানতাম না। হি ওয়াজ টকিং টু দ্যাট লেভেল অব ন্যুইসেন্স উইথ মি। আমাকে দুইদিন কনটিনিওয়াসলি জেরা করেন। এটা ১৫ আগস্টের আগের ঘটনা। এই ধৃষ্টতা তাদের ছিল। এইটা ছিল অব্যবস্থাপনা। ওই সময় কোনো কিছুই প্রফেশনালি চালানো হয় নাই। কতখানি প্যানিট্রেশন ছিল গণবাহিনীর? লিফলেট যে দিত, সেটা ডিএফআই-এর বিষয় না। বিষয় হইল, আমি 'র'-এর কি না। অল ফোকাস ওয়াজ মিসলেড, মিসজাজড, মিসগাইডেড। একটা সিকিউরিটি ফোর্সের যা দরকার তার বিন্দুমাত্র ছিল না।

আমি ১৮ আগস্ট ঢাকায় আসি। সম্ভবত ২০ বা ২২ তারিখ চলে যাই। সফিউল্লাহ ইনক্যাপাসিটেড হইয়া গেছিল। অক্ষম। কোনো কমান্ড নাই। কমান্ড সব ওদের হাতে, ঘাতকদের হাতে। আর জিয়া, যেটুকু আমার কাছে

মনে হইছে, এক ধরনের লিভারেজ ছিল। মানে একটা অথরিটি ছিল। ফুল অথরিটি না। ওই সময় অ্যাবসলিউট কন্ট্রোল ছিল বইলা আমার মনে হয় নাই। একজাক্ট সিচুয়েশনটা কী, কেউ বলতে পারতেছে না। এই অবস্থায় আমি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ফিরলাম। তবে এইটা বুঝলাম, কান্ট্রি ইজ বিইং রান বাই ফিউ মেজরস। কুমিল্লা যাওয়ার পর আমি জানি যে, জিয়া অফিশিয়ালি হ্যাজ বিন মেইড চিফ অব স্টাফ।[৭৮]

শচীন কর্মকারের বর্ণনায় কুমিল্লা সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর সমাবেশের যে তথ্য পাওয়া যায়, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বার্তায়ও সেটা লক্ষ্যণীয়। ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার ১৭ আগস্ট ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো তারবার্তায় জানিয়েছিলেন, পশ্চিমে হিলি ও পূর্বে কুমিল্লা সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী শক্তি বৃদ্ধি করেছে বলে খবর এসেছে। 'বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর তৎপরতাকে ভারতীয় সেনা চলাচলের পাল্টা সাড়া হিসেবেই দেখা যেতে পারে।'[৭৯]

দেশের বাইরে হাতেগোনা যে কয়টি দূতাবাস ছিল, তার মধ্যে দিল্লি আর লন্ডন ছিল সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার অধ্যাপক এ আর মল্লিক ঢাকায় এসে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন. ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ছিলেন পেশাদার কূটনীতিক আতাউল করিম। পরে মস্কোয় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শামসুর রহমান খান দিল্লিতে হাইকমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি শেখ মুজিবের খুব ঘনিষ্ঠ এবং 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' অভিযুক্তদের একজন ছিলেন। ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ তিনি দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়পত্র পেশ করেন।

দিল্লির দূতাবাসে প্রায় সবাই ছিলেন শেখ মুজিবের আস্থাভাজন বা অনুগত। কর্নেল আবুল মনজুর (পরে মেজর জেনারেল) ছিলেন মিলিটারি অ্যাটাশে। ওই সময় কর্নেল এরশাদ দিল্লিতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের (এনডিসি) প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। হাইকমিশনে তৃতীয় সচিবের দায়িত্বে ছিলেন মো. কামালউদ্দিন। তিনি ওই সময়ের একটি বিবরণ দিয়েছেন :

কর্নেল মনজুর ছিলেন খুবই ভদ্র। তিনি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন না। আমাদের কারও বাসায় দাওয়াত থাকলে তিনি আগে এসে দুঃখ প্রকাশ করে চলে যেতেন। তিনি সত্যিই দেশকে ভালোবাসতেন। আমাকে বলে রেখেছিলেন, 'এরশাদ যদি কোনো কারণে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তুমি রিসেপশনে বলে রাখবে আমার সঙ্গে যেন দেখা না হয়।'

১৫ আগস্ট ছিল ভারতের স্বাধীনতা দিবস। প্রথা অনুযায়ী সকালে

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লালকেল্লা থেকে ভাষণ দিচ্ছেন। শ্রোতাদের মধ্যে কূটনীতিকদের জন্য সংরক্ষিত জায়গায় বসে আছি। হঠাৎ কেউ একজন পেছন থেকে ঘাড়ে হাত দিয়ে আমাকে কিছু বলতে চাইল। ব্যাপারটা কূটনীতিকদের জন্য শোভন না। আমি ঘুরে তাকাতেই দেখলাম ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়ার একজন কূটনীতিক। বললেন, 'তুমি কি জানো, তোমার দেশে কী ঘটেছে? তুমি যে এখনো বসে আছো? আমি অবাক হয়ে বললাম, 'জানি না তো!' সে আমাকে বলল, তুমি মিশনে যাও, রেডিও শোনো।'

সামনের দিকে আমাদের হাইকমিশনের কয়েকজন কর্মকর্তা ছিলেন। তাদের কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মিশনে ফিরে এসে দেখি কর্নেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। ওদের কলেজ আমাদের দূতাবাসের পায়ে হাঁটা দূরত্বে। আমি তখন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। তিনি আমাকে বললেন :

—আপনি কি হাইকমিশনের লোক?

—হ্যাঁ, আমি থার্ড সেক্রেটারি।

—এই ছবিটা কেন এখানে আছে?

—কোন ছবিটা?

—ওই যে, ওই যে, শেখ মুজিবের ছবি। ওইটা নামান।

—আপনার কথায় তো এটা নামানো সম্ভব না? আমাদের কাছে যদি নির্দেশ আসে, তাহলে নামাব।

—বাহ্ আপনি তো একটু অন্যভাবে কথা বলেন?

ছবি আমি নামাইনি। দুপুরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন জার্মানি থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে এলেন। আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রটোকল অফিসার। তাঁকে হাইকমিশনারের বাসায় নিয়ে গেলাম। তাঁরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। কামাল হোসেন একদিন হাইকমিশনারের বাসায় ছিলেন।

এরকম একটি ঘটনা ঘটতে পারে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মনে হয় বুঝতে পারেনি। তারা আমাদের কয়েক সপ্তাহ অফিসে যেতে নিষেধ করেছিল। আমরা এক সপ্তাহ যার যার বাড়িতেই ছিলাম। এরপর দূতাবাসে যাওয়া শুরু করি।[৮০]

১১

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে ইন্দিরা গান্ধী বিচলিত হয়েছিলেন, ইন্দিরার বন্ধু ও জীবনীকার পুপুল জয়াকারের লেখায় বিষয়টি ওঠে এসেছে। জয়াকারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর প্রধান আর এন কাও বলেছিলেন, মুজিবকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সালেই এবং বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের গোপন তৎপরতার খবর তাঁর কাছে ছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি ইন্দিরাকে জানিয়েছিলেন এবং ইন্দিরা তাঁকে এ নিয়ে কথা বলার জন্য ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। কাও এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা বাগানে হাঁটছিলাম। আমি মুজিবকে বললাম, আমাদের কাছে তথ্য আছে যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কিন্তু তাঁর মধ্যে উদ্বেগ ছিল না। বললেন, 'আমার কিছুই হবে না। ওরা তো আমারই লোক। আমি তাঁকে আমাদের পাওয়া সুনির্দিষ্ট তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলাম।' পঁচাত্তরের মার্চে কাও জানতে পারেন যে বাংলাদেশের গোলন্দাজ বাহিনীতে মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ইন্দিরা সঙ্গে সঙ্গেই মুজিবকে তা জানিয়েছিলেন। কিন্তু মুজিব এটা বিশ্বাস করেননি। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের জাতির জনক; তাঁর লোকেরা তাঁকে খুন করতেই পারে না। চুয়াত্তরে এমন খবরও ছিল যে বাংলাদেশের বাইরে থেকেও ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ১৫ আগস্টের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে জয়াকার বলেন :

> আমি ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় ইন্দিরার বাসায় গিয়েছিলাম। দেখলাম তিনি ভয়ে আচ্ছন্ন। নিজেকে নিরাপদ মনে করার চিন্তাটা একেবারে তলানিতে পৌঁছে গেছে। লালকেল্লা যাওয়ার ঠিক আগে তিনি হত্যাকাণ্ডের খবরটি শুনেছিলেন। সযত্নে তৈরি করা ভাষণটি তিনি দিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো ঘোষণা দেওয়ার কথা তাঁর মনে হয়নি।
>
> তিনি আমাকে বলেছিলেন, মুজিব হত্যা হলো ষড়যন্ত্রের প্রথম অধ্যায় যা গোটা উপমহাদেশকে প্রভাবিত করবে। তিনি নিশ্চিত যে তিনিই হবেন পরবর্তী লক্ষ্য। মুজিবের ছোট ছেলের খুন হওয়ার খবরটা তাঁর সব চিন্তা এলোমেলো করে দিয়েছিল . তিনি ভয় পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি গোয়েন্দা রিপোর্টকে গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু এটা উপেক্ষা করা আর ঠিক হবে না।' তিনি সব ব্যাপারেই সন্দেহপ্রবণ হলেন এবং সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। ছায়ার মধ্যেও তিনি শত্রু দেখতে পান। আমাকে বললেন, 'কাকে বিশ্বাস করব? রাহুল (ইন্দিরার ছেলে রাজীব গান্ধীর পুত্র) মুজিবের ছেলের প্রায় সমান বয়সী। কাল তার অবস্থাও এমন হতে পারে। তারা আমাকে এবং আমার পরিবারকে শেষ করে দেবে।'[৮১]

মুজিব হত্যা ইন্দিরার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ইন্দিরা তাঁর আস্থাভাজন আর এন কাওকে বলেছিলেন, 'আমি ভালো নেই। আমি এক ঘরে ঘুমাই, সঞ্জয় (ইন্দিরার ছোট ছেলে) ঘুমায় পাশের ঘরে। যদি কিছু ঘটে যায়, ওকে ডাকতে পারব।' দুটো ঘরের মধ্যে এক চিলতে বারান্দা। মুজিবের মৃত্যুর পর থেকে ইন্দিরা তাঁর ঘরের দরজা খোলা রাখতেন।[৮২]

খন্দকার মোশতাক আহমদকে মার্কিনপন্থী এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে সোভিয়েত প্রভাবাধীন বলয়ের একজন হিসেবে মনে করা হতো। ১৫ আগস্টের পর ওই দুটি দেশের প্রতিক্রিয়ায় এর প্রতিফলন দেখা যায়। একটি মার্কিন দলিলে মন্তব্য করা হয়, '১৯৭৫ সালের আগস্টে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত, অকার্যকর এবং সহিংসতাপ্রবণ হয়ে ওঠা সরকারের পতন ঘটাতে সংকল্পবদ্ধ তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের পরিচালিত অভ্যুত্থানে মুজিব নিহত হন।' অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়ায় মুজিব হত্যাকাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। ১৯ আগস্ট *প্রাভদায়* প্রকাশিত একটি নিবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি মার্কিন দলিলে বলা হয়, মুজিব ও তাঁর পরিবারকে হত্যাকারী 'কসাই'দের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর 'বিয়োগান্ত' মৃত্যুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ 'তীব্র শোক প্রকাশ করছে।'[৮৩]

আগস্ট অভ্যুত্থানে সবচেয়ে খুশি হয়েছিল পাকিস্তান। ইসলামাবাদে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরি আলফ্রেড বাইরোড ১৬ আগস্ট ওয়াশিংটনে পাঠানো এক তারবার্তায় (তারবার্তা নং ১৯৭৫ইসলামা০৭৫০৪) উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তান সরকার স্থানীয় সময় বেলা দুটোর দিকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে ভুট্টোর একটি বিবৃতি সরবরাহ করে। বিবৃতিতে বলা হয় :

> বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের প্রতি আমাদের প্রথম ও স্বতঃস্ফূর্ত শুভেচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমি পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে ৫০ হাজার টন চাল, ১ কোটি গজ কাপড় (লং ক্লথ) ও ৫০ লাখ গজ সুতি কাপড় উপহার হিসেবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাংলাদেশের ভাইদের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এসব জিনিসই আমাদের জনগণের অকিঞ্চিৎকর অনুদান এবং আমাদের মধ্যকার সংহতির প্রতীক, আর এই সংহতি ধ্বংস হওয়ার নয়; যা এমনকি ১৯৭১ সালের বিয়োগান্ত ঘটনায়ও নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি।
>
> আমরা আমাদের সাধ্যের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণের জন্য বৃহত্তর ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত। কারণ বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে আমরা অভিন্ন জাতিসত্তা ও ভবিষ্যতের বন্ধনে আবদ্ধ। বিশ্ববাসী জানুক যে আমরা সুখে-দুঃখে ঐক্যবদ্ধ।

> আমরা ইসলামি সম্মেলনের সদস্যদের প্রতি ইসলামী প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি এবং আমরা তৃতীয় বিশ্বের সব দেশের প্রতি একই অনুরোধ জানাই। আমাদের এই আবেদন বেদনামথিত অনুভূতিতে সিক্ত। যে অনুভূতি আমাদের অনুভবে সারাক্ষণ জাগরূক তা হলো, কীভাবে একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশকে বিভক্ত করা হয়েছিল।
>
> শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিয়োগান্ত পরিণতির ঘটনায় আমি দুঃখ প্রকাশ করি।[৮৪]

ভুট্টোর বিবৃতিতে বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করার কারণ হলো, ১৫ আগস্ট সকালে বেতারে মেজর ডালিম বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এটা তিনি ঝোঁকের মাথায় বলেছিলেন, না কি এর পেছনে কোনো পরিকল্পনা ছিল, তা জানা যায়নি। তবে ১৫ আগস্ট সকালে অনেককেই খুশিতে ডগমগ হতে দেখা গিয়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা অনেকেই ভেবেছিলেন, একাত্তর-পূর্ববর্তী অবস্থাটি ফিরে না এলেও পাকিস্তানের সঙ্গে মাখামাখি বাড়বে, এমনকি কনফেডারেশনের বন্দোবস্তও হয়ে যেতে পারে। যে কোনো কারণেই হোক, খন্দকার মোশতাক ওই পথে পা বাড়াননি। এ বিষয়ে একটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায় *দ্য স্টেটসম্যান*-এর সম্পাদক মানস ঘোষের এক নিবন্ধে। নিবন্ধটি ছাপা হয়েছিল ২০১১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। মানস ঘোষের ভাষ্য অনুযায়ী, ভারতের হাইকমিশনার সমর সেন ১৫ আগস্ট দিল্লিতে ছিলেন। তিনি ১৬ আগস্ট কলকাতা হয়ে ঢাকা পৌঁছান। ১৮ আগস্ট তিনি বঙ্গভবনে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে দেখা করেন। মোশতাক দাঁড়ানো থাকা অবস্থায় তিনি একটি কূটনৈতিক নোট পড়ে শোনান। এটা শুনে মোশতাক বিমর্ষ মুখে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েন। নোটে লেখা ছিল :

> যদি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করা হয় এবং কোনো দেশের সঙ্গে কনফেডারেশন করা হয়, তাহলে ভারতের কাছে থাকা বৈধ চুক্তির আওতায় ভারতের সেনাবাহিনী যথাযথ পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু আপনি যদি নাম পরিবর্তন এবং তথাকথিত কনফেডারেশনের ধারণা থেকে বিরত থাকেন, তাহলে ১৫ আগস্ট থেকে যা-ই ঘটুক না কেন, তাকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করবে।[৮৫]

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৭ আগস্ট ভারতের এক সরকারি বিবৃতিতে বাংলাদেশের ঘটনাবলিকে 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। চীনের সংবাদ সংস্থা অভ্যুত্থানের খবর দিলেও কোনো মন্তব্য করেনি।[৮৬]

১২

শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর তাঁকে নিয়ে আরবিতে একটি কবিতা লিখেছিলেন মওলানা শেখ আবদুল হালিম। তিনি ছিলেন টুঙ্গিপাড়া মসজিদের ইমাম। শেখ মুজিবকে দেখেছেন ছেলেবেলা থেকে। তাঁর জানাজাও পড়িয়েছেন তিনি। কবিতাটি সংগ্রহ করে এর বাংলা তরজমা করেন নির্মলেন্দু গুণ। গুণের দাবি, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে লেখা এটাই প্রথম কবিতা।[৮৭] কবিতার পংক্তিগুলো এ রকম :

> হে মহান, যার অস্থি-মজ্জা, চর্বি ও মাংস এই কবরে প্রোথিত; যার আলোতে সারা হিন্দুস্তান, বিশেষ করে বাংলাদেশ আলোকিত হয়েছিলো।
>
> আমি আমার নিজেকে তোমার কবরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেছি, যে তুমি কবরে শায়িত।
>
> আমি তোমার মধ্যে তিনটি গুণের সমাবেশ দেখেছি : ক্ষমা, দয়া ও দানশীলতা।
>
> নিশ্চয়ই তুমি জগতে বিশ্বের উৎপীড়িতদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলে, সেইহেতু অত্যাচারীরা তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে।
>
> আমি/আমরা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের কাছে তাদের বিচারের প্রার্থনা জানাই, যারা তোমাকে বিনা-বিচারে হত্যা করেছে।
>
> আমরা মহান আল্লাহর নিকট তোমার আখিরাতের মঙ্গল কামনা করি।
>
> বিদায়! বিদায়! বিদায়, হে মহান জাতির জনক।[৮৮]

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আরবিতে লেখা মওলানা শেখ আবদুল হালিমের কবিতা

পালাবদল

দেশটা যেন হঠাৎ করেই বদলে গেল। ১৬ আগস্ট লন্ডনে বসবাসরত প্রায় দুশো বাঙালি মোশতাক সরকারের প্রতি সমর্থন জানাতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে যান এবং দেয়ালে ঝোলানো শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ভেঙে চুরমার করে দেন। হাই কমিশনের ৫০ জন কর্মচারির মধ্যে কয়েকজন তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নতুন সরকারের পক্ষে স্লোগান দেন।[১]

১৭ আগস্ট *ইত্তেফাকে* প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, মওলানা ভাসানী ১৬ আগস্ট খন্দকার মোশতাকের কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় নতুন সরকারের প্রতি 'পূর্ণ সমর্থন' জানিয়েছেন এই পরিবর্তনকে তিনি 'এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' বলে অভিহিত করেন এবং দেশের বুক থেকে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি নির্মূল করার এবং অনিশ্চয়তার অবসান ঘটানোর আহ্বান জানান। তিনি মোশতাকের উদ্দেশে বলেন, 'আল্লাহ আপনার ও নয়া সরকারের সহায় হোন।'[২]

ভাসানী তখন টাঙ্গাইলে গ্রামের বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। সেখান থেকে তড়িঘড়ি করে তিনি একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন, এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। রাজনৈতিক মতভিন্নতা সত্ত্বেও পুত্রবৎ শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডকে স্বাগত জানানোর ব্যাপারটি সাজানো কেচ্ছা বলে সন্দেহ হয়। নতুন শাসকদের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্য অতি উৎসাহী কোনো কর্মকর্তা এ কাজটি করে থাকতে পারেন। ভাসানীর নামে এই বিবৃতিটি দেওয়া হলেও এটা তৈরি করেছিল সরকারের তথ্য দপ্তর এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে তা গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়।[৩] এর একদিন পরেই ভাসানীকে সরকারি উদ্যোগে ঢাকায় এনে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খন্দকার মোশতাক তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যান। পত্রিকার প্রথম পাতায় এই সাক্ষাতের ছবি ফলাও করে ছাপা হয়েছিল।

মোহাম্মদ তোয়াহা বাংলাদেশে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় কিছুদিন শেখ মুজিবের আশ্রয়ে ছিলেন। কিন্তু এজন্য তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল

না। ১৮ আগস্ট সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিবৃতিতে বলা হয়, 'বিগত ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনী রুশ-ভারতের নিয়ন্ত্রিত খুনি দুর্নীতিবাজ মুজিব সরকারকে উৎখাত করেছে। দেশবাসী তাতে আনন্দিত। আমরাও সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশকে স্বাগত জানাই।'[৪]

জাসদ, ইউপিপি এবং জাগমুই ১৫ আগস্টের পর একটি বিবৃতি তৈরি করেছিল। ২০ আগস্ট বিবৃতিটি লিফলেট আকারে প্রচার করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, 'বাকশাল ছিল এক ব্যক্তির নিষ্ঠুর ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা, যার অবসান আমাদের কাম্য ছিল। কিন্তু মোশতাকের নেতৃত্বাধীন সামরিক শাসনও কাম্য নয়।'[৫]

২০ আগস্ট জারি করা সামরিক আইন ১৫ আগস্ট সকাল থেকে কার্যকর হয়েছে বলে ঘোষণা দেওয়া হলো। ২১ আগস্ট *বাংলাদেশ অবজারভারের* প্রধান সম্পাদকীয় মন্তব্যের শিরোনাম ছিল 'ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার' (ভয় থেকে মুক্তি)।[৬]

BANGLADESH OB...
DACCA THURSDAY AUGUST 21 1975

Freedom From Fear

power lies in the esta-
of a domain of peace
the very best use of
the service of the multi-
fies its existence in the
of its intrinsic quality.
ased applies to the re-
of international peace and
ples of comity of nations on
basis of sovereignty and terri-
ial integrity of respective na-
ions under the integral power of
national cohesiveness achieving a
universal balance through friend-
ship with all and malice against
none, trust needs have its root at
home and cultivation in all spheres
the closest quarters. Only a peo-
and nation at peace with itself
uinely powerful and in full
ession of the strength derived
national integrity.

Crossing over a vital adminis-
ive change, the new Govern-
t of the People's Republic of
gladesh directs its attention to
nal cohesion and peace born
ple's unstinted co-operation
ity at home as it extends
to all with malice to
tional understand-
... for remedy

strictly observe justice free f...
bias, whether personal or ...
in honour of individual free...
subservient, however, to
greater interest of the nation.
The impartial approach is
reflected in the clear assuran...
the new Government that n...
would be harassed for reason...
political opinion, inclination,
tions, and there has been no ar...
arrest so far on that ground. T...
Government's call to every pat...
tic citizen to re-dedicate himself
the service of the people wit...
sense of devotion to raise the
tion from the morass of accu...
lated evils would find a ready re...
ponse from every genuine lover of
Bangladesh. All false apprehension
and misunderstanding must go so
that the nation may participate as
a body in the present posture...
affairs and lead the country to
cherished goal of prosperity...
peace. The Government's ...
for no fear in disowning the ...
of favour is pertinent in so ...
a free clear national climate ...
precondition for people's ...
cipation, ...
fair, and ...
ment to ...

২১ আগস্ট প্রকাশিত *অবজারভারের* সম্পাদকীয় : ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার

জাতীয় লীগের সভাপতি এবং আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আতাউর রহমান খান বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ১৫ আগস্টকে 'নাজাত দিবস' হিসেবে আখ্যা দেন. জাতীয় সংসদের স্পিকার আবদুল মালেক উকিল কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলনে যোগ দিতে লন্ডন গিয়েছিলেন। লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেন, জাতি ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিছুদিন পর, বাকশালের ১৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য মহিউদ্দিন আহ্‌মেদ খন্দকার মোশতাকের একটা ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন পাওয়ার আশায় মস্কো যান। প্রায় প্রতিদিন গণমাধ্যমে মোশতাকের নেওয়া পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি ছাপা হতে থাকে।[৭]

২৩ আগস্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামারুজ্জামান, আবদুস সামাদ আজাদ, কোরবান আলীসহ ২০ জন আওয়ামী-বাকশাল নেতা গ্রেপ্তার হন। ২৪ আগস্ট মে. জেনারেল সফিউল্লাহকে সরিয়ে মে. জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানী রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।[৮]

দৈনিক বাংলা

নাবাহিনী প্রধান পদে জেঃ জিয়াউর রহমান

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ও পদোন্নতি

রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা পদে ওসমানী
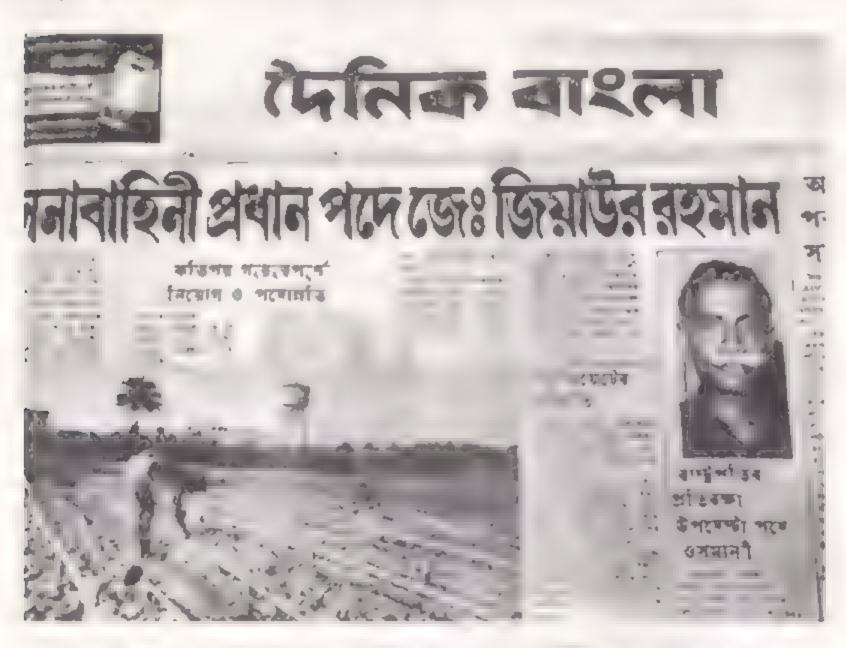
মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তম সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হলেন

সংবিধান বহাল থাকে। ৩০ আগস্ট জারি হয় 'রাজনৈতিক দল (নিষিদ্ধকরণ) অধ্যাদেশ।'[৯] পয়লা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর 'বাকশাল পদ্ধতি' বাতিল করা হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ 'ইনডেমনিটি' অধ্যাদেশ জারি করে ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িতদের আইনি সুরক্ষা দেন। এই আদেশে বলা হয়েছিল, ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত কারও বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।[১০]

৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে একীভূত করার আদেশ জারি করেন। ১৬ অক্টোবর বঙ্গভবনে আবদুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ সদস্যদের একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ময়েজউদ্দিন আহমদ, শামসুল হক ও সিরাজুল হক ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে বক্তব্য দেন।[১১]

অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকারের পক্ষে যথেষ্ট আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া যাবে কি না এ নিয়ে খন্দকার মোশতাকের মনে দুশ্চিন্তা ছিল তিনি প্রকাশ্যে স্থিতাবস্থার পক্ষে থাকার ঘোষণা দেন তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির প্রতি তার সরকার বিশ্বস্ত থাকবে এবং সকল দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি মেনে চলবে। অভ্যুত্থানের পরপর একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে কৌশলগত কারণে তিনি এসব সিদ্ধান্ত নেন। 'সমাজতন্ত্রের' প্রতি মৌখিক সমর্থন বহাল থাকলেও ব্যক্তিখাতকে উৎসাহ দেওয়া হয়। পাট রপ্তানিকারকদের সরাসরি ক্রেতা খোঁজার অনুমতি দেওয়া হয়। সরকারের কথাবার্তায় এবং আচরণে 'ইসলামের' প্রতি দরদ উছলে পড়ে। 'জয়বাংলা' স্লোগানে অনেকেই হিন্দুয়ানি বা ভারতীয় গন্ধ পেতেন। খন্দকার মোশতাক 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলা শুরু করেন। 'জিন্দাবাদ' শব্দটি যে বেশ 'ইসলামিক', এ রকম একটা ধারণা বা পারসেপশন তৈরির চেষ্টা চলে।[১২]

খন্দকার মোশতাক শবে কদরের রাতে একটা নীতিনির্ধারণী ভাষণ দেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে হজের জন্য একটা সরকারি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। যারা আগে 'বন্ধু' ছিল না, অর্থাৎ চীন এবং পাকিস্তান, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার আয়োজন হয়। দিল্লি-ইসলামাবাদ এবং মস্কো-পিকিং থেকে সম-দূরত্ব বজায় রাখার কৌশল নেওয়া হয়। মোশতাক সরকারের আয়ু ছিল প্রায় আড়াই মাস।[১৩]

খন্দকার মোশতাক একটা কালো টুপি পরতেন। শেখ মুজিব একবার বলেছিলেন, 'তোরা জানিস না, ওর কত বুদ্ধি। এই টুপি দিয়েই ঢেকে রাখে।'

এই রামপুরি টুপিকে মোশতাক জাতীয় পোশাকের অংশ বানালেন। দিল্লি হাইকমিশনের কর্মকর্তা কামালউদ্দিন এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের কাছে বার্তা পাঠালেন, পাঁচশো টুপি ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পাঠাও।' উনি জানতেন দিল্লিতে এটা জোগাড় করা সম্ভব। বাণিজ্য শাখায় যাঁরা কাজ করতেন, এ দায়িত্ব তাঁদের ওপর পড়েছিল।[১৪]

২

২ নভেম্বর রাতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সামনে রেখে সেনাবাহিনীতে আরেকটি অভ্যুত্থান হয়। অভ্যুত্থান চলার সময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান—এই চারজন নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। অভ্যুত্থানকারীরা রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাককে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং ৬ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারী সামরিক কর্মকর্তাদের একটি দল খালেদ মোশাররফের সঙ্গে দর-কষাকষি করে ৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় সপরিবারে বিমানে করে ব্যাংকক চলে গিয়েছিলেন।

৩ নভেম্বর সারাদিন ধরেই দু'পক্ষের মধ্যে কথা চালাচালি এবং এক পর্যায়ে আপস হয়। সিদ্ধান্ত হয়, অভ্যুত্থানকারীরা দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। যাওয়ার আগে তাঁরা আলোচনা করে একমত হন যে খালেদ মোশাররফকে হটাতে পারলে জিয়াকে মুক্ত করে তাঁকে আবার সেনাপ্রধান করা হবে এবং মোশতাক আবার রাষ্ট্রপতির পদে ফিরে আসবেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কর্নেল তাহেরের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখবেন। এই আলোচনার সময় তাহের বঙ্গভবনে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ডালিমের বয়ান ছিল এ রকম :

> আমি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে আমাদের আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনাটি জানালাম 'স্যার, আমরা দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি, নূর, পাশা, শাহরিয়ার, হুদা, রাশেদ, রশিদ, ফারুক, মহিউদ্দিন, শরফুল, মাজেদ, কিসমত, নাজমুল, হাশেম এবং মোসলেহউদ্দিন—আমরা সবাই পরিবার নিয়ে আজ রাতেই যাব। রাষ্ট্রপতির সচিবালয় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করছে। আমরা দুঃখিত, আপনাকে ও আপনার সহকর্মীদের সহযোগিতা করতে পারলাম না।'

> 'তোমরা কেন দেশ ছেড়ে যাবে, আমি বুঝতে পারছি না। রশিদ এবং ফারুকের ব্যাপারে আমাদের প্রশ্ন আছে। কিন্তু তোমরা কেন যাবে?' ব্রিগেডিয়ার খালেদ কথাগুলো আবারও বললেন। তিনি বোঝাতে চাইলেন যে এ ব্যাপারে তিনি আন্তরিক। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আমাদের দেশত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা শুনে তিনি খুশি হয়েছেন। তিনি খুশি, কারণ ভেবেছেন তাঁর পথের কাঁটা সরে গেল।
>
> আমাদের ব্যাংকক চলে যাওয়া ছিল একটা কৌশলগত পশ্চাদপসরণ। আমরা দেশকে একটা রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচাতে চেয়েছি। আমরা ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ রাত সাড়ে দশটায় বিমানের একটা বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকা ছেড়ে ব্যাংককের পথে রওনা হলাম।[১৫]

আওয়ামী লীগ নেতা কারাবন্দি আবদুস সামাদ আজাদের দেওয়া এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারা পুলিশ মহাপরিদর্শকের পুরোনো অফিসকে 'নিউ জেল' নাম দিয়ে সেখানে বন্দিদের রাখা হতো। ওখানে কামরা ছিল তিনটা. এক নম্বর কামরায় ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ। দুই নম্বর কামরায় আরও কয়েকজনের সঙ্গে ছিলেন কামারুজ্জামান। তিন নম্বর কামরায় ছিলেন মনসুর আলী ও আবদুস সামাদ আজাদ। খন্দকার মোশতাক আহমদ বঙ্গভবন থেকে আইজি প্রিজনকে ফোন করে অস্ত্রধারী সৈনিকদের জেলের ভেতরে ঢোকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২ তারিখ রাতে তারা এক নম্বর কামরা থেকে সৈয়দ নজরুল ও তাজউদ্দীন ছাড়া অন্যদের অন্য কামরায় সরিয়ে দেয়। দুই ও তিন নম্বর কামরা থেকে কামারুজ্জামান ও মনসুর আলীকে এক নম্বর কামরায় নিয়ে আসা হয়। গভীর রাতে মুক্তিযুদ্ধের এই চার নেতাকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। সেনাবাহিনীর চারজন সদস্য খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়।[১৬]

ভারতীয় কূটনীতিক জে এন দীক্ষিত মনে করেন, ভারত ইচ্ছে করলে এই চারজন নেতার হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে পারত। কেননা, তাঁদের হত্যা করা হতে পারে এ ধরনের তথ্য ভারতের কাছে ছিল। এ প্রসঙ্গে দীক্ষিতের ভাষ্য হলো :

> আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক জিয়াউল হক টুলু পঁচাত্তরের সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটনে এসেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও সামরিক বাহিনীর চক্রান্তকারীরা জেলে আটক আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছে। আমি যেন এই খবরটি ভারত সরকারকে জানাই এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এমন নেতাদের জীবন বাঁচানোর জন্য রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিতে ভারত সরকারকে বলি। আমি বিষয়টি ওয়াশিংটনে ভারতের

রাষ্ট্রদূত টি এন কাউলকে জানাই। তিনি এর আগে আমাদের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। তিনি আমাকে জিয়াউল হক টুলুর দেওয়া তথ্য এবং আমার অনুরোধ সংবলিত প্রতিবেদন তাৎক্ষণিকভাবে ভারত সরকারকে জানানোর জন্য বলেন। আমি নয়াদিল্লিতে বার্তা পাঠালাম এই গুরুত্বপূর্ণ আগাম তথ্যটি জানার পরেও সম্ভবত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আমার মনে হয়, পঁচাত্তরের জুনে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী খুব ঝামেলার মধ্যে ছিলেন। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে ভারতের শক্তি প্রয়োগ বিশ্ব জনমত এবং পরাশক্তিগুলোর কাছে রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতো না।[১৭]

৪ নভেম্বর ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের একটা সম্মিলিত মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে শেখ মুজিবের বাড়িতে যায়। মিছিলে খালেদ মোশাররফের মা এবং ছোট ভাই আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদ মোশাররফ অংশ নেওয়ায় গুঞ্জন ওঠে যে, খালেদ আওয়ামী লীগকে আবার ক্ষমতায় বসাতে চায় মিছিলের প্রধান সংগঠকদের একজন ছিলেন বাকশালের অঙ্গ সংগঠন জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা এবং ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সভাপতি নূহ-উল-আলম লেনিন। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ওই সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন এভাবে :

আমরা রিঅর্গানাইজড হওয়ার জন্য কয়েকদফা বৈঠক করি। সেপ্টেম্বর মাসে আমরা ডিসাইড করলাম, ইউনিভার্সিটি খোলার দিন একটা প্রতিবাদ মিছিল করব। কিন্তু কাউকে টের পাইতে দেওয়া যাবে না। ইউনিভার্সিটি খোলার প্রথম দিন ২০ অক্টোবর আমরা মধুর ক্যান্টিনে সমবেত হলাম। ওখানে আমি, মাহবুব জামান আর ইসমত কাদির গামা বক্তৃতা দিয়া কলাভবনের দিকে একটা ঝটিকা মিছিল করলাম। ভাসানী ন্যাপের অনুসারী ছিল জাতীয় ছাত্রদল। ওরা আমাদের ঢুকতে দেবে না, বাকশালিরা আবার ইউনিভার্সিটিতে কেন, এই সব। ওইদিন আর কিছু হয়নি। দ্বিতীয় দিন যখন আবার মিছিল করলাম, ওরা আমাদের আক্রমণ করল। সে সময় হাতিরপুলের লুকু-লোকমান—খুবই সাহসী—আমাদের সাথে মিলে প্রতিরোধে দাঁড়ায়া গেল। ওরা তখন সবাই ভাগোয়াট। পরে আর সাহস পায়নি আক্রমণ করতে।

প্রথমে আমরা ঠিক করেছিলাম, ২৯ অক্টোবর একটা মৌন মিছিল নিয়া বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাব। দ্যাট ওয়াজ আওয়ার প্ল্যান। পরে ভাবলাম, যদি ওখানে ভালো জমায়েত করতে চাই, তাহলে আরও কিছু হোমওয়ার্ক দরকার। আমরা ডেট ঠিক করলাম ৪ নভেম্বর একর্ডিংলি ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ—এডুকেশন ইনস্টিটিউশনগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলাম,

কারা কোন জায়গায় যোগাযোগ এবং মবিলাইজ করবে। কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথেও কথা বললাম। ওই সময় ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের একটা গোপন বৈঠক হইয়া গেছে। আমরা একটা লিফলেট ছাপাইছিলাম। লিফলেট ডিস্ট্রিবিউট করতে গিয়া খন্দকার শওকত জুলিয়াস, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিদ্দিক অ্যারেস্ট হয়ে গেল। আমরা ঠিক করলাম, জমায়েতে কোনো স্লোগান-ট্লোগান দেব না। শান্তিপূর্ণভাবে যাব—একটা ব্রেক থ্রু করা আর কি।

৪ তারিখ সকালে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গনে সমবেত হই। শুরুতে ছাত্ররাই ছিল। তারপর বেশ কিছু ইয়াংগার রাজনৈতিক নেতা—মানে কোনো প্রতিষ্ঠিত বড় নেতা না—আমাদের সাথে সংহতি জানাতে আসছে। দু-চারজন বুদ্ধিজীবীও আসলেন। মিছিল যখন শুরু করলাম, নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ির ওখানে আমাদের বাধা দেয়। পুলিশের সাথে আমাদের তীব্র বাগবিতণ্ডা হয়।

কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর বাধা উইড্র করল। আমরা দুই সারিতে যাইতেছি, কয়েক ভাগে। সামনে থাকবে সেলিম আর জাতীয় ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা। পেছনে থাকব আমি, নুরু, কাজী আকরাম। কারণ পেছনেও হামলা হতে পারে। মিছিলের মাথা যখন কলাবাগান মাঠের কাছে পৌঁছাইছে, লেজটা রইছে নিউমার্কেটে। এ সময় একজন হোন্ডায় চইড়া আসলেন, শেখর দত্ত। পিছনে আমারে ডাকলেন, জেল হত্যাকাণ্ডের নিউজ দিলেন। বললেন, এটা তো ঘটে গেছে। তোমরা এইটা এখানে বইল না, ভয়-ভীতি হবে। সেলিমরে খবরটা দাও। আমি দৌড়াইয়া সামনে আসলাম। মহিউদ্দিন সাহেব কলাবাগান মাঠ থিকা মিছিলে জয়েন করলেন। তখন তীব্র প্রতিবাদ। উনি তো মোশতাকের এমিসারি হইয়া মস্কো গেছিলেন। মহিউদ্দিন সাহেব ভেউ ভেউ করে কানল। আর একটু যাওয়ার পর কলাবাগানের এই জায়গা থেকে জয়েন করলেন আওয়ামী লীগের রাশেদ মোশাররফ আর তাঁর মা। সেলিমরে আমি খবর দিলাম—

ফরহাদ ভাই খবর দিছে, জেলে এই কাণ্ড ঘটে গেছে। এইটা এখন বলা যাবে না। আমরা ওখানে দাঁড়ায়া সিদ্ধান্ত নিলাম, ফুল দিয়া সবাই চইলা যাব।

বঙ্গবন্ধুর বাড়ির গেটে ফুল-টুল দেওয়া হইল। সবাই কান্নাকাটি, মওলানা জেহাদি মোনাজাত পরিচালনা করল। তারপর আমরা ব্যাক কইরা মধুর ক্যান্টিনে ফিরে আসলাম। বিকাল বেলা প্রতিবাদ সভা ডাকলাম শহীদ মিনারে। খুব ভালো জমায়েত ছিল এইটা বলব না। ভয়ের পরিবেশ অলরেডি সৃষ্টি হয়ে গেছে। তারপরও ছাত্র ইউনিয়নের বড় অংশ উপস্থিত ছিল। ছাত্রলীগের বড় নেতাদের পাই নাই।

গামা-টামারা তখন ছিল না। মমতাজরা কয়েকজন ছিল। ওখান থেকে পাঁচ তারিখে হরতালের ডাক দিলাম। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়।[১৮]

মিছিলে খালেদ মোশাররফের মা ও ভাইয়ের উপস্থিতি দেখে অনেকেই দুয়ে-দুয়ে চার মিলিয়ে আন্দাজ করে নেন, খালেদ মোশাররফের পেছনে আওয়ামী লীগ ও ভারতের সমর্থন আছে, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান হলো আওয়ামী লীগকে আবার ক্ষমতায় আনার 'ভারতীয় ষড়যন্ত্র'। এমনও প্রশ্ন ছিল যে, খালেদের অজান্তেই তাঁর মা এবং ভাই মিছিলে যোগ দিয়ে খালেদের সর্বনাশ ডেকে আনেন। এই মিছিলের অন্যতম উদ্যোক্তা ও সংগঠক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। লেখককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

মিছিল শুরু হবে বটতলা থেকে সকাল ১০টায়। ভোরে আমি মঞ্জু (মঞ্জুরুল আহসান খান) ভাইয়ের শান্তিনগরের বাসায় গিয়েছিলাম। দেখি, তিনি ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। উনি বললেন, ফোনের ওধারে আছেন খালেদ মোশাররফের ভাই, আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদ মোশাররফ। খালেদের মা ওই বাসায় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে খালেদও ওই বাসায় গিয়েছিলেন। এক সময় টেলিফোন ধরলেন খালেদ। মঞ্জু ভাই তাঁকে বললেন, 'আজ তো ছাত্রদের মিছিল আছে। এখানে ডাকসুর ভিপি আছে, ওর সঙ্গে কথা বলুন।' মঞ্জু ভাই ফোনটা আমাকে ধরিয়ে দিলেন। আমি খালেদের সঙ্গে কথা বললাম। আমার ধারণা ছিল এ সময় মিছিল-মিটিং করলে আর্মির সাপোর্ট পাব। মিছিলের প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বললেন, 'দিস ইজ আ সিভিলিয়ান অ্যাফেয়ার। মাই বয়েজ উইল নট ইন্টারফিয়ার (এটা অসামরিক বিষয়। আমার সৈন্যরা বাধা দেবে না)। আপনারা মিছিল করুন, আমার মা এতে যোগ দেবেন।' খুব জলি মুডে ছিলেন। খুবই রিল্যাক্সড মনে হলো তাঁকে, অ্যাজ ইফ মিশন অ্যাকমপ্লিশড।[১৯]

৩

জাসদ-গণবাহিনীর মতে, 'ক্ষমতায় বসেই খালেদ মোশাররফ ভারত-রুশ মহলকে জোরদার করার কাজে লিপ্ত হয়, শেখ মুজিবের ভাবমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয় এবং এর ফলে আওয়ামী লীগ ও তাদের লেজুড় মণি-মুজাফফর চক্র পুনরায় মাঠে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়াস পায়।' ৫ নভেম্বর রাতে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র পক্ষ থেকে ঢাকা সেনানিবাসে প্রচারপত্র বিলি করা হয় এবং সেনাবাহিনীর জোয়ানদের ক্ষোভকে 'উজ্জীবিত ও সংহত' করে প্রতিরোধের

আহ্বান জানানো হয়। জিয়াকে সামনে রেখে সিপাহিরা ৬ নভেম্বর রাতে অভ্যুত্থান ঘটায়। এই অভ্যুত্থানে গণবাহিনীর কমান্ডার লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহেরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[২০]

লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের বীর উত্তম

৭ নভেম্বরের 'সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের' নায়ক হিসেবে পরে আবু তাহেরের নাম প্রচার করা হলেও এটা ছিল জাসদের 'বিপ্লব' সংঘটনের একটা উদ্যোগ। তাহেরকে দলের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।[২১] এ প্রসঙ্গে ডালিমের মন্তব্য হলো, 'আমাদের দেশ ছাড়ার তিন দিনের মধ্যেই, ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সেনা পরিষদ (ডালিমের কথিত সেনাচক্র) এবং কর্নেল তাহেরের গণবাহিনী বিপ্লবের সূচনা করল। জনগণ ১৫ আগস্টের মতো এটাকেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করল।'[২২]

তাহের জিয়ার প্রতি অনুগত সৈন্যদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে সেনানিবাসে ভারত-বিরোধী জিগির তৈরি করতে সমর্থ হন এবং খালেদ মোশাররফকে 'রুশ-ভারতের দালাল' হিসেবে তুলে ধরে এক ধরনের উন্মাদনা তৈরি করেন। কিছু নন-কমিশন্ড এবং জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার সশস্ত্রবাহিনীতে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছিলেন। তাহের এই সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, পরামর্শ দিতেন। তবে সাধারণ সৈনিকদের কাছে জাসদ, তাহের কিংবা 'বিপ্লব' নিয়ে তেমন ভাবাবেগ ছিল না। তাঁরা ছিলেন প্রচণ্ডরকম ভারত-বিদ্বেষী এবং গৃহবন্দি জিয়া তাঁদের কাছে ছিলেন একজন জনপ্রিয় সেনাপতি।

৭ নভেম্বর সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক রকম অস্থিরতা ছিল। আগের রাতেই জাসদপন্থী ছাত্রলীগের নেতারা হলে হলে মিছিল ও সভা করে গেছেন। তাতে তাঁদের বক্তব্য ও স্লোগান শুনে মনে হচ্ছিল দেশে বিপ্লব ঘটে গেছে। জাসদ ছাত্রলীগের নেতা খায়ের এজাজ মাসুদ মুহসীন হলের গেটের সামনে বক্তৃতা দিয়ে রুশ বিপ্লবের সূচনায় অরোরা জাহাজ থেকে গোলা বর্ষণের সঙ্গে সেদিনের ঘটনার তুলনা করেছিলেন ৭ নভেম্বর সকালেও জাসদ ছাত্রলীগের কর্মীদের চোখেমুখে ছিল এক ধরনের উল্লাস।[২৩]

৭ নভেম্বর সকালে ঢাকা সেনানিবাসের দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির অফিস ছিল সকল মনোযোগের কেন্দ্র। চতুর্থ বেঙ্গলের লে. মুনীর (পরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জামাতা) অসামরিক পোশাকে এসে অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল কর্নেল মইনুল হোসেন চৌধুরীকে খবর দেন, জিয়াউর রহমান তাঁকে সেকেন্ড ফিল্ডে যেতে বলেছেন। কর্নেল মইনুল সেখানে গিয়ে জিয়ার সঙ্গে কর্নেল আমিনুল হক ও সুবেদার মেজর আনিসসহ কয়েকজন অফিসারকে দেখতে পান। একটু পরে একটি অসামরিক জিপে করে দুই-তিনজন লোকসহ লে. কর্নেল (অব) তাহের এসে হাজির হন। এসেই তিনি জিয়াকে রেডিও স্টেশনে যেতে অনুরোধ করেন। মইনুল ও অন্য অফিসাররা জিয়াকে রেডিও স্টেশনে যেতে নিষেধ করেন। এ সময় কর্নেল আমিনুলের সঙ্গে তাহেরের ঝগড়া বেঁধে যায়। এক পর্যায়ে আমিনুল তাহেরকে বলেন, 'আপনারা (জাসদ) তো ভারতের বি টিম'। তাহের রেগেমেগে সেখান থেকে চলে যান। পরে জিয়ার একটা বক্তৃতা টেপ করে রেডিওতে প্রচারের জন্য পাঠানো হয়।[২৪]

সেনানিবাসে যারা সৈনিকদের সংগঠিত করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন নায়েব সুবেদার মাহবুবুর রহমান। ১৯৭৩ সালে তিনি জাসদের সংস্পর্শে আসেন। তখন জাসদের সভাপতি মেজর (অব.) জলিল সেনাবাহিনীর ভেতরে 'সাংগঠনিক' যোগাযোগগুলো রাখতেন। চুয়াত্তরের ১৭ মার্চ জলিল গ্রেপ্তার হয়ে

গেলে দায়িত্বটি এসে বর্তায় তাহেরের ওপর। এ প্রসঙ্গে সুবেদার মাহবুবের বিবরণটি এ রকম :

> মেজর জলিল গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর কর্নেল তাহের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে লাল মসজিদের পাশে আমার বাসায় এসেছিলেন। তার হাতে মেজর জলিলের চিঠি। চিঠিতে লেখা, এখন থেকে কর্নেল তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ করতে হবে।
>
> আমরা অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান, অ্যান্টি-আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিব বলল, সেনাবাহিনীর দরকারই নাই। আমরা তো আর্মিই ছিলাম। সিরাজ সিকদার মারা যাওয়ার পর জাসদই একমাত্র অ্যান্টি-ইন্ডিয়ান, অ্যান্টি-মুজিব।
>
> ১৯৭৪ সালের ১৫ এপ্রিল কর্নেল তাহেরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ও আলাপ। ২০ জুন আমাদের এক গোপন মিটিং চলাকালে কর্নেল তাহের বলে উঠলেন, জেনারেল জিয়াও আমাদের সঙ্গে আছেন। জেনারেল জিয়াকে বহুদিন ধরে চিনি, জানি। উনি খুবই ভাল এবং বহুদিন হতে একত্রে কাজ করছি এবং আমার খুবই আপন। ৬ নভেম্বর (১৯৭৫) বিকাল ২টায় ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে কর্নেল তাহেরের বড় ভাই আবু ইউসুফের বাসায় কর্নেল তাহেরসহ গণবাহিনী ও জাসদের নেতা এবং আমরা গোপন মিটিং করি। সংগঠনের প্রধান সিরাজুল আলম খান ছাড়া প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলাম। সভা শেষে কার কী কাজ তা ভাগ করা হলো।
>
> রেভুল্যুশন সাকসেসফুল হলে কার ওপর ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে? কর্নেল তাহের প্রস্তাব করলেন জেনারেল জিয়ার নাম। বললেন, জেনারেল জিয়া আমার লোক, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন হতে আজ অবধি তাকে আমি চিনি, জানি। ও ভাল লোক, সৎ ও দেশপ্রেমিক।
>
> আমাদের বিপ্লব বিনা রক্তক্ষয়ে সম্পূর্ণ সফল হওয়ার পর ৭ নভেম্বর ভোরে জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দি হতে মুক্ত করে এনে সর্বময় ক্ষমতা হস্তান্তর করি। এর পরে এবং জেনারেল জিয়ার ভাষণ মোতাবেক আমাদের জীবনের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ হারায়ে ফেলি এবং জীবন বাঁচানোর জন্য যার যার মতো আত্মগোপন করি এবং জেনারেল জিয়ার কার্যকলাপ দূর হতে লক্ষ করতে থাকি। পরবর্তীতে জিয়া একে একে সব বিপ্লবী সেনাদের বন্দি করে। আমার যতটুকু ধারণা, কর্নেল তাহের, গণবাহিনী ও জাসদ সবার একই অবস্থা। ৭ নভেম্বর ৭.৩০ মিনিটের পর জিয়ার সঙ্গে সব ধরনের কাজকর্ম ও কথাবার্তা কাট অফ হয়ে যাওয়ার কথা।
>
> জিয়ার সঙ্গে তাহেরের কী কথা হয়েছে তা আমি জানি না। তাহের আমাকে বলল, যদি রেভুল্যুশন সাকসেসফুল হয়, তাহলে জিয়াকেই ক্ষমতায় বসানো হবে। সে দেশপ্রেমিক। ৭ নভেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় গেলাম। জিয়া ভয়ে কাঁপতেছিল।

৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পূর্বাপর সম্পর্কে লেখককে দেওয়া নায়েব সুবেদার মাহবুবুর রহমানের হাতে লেখা বিবরণের একটি অংশ

ক্যান্টনমেন্টে বেশ কয়েকজন অফিসার মারা হয়। হত্যাকাণ্ডের দোষ আমাদের ওপর চাপানো হয়। সুবেদার সরোয়ার ৭ নভেম্বর বিকালের দিকে শ্লোগান দিল—সিপাহি সিপাহি ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই। ৭ তারিখে কেউ মরলো না, ৮ তারিখে এতগুলো অফিসার কেন মরলো? তাহের কাউকে হত্যা করতে বলেনি। আমরা তো তাদের ব্যাজ খুলে বের করে দিয়েছিলাম?

৭ নভেম্বর ছিল দুই কুত্তার ঝগড়া। খালেদ মোশাররফ ছিল ইন্ডিয়াপন্থী। জিয়া ছিল আমেরিকাপন্থী।

৮ নভেম্বর দুপুর ১টায় কর্নেল তাহেরের সঙ্গে দেখা করার জন্য এলিফ্যান্ট রোডে সার্জেন্ট আবু ইউসুফের বাসায় যাই। দেখি কর্নেল তাহের টেলিফোনে আলাপ করছেন। টেলিফোনের রিসিভারটা জোর করে রেখে বললেন 'বিট্রেয়ার'। আমি বললাম, স্যার কে? তাহের বললেন জেনারেল

জিয়া। তাহের বললেন, সুবেদার সাহেব কাজ করেন, আপনার সুইসাইড কমান্ডো ফোর্স তৈরি করেন গাদ্দার জিয়াকে ক্ষমতা হতে সরানোর জন্য। আমি বললাম, এখন মোটেই সম্ভব না। কী বলে আজ সিপাহিদের একত্র করব? আমরা কী জন্য কী উদ্দেশ্যে সিপাহি জনতার বিপ্লব করেছি এবং কারা কারা করেছে, তার কোনো কিছুই প্রকাশ হয় নাই। এই বলে হতাশ ও ক্ষুণ্ন মন নিয়ে বিকাল ৫টায় বাসায় ফিরলাম আর চিন্তা করতে থাকলাম, ফাঁসি অনিবার্য। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এতিম হয়ে দ্বারে দ্বারে মানুষের লাথি খাবে আর মানুষে গাদ্দারের ছেলেমেয়ে বলে ধিক্কার দিবে।[২৫]

৭ নভেম্বর সকালে খালেদ মোশাররফ এবং তাঁর দুই সহযোগী কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা এবং লে. কর্নেল এ টি এম হায়দার অভ্যুত্থানকারীদের হাতে নিহত হন। এ তিনজনই ছিলেন একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা।

৭ নভেম্বর সকালে নিহত হন খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম

এক সাক্ষাৎকারে খালেদ মোশাররফের স্ত্রী সালমা খালেদ বলেছেন, 'খালেদ কোনোভাবেই আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল বা ভারতপন্থী ছিলেন না। এসব অপপ্রচার। তাঁর মা ও ভাইয়ের সেই হঠকারি কাজের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।' জিয়ার সঙ্গে খালেদের 'পার্সোনালিটির ক্ল্যাশ ছিল, তবে খালেদ রক্তপাত চাননি এবং তাঁর উদ্যোগে নভেম্বরে রক্তপাত হয়ওনি'।[২৬]

খালেদ-হুদা-হায়দারের হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। কী পরিস্থিতিতে এবং কার নির্দেশে তাঁদের হত্যা করা হলো, তার যথাযথ অনুসন্ধান আজও হয়নি। তবে সন্দেহের তীর কার দিকে, এ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায় কর্নেল হুদার স্ত্রী নীলুফার হুদার বিবরণ থেকে।

কর্নেল হুদা ছিলেন রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার। ১৯৬৮ সালে তিনি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' অভিযুক্তদের অন্যতম ছিলেন। পঁচাত্তরের ৯ নভেম্বর তাঁর খোঁজে নীলুফার হুদা ঢাকায় এসে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁদের কথাবার্তা ছিল এ রকম :

> নীলু : জিয়া ভাই, আপনি থাকতে হুদা মারা গেল কীভাবে? ওকে কে মারল? আপনি থাকতে তো ওকে মারার কথা না।
>
> জিয়া : হি ওয়াজ মিসগাইডেড উইথ খালেদ মোশাররফ। দ্যাটস হোয়াই হি ওয়াজ কিলড।
>
> নীলু : খালেদ মোশারবফকেই-বা মারা হবে কেন? তিনি তো আপনাকে মারেননি। যিনি এক ফোঁটা রক্তও ঝরাননি, তাঁকে কেন মারা হলো। আপনার লোকেরা কেন তাঁকে মারবে?[২৭]

নীলুফার হুদার বর্ণনা থেকে জানা যায়, খালেদ-হুদা-হায়দার শেরেবাংলা নগরে সেনাবাহিনীর দশম বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ইউনিটে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন লে. কর্নেল নওয়াজিশ আহমেদ। ৭ নভেম্বর সকালে জিয়া ঢাকা সেনানিবাসে দ্বিতীয় আর্টিলারি রেজিমেন্টের দপ্তরে ছিলেন। নওয়াজিশ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই সময় জিয়ার সঙ্গে অন্যান্য সেনা কর্মকর্তার মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মীর শওকত আলী, মইনুল হোসেন চৌধুরী, আবদুল মান্নাফ, আমীন আহম্মেদ চৌধুরী প্রমুখ। নীলুফার হুদার ভাষ্য হলো :

> লে. কর্নেল আমিন আহমেদ চৌধুরী (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) আমাকে বলেছিলেন যে, প্রথমে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় কোনো এক থানা থেকে সেখানে ফোন আসে কর্নেল শাফায়াত জামিলের অবস্থান নিয়ে। প্রায় একই সময়ে কর্নেল নওয়াজিশ জেনারেল জিয়াকে টেলিফোন করে বলেন যে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা ও মেজর হায়দার

তাঁর ব্যাটালিয়নে অবস্থান নিয়েছেন। জিয়া নওয়াজিশকে বলেন যে, তাঁদের যেন সুরক্ষিতভাবে রাখা হয় এবং তাঁদের কোনো ধরনের চিন্তা না করতে বলেন। নওয়াজিশ জিয়াকে বলেন, তাঁদের জন্য নাশতার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। এই সময় সেই কক্ষে অবস্থানরত কর্নেল তাহের বাইরে যান এবং মিনিট ১৫ পর ফেরত আসেন। এর আধঘণ্টা পর সেখানে আবার টেলিফোনে খবর এল, নওয়াজিশের ব্যাটালিয়নে বাইরে থেকে কিছু পোশাকধারী এসে খালেদ মোশাররফ, হুদা ও হায়দারকে গুলি করে হত্যা করে বেয়নেট চার্জ করেছে।[২৮]

৭ নভেম্বর সারা দিন ঢাকা সেনানিবাসের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। বিকেলের দিকে পরিস্থিতি পুরোপুরি পাল্টে যায়। অফিসাররা আতঙ্কিত হয়ে পরিবার-পরিজনসহ সেনানিবাস ছেড়ে চলে যেতে থাকেন। স্টেশন কমান্ডার লে. কর্নেল হামিদ ওই রাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> ৭-৮ নভেম্বরের ওই বিভীষিকাময় রাত্রে গভীর অন্ধকারে উন্মাদ সৈনিকেরা অফিসারদের রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠল। ঘটে গেল বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ড বহু বাসায় হামলা হলো অনেকে বাসায় ছিলেন না, অনেকে পালিয়ে বাঁচল। সৈনিকেরা মেজর করিম, মিসেস মুজিব, মিসেস ওসমানকে গুলি করে হত্যা করল। মেজর আজিম ও মুজিব চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন। বিপ্লবী সৈনিকেরা তাঁদের এয়ারপোর্টে পাকড়াও করে আজিমকে গুলি করে হত্যা করে। মেজর মুজিব প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হন অর্ডন্যান্স অফিসার মেসে সৈনিকেরা হামলা করে তিনজন তরুণ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন মেজর মহিউদ্দিন, যিনি শেখ সাহেবের লাশ টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে দাফন করেন। সৈনিকেরা কর্নেল ওসমানের বাসায় আক্রমণ করে। ওসমান পালিয়ে যান, তারা মিসেস ওসমানকে গুলি করে হত্যা করে। হকি খেলতে এসেছিল দুজন তরুণ লেফটেন্যান্ট। তাদের স্টেডিয়ামের পাশে গুলি করে হত্যা করা হয়। অর্ডন্যান্স স্টেটে দশ জন অফিসারকে এক লাইনে দাঁড় করানো হয় মারার জন্য। প্রথমজন এক তরুণ ইএমই ক্যাপ্টেন। তার পেটে গুলি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। বাকিরা অনুনয়-বিনয় করলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, বেঁচে গেল তারা অপ্রত্যাশিতভাবে। টেলিভিশনের একজন অফিসার মুনিরুজ্জামান। বঙ্গভবনে খালেদের সময় খুবই অ্যাকটিভ ছিলেন। তাঁকে ধরে গুলি করা হয়। তিন দিন পর তার লাশ পাওয়া যায় মতিঝিল কলোনির ডোবায়। সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের ডাইরেক্টর কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার) খুরশিদ। বিপ্লবীরা তাঁর বাসা আক্রমণ করে কয়েক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করে। তিনি পালিয়ে যান।... সৈনিকেরা দল বেঁধে প্রায় প্রতিটি অফিসার্স কোয়ার্টারে হামলা চালায়।

ভীতসন্ত্রস্ত অফিসাররা বাসা ছেড়ে অন্ধকারে পেছনের পানির ডোবায়, ঝোপে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে সারা রাত কাটায়।[২১]

৭ নভেম্বর রাতে সিপাহিদের গুলিতে ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরে ও বাইরে বেশ কয়েকজন হতাহত হন। ওই রাতে দুজন নারী নিহত হয়েছিলেন। একজন হলেন সেনাবাহিনীর ডাক্তার, মেজর। অন্যজন হলেন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরীর স্ত্রী নাজিয়া ওসমান। আবু ওসমান চৌধুরী সপরিবারে গুলশানের একটা বাসায় থাকতেন। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওই রাতের একটি বিবরণ দিয়েছেন তিনি :

> ওরা আমাকেই মারতে এসেছিল। আমার ওখানে একজন ব্যাটম্যান আর একজন বাবুর্চি ছিল। ওরা আমাকে বলেছে, স্যার আপনি চলে যান
>
> আমি চলে গেলে ওরা?
>
> কিছু হবে না স্যার।
>
> আমাকে তারা পেছনের ওয়ালের উপর দিয়ে ফেলে দিল। আমি পড়লাম ওই দিকে। সেখানে একটা আন্ডার-কনস্ট্রাকশন বাড়ি ছিল। সেখানে কিছু লোক থাকত ওরা আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল আমি বললাম, কিছু হবে না।
>
> সিপাহিরা এখানে ঢুকে নাই। তারা এ বাড়িসহ বেড় দিয়ে ফেলেছে, বেড় দিয়ে আমার বাড়িতে গুলি মারতেছে। ওই গুলিতে আমার ওয়াইফ মারা গেছে। তিনটা গুলি দেখা গেল একটা গুলি ওয়ালে লেগেছে, একটা উনার পায়ে, আর থার্ড গুলিটা লেগেছে তলপেটে। তখন তারা দরজা ভেঙ্গে আমার মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসছে বাইরে। আমাকে পেল না। তখন সিনিয়র একজন বলল, এদেরকে নিয়ে কী হবে? এরা তো বাচ্চা? একজনের দশ-এগারো বছর, একজনের চার-পাঁচ বছর। ওদের ছেড়ে দাও। তখন থাপ্পড়-টাপ্পড় দিয়ে তাদের ছেড়ে দিল। তারপর চলে গেল।
>
> আমার বাবুর্চি খুব কাজের লোক ছিল কাছেই ছিল ফিরোজা বেগমের বাসা। ওদের কাছে আমার দুই মেয়ে গান শিখত। ওই বাড়িতে নিয়ে গেল তাদের। উনার কানে কানে বলল, ওদের মা মারা গেছে, ওদের বাবা এখান থেকে চলে গেছে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ওরা বেঁচে গেছে। আমি কোনো আওয়াজ শুনতেছি না। বুঝলাম, তারা হয়তো নাই, বা পালিয়ে গেছে। আমি পেছন দিয়ে ওয়াল টপকে পাশের বাসায় ঢুকলাম। দেখলাম বাসা খালি। সব খোলা। ওখানে ইন্দোনেশিয়ান অ্যাম্বাসির ফার্স্ট সেক্রেটারি থাকত। তারা ভয়ে গাড়ি নিয়ে সবাই চলে গেছে। সেখানে টেলিফোন আছে। আমি তাড়াতাড়ি টেলিফোন করলাম। আমার ভায়রা থাকে ইস্কাটনে। বলল, আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকেন। আমরা না আসা পর্যন্ত কিছু করবেন না।

ঘণ্টাখানেক পর তারা আসলো। আমাকে বলল, আপনি কোথাও যাবেন না। ওরা আমার ওয়াইফকে গাড়িতে নিয়ে চলে গেল। দেখতেও দেয়নি। আমাকে আরেক আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে তিনতলায় তালাবদ্ধ করে রেখে দিছে। বলল, আপনি এখানে থাকেন। যা করার আমরা করব।

ফিরোজা বেগমের ভাই ছিল কর্নেল। সে ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ার্স কোর থেকে একটা ডজ গাড়ি নিয়ে আমাকে নামায়া দিল। তারপর ডেডবডি নিয়ে সিএমএইচে গেলাম। সেখান থেকে ছাড়পত্র নিয়ে ডেডবডিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, যেন কারও চোখে না পড়ে, কুমিল্লা নিয়ে গেলাম। সেখানে জানাজা হলো।

কুমিল্লার পুরাতন মৌলবিপাড়ায় একটা পুকুর আছে। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ঘাটলা আছে। তার পাশে কবরস্থান। ওটা আমার শ্বশুরবাড়ি। দাফন করার সময় যখন নিয়ে যায়, তখন আমি ওকে দেখেছি।

সৈনিকদের হাতে নিহতের অন্যতম ছিলেন মেজর মহিউদ্দিন। ১৬ আগস্ট বিকেলে তিনি বঙ্গবন্ধুর মরদেহ হেলিকপ্টারে করে টুঙ্গিপাড়া নিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত এটাই ছিল তাঁর অপরাধ। সেনা কর্মকর্তারা অনেকেই চাননি শেখ মুজিবের লাশ 'মর্যাদার' সঙ্গে দাফন করা হোক।[৩০]

পঁচাত্তরের আগস্ট অভ্যুত্থান ও তার পরবর্তী দিনগুলোতে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, আছে প্রশ্ন। দলীয় রাজনীতির চশমাটা খুলে ফেলে তাঁর বিচার হচ্ছে না। কেউ তাঁকে দেবতা বানায়, কেউ বানায় শয়তান। ওই সময়ের একটা বর্ণনা পাওয়া যায় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরীর কাছ থেকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকার সময় জিয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নেওয়ার পর তাঁকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে দেওয়া হয়।

অক্টোবরের (১৯৭৫) দ্বিতীয় সপ্তাহে নূরুল ইসলাম চৌধুরী একটি সম্মেলনে যোগ দিতে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় যান। যাওয়ার একদিন আগে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান তাঁর বাসায় এসে বলেন, 'লে. জেনারেল (অব.) ওয়াসিউদ্দিনকে সেনাবাহিনী প্রধান করতে চায়। আমার কাছে এই ষড়যন্ত্রের কথা আর গোপন নেই। আমি তাকে প্রয়োজনে লাথি মেরে বের করে দেব।' এরপর জিয়া তাঁকে বিদেশ যেতে বারণ করেন। নূরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, তিনি মানসিক অশান্তিতে আছেন, তিনি বাইরে যাবেনই। আজমীর শরীফও যাবেন। জিয়ার মোশতাকবিরোধী ভূমিকা লক্ষ করে তিনি জেলে আটক চার নেতার মুক্তির জন্য অনুরোধ করেন। জিয়া আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি তাঁরা সবাই মুক্তি পাবেন।' নূরুল ইসলাম যখন ভিয়েনায়, তখন তিনি ৩ নভেম্বরের জেলহত্যার কথা শোনেন। এ অবস্থায় সম্মেলনে যোগ না দিয়ে তিনি

মস্কো চলে যান। মস্কোয় বসে তিনি ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের কথা জানতে পারেন। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি দিল্লি ও কলকাতা হয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। নূরুল ইসলাম চৌধুরীর বয়ান হলো :

> আমার ঢাকায় ফিরে আসার কয়েকদিন পর এক রাতে কার্ফ্যু চলাকালীন কর্নেল অলি আহমদ আমাকে সরকারি বাসভবন থেকে সদ্য স্থানান্তরিত মগবাজারের বাসায় এসে জানালেন, জেনারেল জিয়া আমাকে তার ক্যান্টনমেন্টের বাসায় যেতে বলেছেন। প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও অলি সাহেবকে দেখে ভরসা পেলাম। কারণ অনেক আগে থেকেই অলি আহমদকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। অলি সাহেব জেনারেল জিয়ার বাসায় আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং কিছুক্ষণ পর এসে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান আমাকে দেখেই আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভাগ্যের কারণে ও আল্লাহর রহমতে বেঁচে গেছি।' আমি তখন জিয়াউর রহমানকে তাঁর ওয়াদার কথা স্মরণ করে দিয়ে জেলখানা-হত্যাকাণ্ড বিষয়ে জিজ্ঞেস করি জিয়াউর রহমান বললেন, 'আমি যখন অবরুদ্ধ ছিলাম তখন মোশতাকের নির্দেশে তাদের খুন করা হয়েছে আমার কিছুই করার ছিল না।' জিয়াউর রহমান তার ড্রয়িংরুমে বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখিয়ে আমাকে বললেন, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু কমিউনিস্ট ও তথাকথিত প্রগতির কথা শুনে তিনি বিপথে চালিত হয়েছিলেন।'...
>
> আমরা বেসামরিক নাগরিক, মৃত্যুকে ভয় পাই না—এমন কথা বলা অন্যায় হবে।.... এখনো মনে আছে, খন্দকার মোশতাক সরকারের মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণের পর আমাদের প্রিয় ফণীভূষণ মজুমদার দুঃখ করে আমাকে বলেছিলেন, 'যৌবনে মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবী রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও বৃদ্ধ বয়সে জীবনকে ভালোবেসে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পারলাম না।'[৩১]

১৫ আগস্টের আগে ও পরে জাসদের ভূমিকা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন আছে। জাসদের সঙ্গে জেনারেল জিয়াউর রহমানের যোগাযোগ ছিল। এ ব্যাপারে অবশ্য জিয়াউর রহমানের কোনো ভাষ্য পাওয়া যায় না। জাসদ নেতারাও এ বিষয়ে মুখ খোলেন না। জাসদ, বিশেষ করে কর্নেল তাহের জিয়াকে তাঁদের 'বিপ্লবের' সহযাত্রী মনে করতেন। পরে ক্ষমতার লড়াইয়ে ছিটকে পড়ার পর তাঁরা জিয়াকে ষড়যন্ত্রকারী ও বেইমান হিসেবে প্রচার করেছেন। ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত জিয়ার সঙ্গে জাসদের একটা মধুচন্দ্রিমা পর্ব চলেছিল। ওই সময় জাসদ জিয়াকে দিয়ে তাদের কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। জিয়ার সঙ্গে জাসদের যোগাযোগের মাধ্যম ছিলেন জাসদের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ী সাইদুর রহমান। রাজনীতির অন্দরমহলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ

মধ্যস্থতাকারী। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন :

> জাসদের লগে জিয়াউর রহমানের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। সেই নেগোসিয়েশনটা আমিই করছি। এইটা শেখ সাহেবের কিলিংয়ের পর। তখন প্রত্যেকদিনই তার লগে আমার দেখা হইত। দেখা হইছে তার জেঠসের বাসায়, চকলেট। চকলেটের বাসা ছিল ইস্কাটন। মোজাম্মেল হক সাহেব ছিল তার হাজব্যান্ড। জিয়া আমার বাসায় কয়েকবার আসার পর আর এখানে দেখা করি নাই। 'আপনে এখানে আইসেন না; আমার বাসার অপজিটে হইল ডিবির চিফ-এর বাড়ি'। জিয়া একটা কালো মার্সিডিজ চালাইত।
>
> আমার লগে জিয়াউর রহমানের লাস্ট দেখা হইছে নাইন্থ নভেম্বর (১৯৭৫)। তার লগে আমার কী কথা হয় না হয়, তার সাক্ষী হিসাবে আমার বড় ভাই হাবিবুর রহমানরে (পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান) রাখছি। জিয়াউর রহমানরে একটা আট দফা দেওয়া হইছিল, সিরাজুল আলম খানের। এইটার মধ্যে ছিল গ্রাম সরকার। কয়টা টায়ার থাকবে, এইসব। এইটা সিরাজুল আলম খান, আমার বড় ভাই, রবসহ একত্রে বইসা ঠিক করছে বড় ভাইয়ের এলিফেন্ট রোডের বাসায়। নয় তারিখ বায়তুল মোকাররমে জাসদের একটা মিটিং ছিল। জিয়া তার বাহিনী দিয়া এইটা বানচাল কইরা দেয়।
>
> তারপর গেলাম জিয়াউর রহমানের বাসায়। আমারে বড় ভাই কইত। কইল, 'বড় ভাই, আপনারে ভয় করি।' আরে আমারে ভয় করার কী আছে? বলল, 'আপনারতো সব কথা মনে আছে। আমার ডায়রিতে আছে।' ঘরে ঢুইকা ডায়রিটা আনল। মিয়া ভাই (হাবিবুর রহমান) তারে গ্রাম সরকারের কথাটা বলল। জিয়া বলল, 'ধীরে সুস্থে করতে হবে। আমারে একটু সময় দেন।' তারপর তার লগে দেখা করতে চাইলাম। রব-ইনুরা ধরা পড়ার পর সিরাজুল আলম খান কইল যে, আর্মিতে তো প্রত্যেক দিন একটা কইরা ক্যু হইতাছে। এইভাবে তো আর্মিকে সে (জিয়া) কন্ট্রোল করতে পারবে না। আমাদের লগে একটা ইয়াটিয়া করলে...। সিরাজুল আলম খান আমারে কইল, আপনে তার লগে দেখা কইরা...। আমি টেলিফোন কইরা তারে পাইতেছি না। এরপর আমি চকলেটরে বললাম, আমি তার লগে দেখা করতে চাই। চকলেট গেল। দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরা আইল। ঢুকল কানতে কানতে। বললাম, কী হইছে? কইল, ও আমার ছোটবোনের জামাই। এই জন্যই অনেক কিছু সহ্য করি। ও আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে? বললাম, হইছেটা কী? 'জিয়া বলল, সাইদুর রহমানরে চিনি, তোমার দালালি করতে হবে না। আমার যদি দরকার হয়, তার সাথে আমিই কনটাক্ট করব।' তখন আমি বুঝলাম ব্যাপারটা। জিয়াউর রহমানের সাথে আমার আর দেখা হয় নাই।[৩২]

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে জাসদের পক্ষ থেকে একটা রঙিন পোস্টার ছাপিয়ে সারা দেশে বিলি করা হয়। পোস্টারে একটা স্লোগান লেখা ছিল—গ্রামে গ্রামে শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের সোভিয়েত গড়ে তোলো। এই আহ্বানের সঙ্গে তৃণমূলের 'গ্রাম সরকারের' তত্ত্ব ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। জিয়া পরে গ্রাম সরকারের প্রেসক্রিপশনটি গ্রহণ করেছিলেন, সম্পূর্ণ নিজের মতো করে।

৪

পঁচাত্তরের নভেম্বরে সেনানিবাসগুলোতে এক ধরনের অস্থিরতা ছিল। ঢাকায় সংঘটিত সিপাহি বিদ্রোহের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল ঢাকার বাইরে। সেনাবাহিনীর স্কুল অব ইনফেনট্রি ছিল যশোর সেনানিবাসে (এখন সিলেটে)। একটা প্রশিক্ষণ কোর্স চলছিল। চিফ ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন কর্নেল গোলাম রব্বানি (পরে বিগ্রেডিয়ার)। মেজর ফারুক খান (পরে লে. কর্নেল, মন্ত্রী) ছিলেন ইনস্ট্রাক্টর। কোর্সে যাঁরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন শচীন কর্মকার ও এনামুল হক (পরে বিগ্রেডিয়ার, মন্ত্রী)। ৪ নভেম্বর হঠাৎ করেই কোর্স বন্ধ করে প্রশিক্ষণার্থীদের 'অটো-পাস' দিয়ে দেওয়া হয়। ৭ নভেম্বর শচীন কর্মকারকে 'ভারতের দালাল' হিসেবে চিহ্নিত করে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র হয়। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন লিয়াকত (পরে মেজর, দশ-ট্রাক অস্ত্র মামলার আসামি) এবং মেজর আজিজ। শচীন ওই রাতেই পালিয়ে খুলনা, বরিশাল, ঢাকা ও সাভার হয়ে টাঙ্গাইলে তাঁর ব্যাটালিয়নের রিয়ার হেডকোয়ার্টারে পৌঁছান। স্টেডিয়ামে ছিল অস্থায়ী ক্যাম্প। ময়মনসিংহ সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য টাঙ্গাইলে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছিল। ওই সময় কাদের সিদ্দিকীর অনুগত কিছু লোক 'জাতীয় মুক্তিবাহিনী'র ব্যানারে ভারতীয় বিএসএফ-এর সহযোগিতায় সীমান্তে 'যুদ্ধ' করছিল। ওই সময়ের পরিস্থিতির একটা চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় শচীন কর্মকারের কাছ থেকে :

> সন্ধ্যার আগে দেখলাম দুইটা আর্টিলারি গাড়ি আসলো, সেকেন্ড ফিল্ড-এর। আমার ব্যাটালিয়নের অফিসার কর্নেল জালাল আহমদ (পরে চিটাগাং ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান), ওরে মারতে আসছে। তাকে সেকেন্ড ফিল্ডে হস্তান্তর করতে হবে। গোলাগুলি হইল কিছুক্ষণ। ফায়ার ব্যাক করা হইল। আলটিমেটলি সেকেন্ড ফিল্ডকে পালায়া যাইতে হইল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছ থেকে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সিপাইরা কিন্তু

অফিসারদের সম্মান দিয়েছে। সবাইতো 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই'তে জয়েন করে নাই। টেন বেঙ্গল তো জয়েনই করে নাই। তখন টাঙ্গাইলের এসপি ছিলেন রহিম খান। পরে অ্যাডিশনাল আইজি ছিলেন। ডিসি ছিলেন বারী সাহেব। লুৎফর ছিল এএসপি। তারে পাইলাম। টাঙ্গাইলে আমাদের অবস্থানকালটা দুই সপ্তাহের বেশি না।

রোজার দিন ছিল। তিনটা আমেরিকান এসেছিল। সাংবাদিক বা এই রকম কিছু। গ্রামের মানুষ ওদেরকে মারে। কারণ রোজার মধ্যে ওরা বিড়ি-সিগারেট খাইছে। ওদের গাড়ি ছিল। গাড়িতে হয়তো অয়ারলেস ছিল। দে কমিউনিকেটেড উইথ দ্য অ্যাম্বেসি। উইদিন ওয়ান অ্যান্ড আ হাফ আওয়ার জিয়া কল্ড। ফোন করছে যে, আমেরিকানদের পিটিয়েছে মৌলবিরা। তোমরা একটা কাজ কর। যত মৌলবি পাবা, সবগুলোকে পিটাইয়া হাড্ডি ভাইঙ্গা দেও, যত মৌলবি আছে টাঙ্গাইলে। আমরা পুলিশ নিলাম, বিডিআর নিলাম। বললাম, যত মৌলবি পাও, পিটাও। দেড়শ-দুইশ জনকে আমরা পিটাইয়া হাড্ডি ভাইঙ্গা স্টেডিয়ামে জড়ো কইরা থুইলাম। আমেরিকানদের বললাম, তোমরা এখন আইডেন্টিফাই কর। চাইনিজদের দেখলে সব এক মনে হয় না! আমেরিকানদের কাছে বাঙালিদেরও তো এক মনে হয়! আইডেন্টিফাই করতে পারে না। যাদের উইটনেস পাইলাম, ওদের রিমান্ডে নিলাম। বাকিদের বললাম আরও পিটাও। পিটাইতে বললে সিপাইরা পিটায় একটু বেশি। পিটাইয়া একেবারে আধা লাশ বানায়া ফেলছে। বাকিগুলোরে জেলে দেওয়া হইল। তারপর জিয়া দেখতে আসলেন। সঙ্গে আমেরিকান ছিল, ফাস্ট সেক্রেটারি, সেকেন্ড সেক্রেটারি, কিছু একটা হবে। তার প্রায় দশদিন পর আমরা টাঙ্গাইল থেকে মুভ করে ময়মনসিংহ চলে যাই, টু ফাইট কাদেরিয়া বাহিনী।[৩৩]

একটি হত্যা অনেকগুলো হত্যাকাণ্ডের জন্ম দেয়। নিরাপদ মনে করে নওয়াজিশের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন খালেদ-হুদা-হায়দার। তাঁদের যখন হত্যা করা হয়, তখন তাঁরা নাশতা খাচ্ছিলেন। নিয়তির কী নির্মম পরিহাস। ৭ নভেম্বর সকালে ক্ষমতার লড়াইয়ে তাহের ছিটকে পড়েন। তাঁকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়েছিল। জিয়া একটা ব্যর্থ অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন। জিয়া হত্যার অভিযোগে নওয়াজিশকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

জিয়া এবং তাহেরের মধ্যকার সম্পর্কের অনেকটাই অজানা। মার্কিন অধ্যাপক-গবেষক মার্কাস ফ্রান্ডা ১৯৮০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে জিয়ার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তাহের সম্পর্ক জিয়ার ইতিবাচক মূল্যায়ন ছিল। জিয়া তাহেরকে 'সাহসী ও সরলমনের মানুষ' হিসেবে মন্তব্য করে বলেছিলেন, '১৯৭১

সালে সে ছিল আমার অফিসার—আমি তাকে অস্ত্র দিয়েছি। সে যখন পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসে, আমি তাকে সৈন্য দিয়েছি যুদ্ধ করার জন্য—কিন্তু শেখ মুজিব তাকে সেনাবাহিনী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর সে বদলে গিয়েছিল। সে জাসদে যোগ দিয়ে বেআইনি অস্ত্র দিয়ে গোপন সংগঠন তৈরি করেছিল। তারা তাকে বাহিনীপ্রধান বানিয়েছিল। দেশের আইন অমান্য করে তার লোকেরা নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছিল এবং অনেক লোককে হত্যা করেছিল। আইন অনুযায়ী আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, যা তার প্রাপ্য ছিল।'[৩৪]

জিয়ার ঘনিষ্ঠজনদের মতে, তাহেরকে ফাঁসি দেওয়া ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত। জিয়া তাহেরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেনাবাহিনী ৪৭ জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে ডেকে তাঁদের মতামত চেয়েছিলেন। সবাই বলেছিলেন, তাহের বেঁচে থাকলে সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। জিয়া তখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[৩৫] ২১ জুলাই ১৯৭৬ তাহেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি দেওয়া হয়।

৭ নভেম্বরের ঘটনাটি ছিল অনন্য। এমন একটি ঘটনা এ অঞ্চলে এর আগে ঘটেনি। এই ঘটনায় সামরিক অভ্যুত্থান এবং গণঅভ্যুত্থান, দুটোরই উপাদান ছিল যা ঘটনাটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। অনেকগুলো পক্ষ এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্ষমতার ভারসাম্য এবং সমীকরণ বদলে যাচ্ছিল। কেবল একটি শব্দে বা বাক্যে এটাকে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার রাজনীতির বারান্দায় ঢুকে পড়ে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী। এর আগে সরকারবিরোধী রাজনীতির প্রধান পক্ষ ছিল জাসদ। জাসদ ক্ষমতার পরিবর্তন চেয়েছিল। এই পরিবর্তন যে সহিংস হতে পারে তা জাসদ নেতৃত্বের হিসেবের মধ্যেই ছিল। তা না হলে 'বিপ্লবী গণবাহিনী' ও 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' তৈরি করার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু ১৫ আগস্ট ঘটনার আকস্মিকতায় জাসদের মূল নেতৃত্ব হকচকিত হয়ে পড়ে। যে ঘটনাটি তারা ঘটাতো, সেটা অন্যরা ঘটিয়ে ফেলে। সুতরাং অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে জাসদ তাৎক্ষণিকভাবেই সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা চালায়। এরই অংশ হিসেবে লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের ও তাঁর ডেপুটি হাসানুল হক ইনু ১৫ আগস্ট সকালেই শাহবাগে ঢাকা বেতার ভবনে যান।

১৫ আগস্টের নয় দিনের মাথায় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পান। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জিয়া খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বের ছদ্মাবরণে আওয়ামী লীগের একটি সরকার মেনে নিতে পারেননি। মনে মনে তিনি ফুঁসছিলেন। ব্যাপারটি তাহেরেরও মনঃপুত হয়নি। জিয়ার সঙ্গে তাহেরের

সখ্য ছিল এবং তাঁরা দুজনই একে অন্যকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাহের জিয়াকে ধারণা দিয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে জাসদের মতো একটা সংগঠিত দল আছে যা রাজনীতির পালাবদলে কাজে লাগাবে। তাহের ভেবেছিলেন, সেনাবাহিনীর মধ্যে জিয়ার জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে এবং জিয়াকে সঙ্গে নিলে সেনাবাহিনীর সমর্থন পাওয়া যাবে। জিয়া এবং তাহের দু'জনই ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাঁদের এই সহাবস্থান ও সমীকরণ ৬ নভেম্বর পর্যন্ত টিকেছিল। দুজনই চেয়েছিলেন খন্দকার মোশতাকের অপসারণ। তাহের এক পর্যায়ে জিয়াকে রাষ্ট্রপতি করার জন্য রশিদ-ফারুকদের কাছে ধর্নাও দিয়েছিলেন।[৩৬]

৩ নভেম্বর পাশা উল্টে যায়। জিয়া ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। তাহের দেখলেন, এই সুযোগে যদি সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থান ঘটানো যায়, তাহলে জনমনে এবং জিয়ার কাছে তিনি ত্রাণকর্তা হিসেবে পরিচিতি পাবেন। জাসদ নেতৃত্বকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ৬ নভেম্বর রাতে তিনি অভ্যুত্থানের পক্ষে সম্মতি আদায় করেন।

জাসদের পূর্বপরিকল্পনা ছিল একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করা। ৭ নভেম্বর তাদের সেই প্রস্তুতি মোটেও ছিল না। তাদের মূল ভরসা ছিল ছাত্রলীগ আর শ্রমিক লীগ চুয়াত্তরের ১৭ মার্চের পর দুটো গণসংগঠনই অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে ছাত্রলীগের শক্তিমত্তার কোনো ভিত ছিল না। শ্রমিকদের ঘাঁটি ছিল নারায়ণগঞ্জের আদমজিতে।

জাসদের প্রধান নেতা সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের আলাদা যোগাযোগ ছিল। তিনি ভালো করেই জানতেন, জিয়ার ক্ষমতার ভিত্তি হচ্ছে সেনাবাহিনী। তাহের সেখানে নিছক একজন বহিরাগত। তাহেরের কথার ওপর নির্ভর করে একটা অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করলে তা সফল হবে, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। তাহের অভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যাপারে অতুৎসাহী ছিলেন। তাঁর হিসাব ছিল, জিয়া অন্তরীণ থেকে কিছু করতে পারবে না এবং অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জিয়াকে মুক্ত করতে পারলে জিয়া তাঁর প্রতি অনুগত থাকবে এবং সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে তিনি 'বিপ্লব' করতে পারবেন। আর জাসদ তো রয়েছেই।

৬ নভেম্বর রাতে যখন অভ্যুত্থানের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়, সিরাজুল আলম খান তাতে মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন। তাঁর হিসাব ছিল, যদি অভ্যুত্থান সফল হয়, তাহলে তিনি তো নেতা থাকছেনই। যদি ব্যর্থ হয়, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও সংঘর্ষে সেনাবাহিনী আরও দুর্বল হবে।

৭ নভেম্বর সকালে খালেদ মোশাররফের চারদিনের 'সরকারের' পতন হলো এবং তিনি নিহত হলেন। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে অভ্যুত্থানকারীর যে পরিণতি হয়,

খালেদের তাই হয়েছিল। খন্দকার মোশতাকেরও ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। জিয়ার নেতৃত্বে নতুন করে সংগঠিত সামরিক বাহিনী তখন চেয়েছিল একচেটিয়া সেনাশাসন। এখানেই তাহেরের সঙ্গে জিয়ার সমীকরণ ভেঙে যায়। তাহের চেয়েছিলেন জিয়াকে সেনানিবাসের বাইরে তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবেন এবং তাহলে তিনি (তাহের) প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। জিয়া দেখলেন, সেনাবাহিনীর অধিকাংশ অফিসার ও সৈন্য তাঁর পেছনে এককাট্টা। তিনি কেন তাহের বা জাসদের নিয়ন্ত্রণে যাবেন। এটা ছিল ক্ষমতার লড়াইয়ের একটা জটিল পর্যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এখানে ব্যক্তিগত মান-অভিমানের কোনো জায়গা নেই। জিয়ার ওপর খবরদারি করতে গিয়ে ৭ নভেম্বরের প্রথম প্রহরেই তাহের 'বিপ্লবের' বৃত্ত থেকে ছিটকে পড়েন। জিয়া তাঁর অবস্থান সংহত করতে সমর্থ হন। সিরাজুল আলম খান আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান।

তাহের এবং জাসদের অন্য নেতারা যদি প্রজ্ঞার পরিচয় দিতেন, তাহলে তাঁরা নিজেদের জিয়ার প্রতিপক্ষ না করে দর-কষাকষির একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে পারতেন, হতে পারতেন ক্ষমতার অংশীদার। কিন্তু নিছক আবেগকে সম্বল করে তাঁরা জাসদকে জিয়া ও সেনাবাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন। ফলে জাসদকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। তাহেরকেই শুধু প্রাণ দিতে হয়নি, জাসদের অগুণিত নেতা-কর্মীকে এজন্য মূল্য দিতে হয়েছে। জাসদ পরে সম্বিত ফিরে পেয়েছিল এবং তিন বছর পর জিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করে দলের অনেক নেতা-কর্মীকে 'সাধারণ ক্ষমার' আওতায় জেল-হুলিয়া থেকে মুক্ত করে সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। এই 'উপলব্ধি' হয়েছিল সবকিছু হারিয়ে। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিল। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়ে হয় জেলে গেছেন, নতুবা আন্ডারগ্রাউন্ডে। অনেকেই ভারতে চলে গিয়েছিলেন। তাঁদের শক্তিক্ষয় হয়েছিল অপেক্ষাকৃত কম। জনসম্পৃক্ত রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বুঝেছিলেন, রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হতে হলে অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করার ধৈর্য আওয়ামী লীগ এবং তার মিত্রদের ছিল, জাসদের ছিল না।

জাসদ ঘরানার একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে আহমদ ছফার পরিচিতি ছিল। এই দলের অনেক নেতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সখ্য থাকার কারণে তিনি জাসদের হয়ে বক্তৃতা করতেন, লিখতেন। জাসদ-সমর্থিত দৈনিক *গণকণ্ঠে* তিনি সহকারি সম্পাদক ছিলেন। সর্বহারা পার্টির প্রতিও তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ছফার মতে, 'জাসদ এবং সর্বহারা পার্টির তরুণরাই ছিলেন বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের সবচাইতে সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতিশীল শক্তি।... সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা

অন্যায় হবে না, এই দল দুটির পেছনে কোন সুস্থির রাজনৈতিক দর্শন ছিল না।'
ছফার মন্তব্য হলো, মূলত আওয়ামী লীগেরই লড়াকু অংশটি স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাসদ তৈরি করেছিল। কিন্তু তারা আওয়ামী বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল কি না, তা নিয়ে আছে ঘোরতর সন্দেহ। তাঁর মতে :

> জাসদের নেতারা সদর্পে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলতে থাকলেন, স্লোগানে মিছিলে রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠল, দেয়াল অজস্র চিকায় ভরে গেল। কিন্তু তাঁদের স্বভাবে থেকে গেল আওয়ামী লীগের অপকৃষ্ট অংশ। জাসদ শ্রেণিসংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করল, কিন্তু দেশে অবস্থান নিশ্চিত করতে পারল না তাঁদের স্বভাবে, আচরণে এত অধিক ক্ষমতামনস্কতা প্রকাশ পেতে থাকল, জাসদের তৎকালীন কর্মকাণ্ডকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী পুত্রের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলে ভাল মানায়। জাসদ কর্মীদের বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিল আওয়ামী লীগের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার তাঁদের সঙ্গত অধিকার আছে। জাসদের নেতা এবং কর্মীদের অনেকেই সচেতনভাবে মনে করতে এবং প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না, তাঁরাই শেখ মুজিবকে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছেন। তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এমনকি খুন করেও ক্ষমতা দখল করার যুক্তিসঙ্গত অধিকার তাঁদের আছে।... ক্ষমতায় যাওয়ার পথটি যতই সুদূরপরাহত হয়ে উঠল, ততই তাঁদের লোভ এবং আশাভঙ্গের বেদনা বৃদ্ধি পেতে থাকল। অজস্র তরুণের মৃত্যু, অত্যাচার-অনাচার সহ্য করা এসব তো সেই আশাভঙ্গেরই লক্ষণ।...
>
> শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকারের দাবিনামার অক্ষরগুলো রক্তের প্লাবনে মুছে গেল। বাপকে সিংহাসনচ্যুত করে ভিন্ন লোক যখন সিংহাসনে আসীন হয়, পুত্র তাতে চড়ে বসার তাকত পাবে কোথায়।... শেখ মুজিব বাঘের বাচ্চার জন্ম দিয়েছিলেন, আর সে বাঘের বাচ্চাগুলো নিয়ে অন্য লোক সার্কাস দেখাচ্ছে।...
>
> আওয়ামী লীগ থেকে জাসদের বেরিয়ে আসার কারণে আওয়ামী লীগ শক্তিহীন হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে জাসদের আসল মৃত্যু ঘটে গেছে। একই আঁতুর ঘরে মা এবং বেটা উভয়েই মারা গেল।[৩৭]

৭ নভেম্বরের ঘটনার আকস্মিকতায় বাকশালের নেতা-কর্মীরা হকচকিত হয়ে পড়েন। ওই সময়ের পরিস্থিতির একটি বিবরণ দিয়েছেন নূহ-উল-আলম লেনিন :

> আমরা তো ছত্রখান। বলা যেতে পারে, যে যার মতো আত্মগোপনে যাওয়া। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। খুব গোপনে মমতাজের বাসায় একটা মিটিং

> করলাম। সেলিম, গামা, মুক্তাদির, আমি, মাহবুব জামান, অজয় দাশগুপ্ত এবং আরও কয়েকজন ছিলাম। ওইখানে বসে সিদ্ধান্ত হয়, গামা-সেলিম—ওরা ইন্ডিয়া যাবে। এইটা পার্টির ডিসিশন। ১৫ আগস্টের পর কাদের সিদ্দিকী চইলা গেছিল। কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমাদের মনে হইছে, একটা অল্টারনেটিভ তো আছে। পার্টির ডিসিশন অনুযায়ী সেলিম, নুরুল ইসলাম নাহিদ আর পঙ্কজদা ইন্ডিয়া গেছে। মোনায়েম সরকারও গেছে। আওয়ামী লীগেরও অনেকেই গেছে। আমি লালবাগে পোস্তার ঢালে একটা বস্তিতে জায়গা ঠিক করলাম থাকার জন্য। আমার বন্ধু হাসেমকে নিয়া দুই রুমের একটা চালাঘর ভাড়া নিলাম।
>
> আমরা ভয়ে ছিলাম, জাসদ আবার কী করে, আক্রমণ করে কি না। কিছুদিন পর বোঝা গেল, জাসদও আক্রান্ত তখন আমাদের জাসদভীতি আর থাকে নাই। তবে তাদের সাথে কোনো ইন্টারেকশনের সুযোগ ছিল না। আমাদের সম্পর্ক তো আদায় কাঁচকলায়![৩৮]

প্রেসিডেন্ট সায়েমকে সামনে রেখে সামরিক বাহিনী তাদের কর্তৃত্ব সংহত করতে থাকে। এ সময় ভারত হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে একটা গুঞ্জন ছিল। প্রেসিডেন্ট সায়েম সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা ও জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য আতাউর রহমান খানকে ডেকে মওলানা ভাসানীর কাছ থেকে একটি সমর্থনসূচক বিবৃতি নিয়ে আসার অনুরোধ জানান। আতাউর রহমান খান এ ব্যাপারে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের সাহায্য নেন। ভাসানীর কাছ থেকে সরকারের প্রতি সমর্থনসূচক একটি বিবৃতি আনা হয়েছিল। মইনুল হোসেনের ভাষ্যে জানা যায় :

> আতাউর রহমান সাহেবের সঙ্গে বঙ্গভবনে উপস্থিত হলাম। রাষ্ট্রপতি সায়েম, জেনারেল জিয়াসহ তিন বাহিনীর তিনজন ডেপুটি চিফ মার্শাল ল প্রশাসক উপস্থিত ছিলেন ... আতাউর রহমান সাহেব ও আমি পরদিনই ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সন্তোষের উদ্দেশে গাড়িতে রওনা দিলাম। সঙ্গে রেডিওর লোকজন ছিল।
>
> ভাসানী সাহেবকে আগেই আমাদের আগমন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল।... বক্তব্যের কোনো কাঠামো আমাদের দেওয়া হয়নি। আমি তার বিবৃতি তৈরি করতে সাহায্য নিলাম ভাসানী সাহেবের সাপ্তাহিক *হক কথার* সাংবাদিক ইরফানুল বারীর। তিনি আর আমি একসঙ্গে বসে একটি বিবৃতি দাঁড় করলাম। রেডিওতে প্রচারের জন্য আমাদের সেই বক্তব্যটি ভাসানী সাহেব কোনোরূপ কাটছাঁট না করে হুবহু রেকর্ড করে দিলেন।[৩৯]

৫

১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর জারি হয় পুরোদস্তুর সামরিক শাসন। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী তখন জেলে। গ্রেপ্তার এড়াতে অনেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির অনেক নেতা-কর্মী ভারতে চলে যান। এদের একজন ছিলেন যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা এস এম ইউসুফ। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি ওই সময়ের একটি বিবরণ দিয়েছেন :

> আমাদের তো শহরে কেউ শেল্টার দেবে না। অল্টারনেট রাস্তা হচ্ছে ইন্ডিয়া চলে যাওয়া। রবিউলকে বললাম খোঁজ নেওয়ার জন্য। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বা আখাউড়া দিয়ে আগরতলায় যাওয়া যায় কি না। আমরা ১৫-১৬ জন অর্গানাইজড হলাম। আমার সঙ্গে ওবায়দুল কাদের, রবিউল আলম, মমতাজ হোসেন, আমীর হোসেন, মাহফুজুল বারী, হরেকৃষ্ণ দেবনাথ, নিমচন্দ্র ভৌমিক, ইসমত কাদির গামা, রফিকুল ইসলাম বকুল, ফজলুল হক মন্টু, শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, এ রকম কয়েকজন। প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রফেসর হারুনের বাসায় উঠলাম। সেখান থেকে মাধবপুর হয়ে বর্ডারের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির সোমেশ রায়ের বাড়িতে। তিনি আমাদের বর্ডার পার করে দিলেন সেখান থেকে আগরতলায়। আমরা কয়েকটা বাড়িতে ছিলাম। আমার আশ্রয় হলো মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের বাড়িতে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আমরা গেলাম কলকাতা।
>
> কলকাতায় প্রথম গেছি চিত্ত সুতারের বাড়িতে, ভবানীপুর, সানি ভিলা। নিচতলায় আমাদের ঢালাও বিছানা করে দেওয়া হলো, চাটাই আর বালিশ। একটা বাথরুম। এই ১১-১২ জন, লাইন দেওয়া। অসহ্য লাগল। খাওয়া-দাওয়ার অবস্থাও ভালো না। একটা ডিম অমলেট করে চার টুকরা, দুই টুকরা আলু, একটু ঝোল, এক থালা ভাত। এগুলো খুব অপমানজনক মনে হচ্ছিল। আমাদের কোনো সম্মান ছিল না। যেখানেই যাচ্ছিলাম, অ তোমরা তো বঙ্গবন্ধুকে মাইরা আসছ, তোমাদের বাপকে তো মাইরা আসছ। মুখের উপর বলত এইসব। মাথা হেঁট করে থাকতাম।
>
> কলকাতার 'ত্রিপুরা গেস্ট হাউজে' সুখময় সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা। উনি দিল্লি থেকে মিটিং করে ফিরছেন। বললাম, আমরা তো অসুবিধায় আছি। কিছু করা যায় দাদা? তখন উনি অজিত বাবুকে ডেকে আমাদের ওখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পাঁচ-ছয়টা রুম আছে, আমাদের জন্য পর্যাপ্ত হয়ে গেল। ওখানে সবকিছুই পেতাম, শুধু গরুর মাংস ছাড়া। হরেকৃষ্ণ দেবনাথ বলল, চিত্তরঞ্জন সুতার আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, আমি আর

গামার সঙ্গে। আমি, গামা, আমীর হোসেন, মমতাজ হোসেন আর দেবনাথ, আমরা গেলাম। উনি, আর একজন ভদ্রলোক। নাম বললেন না, শুধু উপাধিটা বললেন। তিনি ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। হি ইজ ফ্রম দিল্লি। চিত্ত সুতারই বলা শুরু করলেন। 'আজকে বঙ্গবন্ধু নাই, শেখ মণি নাই। এত লোককে মেরে ফেলেছে। সব নেতৃত্ব শেষ করে দিয়ে এখন তো দাঁড়ানোর আর কায়দাই নাই। বিভিন্নজন বিভিন্ন কথা বলতেছে। হাসনাত আসতেছে, মন্টুরা আসতেছে। তারা বলতেছে, ইন্ডিয়ান আর্মি মার্চ করুক, তারা ট্যাংকের উপর বসে বাংলাদেশে ঢুকবে। এই সমস্ত কথায় আমি বিরক্ত হইয়া গেছি। তোমাদেরকে ডেকেছি শান্তিমতো আলাপ করার জন্য, ফিউচার লিডারশিপ কী হবে বাংলাদেশে।'

এরপর যোগাযোগ হলো ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব চ্যাটার্জির সঙ্গে। তাঁর মাধ্যমে যোগাযোগ হলো সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনটেলিজেন্সের সান্যালের সঙ্গে। তাঁরা আমাদের সহানুভূতি দেখালেন। গামা বলল, এরা তো আমলা। আমাদের পলিটিক্যাল সার্কেলে যোগাযোগ করা দরকার। যোগাযোগ হলো প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির সঙ্গে। তিনি সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি এবং কংগ্রেসের সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার। তিনি আবার মণি ভাইয়েরও বন্ধু। বসুশ্রী সিনেমা হলের বিল্ডিংয়ে তাঁর একটা অফিস ছিল, সেখানে দেখা হলো। তিনি আমাদের সব কথা শুনলেন। তিন হাজার টাকাও দিলেন। বললেন, যা লাগবে আমাকে বলবেন। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। একদিন প্রিয়দা বললেন, বাংলাদেশে পিপিআর (পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশন) হচ্ছে। এখানে থেকে কিছু হবে না। আপনারা দেশে গিয়ে কাজ করুন। যত রকম সাহায্য লাগে দেব। তারপর তো আমরা দেশে চলে এলাম।[৪০]

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর টাঙ্গাইলের আবদুল কাদের সিদ্দিকী তাঁর অনুগতদের নিয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন এবং বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সিদ্দিকীর লোকেরা বাংলাদেশ রাইফেলস-এর কয়েকটা সীমান্ত চৌকি দখল করে নিয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে ভারতের জাতীয় নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারিয়ে মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে প্রথমে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হলে দৃশ্যপট বদলে যায়। দেশাই এদের অনেককেই বাংলাদেশে ফেরত পাঠান।[৪১] ২৪ জুন ১৯৭৭ *বাল্টিমোর সান* পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়, আগস্ট অভ্যুত্থানের পর যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে ৬০০ 'গেরিলা' বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এছাড়া ভারত সরকার দু হাজার 'অসামরিক শরণার্থীর' ভাতা বন্ধ করে দিলে তারাও ফিরে আসতে বাধ্য

হয়। ভারতে আশ্রয় নেওয়া তিনজন সংসদ সদস্য ৬ আগস্ট (১৯৭৭) দেশে ফিরে এসে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেন।[৪২]

১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েম এক আদেশের মাধ্যমে সংবিধানের প্রথম তফসিলে '১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পিও নং ৮)' বাতিল করেন।[৪৩] ১৯৭৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যে সমন্বয়ের রাজনীতির সূচনা করেছিলেন, ১৯৭৫ সালের শেষে এসে তা ভিন্ন মাত্রা পায়।

আওয়ামী লীগের মধ্যে একাধিক স্রোতোধারা ছিল। নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব যেমন ছিল, তেমনি ছিল আদর্শিক বিরোধ। শেখ মুজিবের বটবৃক্ষসম ব্যক্তিত্বের ছায়ায় উপদলীয় কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর অবর্তমানে দলের সংহতিতে চিড় ধরে। অনেক জ্যেষ্ঠ নেতা দলের মূল স্রোত থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা দল তৈরি করেন। দলের সবচেয়ে প্রবীণ নেতা মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ তৈরি করেন গণআজাদী লীগ। মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় জাতীয় জনতা পার্টি। খন্দকার মোশতাক আহমদ, অলি আহাদ, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন আর মুহম্মদুল্লাহকে নিয়ে তৈরি হয় ডেমোক্রেটিক লীগ। ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে আলাদাভাবে পিপিআর-এর অধীনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেন এবং যথারীতি নিবন্ধন পেয়ে যান।

৬

রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন, ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন হবে এবং এ জন্য ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে দলীয় রাজনীতির অনুমতি দেওয়া হবে।

রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। নিবন্ধনের জন্য দলের গঠনতন্ত্র, কর্মসূচি, ব্যাংক হিসাব ইত্যাদি জমা দেওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়। আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রে 'বঙ্গবন্ধু'র নাম উল্লেখ থাকায় প্রথমে এটিকে নিবন্ধন দেওয়া হয়নি। পরে 'বঙ্গবন্ধু' বাদ দিয়ে সংশোধিত গঠনতন্ত্র জমা দেওয়ার পর আওয়ামী লীগ ৪ নভেম্বর (১৯৭৬) সরকারি অনুমোদন পায়। ওই দিন মিজানুর রহমান চৌধুরীর বাসার ছাদে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় মিজানুর রহমান চৌধুরী ও মোল্লা

জালালউদ্দিনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি কমিটি তৈরি করা হয়।[৪৪] পরে মহিউদ্দিন আহমেদকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং সাজেদা চৌধুরীকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল।[৪৫] বাকশালে বিলীন হওয়া আওয়ামী লীগের পুনরুত্থান হলো।

৪ এপ্রিল ১৯৭৯ বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাব উত্থাপনের আগে প্রথা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করা হয়ে থাকে। শেখ মুজিব সম্পর্কে বলা হয়, '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।' স্পিকার মির্জা গোলাম হাফিজ উত্থাপিত শোক প্রস্তাবে বলা হয় :

> বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রস্তাব করছে যে, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুতে বাংলাদেশের রাজনীতি জগতে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে।
>
> এই সংসদ তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।[৪৬]

উপসংহার

আমাদের দেশের রাজনীতির শব্দভাণ্ডারে গণতন্ত্র আর ষড়যন্ত্র—এই দুটো শব্দের উপস্থিতি বেশ প্রকট। সবাই গণতন্ত্র চান। যারা ক্ষমতায় থাকেন, তাঁরা মনে করেন গণতন্ত্র কায়েম হয়ে গেছে। যাঁরা বিরোধী দলে থাকেন তাঁদের ধারণা, দেশে গণতন্ত্রের ছিটোফোঁটাও নেই। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এখানে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে পরিচিতি পায়। এক দলের কাছে যা রাজনৈতিক কৌশল, প্রতিপক্ষ দলের কাছে তা ষড়যন্ত্র।

ইতালির রেনেসাঁ যুগের রাজনীতিক-কূটনীতিক নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি ইউরোপ জুড়ে স্বৈরশাসকদের উত্থানের প্রেক্ষাপটে তাঁর লেখা *ইল প্রিন্‌চিপে* (*দ্য প্রিন্স*) বইয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'লক্ষ্য হাসিলের জন্য যেকোনো পথই বৈধ'। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এই দর্শনকেই কৌশল হিসেবে মেনে নিয়েছে। এই বাস্তবতার মধ্যেই রাজনীতির চালচিত্র বুঝতে হবে।

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসকে মোটা দাগে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো শুরুর পর্ব—গণতন্ত্রের নবযাত্রা, যা তিন বছরের মাথায় হোঁচট খায়। এর পরের পর্বটি হলো সেনা আধিপত্যের। নব্বই-পরবর্তী সময়টি সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে আসার চেষ্টা।

একাত্তরের যুদ্ধে বাংলাদেশ একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ওই অবস্থায় আওয়ামী লীগ দেশের হাল ধরেছিল। তখন এর কোনো বিকল্প ছিল না। একদিকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবকাঠামো এবং একই সঙ্গে মানুষের আকাশছোঁয়া আকাঙ্ক্ষা। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আওয়ামী লীগকে চলতে হয়েছে।

আমাদের দেশে জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ অনেকেই ছিলেন এবং আছেন। কিন্তু তাঁরা যতটা না 'স্টেটসম্যান', তার চেয়েও বেশি হলেন 'পলিটিশিয়ান'। তাঁদের রাজনীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার পেশাদারত্বের চেয়ে জনসভায় কিংবা রাজপথে জনতার মাঝে উত্তেজনা ছড়ানোই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক থেকে শুরু করে সবাই কমবেশি জনতুষ্টির রাজনীতি করেছেন। এ

ধরনের নেতাদের ইংরেজিতে 'ডেমাগগ' বলা হয়, যার সহজ বাংলা হলো বাগাড়ম্বরকারী। তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন, জনসভায় শ্রোতাদের হাত তুলিয়ে কর্মসূচির পক্ষে ম্যান্ডেট নেন এবং বড় বড় জনসমাবেশ বা বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে রাজপথেই সরকার পাল্টে দিতে চান। তাঁরা অনেকেই গতকাল যা বলেছিলেন, আজ ঠিক তার উল্টো কথাটি বলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁরা দল থেকে বড় হয়ে যান, নিজেরাই হয়ে যান 'প্রতিষ্ঠান'। এ ক্ষেত্রে দলীয় নেতা-কর্মীদের আবেগ কাজ করে, নেতারাও এই আবেগকে প্রশ্রয় দেন। ফলে তৈরি হয় 'কাল্ট'। কাল্ট ওয়ারশিপ বা ব্যক্তিপূজা আমাদের রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য।

১৯৭১ সালের শেষে এসে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার রাজনীতিতে আসন পাতলেও দলটির সমষ্টিগত মনস্তত্ত্বে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি। এর আগে আওয়ামী লীগের রাজনীতির ভাষা ছিল প্রতিবাদের, লড়াইয়ের, আত্মত্যাগের। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতের মুঠোয় এসে যাওয়ার পরও দলের মনোজগতে পালাবদল ঘটেনি। রাষ্ট্র পরিচালনা যে একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার, সেখানে যে স্থূল ও মেঠো আস্ফালনের সুযোগ নেই, দলটির অনেকেই তা বুঝতে চান না রাষ্ট্র যে সব নাগরিকের, দলীয় সংকীর্ণতার বাইরে গিয়ে এটা উপলব্ধি করার মানসিকতা নেই দলের অনেক নেতা-কর্মীর।

পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগের একটি বড় অভিযোগ ছিল, পাকিস্তানি এস্টাবলিশমেন্ট চক্রান্ত করে বাঙালি ও বাংলাকে দাবিয়ে রেখেছে, বঞ্চিত করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও আওয়ামী লীগ মনে করে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের কৌশলকে 'ষড়যন্ত্র' বলে গাল দেওয়ার যে অমার্জিত ভাষা পাকিস্তানে মুসলিম লীগ ও সামরিক সরকারগুলো ব্যবহার করত, স্বাধীন বাংলাদেশেও শাসকগোষ্ঠীর শব্দচয়নে তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এটা সত্য যে স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগই গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংবিধান দিয়েছে এবং ন্যূনতম সময়ের ব্যবধানে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করেছে। এ সবই ছিল ইতিবাচক কাজ, যা এ দেশের অগ্রযাত্রার ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আবার এটাও সত্য যে আওয়ামী লীগের প্রশ্রয়েই এ দেশে বিরোধী রাজনৈতিক মতের ওপর দমনপীড়ন শুরু হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামী লীগ যখন সরকারের হাল ধরে, তারা মগজ থেকে মুসলিম লীগের ভূত তাড়াতে পারেনি। তারা একই গীত গাইতে শুরু করে

দেয়—সরকারবিরোধিতা মানেই রাষ্ট্রদ্রোহ, সরকারের সমালোচক মানেই শত্রুরাষ্ট্রের এজেন্ট, স্বাধীনতার শত্রু। স্বাধীনতার পর দু-তিন বছর এ রকমই চলল।

মুক্তিযুদ্ধকে এড়িয়ে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি কল্পনা করা যায় না। একাত্তরে এদেশে একটা জনযুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পরে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধকে নিজেদের একচেটিয়া সম্পদ এবং অর্জন হিসেবে দাবি করতে থাকে। একই সঙ্গে শুরু হয় অতীতমুখী রাজনীতি। অথচ অতীত হলো স্মরণ রাখার বিষয়। বর্তমানই হলো আসল এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নই প্রধান চালিকাশক্তি।[১] বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই এই উপলব্ধি থেকে অনেক দূরে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের একটি মন্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক :

> যে সকল ব্যক্তি আমাদের ১৯৭১ সালের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন তাঁরা এরই মধ্যে ভীষণভাবে অনুপযোগী হয়ে পড়েছেন, যেমন ১৯৪৭ সালের জন্য যাঁরা আমাদের তৈরি করেছিলেন, ১৯৭১ সালে তাঁরাও তেমনি অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন বরং একটু বেশিই।[২]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু আওয়ামী লীগের প্রাণপুরুষ ছিলেন না, বাংলাদেশের রাজনীতির নাটাইটা তাঁর হাতেই ছিল। এক সময় তাঁর ইশারায় সবাই উঠতেন, বসতেন, ছুটতেন তাঁর মতো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এ দেশের রাজনীতিতে দ্বিতীয়টি দেখা যায়নি। একটি ঘুমন্ত জাতিকে তিনি তাঁর মোহন বাঁশির সুরে জাগিয়েছিলেন। কিন্তু জনপ্রশাসন নিয়ে তিনি স্বস্তিতে ছিলেন না। তাঁর পছন্দের লোকদের তিনি প্রশাসনের শীর্ষ পদে বসিয়েছিলেন। দেশ চালানোর জন্য দলকে ব্যবহার করেছেন বেশি। তাঁকে নিয়ে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির জন্ম হয়েছিল, তা আধুনিক সরকারব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক ক্ষমতা সব জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হয়। সবাই যৌথভাবে প্রশাসন চালায়। আমলাতন্ত্রের এই আধুনিক ধারণার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। ফলে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের রাজনীতিকের মতোই জনপ্রিয়তা বজায় রেখে তিনি দক্ষতার সঙ্গে সরকার চালাতে পারেননি।[৩]

ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির এই ধারায় দলের প্রধান নেতা হচ্ছেন দলের নিয়ন্ত্রক, মালিক. অন্যরা তাঁর আজ্ঞাবহ। এক সময় দেখা গেল, দলে তাঁর কোনো সহকর্মী বা বন্ধু নেই, সবাই আজ্ঞাবহ কিংবা মোসাহেব। এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের প্রধান বাঙালি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

অধীন যে জন, কহ, স্বাধীনতা কোথা
সে জনের? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী।[৪]

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দেশ শত্রুমুক্ত হলে মুজিবনগর সরকার কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে এলে প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ সরকারের কর্তৃত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুজিব সরকার সময় পেয়েছিল মাত্র সাড়ে তিন বছরের মতো। এর মধ্যেই ঘটে যায় বিপর্যয়। পঁচাত্তরের আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগ কিছু সময়ের জন্য দৃশ্যপটের বাইরে চলে যায়।

কেন এই বিপর্যয়? এ নিয়ে নানা জনের নানা মত। ঘটনা পরম্পরায় মন্তব্য করা চলে যে, আওয়ামী লীগ তথা নতুন এই জাতি-রাষ্ট্রটি দুটো কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল যাত্রা শুরুর সময়েই। প্রথমটি হলো দলের মধ্যে গৃহদাহ -পরিণতিতে বিভক্তি। দলের মূল চালিকাশক্তি তরুণদের একটি বড় অংশ আওয়ামী বৃত্তের বাইরে গিয়ে আলাদা সংগঠন তৈরি করল এবং ধীরে ধীরে তা হয়ে উঠল আওয়ামী লীগের প্রবল প্রতিপক্ষ. এতে আওয়ামী লীগের যে প্রচণ্ড শক্তিক্ষয় হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় বিয়োগান্ত ঘটনাটি হলো মুক্তিযুদ্ধের সময় নেতৃত্বদানকারী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেপথ্যে চলে যাওয়া এবং দলের মধ্যে ক্রমে অপাংক্তেয় হয়ে পড়া। ১৯৬৬ সাল থেকেই সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি দলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দলের শীর্ষ নেতা হলেও সাংগঠনিক বিষয়গুলোতে তাজউদ্দীনের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। বাহাত্তরের শুরু থেকে এই ছন্দটি আর থাকল না, কোথায় যেন তাল কেটে গেল।

আজ হোক কাল হোক প্রশ্ন উঠবে যে, এই দুটো বিয়োগান্ত ঘটনার পেছনে কার দায় কতটুকু? প্রশ্ন উঠবে, শেখ মুজিবের সঙ্গে তাজউদ্দীনের সহাবস্থান কি একেবারেই অসম্ভব ছিল? প্রশ্ন উঠবে, ছাত্রলীগের বিভাজন কি শেখ মুজিব আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করতে পারতেন না? তাঁর আস্থাভাজন সামনের কাতারের মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে কেন ছেড়ে গেলেন, এই চিন্তা কি তাঁকে কখনো উদ্বেলিত করেনি?

অনেক কিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথে আছে নানান বাধা। আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্কের পরিবেশটা কেমন যেন হারিয়ে গেছে। অনেকের মনে এক ধরনের সংস্কার বা ট্যাবু কাজ করে—বঙ্গবন্ধু কি ভুল করতে পারেন? সম্মান জানাতে গিয়ে তাঁর এমন একটা ইমেজ তৈরি করা হয়েছে যে, তাঁকে নিয়ে

প্রশ্ন তোলাও যেন গর্হিত অপরাধ বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তবে উল্লিখিত দুটি বিয়োগান্ত ঘটনা না ঘটলে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের যাত্রাপথ সহজতর হতো, এতে সন্দেহ করার কারণ সামান্যই।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ ছিল। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, পিডিপি, মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির অন্তত একটি উপদল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক শক্তি ছিল নানা ভাগে বিভক্ত। রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও ছিল বিভক্তি। এঁদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার থিয়েটার রোডের মুক্তিযোদ্ধা, ভারতের সীমানার ভেতরে দপ্তর স্থাপন করা সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের ভেতরে গ্রামে-গঞ্জে লড়ে যাওয়া অগুণতি মুক্তিযোদ্ধা। তদুপরি ছিলেন ভারতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটি শরণার্থী, পাকিস্তানে আটকে পড়া চার-পাঁচ লাখ বাঙালি এবং দেশের ভেতরে অবরুদ্ধ কোটি কোটি মানুষ। স্বাধীনতার সূর্যটা উঠতে না উঠতেই তাঁদের মধ্যকার ঐক্যের সূতোটা ছিঁড়ে যায়। সবার মধ্যেই দেখা যায় এক ধরনের স্থূল প্রতিযোগিতা—'আমরাই দেশটা স্বাধীন করেছি। অতএব দেশটা আমরাই চালাব।'

সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের দাবি উঠলেও আওয়ামী লীগ তাতে কান দেয়নি। যুদ্ধোত্তর সমাজের নতুন বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগের হাতেই ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন হলো। এর সঙ্গে চেতনে কিংবা অবচেতনে যোগ হলো ক্ষমতার দম্ভ। একে অন্যের দেশপ্রেম নিয়ে সন্দেহ ও কটাক্ষ শুরু হলো। মুক্তিযুদ্ধকে মুনাফা হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ হিসেবে দেখলেন অনেকেই। যত্রতত্র শুরু হলো সম্পদের দখলদারি। যে যা পারেন, দখল নেওয়ার জন্য একদল মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় কেউ নীরব হয়ে গেলেন। অপেক্ষাকৃত দুর্বল যাঁরা, তাঁরা অপাংক্তেয় হয়ে পড়লেন। অনেকেই ক্ষুব্ধ হলেন। এই ক্ষোভের প্রতিফলন দেখা গেল রাজনীতিতে। ফলে রাজনীতি হয়ে উঠল সংঘাতময়, সহিংস। সাংবিধানিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সশস্ত্র রাজনীতির সন্ত্রাসবাদী ধারা বয়ে চলল সমান্তরালভাবে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য সবাই যেন মরিয়া। এই মনস্তত্ত্বের একটি ব্যাখ্যা যেন খুঁজে পাওয়া যায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের *ছাড়পত্র* কাব্যের 'বোধন' কবিতার কয়েকটি ছত্রে :

> লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম
> অনেক দিয়েছি; উজাড় গ্রাম।
> সুদ ও আসলে আজকে তাই
> যুদ্ধশেষের প্রাপ্য চাই।

সবার 'প্রাপ্য' চটজলদি মেটানোর ক্ষমতা দারিদ্র্য-পীড়িত এই দেশটির ছিল না। লোভ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার লাগাম টেনে ধরার সক্ষমতা ছিল না রাজনৈতিক নেতৃত্বের। ফলে দেশ দ্রুত ধাবমান হলো অনিশ্চয়তার দিকে।

অনেকেই তর্জনী তোলেন বাকশালের দিকে। তাদের যুক্তি, বাকশাল তৈরি না হলে পঁচাত্তরের আগস্ট হতো না। এই ধারণা ভুল। সরকার উৎখাতের আওয়াজ এবং চেষ্টা ছিল বাহাত্তর সালেই। চুয়াত্তরের প্রথম দিকেই সেনাবাহিনীর এক বা একাধিক কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—মুজিব মাস্ট গো। প্রশ্ন হলো, শেখ মুজিব কি কিছুই বুঝতে পারেননি?

বাজারে একটা তত্ত্ব চালু আছে যে, শেখ মুজিবকে চাটুকার ও সুবিধাবাদীরা ঘিরে রেখেছিল। এজন্য তিনি বুঝতে পারেননি যে, পরিস্থিতি ক্রমেই প্রতিকূল হয়ে উঠছে। এই সরল ব্যাখ্যায় শেখ মুজিবকে একজন 'হবুচন্দ্র রাজা', অর্থাৎ একজন চাটুকার-নির্ভর নির্বোধ শাসক হিসেবে দেখানোর প্রয়াস আছে। তাঁর মতন একজন পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ কিছুই বুঝতে পারেননি—এমন দাবি যৌক্তিক মনে হয় না।

বাহাত্তর সালের পর থেকেই দেশে বিরোধী রাজনীতি প্রবলতর হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আগুয়ান ছিল জাসদ। জাসদ মুক্তিযুদ্ধেরই উপজাত ফসল। এঁদের অনেকেই ছিলেন শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ, আস্থাভাজন রাজনৈতিক কর্মী। পাড়ার দাদা বা পরিবারের বাবা-মামা-চাচাদের ধরে এঁরা রাজনীতিতে আসেননি। শ্রম-ঘাম ও মেধা দিয়েই এঁরা শেখ মুজিবের আস্থা অর্জন করেছিলেন। তাঁরা কেন দূরে সরে গেলেন?

জাতীয় রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের মিত্র বলতে ছিল মস্কোপন্থী সিপিবি ও ন্যাপ। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে তারা আওয়ামী লীগের কাছাকাছি না হলেও অন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর চেয়ে এগিয়ে ছিল। আওয়ামী লীগের 'বি-টিম' হিসেবে প্রচার থাকা সত্ত্বেও ন্যাপ (মো) ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভোটের হিসাবে দ্বিতীয় হয়েছিল। বাহাত্তরেই তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে সখ্য করল, সহযাত্রী হলো। একটি স্বাধীন বিরোধী দল হওয়ার চেয়ে এরা বেছে নিল সব ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার কৌশল। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্যের কারণে এবং সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এটা তারা করেছিল। এর ফলে তারা বিরোধী দলের চরিত্র হারায়, আওয়ামী লীগও খুব একটা লাভবান হয়নি। ওই শূন্যস্থানটি পূরণ করেছিল জাসদ। বলা যায়, সিপিবি-ন্যাপ জাসদকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল।

আওয়ামী লীগ হয়তো ভেবেছিল, মুক্তিযুদ্ধ করা তরুণ প্রজন্ম সরকারবিরোধী

প্লাটফর্ম বানালেও রাষ্ট্রের গোড়া ধরে হয়তো ঝাঁকুনি দেবে না। বিরোধিতা করলেও প্রয়োজনে তার রাশ টেনে ধরা সম্ভব হবে। বিশেষ করে, বঙ্গবন্ধু ডাক দিলে তারা তা অগ্রাহ্য করতে পারবে না। কিন্তু দৈত্য একবার ছেড়ে দিলে তা আর বোতলে ঢোকানো যায় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বাধীনতা লাভের ছয় মাসের মধ্যেই সিরাজুল আলম খান কেন শেখ মুজিবকে নাকচ করেছিলেন এবং কেন তাঁর কথায় হাজার হাজার সম্ভাবনাময় তরুণ তাঁদের ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়ে 'বিপ্লবের' অনিশ্চয়তা আর ভয়ংকর বিপদের মধ্যে পতঙ্গের মতো ঝাপ দিলেন? এ কেমন তাড়না, যার প্রভাবে হাজার হাজার মেধাবী তরুণ শেখ মুজিবের পর্বতসমান ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে তাঁরই শিষ্য সিরাজুল আলম খানের পেছনে ছুটে গেলেন? এটা কি কেবলই ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও আবেগের বিস্ফোরণ ছিল? এই প্রবণতার সঙ্গে ত্রয়োদশ শতকের একটি জার্মান লোকগাথার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। হ্যামিলনের মেয়রের কাছ থেকে কাজের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরি না পেয়ে এক ক্ষ্যাপাটে বাঁশিওয়ালা নগরের সব বালক-বালিকাকে নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। রবার্ট ব্রাউনিংয়ের (১৮১২-১৮৮৯) কবিতা 'হ্যামিলনের বংশীবাদক'-এ এ রকম একটি বিয়োগান্ত ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ওই বংশীবাদক ছিলেন প্রতিবাদ, ধ্বংস আর মৃত্যুর প্রতীক।

তারপরও কথা থাকে। সংসদে মাত্র পাঁচজন বিরোধী দলের এবং তিনজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য থাকা সত্ত্বেও কেন একদল বানাতে হলো? এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? এর পেছনে কি প্রবল চাপ এবং উসকানি ছিল? অনাবশ্যক এবং অজনপ্রিয় এই ব্যবস্থাটি কায়েম করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নিজেই যেন নিজের কবর খুড়ল।

ঢাকায় ১৯ জুন ১৯৭৫ বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় শেখ মুজিব যে নীতিনির্ধারণী ভাষণটি দিয়েছিলেন, কনটেন্টের বিচারে তার চেয়ে ভালো বক্তৃতা আর কিছু হতে পারে না। এটাকে তাঁর জীবনের সেরা ভাষণ বললে কম বলা হবে। এটা ছিল নিতান্তই একটি মৌখিক বক্তৃতা। কিন্তু এই ভাষণে ভবিষ্যতের একটি রূপকল্প ছিল, সামাজিক বিন্যাসের একটি বিশ্লেষণ ছিল, আত্মসমালোচনাও ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ ধরনের রূপকল্প বাস্তবায়নের উপযোগী দল শেখ মুজিবের হাতে ছিল না। আওয়ামী লীগের সাইনবোর্ড অন্তরালে পাঠিয়ে বাকশাল তৈরি হলেও তার কমিটিগুলোতে আওয়ামী লীগের পুরনো মুখগুলোরই ছড়াছড়ি দেখা গেল।

দলের মধ্যে শেখ মুজিব ছিলেন একক শীর্ষ নেতা। তৃতীয় দুনিয়ার

উপনিবেশ-উত্তর বেশিরভাগ দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর চালচিত্র একই রকমের। দলে তাঁর পুরনো সহকর্মীর ঘাটতি ছিল না। কিন্তু ক্রমে তাঁরা হয়ে গেলেন অনুগত কর্মী, ইয়েসম্যান। তাঁরা কেউ আর বন্ধু থাকলেন না।

মুজিব হত্যাকাণ্ডে বিদেশি ষড়যন্ত্রের কথা উঠে এসেছে। এ নিয়ে আলোচনা আছে, রাজনীতিও আছে। কিন্তু কোনো প্রামাণ্য গবেষণা নেই। জন্মলগ্নেই বাংলাদেশ বৈশ্বিক ঠান্ডা লড়াইয়ের শিকার হয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোপানলে পড়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এ জন্য পরে প্রতিশোধ নিয়েছিল, এমনটা জোরগলায় বলা যাবে কি? বরং বাংলাদেশ পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে সোভিয়েত ধাঁচের 'অধনবাদী বিকাশের' দিকে ঝুঁকে পড়েছিল বলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তা মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছিল।

১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠন করা ছিল শেখ মুজিবের একক সিদ্ধান্ত। এ নিয়ে জন-আলোচনা ছিল না, আলোচনা ছিল না আওয়ামী লীগের মধ্যেও। আওয়ামী লীগ পরে দলীয়ভাবে ওই পদ্ধতির পক্ষে আর দাঁড়ায়নি, যদিও ওই সময়ে ওই পদ্ধতি সঠিক ছিল বলে তাঁদের কেউ কেউ দাবি করেন। প্রশ্ন হলো, বাকশাল কি সফল হতো? এ নিয়ে আছে নানামুখী আলোচনা ও বিতর্ক। নতুন শাসনব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল জনজীবনের সংকট মোচনে সৎ প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন এবং সামরিক বাহিনীর সমর্থনের ওপর। সেদিক থেকে বলা যায়, তখন একক দলের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার নানামুখী প্রচেষ্টা চললেও পরে প্রমাণিত হয়েছে যে, একক দলের নেতৃত্বে কোনো সমাজতান্ত্রিক বা তথাকথিত অধনবাদী পথের রাষ্ট্রগুলো এগোতে পারেনি। ওই রাষ্ট্রগুলোর পুরো ব্যবস্থাই ভেঙে গেছে।[৫]

তবে এটা মনে করার কারণ নেই যে মুজিব হত্যাকাণ্ড কেবলমাত্র গুটিকয়েক মেজর-ক্যাপ্টেনের কাজ। এর পেছনে দেশের অনেক রাজনীতিবিদের ইন্ধন ছিল, সমর্থন ছিল। এটা তাঁর দলের মধ্যেও ছিল। মুজিব হত্যা-ষড়যন্ত্রের অনুসন্ধান ও বিচারের প্রক্রিয়াটি শুরু করলে হয়তো থলের বেড়াল বেরিয়ে যেতে পারে। হয়তো অনেকেই এতে অস্বস্তিতে পড়ে যাবেন। যে কারণেই হোক এই প্যানডোরার বাক্সটি এখনো খোলেনি। বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।

আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের মধ্যে এ অভিযোগ প্রবল যে, জাসদ পঁচাত্তরের রক্তাক্ত আগস্টের প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছে। এটা সত্য যে, আওয়ামী লীগের বাইরে সব দল পরিবর্তন চেয়েছিল। এমন কি আওয়ামী লীগের

অনেক নেতাও পরিবর্তন চেয়েছিলেন। দলের ভেতরেই পরিবর্তনের শর্তগুলো তৈরি হয়েছিল, যার ওপর ভর করে দলের বাইরের শক্তিগুলো কাজ করেছে, সুযোগ নিয়েছে।

আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর ভূমিকা সবসময় ইতিবাচক ছিল না। রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদের ধারা এ অঞ্চলে প্রথম গ্রহণ করেছিল জাতীয়তাবাদীরা, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। চট্টগ্রামের সূর্যসেন ও প্রীতিলতার উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। এমন কি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আইডলদের একজন ছিলেন সূর্যসেন—এটা তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন। সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির ধারাটি পরে বহমান রেখেছিলেন এদেশের কমিউনিস্টরা। এ যাত্রায় জাসদ শামিল হয়েছিল সবার শেষে। সন্ত্রাসবাদ যে চূড়ান্ত বিচারে কারও জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না, এ উপলব্ধি হতে হতে সময় পেরিয়ে যায়। তখন অতীতকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। তবে এ থেকে উৎসারিত হয় ব্লেমগেম, দোষারোপের খেলা। এ খেলা চলতেই থাকে।

রাজনীতিতে যাকে আমরা 'মিলিট্যান্সি' বলি, কিংবা বলি 'র‍্যাডিক্যালিজম', এক সময় তার প্রভাব তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দুনিয়ায়। ১৯৬০ ও ৭০ দশকে তার আবেদন ছিল সব জায়গায়। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। যাঁরা নিজেদের এই বিপদসংকুল পথে সঁপে দিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন বয়সে নবীন, চোখে ছিল স্বপ্ন। সব কিছুর হিসাব কষে মেপে মেপে তো সবাই রাজনীতি করে না। বাংলাদেশ স্বাধীন করার আন্দোলনে শামিল হয়েছেন এদেশের কোটি কোটি মানুষ। কিন্তু অস্ত্র হাতে প্রতিরোধ লড়াইয়ে নেমেছেন মাত্র কয়েক হাজার তরুণ। অন্যরা যখন একটা সময়ের অ্যাকটিভিস্টদের কয়েক দশক পরে বিচার করতে বসেন, তখন অনেক ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে। 'অশুভের সমস্যা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> আমরা যখন লক্ষ্য করি একজন শিশু হাঁটতে চেষ্টা করছে, তখন আমরা তার অগুণতি অসাফল্য দেখি; তার সাফল্য কিন্তু অল্পই থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের পর্যবেক্ষণকে যদি সীমিত করতে হতো, তা হলে দৃশ্যটি নির্মম হতো। কিন্তু আমরা দেখি বার-বার অসাফল্য সত্ত্বেও শিশুটির ভিতরে এক খুশির প্রেরণা আছে, আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব কাজ করে যেতে এই প্রেরণা তাকে ধরে রাখে। আমরা দেখি সে তার পড়ে যাওয়া সম্বন্ধে ততই ভাবে না যতটা ভাবে তার এক মুহূর্তের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা সম্বন্ধে।
>
> একজন শিশুর হাঁটার চেষ্টার এইসব দুর্ঘটনার মতো, আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আমরা নানা ধরনের দুঃখের সম্মুখীন হয়ে থাকি, এই দুঃখ

আমাদের জ্ঞানের ও আমাদের অধিগত ক্ষমতার, ও আমাদের ইচ্ছা প্রয়োগের অসম্পূর্ণতা দেখায়। এরা যদি আমাদের কাছে কেবল আমাদের দুর্বলতা দেখাত তা হলে চরম হতাশায় আমাদের মৃত্যুবরণ করাই উচিত হতো। আমাদের কাজের পর্যবেক্ষণের জন্য যখন আমরা সীমিত ক্ষেত্র মাত্র নির্বাচন করি তখন আমাদের মনে আমাদের ব্যক্তিগত অসাফল্য ও দুঃখ বেদনা বড় হয়ে দেখা দেয়; কিন্তু সহজাতভাবে জীবন আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করার দিকে নিয়ে যায়।[৬]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উত্থানপর্বে আছে রোমাঞ্চকর নাটকীয়তা, আর তাঁর শেষ পরিণতি ছিল চরম বিয়োগান্তক। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় কেন এমনটি হলো, এ নিয়ে তর্কের শেষ নেই . এ বিষয়ে অ্যাকাডেমিক আলোচনার চেয়ে রাজনৈতিক পক্ষপাত কিংবা প্রতিহিংসা উগরে দেওয়ার প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের মূল্যায়নটি উল্লেখ করা যেতে পারে :

শেখ মুজিবের জীবন লক্ষ করলে একটা জিনিস প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে একজন অবিসংবাদী নেতার জনপ্রিয়তা কত তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যেতে পারে এবং ব্যক্তিটি কত বিভিন্ন বিষয়ে অকস্মাৎ বিতর্কিত হয়ে উঠতে পারেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক নেতাদের জনপ্রিয়তা কিছুটা নষ্ট হওয়ার কথা, কিন্তু তা যে এত তাড়াতাড়ি হয়েছিল তার পেছনে রয়েছে দেশের জনগণের প্রত্যাশা ও হতাশার টানাপোড়েন, শেখ মুজিবের শত্রুদের নিরলস প্রয়াস এবং তাঁর বন্ধুবর্গের নিষ্ক্রিয়তা। ক্ষমতায় আসার আগে শেখ মুজিব যে সাফল্যের সঙ্গে বিরোধী রাজনীতি করেছিলেন, সরকারি প্রশাসনের কর্ণধার হওয়ার পর সে সাফল্য অন্তর্হিত হলো। সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি শনাক্ত করতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যাদের আনুগত্য ছিল না তাদের প্রশাসনে রেখে সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয় এমন সাবধানবাণী কাস্ত্রো, টিটো বা বুমেদিয়েন উচ্চারণ করে থাকলেও বিরল আত্মবিশ্বাসে শেখ মুজিব সে সম্পর্কে তখন তেমন দুশ্চিন্তা করেননি। আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে কাস্ত্রো শেখ মুজিবকে এই বলে হুঁশিয়ারি করেন যে পৃথিবীময় তিনি শত্রু সৃষ্টি করেছেন। শেখ মুজিব যে অহঙ্কারে নিজেকে অজাতশত্রু মনে করেছিলেন, তার ভিত্তি মোটেও শক্ত ছিল না।...

শেখ মুজিব গঠনমূলক চিন্তা করার অবকাশ বা অবসর পাননি। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতাহীনতা ও কোন্দল, সুযোগসন্ধানী বেসামরিক ও সামরিক আমলাদের ক্ষমতার বলয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত ও দুর্নীতি, অর্থনীতিবিদদের অবাস্তব পরিকল্পনা এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বের ব্যক্তিদের সীমাহীন অর্থলিপ্সা মধ্যাহ্নে অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল।[৭]

কেউ কেউ মনে করেন, পঁচাত্তরের পালাবদলের মধ্য দিয়ে দেশে বিরাজনীতিকরণের একটা হাওয়া বইতে শুরু করে। হঠাৎ করে রাজনৈতিক দলগুলোর নেপথ্যে চলে যাওয়া এবং সামরিক বাহিনীর সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসা থেকে এই ধারণার সূত্রপাত। কিন্তু এই ধারণা ঠিক না। বরং বলা চলে রাজনীতির নাটাইটা রাজনৈতিক দলের হাতছাড়া হয়ে সামরিক বাহিনীর কবজায় চলে যায়। অর্থাৎ সামরিক বাহিনী রাজনীতির মঞ্চে নতুন শক্তি হিসেবে জায়গা করে নেয়। সামরিক বাহিনী এখন আর নিছক সনাতন ধারার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী না, তারা হয়ে ওঠে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তারা চালকের আসনে বসে যায়।

সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিকীকরণ শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। এদেশে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের মধ্যে স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষার স্ফূরণ ঘটেছিল। এটা এক ধরনের রাজনৈতিকীকরণ, যার প্রতিফলন দেখা যায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' অভিযুক্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকায়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঝেড়ে ফেলে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন। অনেকেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার ফলে বাংলাদেশে যে সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগ ছিল সরাসরি। ১৯৭৩-৭৪ সালে চোরাচালান, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সরকার দেশের বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছিল। ওই সময় সরকারি দলের নেতাকর্মীদের নানা অন্যায় কাজে সম্পৃক্ত থাকা সত্ত্বেও 'ওপরের নির্দেশে' পার পেয়ে যাওয়ার অনেক ঘটনা ঘটেছিল। ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। একই সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতির বিরুদ্ধে তাদের বিষোদগার ছিল। ফলে সেনাবাহিনীতে রাজনীতি গভীরভাবে ঢুকে যায়।

ডান-বাম রাজনীতির যে মেরুকরণ সমাজে দেখা গিয়েছিল, সেনাবাহিনী তার বাইরে ছিল না। লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন এবং লে. কর্নেল আবু তাহের সনাতন ধারার সেনাবাহিনীর খোলনলচে পাল্টে একে বিপ্লবী ধারার 'উৎপাদনমুখী' জনগণের বাহিনীতে রূপান্তরের চেষ্টায় ছিলেন। এছাড়া ক্ষমতাসীন দলের আচরণে তাঁরা ছিলেন ক্ষুব্ধ এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখেছিলেন। ফলে সেনাবাহিনীতে এক ধরনের গোষ্ঠীগত মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়। তাঁদের মধ্যে এই ধারণা জন্মে যে, তাঁরা একটা সফল মুক্তিযুদ্ধ

করেছেন এবং দেশের পুনর্গঠন ও অগ্রযাত্রায় তাঁরাই প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে পারবেন।[৮]

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর মাত্র দুটি ইউনিট জড়িত থাকলেও তা সমগ্র সেনাবাহিনীর সমর্থন পায় এবং পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর মধ্যে গোষ্ঠীতন্ত্র জেঁকে বসে। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীরা রাজনীতিবিদদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবেননি। 'চেইন অব কমান্ড' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার নামে তাঁরা চেয়েছিলেন একচ্ছত্র সেনাশাসন। জেলে আটক ও পরে নিহত চার জাতীয় নেতাকে নিয়ে তাঁদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তাঁরা জাতীয় সংসদ বাতিল করে দিয়েছিলেন। পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী একটা সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর পরবর্তী ইতিহাস হলো ক্রমাগত শক্তিশালী, সুসংহত ও পেশাদার হওয়ার।

পরিশিষ্ট ১

প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩

দল	প্রার্থী	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (%)
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	২৯৩	৭৩.১৬
ন্যাপ (মোজাফফর)	২২৪	-	৮.৩২
ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৯	-	৫.৩২
জাসদ	২০৭	১	৬.৫২
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৪	-	০.২৫
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মা.লে)	২	-	০.১০
বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি	৩	-	০.০৬
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান খান)	৮	১	০.৩৩
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (অলি আহাদ)	১১	-	০.২৮
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	-	০.২০
বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন	৩	-	০.০৯
জাতীয় গণতান্ত্রিক দল	১	-	০.০১
বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন	১	-	০.০৪
বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস	৩	-	০.০২
স্বতন্ত্র	১২০	৫	৫.২৫
মোট	১,০৮৯	৩০০	১০০.০০

সূত্র : নির্বাচন কমিশন ও সমসাময়িক পত্রপত্রিকা

পরিশিষ্ট ২

বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

ঢাকা, ১৯শে জুন

আজ বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে দলীয় চেয়ারম্যান জাতির জনক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

আজকে প্রথম দিন আমরা এখানে বসেছি সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করার জন্য, যাকে বলা হয় গেট টুগেদার। যাতে আমরা মেম্বার যাঁরা রয়েছি, সকলে একসঙ্গে বসতে চাই, সকলকে যেন চেনা যায়, আলোচনা করা যায় এবং জানা যায় কি অবস্থা।

শিগগিরই অ্যাসেম্বলি সেশন হবে, বাজেট সেশন। আগস্ট মাসে সেন্ট্রাল কমিটির বৈঠক বসবে। একদিন দুদিনের জন্যে নয়, দরকার হলে পাঁচ-সাত দিনের জন্য বসবে। এবং সেই সেন্ট্রাল কমিটির মিটিংয়ে বিভিন্ন এজেন্ডা দেয়া হবে। সেই এজেন্ডা অনুযায়ী কনফারেন্সকে ভাগ করে কতগুলো সাব-কমিটি বা কমিশন করে দেয়া হবে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এবং বাইরের যদি দরকার হয় তাদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে একটি প্রপোজাল সাবমিট করা হবে কনফারেন্সের কাছে। যেমন ফুড, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রি, ফ্লাড কনট্রোল, এডুকেশন বিভিন্ন সাবজেক্টের সাব-কমিটি করে তাদের কাছে ভার দেয়া হবে। রেসপেক্টিভ মিনিস্টার সেখানে থাকবেন। সরকারি কর্মচারীরা থাকবেন। দরকার হয় বাহির থেকে—যারা আমাদের কমিটি মেম্বার নয়, কিন্তু যারা কন্ট্রিবিউট করতে পারেন, তাদেরকে আমরা ইনভাইট করতে পারব। সেখানে বসে কতটুকু কী করা হয়েছে, কতটা ভুল হয়েছে, কী ত্রুটি হয়েছে বা কী কী করলে আমরা দেশের

ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারব। সাজেশন দিলে তখন সেন্ট্রাল কমিটি থেকে এটা প্রস্তাব করে গভর্নমেন্ট সেই অনুযায়ী তাদের কাজকর্ম করবে। এই আমাদের ইচ্ছে। আগস্ট মাসে একটা ফুল এজেন্ডা নিয়ে কাজ শুরু করা।

আপনাদের কাছে বক্তৃতা করে বোঝানোর দরকার নাই। তবে এটুকু বলতে পারি কেন আমরা এ নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করলাম আর কেনই-বা আমরা একে বিপ্লব বললাম। সেদিন ডক্টর এনামুল হক সাহেবের একটা লেখা পড়লাম। তিনি বললেন যে, বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয় নাই সেকথা সত্য নয়। বাংলাদেশ অনেকবার স্বাধীন হয়েছে কিন্তু রাখতে পারে নাই। বিদেশিদের ডেকে আনতে হয়েছে, ডেকে এনেছে এই বাঙালিরাই। কথাটা আমার মনে লাগল। কিন্তু আমি তো উনার মতো শিক্ষিত নই। তিনি তো আমার চেয়ে অনেক গুণীজন, গুরুজন। ওনাকে আজও ভক্তি করি আমি। আমি যা চিন্তা করতাম বা ইতিহাসে যা পড়েছি তা উনার কথা পড়ে আমি তা কনফার্ম করলাম। আজকে স্বাধীনতার পরে বিনা কারণে এইভাবে সিস্টেম চেঞ্জ করি নাই। বাংলাদেশে নির্বাচন দিয়েই ৯৭ পারসেন্ট ভোট আউট অব থ্রি হানড্রেড ফিফটিন, থ্রি হানড্রেড সেভেন সিটস আমাদের পার্টি আওয়ামী লীগের ছিল যদি তার পরও ইলেকশন দিতাম, এখনও বিশ্বাস করি দুই এক পারসেন্ট বাদ যেতেও পারে, কিন্তু নব্বই পার্সেন্ট-এর কম পাবে না আমাদের পার্টি। সেজন্য এই সিস্টেমে ক্ষমতাচ্যুত হবার সম্ভাবনা আমাদের অনেক দিন ছিল না—যদি ক্ষমতায় থাকতে চাইতাম। আর ক্ষমতার জন্য রাজনীতি যদি করতাম—তাহলে আমরা অনেকবারই ক্ষমতায় আসতে পারতাম। যদি নেগোশিয়েসন বা আপোষে আমরা ক্ষমতা চাইতাম, তাহলে কেন আমরা এই পরিবর্তন করলাম?

আজ দুনিয়ার দিকে আমাদের চাইতে হবে। স্বাধীনতার পর আমাদের কী দশা হলো? ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমরা স্বাধীনতা পেলাম, এবং রক্তের বিনিময়ে পেলাম। সাড়ে সাত কোটি লোক, ৫৪ হাজার স্কয়ার মাইল। সম্পদ বলতে কোনো পদার্থ আমাদের ছিল না। সমস্ত কিছু ধ্বংস, আমরা কিন্তু চেষ্টা করলাম যে ঠিক আছে, আমরা একদম যাকে যা ফ্রিহ্যান্ড দিয়ে দিলাম। আচ্ছা বলো, আচ্ছা করো, আচ্ছা দল গড়ো, আচ্ছা লেখো, আচ্ছা বক্তৃতা করো, বাধা নাই, ফ্রি হ্যান্ড। আমার মনে নাই, বোধ হয়, আমার মনে পড়ে না যে দশ বিশ বছরের মধ্যে আমরা অনেক পুরানা নেতৃবৃন্দ আছেন যে পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে গালাগালি করে কেউ ফিরে গেছে। এ আমার জানা নাই বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে। কিন্তু তাও ক্ষমতায় এসে বিপ্লবের মাধ্যমে বললাম, যদি কিছু ভালো কথা বলতে চাও বলো, যদি দেশের মঙ্গল হয় বলো। কিন্তু দেখতে

পেলাম কী? আমরা যখন এই পন্থায় এগুতে শুরু করলাম, বিদেশি চক্র এদেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং তারা এদেশের স্বাধীনতা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করল এবং ফ্রি স্টাইল শুরু হয়ে গেল। হুড়হুড় করে বাংলাদেশে অর্থ আসতে আরম্ভ করল। দেশের মধ্যে ধ্বংস—একটা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ যা—এ ছাড়াও আরও দেখা গেল, যাদের আমরা এ সমস্ত ভোগ করতে দিলাম তারা রাতের অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করল। যখন আমরা বলেছি যে, বাবা ঠিক আছে, পাঁচ বছর পরে ইলেকশন হবে, ইলেকশন করো, ইলেকশনে যদি ডিফিট খাই আর একজন এসে বসবে। হাইকোর্টের একজন এক্স-জাজ আমাদের ইদ্রিস সাহেবকে ইলেকশন কমিশনার করা হয়েছিল। তাঁকে আমি ইলেকশনের ব্যাপারে বলেছি, কোনো কথা নাই। যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন আপনি, ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে। তা না করে রাতের অন্ধকারে ইলেকটেড মেম্বার অব পার্লামেন্ট তাঁদের হত্যা করা হলো। যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যুদ্ধ করেছেন, দেশ ত্যাগ করেছেন, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যাঁদের সম্পত্তি, তাঁদের রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হল। মোট কয়েক হাজার কর্মীকে হত্যা করা হল। যারা নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেছে, মুক্তি বাহিনীর ছেলে, তাদের হত্যা করা হল। চরম ষড়যন্ত্র। এত অস্ত্র উদ্ধার করি তবু অস্ত্র শেষ হয় না। এই রাজনীতির নামে হাইজ্যাক, এই রাজনীতির নামে ডাকাতি, টেলিফোন করে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করে বা মানুষের বাড়িতে গিয়ে গহনা কেড়ে নেয়। রাজনীতির নামে একটা ফ্রি-স্টাইল শুরু হয়ে গেল। নব্য, কিছুদিন আগে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটা দেশে এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। পিপ্‌লস-এর মধ্যে যে ডিমরালাইজিং ইফেক্ট হয়, তার ফল খুব খারাপ হয়। আমরা জানি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। আমরা জানি বন্যা, এক কোটি লোক চলে গিয়েছে, তারা ফিরে আসবে, তাদের রিহিবিলিটেশন, ওয়ার্ল্ড ইনফ্লেশন, যা আমার হাতে আপনার হাতে নয়। জিনিসের দাম বেড়ে গেল। ড্রাউট হল বাংলাদেশে, এই সাউথ-ইস্ট এশিয়াতে। ফ্লাড আসল, সাড়ে সাত কোটি লোক, ২০০ বছরের গোলামি, অর্থনৈতিক কাঠামো নেই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলে কোন গভর্নমেন্ট নেই, সবকিছু রয়েছে ইসলামাবাদে। একটা প্রভিনসিয়াল গভর্নমেন্ট ছিল, ছোটোখাট, তাও নয় মাসে আর্মি কন্ট্রোলে নিয়ে নিল। তাদের স্ট্রাকচার ধ্বংস করে দিল। নেই একটা ফরেন অফিস, নেই একটা প্ল্যানিং অফিস, নেই একটা কোনো কিছু। আমাদের সব কিছু আরম্ভ করতে হয়েছিল গোড়া থেকে। এই সুযোগে মামাদের—যারা স্বাধীনতার নামে অনেক চেষ্টা করেছিল যার যার নিজেদের একটা 'বেস' করা যায় কি না। ভবিষ্যতে তাদের স্টুজরা এদেশে সরকার চালাতে পারে কি না। বাংলাদেশ

স্বাধীন হওয়ার পরে এবং আগে যে পলিসি আমরা নিয়েছি, বৈদেশিক নীতি, বাংলাদেশের মানুষ শিক্ষিত সমাজ এবং দুনিয়া এটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে।

আমরা নন-এলায়েন্ড, আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসিতে বিশ্বাস করি, আমরা পিসফুল কো-এক্সিসটেন্স-এ বিশ্বাস করি। আমরা দুনিয়ার নির্যাতিত পিপলের সাথে আছি, আমরা কারো সাথে শত্রুতা করতে চাই না। আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই, আমরা আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি, আমরা বিশ্বে শান্তি চাই, আমরা কারুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না, আমাদের ব্যাপারেও কেউ হস্তক্ষেপ করুক এটা আমরা চাই না। আমরা দেশকে গড়তে চাই, আমরা সকলের শান্তি চাই, আমাদের লোক বাঁচতে চায়। এই পলিসি সকলেই—প্রায় হোল ওয়ার্ল্ড—পছন্দ করল। আমার দেশবাসী সেটাকে সমর্থন জানাল। আমরা মনে করি, আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণরূপে সাকসেসফুল হয়েছে। আজ আমরা নন-এলায়েন্ড কান্ট্রিতে আছি, আজ আমরা ইসলামিক সামিট-এ আছি, আজ আমরা কমনওয়েলথ-এ আছি, আজ আমরা ইউএনও-তে আছি। ইউএনও-র চার্টারে বিশ্বাস করি। আমরা সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স-এ আমাদের প্রয়োজন নাই, এতে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। আমরা, যেখানে কোনো অপ্রেসড ইন্টারন্যাশনাল পিপলস থাকবে, তাঁদের মর‍্যাল সমর্থন দিতে পারি, এবং দিব, যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা দিব। আমরাও অপ্রেসড পিপল, আমরাও যুগযুগ ধরে এটার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, আমরাও মার খেয়েছি, দুনিয়ার শোষকগোষ্ঠী, ইম্পেরিয়ালিস্ট পাওয়ার আমাদের সম্পদ লুট করে নিয়েছে। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, আমাদের স্বজন হারানোর অর্থ কী? এর অর্থ হলো আমাদের অর্থনীতির মালিক আমি এবং আমার দেশ সেই সম্পদ ভোগ করবে।

তারপর পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। আমরা এতো রক্ত দিয়েছি, এতো আমরা আঘাত পেয়েছি, এতো আমাদের ইনটেলেকচুয়েলকে হত্যা করা হয়েছে, মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আমাদের রাস্তাঘাট ধ্বংস করা হয়েছে, তবুও আমরা বলেছি, আমরা সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যারা ১৯৫ জন, যারা কমিটেড ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি, তাদের পর্যন্ত আমরা মাফ করে দিলাম, উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমরা এদেশে—সাউথ ইস্ট এশিয়া, পারটিকুলারলি সাব-কনটিনেন্টে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে আমরা এ দেশে ডেভেলপমেন্টের কাজ করব, আমাদের এটেনশন থাকবে মানুষের মঙ্গল করা, দেশকে গড়া। কিন্তু পাকিস্তান, দুঃখের বিষয়, একটা পয়সা পর্যন্ত, ৫৬ পারসেন্ট আমরা পপুলেশন, কেন্দ্রীয় সরকারের

কোনো সম্পদ আমাদের দিল না, ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ আমাদের দিল না, গোল্ড রিজার্ভ আমাদের দিল না। আমাদের কোনো একটা জাহাজ দিল না, কোনো কিছুই তারা আমাদের দিল না। আমরা আমাদের দিক দিয়ে শত চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তারা এগিয়ে আসলো না, দ্যাটস অল রাইট। মাটি আছে, মানুষ আছে, দেশ আছে, ইনশাল্লাহ। কষ্ট হয়েছে আমার মানুষের, না খেয়ে মরেছে সত্য কথা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে যে সম্পদ আছে যদি গড়তে পারি, অনেস্টলি কাজ করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশের কষ্ট একদিন দূর হয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা চেষ্টা করেছিলাম, আমরা এখনও পর্যন্ত চেষ্টা করছি, কিন্তু তারা এগুচ্ছে না। এছাড়া কারও সঙ্গে দুশমনি নাই। চায়না রেকগনিশন দিল না। আমরা চায়নার সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। তারা একটা বিগ কান্ট্রি। আমরা এখনও বন্ধুত্ব চাই। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে রাশিয়ার, আমার বন্ধুত্ব আছে ভারতবর্ষের সঙ্গে, আমার বন্ধুত্ব আমেরিকার সঙ্গে। এ বন্ধুত্ব সকলের সঙ্গে আমরা চাই। আমরা কারও সঙ্গে গোলমাল করতে চাই না। কারণ আমি আমার দেশকে গড়তে চাই, এই পলিসিতে আজ পর্যন্ত আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু দেশের মধ্যে এজেন্সি শুরু হয়ে গেল, একটা খবরের কাগজ–বহুদিন রাজনীতি করেছি, ১৮ বছর বয়স, তখন বোধ হয় ১৯৩৮ সন তারপর চোঙ্গা মুখে দিয়ে রাজনীতি করেছি, রাস্তায় হেঁটেছি, পায়ে হেঁটেছি, ফুটপাথে ঘুমিয়েছি। সেই রাজনীতি থেকে আজ এ পর্যন্ত এসেছি, এর মধ্যে আমি বলতে চাই না যে আমি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছি, সাধারণ মানুষ থেকে আমি চোঙ্গা ফুঁকেছি, সাইকেলে ঘুরেছি, গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাজনীতি করেছি–একটা খবরের কাগজ চলতে পারে না যদি অ্যাডভারটাইজমেন্ট না পায়। বৎসরের পর বৎসর এই টাকা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ব্যয় করতে পারে বলে আমার জানা নাই। আর আমি হলাম বিগেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি লিডার, যে দেশে একটা পার্টি গড়ে তুলেছি এবং চালিয়েছি, যেটা নাম্বার ওয়ান পলিটিক্যাল পার্টি অব বাংলাদেশ।

আমি একটি ডেইলি কাগজ চালাতে পারি নাই। অর্ধেক ভাগ করেন তার মানিক ভাই। বরং মানিক ভাইর 'এবিলিটি' এবং 'এক্সপেরিয়েন্সে' *ইত্তেফাক* কাগজ চালাতেন তিনি। তা থেকে আমাদের সমর্থন করতেন। এ তিন বছরের মধ্যে দেখা গেল যে এমন কাগজও চলল, যে কাগজ বছরে এক ইঞ্চি 'অ্যাডভারটাইজমেন্ট' পায় নাই। কিন্তু একটা কাগজ করতে মাসে কম পক্ষে এক লক্ষ, সোয়া লক্ষ, দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়। আজকে এই টাকা তারা কোথা থেকে পায়? কে দেয়? তাদের এই টাকা কোথা থেকে আসে? তারপর 'ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট' বলতে যে পদার্থ বাংলাদেশে আছে, তাদের এতো টাকা আছে বলে আমার জানা

নাই—ছিল কি না জানি না। এখন কিছু লোক নতুন টাকার মানুষ হয়েছে। কিন্তু 'ইন্ডাস্ট্রি' তো আমরা নিয়ে নিলাম। দেখা গেল যে বিদেশে কিছু কিছু জায়গা থেকে পয়সা পেয়ে তারা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, গোলমাল সৃষ্টি করে।

আর দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা এই 'সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস' করলাম কেন? এই যে আমাদের সমাজ, এখানে দেখতে পাই, আমি অনেক চিন্তা করেছি, বহুদিন কারাগারে, জেলে একলা একলা বসে বসে চিন্তা করতে আমি সময় পেয়েছি, এই সব বিষয়ে যে, আমার দেশের ২০% লোক আমরা শিক্ষিত। তার মধ্যে আমরা ১০% বা ৫% লোক বলব আমরা লেখাপড়া কিছুটা জানি। এর মধ্যে এক গ্রুপ আমরা পলিটিশিয়ান হয়ে গেলাম। এক গ্রুপ আমরা বুদ্ধিজীবী। এক গ্রুপ স্কুল টিচার, যারা এই ঘোর প্যাচের মধ্যে আসতে চায় না। এক গ্রুপ সরকারি কর্মচারী হয়ে গেলাম, কেউ ডাক্তার হয়ে গেলাম, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেলাম, কেউ অমুক হয়ে গেলাম। আর কিছু সংখ্যক থেকে গেলাম রাজনীতিবিদ। কিন্তু 'অ্যাকচুয়াল' যেটা 'পিপল' সমস্ত একতাবদ্ধ করতে না পারলে সমাজের দুর্দিনে দেশের মঙ্গল হতে পারে না। সেজন্য আমরা চিন্তা করলাম সমাজের যেখানে যে আছেন, বুদ্ধিজীবী হন, ডাক্তার হন, ইঞ্জিনিয়ার হন, সরকারি কর্মচারী হন, রাজনীতিবিদ হন, ল-ইয়ার হন—কারণ আমার সমাজে তো শতকরা ২০ জনের বেশি শিক্ষিত নন, এর মধ্যে সমস্ত লোককে একতাবদ্ধ করে দেশের মঙ্গলের জন্য যদি এগিয়ে যেতে না পারি, তবে দেশের মঙ্গল করা কষ্টকর হবে। সেজন্য নতুন 'সিস্টেমের' কথা বহুদিন পর্যন্ত চিন্তা করেছি। আমার মনে হয় বাংলাদেশবাসী এটাকে গ্রহণ করেছে। এবং ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। আর একটা জিনিস আমি 'মার্ক' করলাম। সেটা হল, এই যে, এক দল বলে আমরা 'পলিটিশিয়ান', এক দল বলে আমরা 'ব্যুরোক্রেট'। তাদের 'অ্যাটিচিউড' হল 'হাউ টু ডিসক্রেডিট দি পলিটিশিয়ান।' 'পলিটিশিয়ানরা' তাদের 'স্ট্রেংথ' দেখাবার জন্য বলত যে 'অলরাইট, গেট আউট'। এই নিয়ে সমস্ত দেশে একটা ভাগ ভাগ অবস্থার মধ্যে থাকত। এবং এই সন্দেহটা দূর করা দরকার। এবং দূর করে সকলেই যে এক এবং সকলেই যে দেশকে ভালোবাসে এবং মঙ্গল চায়, আমার সমাজের যে সমস্ত গুণী জ্ঞানী লোক আছেন ও যত লোক আছেন, তাদের নিয়ে আমার একটা 'পুল' করা দরকার। এই পুল আমি করতে পারি, যদি আমি নতুন একটা 'সিস্টেম' চালু করি এবং একটা নতুন দল সৃষ্টি করি—জাতীয় দল, যার মধ্যে একমত, এক পথ, এক ভাব, এক হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায়, যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে তারা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে পার। এজন্য আজকে এটা করতে হয়েছে।

আর দ্বিতীয়ত : পয়সা কড়ি খরচ করে অন্য ধরনের রাজনীতি করা যায়। কিন্তু আমি যেটা বলেছি—শোষিতের গণতন্ত্র কেন বলেছি 'শোষিতের গণতন্ত্র এজন্য বলেছি—যে আজকে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসে মানুষ। বঙ্গবন্ধু বলে দিয়েছে 'অল রাইট' যাও তুমি যেয়ে কনটেস্ট কর। আমি যেয়ে কিছু বক্তৃতা করে দিয়ে আসলাম—যাও। পছন্দ করল না, বঙ্গবন্ধু কইছে, আর করবো কি, ভোটটা, দিয়েই দিলাম। এ-ও হয়েছে অনেক জায়গায়—হয়। কাজেই সেজন্য সিস্টেম চেঞ্জ করে বলেছি এই যে কনস্টিটুয়েন্সিতে চার জন, কি তিন জন, কি দুই জন লোক গেছে তাদের সম্বন্ধে লোকদেরকে বলে দেওয়া হলো, এই তিন জন চার জন পার্টির লোক আছে তার মধ্যে যাকে আপনারা পছন্দ করেন ভোট দিন। ফলে ওই জনগণ সুযোগ পেল অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার অউন চয়েস ভালো লোককে পাঠাবার জন্য। তাহলে আমরা অনেক সময় 'জিন্দাবাদ' 'মুর্দাবাদ' দিয়ে পাশ করে নিয়ে আসি। তাতে দেখা গেছে যে সত্যিকারের ভালো লোক অনেক সময় নাও আসতে পারে। কিন্তু এতে সত্যিকারের ভালো লোক আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সেজন্য এই সিস্টেম করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত : জাতীয় ঐক্য, যেটা বলেছি আমি, জাতীয় ঐক্য আমরা করতে পারব। আর যারা দেশকে ভালোবাসে না দেশের সঙ্গে বেইমানি করল তাদের সকলকে আমরা ক্ষমা করলাম। স্বাধীনতার সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করল—বেইমানি করল, রাজাকার হলো তাদেরকেও আমরা ক্ষমা করে দিলাম। অন্য দেশে বিপ্লবের পরেও এভাবে ক্ষমা করে নাই। একেবারে নির্মূল করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা ক্ষমা করলাম। বললাম যে ঠিক আছে, তওবা করো, আল্লাহ তোমাদের ঈমান দিক : তোমরা দেশের কাজ করো। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। তাদের মধ্যে একটা গ্রুপ, সেই শত্রু যে শত্রু আমাদের এখানে ম্যাসাকার করল তাদের মাধ্যমে লন্ডনে বসে অর্থ খরচ করে বাংলাদেশের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে আরম্ভ করল। তাদের কি অধিকার আছে রাজনীতি করার বাংলাদেশে? ক্ষমা করতে পারি কিন্তু কী অধিকার তাদের আছে বিদেশে বসে বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করার? স্বাধীনতার সঙ্গে শত্রুতা করার? অন্য একটা দেশের প্রভিন্স করবার চেষ্টা করার? বাংলাদেশে তাদের রাজনৈতিক অধিকার থাকবে না—থাকতে পারে না। অ্যান্ড উই মাস্ট বি রুথলেস ফর দ্যাট। এসমস্ত লোককে সন্দেহ লাগে। আমরা জানি—পরিষ্কার জানি যে এ জিনিস হচ্ছে। সেজন্যই আজকে আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন। আজকে আমাদের যাদের এক মত, এক পথ, আজকে তারা আমরা মিলে এক সঙ্গে এক ঐক্যে নতুন দলের সৃষ্টি করেছি। নতুন সিস্টেম করেছি। আমাদের দেশে বহুদিনের একটা মেন্টালিটি দেখেছি। কিছু একটা নতুন

জিনিস দেখলে আমাদের একটা বাধা আসে। বিপ্লব কাকে বলা হয়? পুরানো রীতি, যেটা দেশের মঙ্গল না করে সেই রীতি বদলানোর মত সৎ সাহস থাকা প্রয়োজন। পুরানো আইন, যে আইন দেশের মঙ্গল না করে সেই আইনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার অধিকার জনগণের রয়েছে। পুরোনো মত এবং পথ যদি দেশের মঙ্গল করতে না পারে সেই মত এবং পথের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করার অধিকার বাংলাদেশের জনগণের রয়েছে। নতুন বিপ্লব যখন আপনি বলছেন তখন এই বিপ্লবের মাধ্যমে জাতির জন্য একটা নতুন জিনিস নতুন সিস্টেম আপনাকে গড়ে তুলতে হবে। যে সিস্টেম আজকে আমরা দেখি সেই সিস্টেম ব্রিটিশ কলোনিয়াল সিস্টেম। এতে দেশের মঙ্গল হতে পারে না। এটাতে আমরা কনভিনসড। ব্রিটিশ যে সিস্টেম করে গিয়েছিল বা যেটা আমাদের দেশে চলছিল অর্থাৎ উপনিবেশবাদীরা দেশকে শোষণ করার জন্য যে সিস্টেম দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে চালু করে গিয়েছিল সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেই সিস্টেম সেই আইন, সেই সব কিছু পরিবর্তন করার নামই বিপ্লব। শুধু এজন্যই যে আমি এক পার্টি করেছি তা নয়। ঘুণে ধরা এই শাসন ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার আমি করতে চাই। বর্তমানে ঘুণে ধরা বিচার পদ্ধতিকে ভেঙেচুরে জনগণ যাতে তাড়াতাড়ি বিচার পায় সে রকম ব্যবস্থা আমি নতুন করে করতে চাই। আমার এই নতুন সিস্টেমই একটা বিপ্লব। সে জন্যই আজকে আমি কারও কথা শুনি নাই। শুনতে আসি নাই। আজকে আপনাদের কাছে বলার জন্য আমি খবরের কাগজেও দেই নাই। কাল আমি অর্ডার দিয়ে এসেছি। গো অন, সিক্সটি ডিস্ট্রিকটস। ষাইটটি সাবডিভিশন হবে ষাইটটি জেলা। প্রত্যেক জেলার জন্যে একজন গভর্নর থাকবেন। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। তাঁর অধীনে এসপি থাকবেন। দলের প্রতিনিধিগণ থাকবেন, সংসদ সদস্যরা থাকবেন, জনগণের প্রতিনিধিরা থাকবেন। কাউন্সিলে সরকারি কর্মচারীরাও থাকবেন। প্রত্যেক জেলায় অর্থাৎ বর্তমান মহকুমাসমূহে একটি করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল থাকবে এবং তার একজন গভর্নর থাকবে। সে স্থানীয়ভাবে শাসন ব্যবস্থা চালাবে। শাসন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। জেলা গভর্নরের কাছে যাবে আমার ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা। তার কাছে যাবে আমার খাদ্য সামগ্রী। তার কাছে যাবে আমার টেস্টরিলিফ, লোন, বিল ও সেচ প্রকল্পের টাকা। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ডাইরেক্ট কন্ট্রোলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরিচালনা করবে। তবে ব্রিটিশ আমলারা বলে গিয়েছেন, সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে হবে, এসডিও সাহেব, যা করবেন সেটাই হবে ফাইনাল কথা। সিও সাহেব শাসন করবেন থানায় বসে, সেই অ্যাডিমিনিস্ট্রেশন রাখতে হবে? এতে

দেশের মঙ্গল দূরের কথা। কারণ আমি যে টাকা দেবো একটা থানায়, সেই টাকা দেবো সিও সাহেবকে। এনি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার ইজ বেটার দ্যান এনি সিও ইফ দি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার ইজ সিনসিয়ার। ক্যাশের টাকা সেখান থেকে লুট হয়ে যাবে, সে জন্য আমি অর্ডার দিয়েছি, আজকে অর্ডার হয়ে গেছে। ১৫ জুলাই থেকে এই ৬০ জন গভর্নরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে। ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে। ১ বছরের মধ্যে থানা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল করতে হবে। সেখানে বাকশালের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, কৃষকের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, শ্রমিকের থাকবে, যুবকের থাকবে, মহিলাদের থাকবে। একজন গভর্নর থাকবে, যিনি হবেন হেড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সেখানে মেম্বার অব পার্লামেন্ট গভর্নর হতে পারে, সেখানে পার্লামেন্টের মেম্বার নয় এমন পলিটিক্যাল ওয়ার্কার হতে পারে, সেখানে সরকারি কর্মচারী যাকে বিশ্বাস করি সেও হতে পারে। আবার নাক উঁচু করা চলবে না। পার্টির মেম্বার হওয়ার পরে দে উইল টেক রেসপনসিবিলিটিজ অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এই তো গেল একদিক। তবে আমি কাজ বাড়িয়ে দিয়েছি আইনমন্ত্রীর। আমি অর্ডারগুলি করে দিয়েছি, কিন্তু তাঁর জান শেষ। মানে এইগুলি করতে করতে তাঁর জান শেষ হয়ে যাবে। বুঝেছি, শুনে মুখ কালো করে ফেলেছেন। অর্ডার আমি দিয়ে দিয়েছি, আইন তাঁর বদলাতে হবে। আইন-টাইন আমি বুঝি না। আমি বলেছি কাজ করে যান যা কিছু দরকার হয়। এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তারপর আমাদের সেক্রেটারিয়েট এসব ভাঙতে হবে। এসব চলতে পারে না। আই অ্যাম গোয়িং ফর দ্যাট। টাকা নাই, পয়সা নাই, খাবার নাই, এটা নাই, ওটা নাই। ভাঙতে হবে। ডাবল, ট্রিপল, অ্যান্ড দ্যাট। এক এক নোট লিখে নিয়ে আসে। আমি বলেছি এস্টাবলিশমেন্টের সাহেবরা আছেন। এখান থেকে আরম্ভ করে সেকশন অফিসার, তারপর ডেপুটি সেক্রেটারি, সেক্রেটারি, তারপর আসে আমার কাছে। এইটুকু নোট, এইটুকু ফাঁক।

প্রয়োজন নাই, সোজাসুজি কাম চালান। কর্পোরেশন করেছি। অলরেডি দুইটি কর্পোরেশন করে ফেলেছি। এভরি কর্পোরেশন ডাইরেক্টলি আন্ডার দি মিনিস্টার থাকবে। লেট দি মিনিস্টার গেট ওয়ার্ক ফ্রম জয়েন্ট সেক্রেটারি। ব্রিটিশ আমলের সেই ঘুণে ধরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম দিয়ে বাংলার মানুষের মঙ্গল হতে পারে না। ইট মাস্ট গো। সে জন্য আমূল পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়েছে। দ্যাট ইজ অলসো এ রেভ্যুল্যুশন। আজকে এই যে নতুন এবং পুরান যে সমস্ত সিস্টেমে আমাদের দেশ চলছে, আমাদের আত্মসমালোচনা প্রয়োজন আছে। আত্মসমালোচনা না করলে আত্মশুদ্ধি করা যায় না। আমরা ভুল করছিলাম, আমাদের বলতে হয় যে ভুল করেছি। আমি যদি ভুল করে না শিখি, ভুল করে

শিখব না, সে জন্য আমি সবই ভুল করলে আমার সকলেই খারাপ কাজ করবে, তা হতে পারে না। আমি ভুল নিশ্চয়ই করব, আমি ফেরেস্তা নই শয়তানও নই, আমি মানুষ আমি ভুল করবই। আমি ভুল করলে আমার মনে থাকতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ। আমি যদি রেকটিফাই করতে পারি সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গোঁ ধরে বসে থাকি যে না আমি যেটা করেছি সেটাই ভালো। দ্যাট ক্যাননট বি হিউম্যান বিইং। ফেরেস্তা হইনি যে সবকিছু ভালো হবে। হতে পারে, ভালো হতে পারে। উই উইল রেকটিফাই ইট, এই সিস্টেম ইনট্রোডিউস করে যদি দেখা যায় যে খারাপ হচ্ছে, অল রাইট রেকটিফাই ইট। কেননা আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে আমরা নতুন ল্যান্ড সিস্টেম-এ আসতে চাচ্ছি, আমরা কো-অপারেটিভ-এ আসতে চাচ্ছি। দিজ ইউনিয়ন কাউন্সিলস ওলড ব্রিটিশ ইউনিয়ন কাউন্সিল যেখানে যা দেওয়া হয় অর্ধেক থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে সাফ। সে জন্য একমাত্র উপায় আছে যে, আমরা যে আজকে মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ চালু করতে চাচ্ছি, এটা যদি গ্রো কবতে পারি আস্তে আস্তে এবং তাকে যদি আমরা ডিস্ট্রিক্ট এবং থানায় ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে আমি বিশ্বাস করি এজন্য ডেডিকেটেড ওয়ার্কারের দরকার। এটা উইদাউট ডেডিকেটেড ওয়ার্কার হতে পারে না। সেইজন্য সাকসেসফুল আজকে আমি চাচ্ছি—আর্মির মধ্যে হোক, নেভির মধ্যে হোক, এয়ারফোর্স-এর মধ্যে হোক, বিডিআর হোক, রক্ষীবাহিনী হোক, পুলিশ হোক, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হোক, পলিটিশিয়ান হোক, যেখানেই হোক—ভালো লোক যেখানে আছে তাদের এক জায়গায় করে কাজে লাগাতে হবে। ফান্ড পেলে বলো, কাজ করে নিয়ে এসো। আমার তো দরকার নাই। আমি খালি খালি বসে অতো পয়সা খরচ করার তো দরকার নাই। আই ওয়ান্ট মাই আর্মি—এ পিপলস আর্মি। আই ডু নট ওয়ান্ট মাই আর্মি টু ফাইট এগেইনস্ট অ্যানি বডি, বাট আই ওয়ান্ট মাই আর্মি টু ডিফেন্ড মাইসেলফ অ্যান্ড অ্যাট দি সেম টাইম টু ওয়ার্ক। আর একটা ফ্যাসান আছে আমাদের—এই কাজটা তো ফুড ডিপার্টমেন্টের, এটা তো অ্যাগ্রিকালচারের, আমার তো না, এটা তো ইরিগেশনের আমার তো না। ডিস্ট্রিক্টে, সাবডিভিশনে সব জায়গায় হয় কি? একজন (আপনার) বড় অফিসার। আমরা যখন চলে যাব—দেখব যে রাস্তায় একটা ইট পড়ে আছে, ওইটা আমার ডিপার্টমেন্টের না—একথা বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। হোয়াট ইজ দিস? দিজ মেন্টালিটি মাস্ট বি চেঞ্জড। প্রত্যেকটি লোক, প্রত্যেকটি কাজই আমার—মাটি কাটা আমার কাজ, ফ্যাক্টরিও আমার কাজ, রাস্তা বানানোও আমার

কাজ। আমি একটা হাই অফিসিয়াল, আমি একটা পলিটিশিয়ান, আমি একটা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার, আমি একটা এমপি, আমি দেশের একটা কর্মচারী, আমি একজন পুলিশ অফিসার। আই হ্যাভ মাই রিসপনসিবলিটি। এখানে চুরি হচ্ছে, এখানে অন্যায় হচ্ছে, এখানে খারাপ হচ্ছে—এটা বলার অধিকার আমার থাকবে। দেখার অধিকার থাকবে। সেই জন্য আজকে যদি পলিটিক্যাল অরগানাইজেশন স্ট্রং না করা হয়—ভিলেজ লেভেল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত যাকে ওয়াচ ডগ বলা হয়—তাহলে দেশের মঙ্গল করা যায় না শুধু সরকারি কর্মচারীর ওপর নির্ভর করে। দেয়ার মাস্ট বি এ ব্যালেন্স। দেয়ার মাস্ট বি পিপলস মোবিলাইজেশন। হোল কান্ট্রিকে, সমস্ত দেশকে মবিলাইজ করতে হবে ফর ডেফিনিট পারপাজ। দেখুন বাংলাদেশের কৃষক পিছিয়ে নাই। আমি সার দিতে পারি নাই। যা সার দিয়েছি তার থার্টি পারসেন্ট চুরি হয়ে গেছে। স্বীকার করেন? আমি স্বীকার করি। আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না। মিথ্যা বলে একদিনও হারাম এদেশের প্রেসিডেন্ট থাকব না। আমার যে সার আমি দিয়েছি তার কমপক্ষে থার্টি পারসেন্ট ব্ল্যাক মার্কেটিং-এ চুরি হয়ে গেছে। আমি যে ফুড দেই তার কুড়ি পারসেন্ট চুরি হয়ে যায়। আমি যে মাল পাঠাই গ্রামে গ্রামে তার ২০% ২৫% চুরি হয়ে যায়। সব চুরি হয়ে যায়। হুইট—আমি তো হুইট পয়দা করি না, খুব কমই করি—কোন বাজারে হুইট পাওয়া যায় না? গভর্নমেন্ট গোডাউনের হুইট। সার তো আমি ওপেন মার্কেটে বিক্রি করি না, কোন বাজারে সার পাওয়া যায় না? লেট আস ডিসকাস দিস মেটার। দেয়ার শ্যাল বি এ ফ্রি এন্ড ফেয়ার ডিসকাশন। আমাদের একটি জিনিস মনে রাখা দরকার—যে লোক হাসতে হাসতে জীবনের মায়া কাটিয়ে ফাঁসি পর্যন্ত যেতে পারে, জানে যে গুলি হয়ে এক ঘণ্টা পর মারা যেতে পারে, না থাকতে পারে, সেই মানুষ ক্ষমতার জন্য মিথ্যা কথা বলবে না। এটা আপনাদের জেনে রাখা উচিত। এই গুলি কী করে আপনারা করবেন। এই এগ্রিকালচার আমার নয়, চুরি হয় হোক। এই ফুড আমার নয়, চুরি হয় হোক। এটা আমার নয় চুরি হচ্ছে হোক। নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড এগেনস্ট করাপশন। পাবলিক অপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সিসটেমকে পরিবর্তন করতে হবে। ঘুণে ধরা সিস্টেম দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যায় না। এই সিস্টেমেই হলো করাপশনের পয়দা। এই সিস্টেম করাপশন পয়দা করে এবং করাপশন চলে।

সেই জন্য আমার দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক। ভেঙে ফেলে সব নতুন করে গড়তে হবে। নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য আমি কো-অপারশনে গিয়েছি। আমি জাম্প করতে চাই না, আমি জাম্প করার মানুষ নই। আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি

১৯৪৭-৪৮ সালে, কিন্তু আমি ২৭ বৎসর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ করেছি। আমি জানি এদের সঙ্গে মানুষ থাকতে পারে না। আমি ইম্পেশেন্ট হই না, আমি অ্যাডভ্যানচারিস্ট নই। আমি খোদাকে হাজের নাজের জেনে করি, চুপি চুপি, আস্তে আস্তে মুভ করি সব কিছু নিয়ে। সেইজন্য আমি বলে দিয়েছি ৬০টা থেকে ৭৫ কি ১০০টা কো-অপারেটিভ করব। এই কো-অপারেটিভে যদি দরকার হয় সেন্ট্রাল কমিটির এক একজন মেম্বার এক একটার চার্জে থাকবে। লেট আস স্টার্ট আওয়ারসেলভস। ১১৫ জন সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার আছেন। এর মধ্যে ১০০ কি ৭০ জনকে এক একটা কো-অপারেটিভের চার্জ দিয়ে দেব সুপারভাইজিং অফিসার। লেট আস স্টার্ট। ওয়ানস উই আর সাকসেসফুল এবাউট দিস মাল্টিপারপাস সোসাইটি যেখানে দেশের মানুষকে একতাবদ্ধ করা যাবে। বদমায়েশ একদল লোক—জমি সব শেখ সাহেব নিয়ে যাবে প্রপাগান্ডা হয়ে গেল। জমি নেব না—তোমরা চেষ্টা করবে, একসঙ্গে ফসল উৎপাদন করবে, তোমার শেয়ার তুমি নিবে। কিন্তু তবু এগেইনস্টে প্রপাগান্ডা করে, জমি নিব না, জমি থাকবে। কিন্তু জমির একটা লিমিট আছে তোমাদের রাখার। আইন হয়েছে ১০০ বিঘার বেশি রাখতে পারবে না। সেটা আমরা ফলো করার চেষ্টা করব এবং আস্তে আস্তে যদি ফ্লাড বন্ধ করতে পারি, সেচের ব্যবস্থা করতে পারি, ফারটিলাইজার দিতে পারি, নিশ্চয়ই আমরা চিন্তা করব আরও কতদূর কী করতে পারি। কেননা আমার দেশের জমির মধ্যে পার্থক্য আছে। এখন আমি যদি সুনামগঞ্জের জমিতে ৩ বৎসর বন্যা হয়, এক বৎসর ফসল হয়, নর্থ বেঙ্গলের জমি আর বরিশালের জমি, আর চিটাগাং হিল ট্রাক্টসের জমি, আর সব জমি যদি এক পর্যায়ে দেখতে চাই, তাহলে অসুবিধা আছে। আমার স্টাডির প্রয়োজন আছে যে কোন জায়গায় কত পরিমাণ হতে পারে।

আজকে কো-অপারেটিভ যদি আমরা করতে পারি, সেখানে যদি ফার্টিলাইজার দিতে পারি, রেশন কার্ডে দিতে পারি, তাহলে সেখানে চুরিটা কম হবে। সেখানে যদি ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা দিতে পারি—চুরিটা কম হবে। একটা সিস্টেমের মধ্যে আসতে পারি। চিৎকার করে, গালাগালি করে কাজ হবে না।

এই যে পলিটিক্যাল পার্টি—একটা খুব ইম্পরট্যান্ট জিনিস। এর মেম্বারশিপ ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না। মেম্বার বেছে বেছে নিতে হবে। গলায় সাইনবোর্ড লাগিয়ে আমি মেম্বার, আমাকে একটা পারমিট দাও, সেটি হবে না। মেম্বার যে হবে তার একটা কার্ড থাকবে। প্রাইমারি মেম্বার থাকবে অনেকে। এছাড়া আমি আপনাদের বর্তমান মেম্বার করে দিয়েছি। আপনাদের জন্য কৃষক, লেবার অর্গানাইজেশন হচ্ছে। লেবার পলিসি করতে হবে, প্ল্যান করতে হবে। কোনো

ঢাক ঢাক গুড় গুড় থাকবে না। এই আমার আছে, এই তোমার ডেভেলপমেন্ট, এই ইনকাম করতে পারলে এই তোমরা পাবে। দিতে চাই আমি তোমাদের লাভের জন্য ওদেরও দিতে হবে, তোমরা মানুষের মতো বাস করবে। তাদের দিতে হবে, যাতে কৃষক কৃষকের মতো বাস করতে পারে। ছাত্র লেখাপড়া করবে নতুন সিস্টেমে। আমরা একটা নতুন এডুকেশন সিস্টেম করতে বলেছি। কেরানি পয়দা করে লাভ হবে না, মানুষ পয়দা করতে হবে। নতুন এডুকেশন সিস্টেম করতে পারি কি না, আমরা তা দেখছি। দেশের সার্বিক অবস্থা ইম্প্রুভ করতে সময় লাগবে। তিন বছর, সাড়ে তিন বছর একটা দেশের জীবনে কিছুই না। আমাদের ইকোনমিক কন্ডিশন ভালো না। আমাদের মাল বিদেশ থেকে বেশি আনতে হয়। ফাইন্যান্স মিনিস্টার সাহেব, কমিটি করতে গেলে আমার কলম ধরে বসেন। মহা বিপদ আমাকে নিয়ে। টাকা পাওয়া যাবে না। দেশের ট্যাক্স, জাতীয় আয় বাড়াতে পারলে দেশের আয়ও বাড়বে, ইনশাল্লাহ আমরা কতগুলি স্টেপ নিয়েছি—ইকোনমিক স্টেপ। তাতে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আমরা যে একটা ভীষণ খারাপ অবস্থায় পড়েছিলাম গত বছর, ইনশাল্লাহ আমরা অতখানি খারাপ অবস্থায় এ বছর নাই। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি এখন এখানে বেশি কিছু বলতে চাই না। ফাইন্যান্স মিনিস্টার এ মাসের ২৩ তারিখে পার্লামেন্টে বক্তৃতা করবেন। তিনি সেদিন বলবেন। তবে আমি এটুকু বলতে পারি আমাদের ইকোনমিক কন্ডিশন ইজ নট সো ব্যাড অ্যান্ড ইট উইল ইম্প্রুভ ডে বাই ডে। কারণ দেশের মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসছে, তারা কাজ করছে, ফ্যাক্টরিতে কাজ হচ্ছে, কৃষক ভাইরা সবাই কাজে অ্যাডভান্স করেছে, দেশের মানুষও এগিয়ে এসেছে ইনশাল্লাহ আই সি এ ব্রাইট ফিউচার অব মাই কান্ট্রি। তবে এখানে যে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা আমরা বলেছি সে অর্থনীতি আমাদের, সে ব্যবস্থা আমাদের, কোনো জায়গা থেকে হায়ার করে এনে, ইম্পোর্ট করে এনে, কোন ইজম চলে না, এদেশে—কোনো দেশে চলে না। আমার মাটির সঙ্গে, আমার মানুষের সঙ্গে, আমার কালচারের সঙ্গে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডেরে সঙ্গে, আমার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেই আমার ইকোনমিক সিস্টেম গড়তে হবে। কারণ আমার দেশে অনেক অসুবিধে আছে। কারণ আমার মাটি কী, আমার পানি কত, আমার এখানে মানুষের কালচার কী, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কী, তা হয় না। ফান্ডামেন্টালি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই। আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে চাই। বাট দি সিস্টেম ইজ আওয়ার্স। উই ডু নট লাইক টু ইমপোর্ট ইট ফ্রম অ্যানিহোয়্যার ইন দি ওয়ার্ল্ড। এটা আমার মতো, পার্টির মতো।

আমরা কারোর বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলতে চাই না। আমাদের একটা ফ্যাশান হয়ে গেছে যে, এ ওর বিরুদ্ধে গালাগালি করে, অন্য একজনের বিরুদ্ধে গালাগালি করে। বাংলাদেশের মাটিতে যেন একটা হটবেড অব ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স হয়ে গেছে। এ ওরে গালাগালি করে, ও ওরে গালাগালি করে, আমার মাটিতে বসে গালাগালি দরকার কি বাবা। যার যার দেশে গিয়ে গালাগালি করো। একটা ডিপ্লোম্যাটিক ডেকোরাম আছে। এক দেশে দাঁড়িয়ে অন্যদেশের বিরুদ্ধে কথা বলা চলে না। আমার দেশে তোমার কী ভালো, সেটা বলো।

আই বিলিভ ইন পজিটিভ অ্যাপ্রোচ, নট এ নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। সেজন্য আমার পার্টিতে যাঁরা আপনারা আছেন, আসুন আমরা পজিটিভ অ্যাপ্রোচ নেই। আমি যখন খুব ইয়ং ছিলাম, আমার নেতা সোহরাওয়ার্দি সাহেবকে কেউ গালাগালি করলে আমি রাগ করে তাঁর কাছে যেতাম! তিনি হেসে বলতেন, 'থাক, বলতে দাও, ওতে কী হবে।' উনি আমাকে বলেছেন, থিংক ফর এ পজিটিভ অ্যাপ্রোচ দ্যান এ নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ আমার লাইফকে আমি ওই দৃষ্টিতেই দেখেছি।

যখন আমি ৬ দফা দিলাম, আমার বিরুদ্ধে যখন আক্রমণ করল সকলে মিলে, আমি কিন্তু কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা বললাম না. আমি চলে গেলাম দেশের মানুষের কাছে। গিয়ে ৬ দফার প্রচার আরম্ভ করে দিলাম। আমি যখন পার্টি রিভাইভ করলাম, আমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা হল। কিন্তু আমরা চলে গেলাম পিপলের কাছে। পিপল আমাকে গ্রহণ করে নিল কাউকে গালাগালি করে লাভ নেই।

আমি বিশ্বাস করি, ক্যাম্বোডিয়া, আই শুড রিকগনাইজ ইউ। আই ডোন্ট কেয়ার এনিবডি ইন দি ওয়ার্ল্ড হোয়েদার এনিবডি ইজ স্যাটিসফায়েড অর এনিবডি ইজ আনহ্যাপি অর এনিবডি ইজ হ্যাপি। আই ফিল দ্যাট দে আর ফাইটিং ফর দেয়ার ওন লিবার্টি। আই অ্যাম উইথ দেম। আই সাপোর্ট পি আর জি। আই গিভ দেম রিকগনিশন বিকজ আই এম এ সাফারার। আই এম এ সাফারার ফর জেনারেশন টু জেনারেশন ফর দিস বেঙ্গলি নেশন। আমার কাছে যে যুদ্ধ করছে তার মাতৃভূমির জন্য তাকে সমর্থন দেবো তাই বলে আমি অন্যকে গালাগালি করব না। এই জিনিসটা আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব। আজকে মনে রাখবেন যে আপনারা নতুন আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স, ফোর্সেস, সরকারি কর্মচারী, বেসরকারি কর্মচারী, পলিটিসিয়ান, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ডক্টরস, ইঞ্জিনিয়ারস যদ্দুর সম্ভবপর এদের রাখার চেষ্টা করেছি। পলিটিশিয়ানদের মধ্যে অনেক এক্সপেরিয়েন্সড আমার পুরনো বন্ধুরা আছেন যাঁরা আগে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কিছুদিন ডিফারেন্ট পার্টি করেছেন। আগে আমরা এক জায়গায়ই ছিলাম। মধ্যে ভাগ হয়ে গেলাম—সেটা সব জায়গায় হয়। আবার আমরা এক হয়েছি. সেকেন্ড রেভল্যুশন ইজ নট দি এন্ড

সেকেন্ড রেভল্যুশন যে করেছি আমি—চারটা প্রোগ্রাম দিয়েছি, এটাই শেষ নয়, শেষ কথা নয়। এটা হল স্টেপ। ডেভেলপমেন্ট, মোর প্রডাকশন, ফাইট এগেনস্ট করাপশন, ন্যাশনাল ইউনিটি অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং। এগুলো করলেই আমরা একটা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়তে পারব-যেখানে মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারবে। এটাই হলো আমার সেকেন্ড রেভল্যুশনের মূল কথা—এজন্যই আমি সেকেন্ড রেভল্যুশনের ডাক দিয়েছি।

আজ আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি আমার বহু সহকর্মী যাঁদের সঙ্গে আমি দুর্দিনে কাজ করেছি, বিপদের দিনে কাজ করেছি, ৪৭, ৪৮, ৪৯ সালে—তাঁরা আজকে এখানে এসেছেন। মাঝখানে এদিক ওদিক ছুটেটুটে গেছিলাম অনেকে। ডিফারেন্স অব ওপিনিয়নের জন্য। আজকে আমরা আবার এক হয়েছি—সরকারি কর্মচারীরা এক হয়েছি। আজকে সকলে মিলে, যার যার যা কর্তব্য আছে, সেই সঙ্গে করাপশনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সারা বাংলাদেশের টুয়েনটি থেকে থার্টি পার্সেন্ট দুঃখ দূর হয়ে যাবে যদি করাপশন বন্ধ করতে পারি। থার্টি পার্সেন্ট দুঃখ দূর হয়ে যাবে মানুষের। এজন্য লেট আস টেক ওথ টুডে। যে নিজেরা আমরা করাপট প্র্যাকটিস করি, তাই আবার অন্য কেউ করলে আমরা সহ্য করি না। উই মাস্ট মবিলাইজ দি পিপল এগেনস্ট করাপশান। এটা যদি করতে পারি, দেখবেন অনেক প্রবলেম আমরা সলভ করতে পারব। এজন্যই আজকে আমাদের মবিলাইজ করতে হবে পিপলকে। আমাদের সোশ্যালি বয়কট করতে হবে যে লোকটা ঘুষ খায়, তাকে সোশ্যালি বয়কট করতে হবে যে লোকটার মাইনে হাজার টাকা কিন্তু সে ব্যয় করে পাঁচ হাজার টাকা। যে লোকটার ইনকাম তিন হাজার টাকা কেমন করে সে ব্যয় করে পনের হাজার টাকা? এই যে জিনিসটা সমাজের কাছে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে এবং তাহলেই সমাজ তথা পিপলের আপনাদের ওপর আস্থা ফিরে আসবে।

আমি মাঝে মাঝে আল্লার কাছে বলি যে কি, গেছি চট্টগ্রাম—চট্টগ্রাম থেকে গেছি সেখানে, বেতবুনিয়া, সে গ্রামের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক দুই পাশে বসে আছেন—এরা এসেছে আমাকে দেখার জন্য—মনে মনে আমি বলি যে, আমি কী করেছি ওদের জন্যে; আমার দুঃখ হয়, স্টিল দে লাভ মি। দুনিয়ার নিয়মই এই ভালোবাসা পেতে হলে ভালোবাসতে হয়। এবং সে ভালোবাসা সিনসিয়ারলি হওয়া দরকার। তার মধ্যে যেন কোন খুঁত না থাকে। ইফ ইউ ক্যান লাভ সামবডি সিনসিয়ারলি ইউ উইল গেট দি লাভ অব সামবডি। দেয়ার ইজ নো ডাউট এবাউট ইট। আমার জীবনে আমি দেখেছি লাখ লাখ লোক দু'পাশ দিয়ে কী অবস্থার মধ্যে—আমি তো কল্পনাও করতে পারি না। হোয়াই দে লাভ মি সো

মাচ? আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করি মবিলাইজ দি পিপল অ্যান্ড ডু গুড টু দি হিউম্যান বিইংস অব বাংলাদেশ। দিজ আনফরচুনেট পিপল হ্যাভ সাফার্ড লং—জেনারেশন আফটার জেনারেশন। এদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে—দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে, এদের খাবার দিতে হবে।

যদি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে পারি, যদি করাপশন বন্ধ করতে পারি, আমি বিশ্বাস করি, ইনশাল্লাহ, বাংলার মাটিতে যা এখনো আছে, ৭ কোটি লোক হলেও বাংলার মানুষ না খেয়ে মরতে পারে না। আই হ্যাভ সিন দ্যাট। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই কারণ আই হ্যাড বিকাম ইমোশনাল। আগস্ট মাসে আমি আপনাদের সভা ডাকছি উইথ ডেফিনিট এজেন্ডা। ফুড, এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রি, এডুকেশন, কো-অপারেটিভ, সমস্ত প্রোগ্রাম দিয়ে তারপর আমি আপনাদের এই হাউসটাকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে দিচ্ছি। আপনারা ডিভাইড হয়ে যাবেন, সব কিছু ডিভাইড হয়ে গেলে তখন এই কমিটিতে বা গ্রুপে সেক্রেটারিয়েট থেকে লোক আসবে, গভর্নমেন্ট থেকে লোক আসবে, ডিপার্টমেন্ট থেকে আসবে, পলিটিক্যাল ওয়ার্কার আসবে, সমস্ত ফ্যাক্টস ফিগার নিয়ে, এই জায়গাতে কোথায় ডিফেক্ট হয়েছে, কোন জায়গাতে ইম্প্রুভ করতে পারি, আপনারা একটা সাজেশন দিবেন। তখন কেন্দ্রীয় কমিটি কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট সুপারিশ পেশ করবে এবং ওই কমিটি সরকারকে এটা কার্যকরী করতে অনুরোধ করবে।

আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম। বেয়াদবি মাফ করবেন। লেট আস ওয়ার্ক টুগেদার। উই আর নাউ ওয়ান পার্টি। পার্টি মানে কি জানেন, এভরি পার্টি ওয়ার্কার অব মাইন ইজ লাইক মাই ব্রাদার, ইজ লাইক মাই সন। আই ক্রিয়েটেড এ ফ্যামিলি হোয়েন আই অরগ্যানাইজড আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমি যাইনি। আর পলিটিক্যাল পার্টি মিনস এ ফ্যামিলি—যার মধ্যে আছে আইডিওলজিক্যাল অ্যাফিনিটি। সেজন্য এই পার্টিতে উই আর ওয়ান ফর সাম পার্টিকুলার পারপাসেস, হোয়্যারেভার উই আর। আমাদের আদর্শ হল, বাংলাদেশকে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ইজ্জতসহকারে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখা, বাংলার দুঃখী মানুষকে পেট ভরে খাবার দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা এবং যেখানে অত্যাচার অবিচার জুলুম থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না। লেট আস অল ট্রাই ফর দ্যাট। আসুন আমরা চেষ্টা করি সে সম্পর্কে সকলে মিলে।

আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ।

পরিশিষ্ট ৩

তথ্যসূত্র

যাত্রা শুরু

১. Dixit, J.N. (1999). *Liberation and Beyond: Indo-Bangladesh Relations*, UPL, Dhaka, p.125

২. Banarjee, Sashanka S (2011) *India, Mujibur Rahman, Bangladesh Liberation & Pakistan (a political treatise)* Aparajita Sahitya Bhaban, Narayanganj, pp. 9-16, 137-138

৩. মহিউদ্দিন আহমদ

৪. Banarjee, pp. 137-138

৫. Ibid, pp. 138-139

৬. মতিউর রহমান, 'ভেদ মারওয়া: বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গী', ছুটির দিনে, *প্রথম আলো*, ১০ জানুয়ারি ২০০৯

৭. Banarjee, p. 138-150

৮. *The Indian Express*, 11 January 1972; Ministry of External Affairs (MEA), Government of India, *Bangladesh Documents*, Vol. II, New Delhi, pp. 604

৯. MEA, p. 608

১০. Ibid, p. 607

১১. Fox Butterfield, *The New York Times*, 11 January 1972; MEA, p. 611

১২. মিয়া, এম এ ওয়াজেদ (১৯৯৩)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ১২১-১২২

১৩. সিরাজুল আলম খান

১৪. Karim, S A (2007). *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy*, UPL, Dhaka, pp. 264-266

১৫. সিরাজুল আলম খান

১৬. মুহম্মদুল্লাহ (২০০৬)। *নীরবতা ভেঙ্গে*, অয়ন প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১২০

১৭. *The Bangladesh Gazette*, Extraordinary, 11 January 1972, pp. 47-48

১৮. Hossain, Kamal (2013). *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice*, UPL, Dhaka, p. 137

১৯. *The Bangladesh Observer*, 15 January 1972; MEA, p. 635

২০. Gandhi, Indira (1972). *India and Bangladesh: Selected Speeches and Statements March to December 1971*, Orient Longman, New Delhi, p. 170

২১. MEA, p. 620

২২. Ibid

২৩. কামাল লোহানী, 'ফায়ার ইটার মওলানা'। *মওলানা ভাসানী স্মারক সংকলন*, মহসিন শাস্ত্রপানি সম্পাদিত (২০০২), মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পরিষদ, ঢাকা, পৃ. ১১২

২৪. youtube.com watch?feature=share&v=G2SLHCoHKB0, সুমন মাহমুদের সৌজন্যে পাওয়া

২৫. Ibid

২৬. Dixit, pp. 131-133

২৭. Ibid, pp. 137-141

২৮. MEA, p. 636

২৯. Ibid, p. 637

৩০. Dixit, pp. 145-146

৩১. Ibid, pp. 147-148

৩২. Ibid, p.145

৩৩. Ibid, pp.151-153

৩৪. মনিরুজ্জামান, তালুকদার (১৯৯৫)। *তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা*, অবসর, ঢাকা, পৃ. ৩৭

৩৫. MEA, p. 647

৩৬. 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার', ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, *গণকণ্ঠ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

৩৭. *দৈনিক বাংলা*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩; আহাদ, অলি (২০১২); *জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, পৃ. ৪৪৭

৩৮. *ইত্তেফাক*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
৩৯. MEA, pp. 644-645
৪০. কায়সার, পান্না (১৯৯১), *মুক্তিযুদ্ধ : আগে ও পরে*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৬২-১৬৩
৪১. MEA, p. 648
৪২. Ibid, p. 649
৪৩. হোসেন, আমজাদ (১৯৯৭), *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, পড়ুয়া, ঢাকা, পৃ. ৭০-৭৬
৪৪. ওই, পৃ. ১১৪
৪৫. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে), সম্পাদকীয় রিপোর্ট (৯ ফেব্রুয়ারির রিপোর্ট নামে পরিচিত), পৃ. ১০; হোসেন, পৃ. ৮৬
৪৬. হোসেন, পৃ. ৮৬-৮৯
৪৭. রহমান, সাঈদ-উর (২০০৪)। *১৯৭২-১৯৭৫ কয়েকটি দলিল*, মৌলী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১০১
৪৮. *সিরাজ সিকদার রচনা সংগ্রহ*, শ্রাবণ, ঢাকা, পৃ. ১৮৪-১৮৫
৪৯. Khan, Sultan M (1997). *Memoirs & Reflections of a Pakistani Diplomat*, The London Centre for Pakistan Studies, London, p. 422-428
৫০. Khasru, B. Z. (2014). *The Bangladesh Military Coup and the CIA Link*, Rupa Publications, New Delhi, pp. 38-39
৫১. Ibid, pp. 40-41
৫২. Foreign Relations of the United States (FRUS), 1969-76, Vol. E-7, Documents on South Asia, 1969-72, Document 408, Memorandum from Secretary of State Rogers to President Nixon, Washington, 6 March 1972; Khasru, p. 43
৫৩. FRUS, Document 413, Memorandum from the Pressident's Assistant for National Security Adviser (Kissinger) to Secretary of State Rogers, Washington, 28 March 1972
৫৪. FRUS, Document 417, Telegram 56444 from the Department of State to the Consulate General in Dacca, 3 April 1972; Khasru, p. 44
৫৫. FRUS, Document 418, Letter from President Nixon to Bangladesh Prime Minister Rahman, Washington, 4 April 1972; Khasru, p. 44
৫৬. Dixit, pp.153-155
৫৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭২; লেনিন, নূহ-উল-আলম (২০১৫), *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, সময়

প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৬৮-৬৯

৫৮. FRUS, Document 419, Telegram 60873 from the Department of State to the Embassy in Bangladesh, 8 April 1972; Khasru, pp. 44-45

৫৯. FRUS, Document 420, Telegram 1227 from the Embassy in Bangladesh to the Department of State, 10 April 1972; Document 423, Memorandum for the President's File, Washington, 16 May 1972; Khasru, p. 45

৬০. আনিসুজ্জামান (২০১৫), *বিপুলা পৃথিবী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১৪, ৩২-৩৪

৬১. ওই, পৃ. ৩৪

৬২. *হক কথা*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭২

৬৩. ওই, ২৩ জুন ১৯৭২

৬৪. *ইত্তেফাক*, ৯ অক্টোবর ১৯৭২

৬৫. *হক কথা*, ২৩ এপ্রিল ১৯৭২

৬৬. কামাল উদ্দিন আহমেদ

৬৭. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৪), *জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৭৩

৬৮. ওই

৬৯. সিরাজুল আলম খান

৭০. রেহমান সোবহান

৭১. সৈয়দ রেজাউর রহমান

৭২. রায়হান ফিরদাউস

৭৩. আ স ম আবদুর রব

৭৪. শরীফ নুরুল আম্বিয়া, মনিরুল ইসলাম

৭৫. সিরাজুল আলম খান

৭৬. রেজাউল হক মুশতাক

৭৭. শেখ শহীদুল ইসলাম

৭৮. সৈয়দ রেজাউর রহমান

৭৯. আবু করিম

৮০. উমর, বদরুদ্দীন (২০১২), *রচনাসংগ্রহ* ২, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫৯৫

৮১. শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

৮২. আ স ম আবদুর রব; আহমদ (২০১৪), পৃ. ৮৬

৮৩. *গণকণ্ঠ*, ১ নভেম্বর ১৯৭২

৮৪. *গণকণ্ঠ*, ২৬ মে ১৯৭২; আহমদ (২০১৪), পৃ. ৭৬-৭৭
৮৫. বাংলাদেশ গেজেট, এক্সট্রা অর্ডিনারি, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯৫-৩৪৭৬
৮৬. ওই
৮৭. ওই
৮৮. বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা ১২ অক্টোবর ১৯৭২, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৭১-৯২।
৮৯. ওই
৯০. ওই
৯১. পরিষদ বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা ১৩, ৩১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ৪৫২-৪৫৩, উদ্ধৃত হয়েছে, রহমান, পৃ. ১৩৭-১৩৮
৯২. পাভেল পার্থ, 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা: অনিবার্য রাষ্ট্রের কাছে দ্রোহের আলাম', *জুম পাহাড়ের জীবন গ্রন্থে* সংকলিত (২০০৮); সম্পাদনা আহমদ, মহিউদ্দিন ও অন্যান্য, গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, পৃ. ১১০; বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা ১৫, ২ নভেম্বর ১৯৭২
৯৩. আনিসুজ্জামান, পৃ. ৫৯
৯৪. হাসিনা, শেখ ও মওদুদ, বেবী সম্পাদিত (২০১৫)। *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৫-৫২
৯৫. হাশেম খান, 'বঙ্গবন্ধু, শিল্পাচার্য ও কিছু অনুভব', *শেখ মুজিবুর রহমান স্মারক গ্রন্থ* (২০১২)। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশক: এম নজরুল ইসলাম, ঢাকা, পৃ. ৮২৭-৮২৮
৯৬. আনিসুজ্জামান, পৃ. ৩৮
৯৭. গোলাম মুরশিদ, 'স্বরূপের সংকট, না নয়া-সাম্প্রদায়িকতা', ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল ও বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল সম্পাদিক (১৯৯৯)। *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি : ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সংকট* গ্রন্থে সংকলিত। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১৫২.১৫৩
৯৮. 'Secularism Indeed', M.N. Roy in Sinha, V.K. (ed) (1968), *Secularism in India*. Lalvani Publishing House, Bombay, p. 155; cited in Maniruzzaman, Talukder (1994). *Politics and Security of Bangladesh*. UPL, Dhaka, p. 7
৯৯. হাসিনা ও মওদুদ, পৃ. ৪৩-৪৪
১০০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'নেশন কী', *আত্মশক্তি*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৩য়খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫১৮

পিচ্ছিল পথ

১. *The Bangladesh Observer*, 15 March 1972
২. লেনিন (২০১৫), পৃ. ২৪৫
৩. *গণকণ্ঠ*, ২৬ মে ১৯৭২
৪. *বাংলার বাণী*, ৩০ মে ১৯৭২
৫. Lal Bahini desperate for Arms, *Holiday*, 25 June 1972
৬. আলম, আনোয়ার উল (২০১৩), *রক্ষীবাহিনীর সত্য-মিথ্যা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১১-১৯
৭. ওই, পৃ. ২১-২৯
৮. ওই, পৃ. ৩০
৯. আহ্মদ, ফয়েজ (১৯৮৮), *মধ্যরাতের অশ্বারোহী*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ২২৩-২২৯
১০. আহমদ ছফা, 'মুজিব হত্যার নীলনক্সা: আমি যতটুকু জানি', *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ* (২০১১), নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, পৃ. ৪০৬-৪০৭
১১. আবু হেনা
১২. রহমান, পৃ. ২২১; আহমদ (২০১৪), পৃ. ১২৬
১৩. সিরাজুল আলম খান
১৪. হক, মাহাবুবুল ও আলম, বায়েজীদ (২০১৪), *বাংলাদেশের জোট রাজনীতি ১৯৫৪-২০১৪*, অবসর, ঢাকা, পৃ. ৭৩, ৯৬
১৫. *সংবাদ*, ২ জানুয়ারি ১৯৭৩; উদ্ধৃত হয়েছে পারভেজ, আলতাফ (২০১৫), *মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনর্পাঠ*, ঐতিহ্য, ঢাকা, পৃ. ৫৬৯
১৬. লেনিন, নূহ-উল-আলম ও দাশগুপ্ত, অজয় (২০০১), *বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড: প্রতিবাদের প্রথম বছর*। হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ২৩
১৭. *সংবাদ*, ৩ জানুয়ারি ১৯৭৩। পারভেজ, পৃ. ৫৬৮
১৮. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৭), *আওয়ামী লীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৪৩
১৯. আনিসুজ্জামান, পৃ. ৬৭
২০. আবুল হাসিব খান
২১. আনিসুজ্জামান, পৃ. ৬৭
২২. হুদা, এ টি এম শামসুল (২০১৪), *ফিরে দেখা জীবন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৮৭-৮৯
২৩. সিরাজুল আলম খান

২৪. Maniruzzaman, Talukder (1980). *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Bangladesh Books International Limited, Dhaka, p. 159
২৫. লেনিন (২০১৫), পৃ. ৩১১
২৬. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৭৩, লেনিন (২০১৫), পৃ. ৩১৪
২৭. ওই, পৃ. ৩২১
২৮. আজিজ, শেখ আবদুল (২০০৯), *রাজনীতির সেকাল ও একাল*, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ২৯২
২৯. দৈনিক *গণকণ্ঠে* প্রকাশিত ওই সময়ের প্রতিবেদন
৩০. আহমদ, মওদুদ (২০০২), *বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ১৭৮
৩১. Karim, pp. 306-307
৩২. আনিসুজ্জামান, পৃ. ৭০
৩৩. *Holiday*, 18 March 1973
৩৪. রাশেদ খান মেনন, 'প্রতিভার মুখ রাজনীতিবিদ', *ডক্টর আলীম-আল-রাজী স্মারকগ্রন্থ* (প্রথম খণ্ড, বাংলা) (২০১৩), সম্পাদনা: আমিনুল ইসলাম ও মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, কাশবন প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৬০
৩৫. *সংবাদ*, ১০ মার্চ ১৯৭৩
৩৬. সরদার ফজলুল করিম ও মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, 'মোখলেসুর রহমানের (সিধু ভাই) সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা: আমার জীবন-কথা ও সময়', *প্রতিচিন্তা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা ২০১৪, পৃ. ১২১
৩৭. জিল্লুর রহমান, সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৪, ১৮, ১৯, ২০শে জানুয়ারি; লেনিন (২০১৫), পৃ. ৩৫১
৩৮. Maniruzzaman (1980), p.157-158
৩৯. en.prothom-alo.com, 4 June 2015
৪০. তাজউদ্দীন আহমদের অপ্রকাশিত ডায়েরি
৪১. ওই
৪২. ওই
৪৩. Dixit, p.168
৪৪. Ibid, p.135
৪৫. আহমদ (২০১৪), পৃ. ১০৬
৪৬. আমানউল্লাহ

৪৭. মোরশেদ শফিউল হাসান
৪৮. রহমান, মো. আনিসুর (১৯৯৬), *অপহৃত বাংলাদেশ*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৪৫-৪৬
৪৯. Jahan, Rounaq (2005). *Bangladesh Politics: Problems and Issues*. UPL, Dhaka, pp. 142-143
৫০. Mohiuddin Alamgir, 'Some Analyses of Distribution of Income, Consumption, Saving and Poverty in Bangladesh,' *The Bangladesh Development Studies*, Vol.II, October 1974, No.4, p. 754-758; cited in Jahan (2005), p. 143
৫১. রহমান (১৯৯৬), পৃ. ৯১
৫২. *গণকণ্ঠ*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭২
৫৩. কামাল আহমেদ
৫৪. মুসা, আহমেদ (১৯৮৮)। *বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনা পর্ব : ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ*। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, পৃ. ১২১-১২৪
৫৫. The Bangladesh Observer, 14 November 1973; Chowdhury, Jamshed S. A. (2004). *Bangladesh: Failure of a Parliamentary Government 1973-75*. Pathak Samabesh, Dhaka, pp. 118-119
৫৬. Chowdhury, p. 120
৫৭. Ibid, p. 138
৫৮. Ibid, p. 139
৫৯. মাহমুদ, আল (১৯৭৩)। *সোনালি কাবিন*। প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৬৯
৬০. *জনকণ্ঠ*, ১২ অক্টোবর ২০০৬
৬১. *গণকণ্ঠ*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩
৬২. হাসিনা, শেখ (১৯৯৯)। *সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র*। অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১১৩
৬৩. লেনিন (২০১৫), পৃ. ৩৩৫
৬৪. *ইত্তেফাক*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৪; লেনিন (২০১৫), পৃ. ৬৮-৬৯
৬৫. লেনিন, নূহ-উল-আলম (২০১৬), *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, দ্বিতীয় খণ্ড, সময় প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২৯
৬৬. *ইত্তেফাক*, ১৮ মার্চ ১৯৭৪
৬৭. *সাম্যবাদ*, চতুর্থ সংখ্যা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, পৃ. ২১
৬৮. মুসা, পৃ. ১২১-১২৪

৬৯. রহমান, মেজর জেনারেল এম খলিলুর (২০১৬), *কাছে থেকে দেখা ১৯৭৩-১৯৭৫*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১৯৪-১৯৫
৭০. মতিউর রহমান চৌধুরী
৭১. রায়হান ফিরদাউস
৭২. সাম্যবাদ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ১৯
৭৩. আহমদ (২০১৪), পৃ. ১৩৫-১৩৬
৭৪. শাজাহান সিরাজ, জাসদ, রাজনৈতিক রিপোর্ট, দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন, ২৯ ও ৩০ মার্চ ১৯৮০
৭৫. উল্লাহ, মাহফুজ (২০১৬)। *পাঠকের চোখে জাসদ*। মধ্যমা, ঢাকা, পৃ. ১৪১-১৪৩
৭৬. *সংবাদ*, ২১ অক্টোবর ১৯৭৬; *দৈনিক বাংলা*, ২১ অক্টোবর ১৯৭৬; *বিচিত্রা*, ৫ম বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২৯ অক্টোবর ১৯৭৬; উল্লাহ (২০১৬)
৭৭. ছফা, আহমদ অনূদিত (১৯৮৬), *য়োহান ভোলফ্‌গাঙ ফন গ্যোতে : ফাউস্ট*। মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ৩০
৭৮. ওই, পৃ. ১২৭
৭৯. *সংস্কৃতি*, সম্পাদক : বদরুদ্দীন উমর, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-মে ১৯৭৪, পৃ. ৯৭-১০০
৮০. *ইত্তেফাক*, ১২ এপ্রিল ১৯৭৪; মুসা, পৃ. ২৭৫-২৭৭
৮১. লেখকের সতীর্থ রব ঘটনাটি ক্লাসে বর্ণনা করেছিলেন
৮২. মো. কামালউদ্দিন মোল্লাহ
৮৩. আহমদ (২০১৪), পৃ. ১৩৭
৮৪. মাসুদ খান
৮৫. Maniruzzaman (1980), p.181
৮৬. *সংস্কৃতি*, এপ্রিল-মে ১৯৭৪, পৃ. ৭৯-৮৭; রহমান, পৃ. ৩১৫-৩২০
৮৭. ওই
৮৮. ওই
৮৯. Jahan (2005), p. 150
৯০. Maniruzzaman (1980), p. 164
৯১. আলম, পৃ. ৭৬
৯২. ওই, পৃ. ৭২
৯৩. Islam, Nurul (2013). *Making of a Nation Bangladesh: An Economist's Tale*, UPL, Dhaka, pp. 179-181
৯৪. Ibid

৯৫. শামসুদ্দীন, আবু জাফর (২০১৬), *আত্মস্মৃতি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৮২৩-৮২৪

৯৬. মল্লিক, এ আর (১৯৯৫), *আমার জীবনকথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৫৫-১৫৬

৯৭. ওই

৯৮. ওই

৯৯. Ahsan, Syed Badrul (2014), *From Rebel to Founding Father: Sheikh Mujibur Rahman*, Niyogi Books, New Delhi, p. 241

১০০. আমীর হোসেন আমু

১০১. আমানউল্লাহ

১০২. শামসুদ্দীন, পৃ. ৮৪০

১০৩. ওই, পৃ. ৮৪৩

১০৪. ওই

১০৫. কবির, আকবর (২০১০), *আত্মকথা : স্মৃতি-বিস্মৃতির বাংলাদেশ*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃ. ১৩২-১৩৩

১০৬. মল্লিক, পৃ. ১৫২-১৫৪

১০৭. ওই

১০৮. আহমদ, ফয়েজ (১৯৮৮), পৃ. ১৪২-১৪৩

১০৯. মল্লিক, পৃ. ১৫৭-১৬৩

কালবেলা

১. হক ও আলম, পৃ. ৮২

২. আহমদ, আবুল মনসুর (১৯৯৯), *বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ২১৩

৩. সিদ্দিকী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জুবায়ের (২০১২), *আমার জীবন আমার যুদ্ধ*, পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১০১-১০২

৪. Dalim, Lt. Col. (Retd) Shariful Haq (2015), *Bangladesh: Untold Facts*, Jumhoori Publications, Lahore, p. 340-346

৫. সৈয়দ রেজাউর রহমান

৬. ওই

৭. Dalim, p. 350-362

৮. Ibid

৯. Ibid

১০. Ibid
১১. Ibid
১২. আহমদ (২০১৪), পৃ. ৫৪
১৩. হক ও আলম, পৃ. ৮৫
১৪. ২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্ট, জুন ১৯৮০, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৭-১৩
১৫. *আহমদ ছফার কবিতা* (২০০০), শ্রীপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১০৮
১৬. *জনপদ*, ১১ মার্চ ১৯৭৪; আহমদ (১৯৮০), পৃ. ১৫৫
১৭. আহমদ, মুনির উদ্দীন সম্পাদিত (১৯৮০)। *বাংলাদেশ ৭২ থেকে ৭৫*। বাংলাদেশ গ্রন্থবিতান, ঢাকা, পৃ. ৪১
১৮. *Newsweek*, 15 July 1974; উদ্ধৃত হয়েছে, আহমদ (১৯৮০), পৃ. ৬৫৫-৬৫৭
১৯. আহমদ (১৯৮০), পৃ. ১৫৬-১৬১
২০. ওই, পৃ. ১৬৬
২১. *Guardian*, 9 August 1974
২২. আহমদ (১৯৮০), পৃ. ৫১১-৫৩৮
২৩. আজাদ, রফিক (১৯৯৬), *সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে : কবিতাসমগ্র*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৬৩-৬৪
২৪. আনোয়ার উল আলম
২৫. 'এখন মৃত্যুকে সামনেই দেখি, প্রায়ই দেখি'; জব্বার আল নাঈমকে দেওয়া রফিক আজাদের সাক্ষাৎকার, *প্রথম আলো*, ১৮ মার্চ ২০১৬; 'চরণরেখা যায় না দেখা, চলে গেলে এত দূরে?' আদিলা বকুল, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২০ মার্চ ২০১৬
২৬. শামসুদ্দীন, পৃ. ৮৩৩
২৭. মুহম্মদুল্লাহ, পৃ. ১০৪-১০৫
২৮. Islam, p. 221-222
২৯. Ibid, p. 229-234
৩০. Ibid
৩১. আহমদ (১৯৮০), পৃ. ৫৯১
৩২. Sen, Amartya (1981), *Proverty and Famine: Essay on Entitlements and Deprivation*, Clarandon Press, Oxford, p. 134
৩৩. আমানউল্লাহ
৩৪. রহমান (১৯৯৬), পৃ. ৯৭

৩৫. 'মন্বন্তর প্রতিরোধ আন্দোলন' শিরোনামে ৮২ জন বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরিত বিবৃতি, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৭৪; আহমদ (২০১৪), পৃ. ১৩৮-১৩৯

৩৬. ওই

৩৭. কবির, শাহরিয়ার (২০১১), *ওদের জানিয়ে দাও*, অনন্যা, ঢাকা, পৃ. ৭৯

৩৮. রহমান (২০০৪), পৃ. ২৯৯-৩০৯

৩৯. *একতা*, ১ নভেম্বর ১৯৭৪

৪০. Islam (2013), pp. 182-183

৪১. *ইত্তেফাক*, ১৪ নভেম্বর ১৯৭৪; আহমদ (১৯৮০), পৃ. ৪২০

৪২. *গণকণ্ঠ*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭৪

৪৩. Dalim, p. 366

৪৪. Ibid, p. 374

৪৫. Ibid, p. 378

৪৬. Ibid, p. 379

৪৭. Ibid, p. 380

৪৮. সাইদুর রহমান

৪৯. সিরাজুল আলম খান

৫০. ওই

সমঝোতা

১. সালিম সামাদ

২. Ahmad, Naziruddin (1972), *Trial of Collaborator*, Book Society, Dhaka

৩. The Bangladesh Gazette, Extraordinary, 24 January 1972, p.117-123

৪. *Morning News*, 10 April 1972

৫. Ibid, 18 April 1972

৬. আহমদ (২০০২), পৃ. ৭০-৭২

৭. মিয়া, পৃ. ১৩৫

৮. সালিম সামাদ

৯. The Bangladesh Gazette, Extraordinary, 15 July 1973, pp. 5207-08, 5901-02

১০. জাসদ জাতীয় কমিটির ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩ তারিখের সভায় গৃহীত প্রস্তাব; *গণকণ্ঠ*, ১ জানুয়ারি ১৯৭৪

১১. মিয়া, পৃ, ১৬৪-৬৬
১২. ওই
১৩. উমর, পৃ. ৬৭৫-৬৭৬
১৪. *প্রতিচিন্তা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ. ১২৮
১৫. সাইফুদ্দিন কাদের চৌধুরী
১৬. Roy, Raja Tridiv (2003). *The Departed Melody*. PPA Publications, Islamabad, pp. 252-253
১৭. মল্লিক, পৃ. ১০৬
১৮. তোফায়েল আহমেদ
১৯. তোয়াহা, মোহাম্মদ (২০১৬), *স্মৃতিকথা*, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৬৮-২৭০
২০. সিরাজুল আলম খান
২১. তোয়াহা, পৃ. ২৭০
২২. ওই, পৃ. ২৭৪-২৭৫
২৩. ওই, পৃ. ২৭৭-২৭৮
২৪. রায় রমেশ চন্দ্র
২৫. রুমু আহমেদ, ৩ জুলাই ২০১৫ ব্যক্তিগত ফেসবুকে দেওয়া তথ্য
২৬. হোসেন, শাহ্ মোয়াজ্জেম (২০০২), *বলেছি বলছি বলব*, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, পৃ. ১৩৫-১৩৮
২৭. Dixit, p. 185
২৮. শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন
২৯. Sayed Ahamed, 'The Curious case of the 195 War Criminals', Forum, *The Daily Star*, Vol. 3, Issue 5, May 2010; Ahmed Ishtiaq (2013), *The Pakistan Military in Polities: Origins, Evolution, Consequences*, Amaryllis, New Delhi, p. 199-203
৩০. মিয়া, পৃ. ১৪৫
৩১. Ahmed (2013), pp. 199-203
৩২. Ibid, pp. 203-204
৩৩. রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (১৯৮৫)। *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৪১-২৪৩
৩৪. রহমান, সাঈদ-উর, পৃ. ১৮৬
৩৫. খান, লে. জেনারেল গুল হাসান (১৯৯৬), *পাকিস্তান যখন ভাঙল*, অনুবাদ : এ টি এম শামসুদ্দীন, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ১২৪-১২৫

৩৬. রহমান, সাঈদ-উর, পৃ. ১৮৪-১৮৫
৩৭. ওই, পৃ. ১৮৪-১৮৫
৩৮. Hossain, p. 243
৩৯. Dixit, p. 189
৪০. Islam, pp. 287-296
৪১. Ibid, pp. 297-298
৪২. তালুকদার, মাহবুব (২০১৩), *বঙ্গভবনে পাঁচ বছর*, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ১০৮
৪৩. Dixit, pp. 189-202
৪৪. আহমদ (২০১৪), পৃ. ১১৫-১১৭
৪৫. আকা ফজলুল হক রানা
৪৬. রহমান (১৯৮৫), পৃ. ৯১
৪৭. শাহরিয়ার ইকবাল, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: কাছে থেকে দেখা', *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ* (২০১২) খণ্ড ১, প্রকাশক: এম নজরুল ইসলাম, ঢাকা, পৃ. ২১৯-২২০
৪৮. ওই , পৃ. ২২১
৪৯. Hossain (2013), p. 191
৫০. Ibid, pp. 191-196
৫১. শাহরিয়ার ইকবাল, পৃ. ২২১-২২২

বাকশাল

১. আহমদ (১৯৮০), পৃ. ৪-৩৩
২. হাসিনা ও মওদুদ, পৃ. ২১০-২১৬
৩. *Christian Science Monitor*, 18 October 1974; আহমদ (১৯৮০), পৃ. ৫৯০
৪. Rizvi, Gowher (1985), *Bangladesh. The Struggle for the Restoration of Democracy*, Bangabandhu Society, Europe, London, p. 25
৫. *Holiday*, 17 November 1974
৬. The Bangladesh Gaztte, Extraordinary, 28 December 1974, p. 6641-47
৭. আহমদ, মওদুদ (২০১০), *চলমান ইতিহাস: জীবনের কিছু সময় কিছু কথা*। ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ১০-১২
৮. *Far Eastern Economic Review*, Hong Kong, 10 January 1975; আহমদ (১৯৮০), পৃ. ৬২৬-৬২৮

৯. *Daily Telegraph*, London, 17 January 1975; আহমদ (১৯৮০), পৃ. ৬২৮
১০. আহমদ, মওদুদ (২০০২), পৃ. ৩১১-৩১২
১১. ওই, পৃ. ৩১৩-৩১৪
১২. হোসেন, মইনুল (২০১৮), *আমার জীবন আমাদের স্বাধীনতা*, প্রকাশক: সাজু হোসেন, ঢাকা, পৃ. ১১২
১৩. পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময় হইতে কেন্দ্রীয় কমিটির মূল মূল নীতি ও কার্যাবলী পর্যালোচনা, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৯-১০
১৪. The US National Archives, Document 1975 DACCA00456, Telegram from the Embassy in Bangladesh to the Department of State, 23 January 1975; Khasru, p. 162
১৫. আহমদ, মওদুদ (২০০২), পৃ. ৩১৪
১৬. Jahan, Rounaq (2015), *Political Parties in Bangladesh: Challengs of Democratization*, Prothoma Prokashan, Dhaka, p. 13
১৭. মতিউর রহমান
১৮. ইনু, হাসানুল হক (২০০২), *তিন দাগে ঘেরা বাংলাদেশ*, পড়ুয়া, ঢাকা, পৃ. ৮৬
১৯. ওই, পৃ. ১০১
২০. *Frontier*, Calcutta, 1 February 1975; আহমদ (১৯৮০), পৃ. ৬৩১-৬৩২
২১. *Statesman Weekly*, New Delhi, 1 February 1975; আহমদ (১৯৮০), পৃ. ৬৩৩-৬৩৪
২২. Dixit, pp. 189-202
২৩. Ibid, pp. 232-233
২৪. হাসিনা ও মওদুদ, পৃ. ৮৮-৮৯
২৫. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ অক্টোবর ১৯৭০
২৬. আহমদ, কাজী জাফর (২০১৭), *আমার রাজনীতির ৬০ বছর : জোয়ার-ভাটার কথন*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৯৫-২৯৮
২৭. Jahan (2005), p.156
২৮. হাসিনা ও মওদুদ, পৃ. ৮৮-৮৯
২৯. *একতা*, ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৫
৩০. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৮৭), ঘোষণা ও কর্মসূচি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা, পৃ. ৭
৩১. মুরশিদ, গোলাম (২০১০), *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২০৮

৩২. *ইত্তেফাক*, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৭৫
৩৩. The US National Archives, Document 1975 DACCA00605, 1 February 1975; Khasru, p. 163
৩৪. রায় রমেশ চন্দ্র
৩৫. রনো, হায়দার আকবর খান (২০১২), *শতাব্দী পেরিয়ে*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৩৯-৩৪৩
৩৬. The Bangladesh Gazette, 24 February 1975, pp. 621-622
৩৭. The Bangladesh Gazette, 25 February 1975, pp. 629-630
৩৮. মতিউর রহমান
৩৯. শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন
৪০. তালুকদার, পৃ. ১৩৭-১৩৮
৪১. *The Bangladesh Observer*, 3 June 1975
৪২. মো. শফিকুল করিম
৪৩. *The Bangladesh Observer*, 10 June 1975
৪৪. আহমেদ, রিয়াজ উদ্দিন (১০২৮), *সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন*, অনন্যা, ঢাকা, পৃ. ৩৬-৩৯
৪৫. আবু করিম
৪৬. মাহফুজ উল্লাহ
৪৭. আমানউল্লাহ
৪৮. বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, ৭ জুন ১৯৭৫
৪৯. ওই
৫০. Ullah, Mahfuz (2002). *Press under Mujib Regime*, Kakoli Prokashani, Dhaka, p. 132
৫১. Ibid, p. 133
৫২. আহমদ (১৯৮০), পৃ. ৬৮৪
৫৩. আহমদ, মওদুদ (২০০২), পৃ. ৩৩৯
৫৪. ওই, পৃ. ৩৩০-৩৩১
৫৫. ওই, পৃ. ৩৫৫
৫৬. ১৯ জুন ঢাকায় বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ।
৫৭. *ইত্তেফাক*, ২৩ জুন ১৯৭৫
৫৮. ওই, ২৬ জুন ১৯৭৫
৫৯. ওই, ২৯ জুন ১৯৭৫

৬০. ওই, ১০ জুলাই ১৯৭৫
৬১. ওই, ৮ জুলাই ১৯৭৫
৬২. আহমদ (১৯৮২), পৃ. ১৯৩
৬৩. Maniruzzaman (1980), pp. 182-183
৬৪. *ইত্তেফাক*, ২৭ জুলাই ১৯৭৫
৬৫. ওই, ১০ আগস্ট ১৯৭৫
৬৬. মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা', আহমদ, মহিউদ্দিন সম্পাদিত (২০০৬)। *আমাদের একাত্তর*, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, পৃ. ৭৭৩
৬৭. আহমদ ছফা
৬৮. ছফা, আহমদ (২০১১), 'মুজিব হত্যার নীলনক্সা : আমি যতটুকু জানি', *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, নূরুল আনোয়ার সম্পাদিত, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, পৃ. ৩৬৯-৩৭৩
৬৯. আহমদ (২০০৬), পৃ. ৭৭৫-৭৭৬
৭০. Karim, p. 258
৭১. আহমদ, মওদুদ (২০১০), পৃ. ৯৩-৯৫
৭২. মতিউর রহমান
৭৩. ওই
৭৪. Dixit, p.204
৭৫. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ১৫৯-১৬২
৭৬. নেহাল করিম
৭৭. আবুল কাসেম ফজলুল হক
৭৮. মুনতাসীর মামুন

অভ্যুত্থান

১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৮০), 'তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্ট' পৃ. ৩০
২. Dixit, p. 179
৩. Hossain (2013), p. 200
৪. *সাম্যবাদ*, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, পৃ. ২৯
৫. আবুল হাসিব খান
৬. ওই
৭. তালুকদার, পৃ. ১৪৩-১৪৪
৮. লেখকের স্মৃতি থেকে, এমএ শেষ বর্ষের ছাত্র হিসেবে লেখক অংশ নিয়েছিলেন

৯. মোশতাক আহমেদ
১০. ম্যাসকারেনহাস, অ্যান্থনি (২০০২)। *বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ*। *বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসি অব ব্লাড*-এর অনুবাদ, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ৫৩-৫৪
১১. Lifschultz, Lawrence (1979), *Bangladesh : The Unfinished Revolution*. Zed Press, London, pp. 77-87; আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৬)। *বিএনপি : সময়-অসময়*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৩৫-৩৬
১২. উদ্দিন, মেজর নাসির (১৯৯৭), *গণতন্ত্রের বিপন্নধারায় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫২
১৩. ম্যাসকারেনহাস, পৃ. ৫২-৫৪
১৪. তালুকদার, পৃ. ১৪৪-১৪৭
১৫. কাজী ফিরোজ রশীদ, এমপি, 'বঙ্গবন্ধুকে শেষ দেখা', সংসদ গ্রন্থাগার বুলেটিন, সংখ্যা ৯০, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পৃ. ১২-১৩
১৬. ম্যাসকারেনহাস, পৃ. ৫২-৫৪
১৭. ছফা (২০১১), মুজিব হত্যার নীলনক্সা, পৃ. ৩৭৫-৩৭৬
১৮. মোশতাক আহমেদ
১৯. নাসির খান খিলেন
২০. Dalim, p. 403; Khasru, p. 226
২১. গিয়াসউদ্দিন
২২. Dalim, p. 411
২৩. Lifsehultz, p. 86-88
২৪. মোহাম্মদ মারুফ রশীদ
২৫. হামিদ, লে. কর্নেল (অব.) এম. এ. (২০১৩), *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৭৪-৭৯
২৬. Khan (1997), pp. 128-129
২৭. মোল্লা, কর্নেল (অব.) সারোয়ার হোসেন (২০১৪), *রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৪১-৪৭
২৮. নূরুল ইসলাম চৌধুরী, '১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড: ঘটনার আগে, ঘটনার পরে', *ভোরের কাগজ*, ১৫, ১৬ ও ১৭ আগস্ট ১৯৯৪
২৯. মুহম্মদুল্লাহ, পৃ. ১২৫
৩০. টুটুন চৌধুরী
৩১. এস এম ইউসুফ
৩২. তোফায়েল আহমেদ, 'স্মৃতি ও সংগ্রামমুখর দিনগুলো', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*,

১৫ আগস্ট ২০১৬

৩৩. মোস্তফা মহসীন মন্টু

৩৪. কে এম সফিউল্লাহর সাক্ষাৎকার, *ভোরের কাগজ*, ১৫ ও ১৬ আগস্ট ১৯৯৩। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন সম্পাদক মতিউর রহমান

৩৫. মাহবুব তালুকদার

৩৬. শফিকুল ইসলাম ইউনুস

৩৭. আবুল কাসেম ফজলুল হক

৩৮. মেহেরুন্নেসা চৌধুরী

৩৯. মাহফুজ উল্লাহ

৪০. হোসেন, শাহ্ মোয়াজ্জেম, পৃ. ২৫৫

৪১. হামিদ, পৃ. ৫৯

৪২. ওই, পৃ. ৫১-৫২

৪৩. Dixit, p. 212

৪৪. Ibid, p. 211

৪৫. রমন, বি (২০০৮), *র এর কাউবয়েরা : স্মৃতির সিঁড়িতে অবরোহণ*, *The Kaoboys of R&AW: Down Memory Lane* গ্রন্থের অনুবাদ, প্রতীতি প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৪৯-৫০

৪৬. নূহ-উল-আলম লেনিন

৪৭. খান আলতাফ হোসেন ভুলু, '১৯৭৫ সালের মর্মান্তিক ১৫ই আগস্ট', *কালের কণ্ঠ*, ৩১ আগস্ট ২০১৯

৪৮. নূর খান

৪৯. বদিউল আলম

৫০. মোশতাক আহমেদ

৫১. *সাম্যবাদ*, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ১২-১৩

৫২. জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং আমাদের পার্টির ভূমিকা ও করণীয়, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯৭৯), কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত, পৃ. ১৯

৫৩. *ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫

৫৪. *Guardian*, London, 16 August 1975; আহমদ (১৯৮০), পৃ. ৬৬৩-৬৬৫

৫৫. *ইত্তেফাক*, ৩০ আগস্ট ১৯৭৫

৫৬. The Bangladesh Gazette, Extraordinary, 20 August 1975, pp. 2413-14

৫৭. হামিদ, পৃ. ১৩

৫৮. সাইদুর রহমান

৫৯. আমানউল্লাহ
৬০. নূরুল ইসলাম চৌধুরী, *ভোরের কাগজ*, ১৫, ১৬ ও ১৭ আগস্ট ১৯৯৪
৬১. Dixit, p. 163
৬২. সৈয়দ ফারুক রহমানের সাক্ষাৎকার, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ১৫ আগস্ট ১৯৯২; খান, মিজানুর রহমান (২০১৩), *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৩২৮-৩৩১
৬৩. Dalim, p. 396
৬৪. রায়হান ফিরদাউস
৬৫. Maniruzzaman (1980), pp. 183-187
৬৬. রহমান, পৃ. ১৪০
৬৭. ওই, পৃ. ৩৫-৩৬
৬৮. Maniruzzaman (1980), pp. 183-187
৬৯. Hossain (2013), p. 203
৭০. Maniruzzaman, Talukder (1994). *Politics and Security of Bangladesh*. UPL, Dhaka, p. 167
৭১. Ibid, p. 187
৭২. মুহম্মদুল্লাহ, পৃ. ১৪১
৭৩. আমানউল্লাহ
৭৪. চৌধুরী, মতিউর রহমান (২০১২), *কূটনীতির অন্দরমহল*, সূচীপত্র, ঢাকা, পৃ. ২১০-২১১
৭৫. ওই
৭৬. Ahmed, Emajuddin (1988). *Military Rule and the Myth of Democracy*, UPL, Dhaka, p. 65
৭৭. আলম, পৃ. ১১০-১১২
৭৮. শচীন কর্মকার
৭৯. খান (২০১৩), পৃ. ৮৫
৮০. মো. কামালউদ্দিন
৮১. Jayakar, Pupul (1995). *Indira Gandhi: A Biography*. Penguin Books, Gurgaon, Hariyana, pp. 288-289
৮২. Ibid, p. 292
৮৩. খান (২০১৩), পৃ. ২১১
৮৪. ওই, পৃ. ১০৬
৮৫. ওই, পৃ. ১০৯-১১০

৮৬. ওই, পৃ. ২০৩
৮৭. নির্মলেন্দু গুণ
৮৮. 'বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর তাঁকে নিয়ে রচিত প্রথম কবিতা', মৌলানা শেখ আবদুল হালিম, সংকলিত হয়েছে : গুণ, নির্মলেন্দু (২০১৮)। *একটি সন্তানসম্ভবা পাখির গল্প*। অবসর, ঢাকা, পৃ. ৭০।

পালাবদল

১. *ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫
২. ওই
৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ
৪. *গণশক্তি*, আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১; হোসেন, পৃ. ১১৫
৫. রনো, পৃ. ৩৪৭
৬. *The Bangladesh Observer*, 21 August 1975
৭. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ১৬৮-১৭১
৮. ওই; *দৈনিক বাংলা*, ২৫ আগস্ট ১৯৭৫
৯. The Bangladesh Gazette, Extraordinary, 30 August 1975, pp. 2565-66
১০. The Bangladesh Gazette, The Indemnity Ordinance, 1975, Ordinance No. XIX of 1975, 26 September 1975
১১. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ১৭১
১২. Jahan (2005), p. 174
১৩. Ibid
১৪. মো. কামালউদ্দিন
১৫. Dalim, pp. 440-441
১৬. আহমদ, শরমিন (২০১৪), *৩ নভেম্বর : জেলহত্যার পূর্বাপর*, ঐতিহ্য, ঢাকা, পৃ. ৪৬-৬১
১৭. Dixit, pp. 213-214
১৮. নূহ-উল-আলম লেনিন
১৯. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
২০. *সাম্যবাদ*, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ১৩-১৪
২১. সিরাজুল আলম খান
২২. Dalim, p. 441
২৩. মোরশেদ শফিউল হাসান
২৪. চৌধুরী, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন (২০০০), *এক জেনারেলের নীরব*

সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৯২-৯৩

২৫. মাহবুবুর রহমান

২৬. সালমা খালেদের একান্ত সাক্ষাৎকার, 'খালেদ মোশাররফ প্রো-ইন্ডিয়ান ছিলেন না', শাহাদাৎ চৌধুরীর বর্ণনা, *নিপুণ*, দ্বাদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৫

২৭. হুদা, নীলুফার (২০১১)। *কর্নেল হুদা ও আমার যুদ্ধ*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১২২

২৮. ওই, পৃ. ১৩৪

২৯. হামিদ, পৃ. ১৩৯-১৪০

৩০. আবু ওসমান চৌধুরী

৩১. নূরুল ইসলাম চৌধুরী, *ভোরের কাগজ*, ১৫, ১৬ ও ১৭ আগস্ট ১৯৯৪

৩২. সাইদুর রহমান

৩৩. শচীন কর্মকার

৩৪. Franda, Marcus (1982), *Bangladesh: The First Decade*, South Asian Publishers Pvt Ltd, New Delhi, pp. 261-262

৩৫. Ibid, p. 262

৩৬. হামিদ, পৃ. ১৯১; আহমদ (২০১৪), পৃ. ১৮৬

৩৭. ছফা (২০১১), 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল: একটি সেন্টিমেন্টাল মূল্যায়ন', পৃ. ৪০৬-৪০৮

৩৮. নূহ-উল-আলম লেনিন

৩৯. হোসেন (২০১৮), পৃ. ১৩৪-১৩৫

৪০. এস এম ইউসুফ

৪১. Dixit, p. 241

৪২. Maniruzzaman (1980), pp. 209-210

৪৩. The Bangladesh Gazette, Extraordinary, 31 December 1975, pp. 3326-37

৪৪. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ১৮৩

৪৫. লেনিন, নূহ-উল-আলম, সম্পাদিত (২০০৪), *গৌরবের ৫৫ বছর, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*, ঢাকা, পৃ. ২১০

৪৬. হাবিব, খালেদা (১৯৯১), *বাংলাদেশ : নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা* ১৯৭০-৯১, প্রকাশক: এ আর মুরশেদ, ঢাকা, পৃ. ১৪

উপসংহার

১. আহমদ, এমাজউদ্দীন (২০০১), *বাংলাদেশ : রাজনীতির সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির রাজনীতি*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৬

২. Razzaq, Abdur (1981). *Bangladesh: State of the Nation*. Shahitya Prakash, Dhaka, pp.13-15

৩. আহমদ (২০০১), পৃ. ২৬-২৭

৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*, প্রথম সর্গ, *মধুসূদন রচনাবলী* (১৯৯০), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পৃ. ১৪

৫. মতিউর রহমান, 'বঙ্গবন্ধু বাকশাল ও পনেরো আগস্ট', ক্রোড়পত্র, *প্রথম আলো*, ১৫ আগস্ট ২০০৫

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২০১৯), *সাধনা : জীবনের উপলব্ধি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৫২-৫৩

৭. রহমান (১৯৮৫), পৃ. ৯৪-৯৫

৮. Ahmed, Emajuddin (1988), pp. 43-67

পরিশিষ্ট ৪

যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে

আকা ফজলুল হক রানা : প্রকৌশলী। পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য। ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

আ স ম আবদুর রব : পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি, জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানে এর একটি অংশের সভাপতি . সাবেক মন্ত্রী। ২৮ অক্টোবর ২০১৫

আনোয়ার উল আলম : অবলুপ্ত জাতীয় রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এস এম হল ছাত্রসংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক (১৯৭০-৭২)। ২৭ মার্চ ২০১৬

আবু ওসমান চৌধুরী : লে. কর্নেল (অব.), মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার। ১৫ মে ২০১৮

আবু করিম : জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য। দৈনিক *গণকণ্ঠ* ও সাপ্তাহিক *রোববার*-এর সাবেক সহকারী সম্পাদক। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব। ১ এপ্রিল ২০১৭

আবু হেনা : চিকিৎসক। সাবেক ছাত্রলীগ নেতা। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জের একটি আসন থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৫ এপ্রিল ২০১৬

আবুল হাসিব খান : জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বিপ্লবী গণবাহিনীর ঢাকা নগর ইউনিটের সংগঠক. ২৫ অক্টোবর ২০১৫

আবুল কাসেম ফজলুল হক : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২২ মে ২০১৬

আমানউল্লাহ : এপিপি-এর চিফ রিপোর্টার, পিপিপির ব্যুরো চিফ, বিপিআইয়ের চিফ এডিটর, ইউপিআই, *ডেইলি টেলিগ্রাফ* ও ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদদাতা ছিলেন। পরে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ছিলেন। ১৮

ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ৫ অক্টোবর ২০১৬, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

আমীর হোসেন আমু : আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা। সংসদ সদস্য, সাবেক মন্ত্রী। ৪ জুন ২০১৯

আহমদ ছফা : কবি ও লেখক। দৈনিক *গণকণ্ঠ*-এর সাবেক সহকারী সম্পাদক। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

এস এম ইউসুফ : পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি, আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং পরে শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, অবলুপ্ত বাকশালের সাংগঠনিক সম্পাদক। ২১ অক্টোবর ২০১৫

কাজী ফিরোজ রশিদ : জাতীয় পার্টির টিকিটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য। সাবেক মন্ত্রী। আওয়ামী যুবলীগের সাবেক সংগঠক।

কামাল আহমেদ : ১৯৬০ ও সত্তর দশকের রাজনৈতিক পোস্টার আঁকিয়ে। ছাত্রলীগ ও জাসদের জন্য অনেক পোস্টার ও লোগো তৈরি করে দিয়েছেন। ঢাকার বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থায় শিল্প উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে কানাডাপ্রবাসী। ২৬ জানুয়ারি ২০১৫

কামাল উদ্দিন আহমেদ : তিতুমীর কলেজ ছাত্রসংসদের সাবেক সহসভাপতি, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম অভিযুক্ত সুলতান উদ্দিন আহমেদের ছোট ভাই। জুলাই-আগস্ট ২০১৩

গিয়াসউদ্দিন : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-ড্রেজার বিভাগের সাবেক গাড়িচালক। ১২ মার্চ ২০১৫

টুটুন চৌধুরী : সরকারি কর্মকর্তা। ১৫ আগস্ট আত্মগোপনে যাওয়ার সময় আবদুর রাজ্জাক কিছুক্ষণ তাদের বাসায় ছিলেন। ২৫ জুলাই ২০১৭

তোফায়েল আহমেদ : আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা। সংসদ সদস্য, সাবেক মন্ত্রী।

নাসির খান খিলেন : খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রতিবেশী। ফজলুল হক মনার ছোট ভাই। ২০ নভেম্বর ২০১৪

নির্মলেন্দু গুণ : কবি। ১৯ মার্চ ২০১৮

নূর খান : জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাবেক পরিচালক। ২৩ মার্চ ২০১৬

নূহ-উল-আলম লেনিন : বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য। লেখক ও গবেষক। ১৩ জুলাই ২০১৭

নেহাল করিম : অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২২ মে ২০১৬

বদিউল আলম : ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক, জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, জাসদ-সৃষ্ট গণবাহিনীর কুমিল্লা জেলার কমান্ডার। বর্তমানে সাংবাদিক। জুলাই ২০১৪

মতিউর রহমান চৌধুরী : *দৈনিক মানবজমিন*-এর সম্পাদক, অবলুপ্ত *বাংলার বাণী*র রিপোর্টার। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

মতিউর রহমান : সম্পাদক, *প্রথম আলো*। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য, সাপ্তাহিক *একতা* এবং দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এর সাবেক সম্পাদক। ২৮ জুলাই ২০১৬

মনিরুল ইসলাম : ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি। জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য। জাসদ-সৃষ্ট বিপ্লবী গণবাহিনীর উত্তরাঞ্চলের পলিটিকাল কমিসার, জাতীয় শ্রমিক জোটের একাংশের সাবেক সভাপতি। ২০ মার্চ ২০১৭

মহিউদ্দিন আহমদ : সাবেক পররাষ্ট্র সচিব। ১০ জুন ২০১৯

মাসুদ খান : ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক। বর্তমানে ব্যবসায়ী। ১৫ এপ্রিল ২০১৭

মাহফুজ উল্লাহ : ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) সাবেক সংগঠক, সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*র সাবেক সহকারী সম্পাদক, লেখক ও গবেষক। ২৪ আগস্ট ২০১৭

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি। ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি, ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি। ২৭ জুন ২০১৮

মুনতাসীর মামুন : লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। ১৪ আগস্ট ২০১৭

মেহেরুন্নেসা চৌধুরী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক শিক্ষক, শামসুন্নাহার হলের সাবেক প্রভোস্ট এবং ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) স্টুডেন্টস কাউন্সেলিং অ্যান্ড গাইডেন্স-এর সাবেক পরিচালক। ২৭ আগস্ট ২০১৭

মোরশেদ শফিউল হাসান : লেখক ও গবেষক। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

মো. কামালউদ্দিন মোল্লাহ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক। বর্তমানে আরবান নামের একটি এনজিওর সমন্বয়কারী। ১১ জুলাই ২০১৭

মো. কামালউদ্দিন : ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং মুহসীন হল শাখার সাবেক সভাপতি, মুহসীন হল ছাত্রসংসদের সহসভাপতি (১৯৭০-৭২)। ১৯৭৩ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। মালয়েশিয়া ও ইরাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১২ জুন ২০১৬

মো. শফিকুল করিম : সিনিয়র সাংবাদিক। দিল্লিতে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাবেক ব্যুরো প্রধান। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

মোশতাক আহমেদ : জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক, বিপ্লবী গণবাহিনীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংগঠক। বর্তমানে গণফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক। ২৮ এপ্রিল ২০১৬

মোস্তফা মহসীন মন্টু : যুবলীগের সাবেক চেয়ারম্যান। গণফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। ১৭ অক্টোবর ২০১৮

মোহাম্মদ মারুফ রশীদ : সিলেটের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা। ১৯৭১ সালে বিএলএফ (মুজিববাহিনী)-এর সদস্য। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ব্যাচের কমিশন্ড অফিসার, মেজর পদমর্যাদায় থাকাকালে ১৯৮১ সালের মে মাসের ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বরখাস্ত ও দণ্ডিত। ১৭ অক্টোবর ২০১৪

মাহবুবুর রহমান : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক নায়েব সুবেদার। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সংগঠক। ৭ নভেম্বর সিপাহী অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা। ১০ এপ্রিল ২০১৬

মাহবুব তালুকদার : কবি ও কথাসাহিত্যিক। রাষ্ট্রপতির সাবেক সহকারী প্রেস সচিব। সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনার। ৩০ এপ্রিল ২০১৫

রায় রমেশ চন্দ্র : খুলনার বিএল কলেজের আওয়ামী-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাকশালের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য (১৯৮০-৯২)। ১০ ডিসেম্বর ২০১৫

রায়হান ফিরদাউস : জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সাহিত্য সম্পাদক, জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য। ১২ মার্চ ২০১৭।

রেহমান সোবহান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক চেয়ারম্যান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। বর্তমানে 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের' চেয়ারম্যান। ৪ এপ্রিল ২০১৫

রেজাউল হক মুশতাক : ছাত্রলীগের সাবেক সহ-দপ্তর সম্পাদক, জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক দপ্তর সম্পাদক। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন : পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ, খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকারের প্রতিমন্ত্রী, জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব। বর্তমানে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান। ৯ অক্টোবর ২০১৫

শচীন কর্মকার : অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন পান। ২৭ নভেম্বর ২০১৫

শরীফ নুরুল আম্বিয়া : জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি। জাসদ-সৃষ্ট বিপ্লবী গণবাহিনীর দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পলিটিক্যাল কমিসার। বর্তমানে জাসদের একাংশের সভাপতি। ১৫ মার্চ ২০১৭

শেখ শহীদুল ইসলাম : ছাত্রলীগের একাংশের সাবেক সভাপতি, অবলুপ্ত জাতীয় ছাত্রলীগের (বাকশালের অঙ্গসংগঠন) সাধারণ সম্পাদক। এরশাদ সরকারের সাবেক মন্ত্রী, জাতীয় পার্টির একাংশের মহাসচিব। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬

শফিকুল ইসলাম ইউনুস : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক কর্মী। বর্তমানে *দৈনিক ঢাকা*-এর সম্পাদক।

সাইফুদ্দিন কাদের চৌধুরী : পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সাবেক স্পিকার ও কনভেনশন মুসলিম লীগের সাবেক সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরীর মেজো ছেলে। তাঁর আগ্রাবাদের (চট্টগ্রাম) অফিসে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় ছাত্রলীগের সাবেক সাহিত্য সম্পাদক রায়হান ফিরদাউস উপস্থিত ছিলেন। আগস্ট ১৯৮৫

সাইদুর রহমান : ব্যবসায়ী। শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও জাসদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

সালিম সামাদ : সাংবাদিক। যুদ্ধাপরাধ আইনের খসড়া প্রণেতা খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন আহমদের দৌহিত্র। ২০ অক্টোবর ২০১৫

সিরাজুল আলম খান : ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। বিএলএফ (মুজিব বাহিনী)-এর অন্যতম সংগঠক, জাসদের প্রতিষ্ঠাতা। নভেম্বর ২০১৩-মে ২০১৪

সৈয়দ আবুল মকসুদ : লেখক ও গবেষক। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাবেক সাংবাদিক। ৮ মে ২০১৯

সৈয়দ রেজাউর রহমান : ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি, যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য, ধানমন্ডি ল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটর। ২৬ ডিসেম্বর ২০১৬

✣